সূচী।

কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

(চতুর্থ বৎসর)

কল্পনার গান

(রাগিণী চিত্রাগৌরী।)

কল্পনে গা' লো আবার।
ভারতীর কোলে বালিকা তুই, গা' লো আবার।
অতি ক্ষুদ্র মেয়ে তুই, আধ-ফোট ভাষ,
কথা কহিতে যায় জড়া'য়ে;
বালিকাপরাণ তোর না জানি কেমন,
ফুলটি ফুটিলে
চাঁদটি উঠিলে
আকাশে হেরিলে ভাঙা ভাঙা মেঘ,
ভাবের বুকেতে শুয়ে শুয়ে কত
স্বপনের মত
অস্ফুট ভাষায়
হাসি-কান্না-মাখা গান গা'স ধীরে ধীরে।
তুই লো সারিকা সাহিত্য-কাননে
নীরবতা তোর সাজে কি লো কভু?
কল্পনে গা' লো আবার।
ভারতীর কোলে বালিকা তুই গা' লো আবার।

ছিঁড়িয়াছে তার, বীণা বাজেনা'ক আর
অযতনে তাই রেখেছ ফেলিয়ে,
লহ গুছাইয়া অই, দাও গিরা আঁটি,
কর দেখি ধীরে আঙুল আঘাত,
ওঠে না মূর্চ্ছনা—ফোটেনা ক সুর
গলা গিয়েছে ভাঙিয়ে,
সে পুরাণ গান মনে নাহি আর;
হ'ক মেনে সব,
চেয়ে দেখ অই
বসন্ত পঞ্চমী আজি লো এ বঙ্গে
ভাঙা ঘরে হের খেলিয়াছে চাঁদ,
আনন্দে আজি লো গাহিবার দিন,
গায়িতেছে পিক,
গায়িছে ভ্রমরা,
তুই কি লো শুধু থাকিবি নীরবে?
কল্পনে গা' লো আবার,
ক্ষুদ্র মেয়ে--ক্ষুদ্র শক্তি তোর—গা' লো আবার।
ভারতীর কোলে বালিকার বোলে গা' লো আবার।

সভ্যতার অত্যাচার।

সভ্য আগে আমরা বুঝি ছিলাম, বুঝি বা ছিলাম না। কিন্তু সে সব অনেক কথা; সে সব কথায় কাজ নাই। কোন্ কালে কবে কি ছিলাম না ছিলাম তাহা লইয়া আস্ফালন করিলে বর্ত্তমান অবস্থার পূরণ হয় না। কোন্ দিন পেট ভরিয়া খাইয়াছিলাম তাহা বলিলে আজিকার ক্ষুধা মেটে

না। বর্ত্তমান ভুলিয়া অতীত কাহিনী কহিয়া স্পর্দ্ধা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আজ কাল দেখিতে পাই ইহার বিপরীত একটা ঢেউ উঠিয়াছে—সকল কাজেই প্রায় অতীতের দোহাই আরম্ভ হইয়াছে। বিড়ম্বনা।

অতীতের কথাটা না তোলাই বুঝি ভাল ছিল। সে দোহাই দিলে এ প্রস্তাবের যে কিছু গুরুত্ব বাড়িবে এমন ভরসা নাই, বরং উল্টোৎপত্তি হইবারই সম্ভাবনা। আমাদের অতীত ইতিহাসের সহিত "আর্য্য" কথাটার বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পুরাকালের সে কথা তুলিতে হইলে আমাদিগকে "আর্য্য-সন্তান" বলিয়া পরিচয় দিতেই হইবে, না দিলে চলে না। আমরা আর্য্য-সন্তান ইহাই আমাদের স্পর্দ্ধার পরাকাষ্ঠা—এই কথাটীতেই এই প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি; কিন্তু আর এ কথা চলে না। ইহার উপরেই ভিত্তি স্থাপন করিয়া যে আপনাদিগের প্রাচীনতম সভ্যতার বিষয় বলিতে যাইবে আজকালের বাজারে সে বাতুল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পণ্ডিত-প্রধান Maxmüller স্পষ্টই প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, আর্য্য শব্দ ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ঋ ধাতুর অর্থ চাষ করা, সুতরাং আর্য্য অর্থে চাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখিতে পাই, চাষায় আর সভ্যে বিস্তর প্রভেদ—আকাশ পাতাল তফাৎ। যে আর্য্য চাষা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহার ইতিহাস ধরিয়া আমরা সভ্য ছিলাম কি না ছিলাম তাহার বিচার করা মূঢ়ের কাজ নয় তো আর কি বলিব? তাই বলিতেছিলাম, অতীতের কথাটা না তোলাই বুঝি ভাল ছিল।

যাহা হউক, আজ কাল আমরা যে ভারি একটা সভ্য হইয়াছি—উনবিংশ শতাব্দীর ঘোর আবর্ত্তে পড়িয়া অসভ্যতার নিম্নতম স্তর হইতে ভাসিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি—প্রেতের অন্ধকার হইতে স্বর্গের আলোকে আসিয়াছি ইহা আমাদের মনে মনে বড়ই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের আমরা এতদূর বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি যে ইহা আমাদের প্রাণবায়ু হইয়া উঠিয়াছে। সভ্যতা ভিন্ন মানুষ কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারি না। "অসভ্য" এই কথাটা শুনিলেই শিহরিয়া উঠি, অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে। সে স্থান হইতে দূরে পলাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। অন্য পরে কা কথা, পিতারও অসভ্যতা দেখিলে তাঁহাকে পরিত্যাগ

করিয়া অন্যত্র যাইবার চেষ্টা দেখি। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকেও যখন অনেকের অসভ্যতা ঘুচিল না তাহা দেখিয়া চমকিত হই; হতভাগ্য ভারতের অদৃষ্টে যে কত দুঃখ আছে তাহা ভাবিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া থাকি। তখন যথাশক্তি মঠে, মন্দিরে, চর্চ্চে, মসজিদে, পুলপিটে কি বেদীতে অথবা ওপনএয়ারে যেখানে পারি দাঁড়াইয়া জগতের নরনারীর জন্য আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করি।

আমরা যে এতদূর করি সে কেবল আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা প্রকৃত সভ্য হইয়াছি, আর অন্যে সেইরূপ সভ্য হইতে পারিল না ইহাই দুঃখ। আমাদের নিজের সভ্যতার উপর যে বিশ্বাস তাহা বিশ্বাস মাত্রেই অবস্থিত থাকে না, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে তাহাকে পরিণত করিয়া থাকি। একজন সেকেলে লোককে দাঁড় করাও আর আমাদের মধ্যে একজনকে দাঁড়াইতে বল, প্রভেদ এখনই বুঝিতে পারিবে। যে সভ্য সে সকল বিষয়েই সভ্য। কিসে নয়? আমরা এখন কেশে সভ্য, বেশে সভ্য, চলিতে সভ্য, বলিতে সভ্য, হাঁসিতে সভ্য, কাসিতে সভ্য, দানে সভ্য, ধ্যানে সভ্য, কর্ম্মে সভ্য, ধর্ম্মে সভ্য, স্বাধীনতায় সভ্য, অধীনতায় সভ্য, আহারে সভ্য, বিহারে সভ্য, আচারে সভ্য, বিচারে সভ্য, বিদ্যায় সভ্য বুদ্ধিতে সভ্য, অধিক কি আপনাদের নামগুলি পর্য্যন্ত আগে সভ্যতার হাপরে পোড়াইয়া তাহা হইতে সেই পৈতৃক খাদমলা বাদ দিয়া তবে ব্যবহার করিয়া থাকি। আর যে অসভ্য? ছিঃ তাহার কথায় আর কাজ নাই।

কিন্তু জগতের কেমনই অসম্পূর্ণ অবস্থা, কোন কিছুই যেন পূর্ণ হইতেই পারে না। পূর্ণ হইলেও, কতকগুলা লোকের যেন এমনি প্রতিজ্ঞা তাহাকে কোন মতে পূর্ণ বলিতে দিবে না। কাহারও ভাল তাহারা দেখিতে পারে না, দেখিলে চোক টাটাইয়া উঠে, তৎক্ষণাৎ তাহাতে নানা রকমের কথা আনিয়া উপস্থিত করে। এমন যে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকময় সভ্যতা, ইহাতেও লোকে কত কথা কয়। অসভ্য বৃদ্ধগণ—যাঁহাদিগের প্রতি এই বর্ত্তমান সভ্যতা Old fool বলিয়া ঘৃণায় তর্জনী প্রদর্শন করিয়া থাকে—তাহারা তো বলিবেই, তাহাদের কথা না হয় ধরিলাম না; কিন্তু যাঁহাদিগকে

মানুষের মত বলিয়া ভাবি, তাঁহারাও যে আবার কি সব কথা বলিয়া বেড়ান! এই এক জন তো "একাল ও সেকাল" বলিয়া এক খানা প্রকাণ্ড বই-ই লিখিয়া ফেলিলেন। সকলের অপেক্ষা বেশি দুঃখ এই যে, যে উচ্চশিক্ষা এই সভ্যতার একমাত্র প্রসূতী, কেহ কেহ সেই শিক্ষার ঘাড়ে দোষের পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে-সে লোকে নয়। স্পেন্সর* কেন তাহারাই একজন প্রধান নেতা। কথাটার অর্থ কি?

কখন কখন তাই ভাবি, কথাটা বুঝি নিতান্তই নিরর্থক নয়, আমাদের শিক্ষার গোড়ায় বুঝি কিছু খুঁত আছে, বুঝি আমাদের এ সভ্যতা আসল খাঁটি সভ্যতা নয়। যে জিনিষটা খাঁটি তাহাতে কলঙ্ক ধরিতে পারে না। আমাদের এই সভ্যতা যদি খাঁটি হইত তবে ইহারই মধ্যে ইহাতে এত কলঙ্ক ধরিত না। তবে বলিতে পার, লোকে জোর করিয়া ধরাইতেছে— উপায় কি? কিন্তু যদি তাহাই হইবে, তবে ইহা অহরহঃ সমালোচনার তীব্র আগুনে পুড়িয়াও আজিও আপনার খাঁটিত্ব বজায় রাখিতে পারিতেছে না কেন? লোকে বলে, আসল অপেক্ষা নকলের চাক্‌চিক্য অধিক, খাঁটি সোণা অপেক্ষা যে সোণায় তামা ভাঁজাল থাকে তাহার উজ্জ্বলতা বেশি হয়; কিন্তু আসল কি নকল, খাঁটি কি ভাঁজাল-দেওয়া ব্যবহারে তাহা ধরা পড়ে। এও কি তবে তাই?

যাহাই বলি, দেখিয়া শুনিয়া আমাদের এ সভ্যতার উপর একটা সন্দেহ হয় বটে। সকল বিষয়ই কিছু দেখিবামাত্র বুঝিয়া উঠা যায় না, ব্যবহার করিয়া তাহার ফলাফল দেখিয়া তবে সেটা ভাল কি মন্দ তাহা স্থির করা যায়। দৃষ্টিমাত্র অনেক জিনিষের বাহ্যশোভা মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, কিন্তু তাহার অন্তরের গুণ তাহার সহিত না মিশিলে বুঝিয়া উঠা বড়ই দুষ্কর। দেখিতেছি, আমাদের এ সভ্যতার বাহ্য-শোভা খুব জাঁকাল। যাহা কিছু

* And this it is which determines the character of our education. Not what knowledge is of most real worth, is the consideration; but what will bring most applause, honour, respect—what will most conduce to social position and influence—what will be most imposing.

H. SPENCER'S *Education*.

এদেশে ছিল না, সভ্যতা সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে তাহা এদেশে আনিয়া দিয়াছে। কোট্ পেণ্টালুন, ফ্রগ্ গাউন, বুট মোজা, ষ্টিক্ চশমা চেন চুরুট—হরেক রকম ভাল ভাল জিনিষের আমদানি হইয়াছে। Freedom, Fraternity, Female Emancipation, Mass-Education প্রভৃতি লম্বাচৌড়া অনেক গুলা কথা সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া এ দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। দেখিতে শুনিতে বড়ই ভাল। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত সভ্যতা? 'লম্বশাটপটাবৃত' হইয়া কথায় কথায় ইংরাজির তীব্র রসাল মধুর বুক্‌নি ব্যবহার করাকেই কি যথার্থ সভ্যতা বলে? বাহ্য শোভায় আকৃষ্ট হইয়া অনেক দিন ইহার উপাসনা করিয়াছি; করিয়া এতদিনে বুঝিয়াছি, যেন ইহা সভ্যতা নহে—যেন—যেন আর কিছুই নহে—কেবল সাহেবিয়ানা মাত্র।

সভ্যতাই হউক, আর সাহেবিয়ানাই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইত না, যদি ইহার ফল উপকারক হইত। আগে বুঝিতে পারি নাই, তখন কলেজের উষ্ণ মস্তিষ্ক সংসার-বায়ু-হিল্লোলে শীতল হয় নাই, এখন রক্ত পাতলা হইয়া আসিয়াছে, এখন বুঝিতে পারিতেছি, এ সভ্যতা মন্দ বৈ ভাল নয়, ইহাতে অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নাই. ইহার উপকারের কথা চুলায় যাক্, ইহার অত্যাচারে প্রাণ যায়। দেখিতেছি. দিন দিন ইহার অত্যাচার বাড়িয়া উঠিতেছে। পুত্র পিতাকে মানে না, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে ঠেলিয়া যায়, পত্নী পতির উপর প্রভুত্ব করে। দেখিতেছি সকলই বিচিত্র। ধার্ম্মিক ধ্যান করেন ঘড়ি খুলিয়া, পাছে ঘড়ির কাঁটাটা নিরূপিত সময়ের এক সেকেণ্ড এদিক ওদিক হয়; দাতা দান করেন সংবাদপত্রে তাঁহার নাম ঘোষিত হইবে বলিয়া; বন্ধু বন্ধুকে দেখিলে আলাপ না করিয়া একবার ঈষৎ ঘাড়টি নাড়িয়া চলিয়া যান—তিনি সময়ের মূল্য বুঝেন, অনর্থক বাক্যব্যয়ে পরস্পরের মূল্যবান্ সময় অপব্যয় করিতে চাহেন না; একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যে এই প্রথার পক্ষপাতী সে ঘোর মূর্খ, সে Political Economy কিছুই বুঝে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে যে শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া যাহারা 'হম্‌বগ' বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে, আবার তাহাই Madame Blavatsky যখন তাঁহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশ করিতেছেন তখনই তাহাদিগের তাক্ লাগিয়া যাইতেছে। দেখিতেছি—

ছেলেগুলো বাপের সুমুখেই টেরি কাটে। ছুঁড়িগুলো বুট পায়ে দিয়ে হুট করে ছুটিয়া বেড়ায়; গৃহিণীর আর গৃহকার্য্যে মন নাই, মাথাধরা, বুকজ্বালা, মনভার লইয়াই তো বিব্রত, শরীরটা কি ভাল, তা কাজ করিবেন কখন? যদি বা একটু সময় হইল ত নাটক নভেল, কাঁটা কারপেট বা সোপ তোয়ালে লইয়াই দেখিতে দেখিতে দিনটা কাটিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আবার যে বাড়ীর অন্দর মহলে—হায় তাহাকে অন্দর কেন বলি, সে তো সদর অপেক্ষা অন্দর আরও আলোয় আলোময়—যেখানে সভ্যতার বেশী প্রাদুর্ভাব, সেখানে—সেখানে আর কি বলিব—সেখানে সে ত স্ত্রী নয় "যেন পুলিষ!" প্রকৃতির বাঁধটা ভাঙিয়া ফেলিয়া মেয়েগুলো পুরুষের সত্ব দখল করিতে চাহে। আগে হইতেই আপনাদের নামগুলো "সারদা সুন্দরী কাঞ্জিলাল, ইন্দুবালা মাস্‌চটক". ইত্যাকারে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া ফেলে। ওদিকে আবার সৃষ্টিধর পরামাণিকের ছেলে নিতাই N. Biswas হইয়া জাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছে, আপিষে আপিষে টো টো করিয়া ঘুরিয়া তাহার চাকুরি মেলে না, তাহার বুড়া বাপ আর সংসার চালাইতে পারে না, তথাপি সে জাতি ব্যবসা করিবে না, অথবা পৈতৃক যে দুই এক কুড়ো ভুঁই আছে তাহার চাস আবাদে মন দিবে না; সে সভা করে, বক্তৃতা দেয়, আর বলিয়া বেড়ায় "আমরা সকলেই যখন এক পিতার সন্তান, তখন ব্রাহ্মণ ও যে আমি ও সে, ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের এক পংক্তিতে বসিয়া খাইতে দোষ কি?" শুনিতেছি সে শীঘ্রই নাকি "ব্রাহ্মণমুণ্ডচ্ছেদিনী" না কি এমনি একটা নামে একখানা প্রকাণ্ড বৈ ছাপাইবে। আবার শুনিতেছি, অনেকে নাকি মিলিয়া একটা ধর্ম্মঘট করিয়াছে যে, যখন আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান তখন আবার বাবা কে? সেই অনন্ত অসীম অপরিমেয় পরম পবিত্র প্রেমময় পিতাকে সত্য জানিয়াও আবার পার্থিব পিতাকে প্রণাম করা সে তো ঈশ্বরের অবমাননা—সে তো ঘোর নাস্তিকতার পরিচয় মাত্র! এ হলো কি? ইহাই কি সভ্যতার ফল? ইহা ভাবিলে ভয় হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে, অপরন্তু কিং ভবিষ্যতি ভাবিয়া অন্তরাত্মা আকুল হইয়া পড়ে।

কিন্তু কেন এমন হইল? এরূপ হইবার একটা কারণ বুঝিতে পারি।

বুঝিতে পারি, যাহা কিছু অকালপক্ক তাহা কখনই ভাল হয় না। জ্যেঠা ছেলেকে কেহই দেখিতে পারে না, তাহার দৌরাত্ম্যে লোকে ঝালাপালা হইয়া উঠে। কাঁঠাল ইচোড়ে পাকিলে তাহার স্বাদ পাওয়া যায় না, খাইলে অজীর্ণে কষ্ট পাইতে হয়। আমাদের এ সভ্যতা কেবল অকালকুষ্মাণ্ড মাত্র। যাহা যুগ যুগান্তের কাজ তাহা আমরা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিতে চাহি। সকল বিষয়ই কালসাপেক্ষ! আবার সেই কালের মধ্যে বিষয়টীকে লালনপালন করিয়া তবে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হয়। চারা পুতিলেই পর দিন তাহাতে ফল জন্মে না। সময়ের আবশ্যক করে। সেই সময়ের ভিতর আবার তাহাকে যতনে বর্দ্ধিত করিতে হয়। গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হয়, জল সেচন করিতে হয়, যাহাতে আলোক ও উত্তাপ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এত করিলে তবে সে চারাটি কালে প্রকাণ্ড গাছ হইয়া ঈপ্সিত ফল প্রদান করে। কোন জিনিষই তাহার ঠিক্ সময়টি না আসিলে ফলোপধায়ী হয় না। বরং অসময়ে সংস্কার-চেষ্টায় বিপরীত ফলই ফলিয়া থাকে। এই জন্যই ফ্রান্স ও জার্ম্মণিতে সংস্কারকগণ স্বাধীনতা প্রচার করিতে গিয়া পরাধীনতাকে অধিকতর বদ্ধমূল করিয়াছিলেন, উপধর্ম্মকে লোপ করিতে গিয়া তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়মূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন।* সময়ে আপনাদিগকে কোনও কার্য্যের জন্য উপযোগী করিয়া না তুলিয়া যে কোন কাজ কর তাহা কখনই সুসিদ্ধ হইবে না। ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ডেলহৌসি (Lord Dalhousie) যখন ভারতবর্ষের শাসনভার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার গৃহ মধ্যে তাঁহার লিখিত এক খানি পত্র পাওয়া গিয়াছিল। সেখানি খামের ভিতর মোড়া। তাহার উপর লেখা, "ইহা বিশবৎসরের মধ্যে কেহ খুলিও না।" সেই পত্রের ভিতর কি লেখা ছিল? তাহার মধ্যে শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তনোপযোগী কতকগুলি নূতন নিয়ম লিপিবদ্ধ ছিল; কিন্তু

* Thus for instance, in France and Germany, it is the friends of freedom who have strengthened tyranny, it is the enemies of superstition who have made superstition more permanent.

BUCKLE'S *History of Civilization.*

ডেলহৌসি জানিতেন, বিশ বৎসরের মধ্যে সে প্রকার পরিবর্ত্তন কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না, হইলেও তাহাতে শুভ ফল উৎপন্ন হইবে না। তাই তিনি তাহার খামের উপর বড় বড় অক্ষরে ঐরূপ নিষেধ-বাক্য লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে। উপযোগী না হইলে কিছুই করা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্স কেন আপনার স্বাধীনতা হারাইয়া নেপোলিয়নের একনায়কত্ব শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল? এত করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিল না কেন? সেও ঠিক্ এই জন্য। ফ্রান্স তখন আপনি তেমন উপযুক্ত হইতে পারে নাই।* বলিয়াছি তো উপযুক্ত না হইলে কিছুই করিয়া উঠা যায় না। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ইহা পরিণতিবাদের মূলতত্ত্ব। যে ইহা না বুঝে, সে আপনিই ঠকে। কাঁঠালকে পাকিবার সময় না দিয়া, জোর করিয়া যে ইচোড়ে পাকাইয়া খাইতে যায়, তাহার কাঁঠাল খাওয়া হয় না. সে কেবল নিতান্তই ভুতুড়িই চোষে।

আর একটা কথা আছে। আমরা যাহাকে "সভ্যতা সভ্যতা" করিয়া আজকাল পাগল হইয়াছি, মূল ধরিতে গেলে, ইহা আমাদের বৈদেশিক মিশ্রণের সংঘর্ষজাত ফল মাত্র। কোনও সমাজে হঠাৎ এইরূপ একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে প্রায় এইরূপই হইয়া দাঁড়ায় বটে। এই সমাজ-বিঘট্টনের মধ্যে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। একটি নাশক-শক্তি, আর একটী গঠন শক্তি। একটি ভাঙে, আর একটি গড়ে। যে ভাঙে, সে কেবলই ভাঙিতে থাকে; কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা রাখা উচিত কোন্‌টা ভাঙা উচিত, ততটা বিষয়ের অবসর তাহার থাকে না; অথবা সে খেয়ালই তাহার নাই। যে যে জিনিষ সে ভাঙিয়া ফেলে, তাহার ধ্বংসে সমাজের মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে, তাহার স্থানে আর একটা কিছু গড়া উচিত কি না, সে সব বিষয়ে ইহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ধ্বংস করাই

---

* France failed through the want of that moral preparation for liberty without which the blessing cannot be secured. She was not ripe for the good she sought.

CHANNING.

ইহার উদ্দেশ্য। ধ্বংস করিয়াই ইহার তৃপ্তি। আর যে শক্তি গড়ে, সে সেই ভাঙ্গাচোরা জায়গায় নূতন জিনিষ গড়িতে চেষ্টা করে, শূন্যস্থল পুরণ করিতে উদ্যোগী হয়। ইহারও দৃষ্টি সেই এক দিকে; লক্ষ্য সেই এক। কিন্তু এই শক্তিটি বড় দুর্ব্বল ও চিরক্রিয়। কার্য্যে বড়ই ধীর। এক দিনে যাহা ভাঙা যায়, তাহা হয়তঃ বহুযুগেও গড়িয়া উঠা যায় না। কোন অণু-সমষ্টিকে সবলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা যত সহজ, সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পরমাণু হইতে সেইরূপ একটি অণুসমষ্টি সৃষ্টি করা কখনই তত সহজ নহে। ধীরে ধীরে ধীরে এই গঠনশক্তি সমাজে আপনার কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্ত যখন সমাজের লোকেরা অসহিষ্ণু হইয়া, ইহার এই চিরক্রিয়তায় উত্যক্ত হইয়া, ইহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে আরম্ভ করে; তখন ইহা নিতান্তই নাচারে পড়িয়া, আপনার গন্তব্য-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া, তাহার স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তখন ইহা যাহা করে, তাহা ভাল কি মন্দ তাহা লক্ষ্য থাকে না, অনিষ্টের স্থানে ইষ্ট করিতেছে, কি ইষ্টের স্থানে অনিষ্ট করিতেছে সে বিষয়ে মন দেয় না, উন্নতি অবনতির দিকে দৃক্‌পাত নাই—তখন ইহার একমাত্র চেষ্টা কিসে আপনার কার্য্য সারিতে পারিবে। সে সম্মুখে যাহা পায়, তাহাই লইয়া কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি শূন্য স্থানগুলি পুরাইতে চেষ্টা পায়। সুতরাং তখন যে নূতনের সংঘর্ষে পুরাতনের লয় হইতেছিল, এই শক্তি সেই নূতন লইয়াই আপনার কার্য্য আরম্ভ করে। নূতনের কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ ততটা বিচার তখন করে না। তাহাতে হয় কি? তাহাতে প্রায়ই দেখিতে পাই, দেব গড়িতে বাঁদর হইয়া পড়ে। পরিহাসের কথা নহে। সাক্ষী ইহার ইতিহাস। প্রথম চার্লসের (Charles I) সময়ে যখন পিউরিটানগণ সমাজে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, আর সেই বিপ্লবে নাশকশক্তি যখন চারিদিকে আপনার ভৈরব নৃত্য প্রদর্শন করিতে-ছিল—রাজা কোথায়?—পোপ কে?—হোয়াইট হলের রাজমঞ্চ একজন কৃষকের পদধূলিতে ধূসরিত—তখন এই গঠনশক্তি ধীরভাবে আপনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। সে কার্য্যের ফল কবে কি প্রকারে ফলিত বলিতে পারি না; কিন্তু বিপ্লবকারীগণ তখন উন্মত্ত, সে ধীরচেষ্টা সহিতে পারিল না। তখন হইল কি? রাজাময় স্বেচ্ছাচারিতার ভীষণ ক্রীড়া আরম্ভ হইল।

এই গঠন শক্তিকে আপনার ভাবে কার্য্য করিতে না দিলে প্রায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তবে যে এ শক্তি আপনার ভাবে কাজ করিলে অভ্রান্ত ভাবে সকল সময়েই ভাল-বৈ মন্দ গড়িবে না, ইষ্ট বৈ অনিষ্ট করিবে না, এমত স্থির বলা যাইতে পারে না। তবে এটা স্থির যে, পনর আনা ভাগ ভাল হইবার সম্ভাবনা। কারণ প্রকৃতি ইহাই চায়। নদীর একদিক্ ভাঙে, একদিক্ গড়ে। সমাজেরও সেইরূপ একদিক ভাঙিলে, অন্যদিক গড়িতে আরম্ভ হয়। তবে একটু সময় আবশ্যক করে বটে; কিন্তু সেজন্য অধৈর্য্যে কাণ্ডাকাণ্ডশূন্য হইয়া কার্য্য করিলে কার ক্ষতি?

দুঃখের বিষয়, যার ক্ষতি সে ক্ষতি কি বৃদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলেই বা এমন দশা ঘটিবে কেন? সে তখন উন্মত্ত হইয়া পড়ে। যাহা ছিল তখন তাহা নাই। সে অভাবে কষ্ট বোধ করে। তখন উদ্-ভ্রান্তের ন্যায় সম্মুখে যাহা পায় তাহা দিয়া সেই অভাব পূরণ করিতে চেষ্টা পায়। পুরাতন ভাল গাছটির স্থানে না হউক, কাঁটা গাছটিরও স্থানে স্বতঃ নূতন একটি কাঁটা গাছ পতিয়া বসে। ভাল গাছটির বদলে কাঁটাগাছ হইলে তাহার তো কথাই নাই। যদি কাঁটাগাছের বদলেও হয় তাহাতেও অশেষ যন্ত্রণা। পুরাতন গাছটির কাঁটা গোঁজা আমাদের সহা অভ্যাস থাকে, তাহাতে তত অধিক কষ্ট হয় না, কিন্তু নূতনটির কাঁটার ছড়ে আঁচড়ে শেষ জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হয়। সেই জ্বালা যতক্ষণ না ধরে ততক্ষণ চৈতন্য হয় না। ততক্ষণ বুঝিতে পারে না, কি হইতে কি হইয়াছে, কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসিয়াছে। এমন লোকও হয় ত আছে ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। অন্যে বুঝাইতে গেলে চটিয়া যায়। হয়ত বলিয়া বসে "জ্বালা হউক যন্ত্রণা হউক, সে যার তারই আছে, অপরের তাহাতে কি হে বাপু?" উত্তম কথা। কিন্তু অপরের মাথা ব্যথা হইত না, যদি সে জন্য অপরকে ভুগিতে না হইত—যদি তাহার একের কার্য্যের ফলফিলে সমাজে ভাল মন্দ না ঘটিত। জানা উচিত, এ প্রকার কার্য্যের ফল আপনাতে বা আপনার পরিবারমধ্যেই নিবদ্ধ থাকে না, ইহা সমাজে উপগত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রে আপনার কার্য্য করিতে চেষ্টা পায়। জানা উচিত, মানুষ আপনার শরীর ও মনের উপরই

যদৃচ্ছা আধিপত্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার কার্য্যের জন্য অপরকে ফলভাগী করিবার তাহার কোনও অধিকার নাই। মিল্ (Mill) যে এত স্বাধীনতার গুণ গাহিয়াছেন, তিনিও এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।* তাঁর কাঁটার আঁচড়ে তিনি আপনিই জ্বলুন বা যাহাই হউন, কিন্তু অপরকে জ্বালাইবার তিনি কে?

আর কেনই বা আমরা এরূপ করিতে যাই? আমাদের অভাব কিসের? অন্যের যাহা আছে, আমাদের যদিই তাহা না থাকে, তবেই কি আমরা সেটা একটা ভারি অভাব বলিয়া তাহা পূরণ করিবার জন্য একেবারে লালায়িত হইয়া পড়িব? বানরের যে একটা অঙ্গ বিশেষ বেশী আছে আমাদের তাহা নাই বলিয়া সেই অভাবটার জন্য বিশেষ আকুল হইয়া তাহা পূরণের জন্য কাহাকেও তো বড় একটা আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। আমাদের এ বিলাতি সভ্যতা না-ই বা হইল! যাহা ছিলাম তাহাই থাকিলে দোষ কি? এ সাহেবিয়ানা কেন? এ সভ্যতার অত্যাচারে যে প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে! তাই বলি, হে সমাজ-সংস্কারক, হে সভ্যসমুত্থানপক্ষপাতিন্, তোমার ও সংস্কারের পূর্ব্বে আগে বুঝ, তুমি কে, তোমার সমাজ কি, তোমার সংস্কারের প্রয়োজন কি? আর যদি তোমার সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনই বুঝিয়া থাক, তবে আগে জানিতে চেষ্টা কর, যাহা সংস্কার করিতে যাইতেছ তাহা কি, পুরাতনের পরিবর্ত্তে যে নূতন গড়িতে উদ্যত হইয়াছ তাহাই বা কি, এবং তোমার এ সংস্কারে সুফল ফলিবে কি কু ফল উৎপন্ন হইবে, এ নবরোপিত বৃক্ষের ছায়ায় দেহ শীতল হইবে, কি ইহার কণ্টকাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে; জানিতে চেষ্টা কর, সংস্কার ও হঠকারিতায় কত প্রভেদ, পুষ্পবৃক্ষে ও কণ্টকলতায় কত তফাৎ, সভ্যতায় ও সাহেবিয়ানায় কত অন্তর। এখনও যদি না বুঝ, এখনও যদি অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া, বিচারশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া না চল, তবে

* That part of the conduct of any one, for which he is amenable to society, is that which concerns others. * * * Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign.

J. S. MILL, *Liberty.*

যে পরিণামে কি হইবে ভাবিয়া উঠিতে পারি না। দিন দিন যেরূপ হইয়া উঠিতেছে, ভয় হয়, এইরূপই চলিলে আর শতাব্দী পরে বাঙ্গালি কি হিন্দু কিছুই থাকিবে না, সকলেই সাহেব হইয়া যাইবে। হায়, সে কি ভয়ানক দিনই আসিবে ভাবিতে আতঙ্ক হয়। এ আশঙ্কা কাল্পনিক নহে! ন্যায়ের কথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ!"

কলি।

ব্রহ্মার দিনমানের নাম কল্প। প্রতিকল্পে এক সহস্র চতুর্যুগ হয়, অর্থাৎ ১০০০ সত্য, ১০০০ ত্রেতা, ১০০০ দ্বাপর এবং ১০০০ কলি। একবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি হয়। এইরূপে ১০০০ বার এই চতুর্যুগ পরিবর্ত্তিত হইলে পর শেষ-কলিযুগের অবসানে কল্পান্ত হয়। বলবান কাল, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব, ভোগের ক্ষয়শীল ধাতু, জ্ঞানধর্ম্মের যুগান্ত বশতঃ প্রতিদিন ধর্ম্ম, সত্য, শুচিতা, দয়া, ক্ষমা, আয়ু, বল, স্মৃতি, ভোগ প্রভৃতি ক্রমশঃ হ্রাসাবস্থ হইয়া কলিযুগকে উপস্থিত করে। "অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা" (মনু ১।৮৫) ইত্যাদি বচনে কুল্লুকভট্ট কহিয়াছেন, "যুগাপচয়ানুরূপেণ ধর্ম্মবৈলক্ষণ্যং।" যুগের অপচয়ানুসারে ধর্ম্মেরও বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি এই স্থূল জগতের কল্পান্তস্থায়ী পরমায়ুকালের মধ্যে কলিযুগসমূহ প্রকৃতির শরীরের ব্যাধিস্বরূপ। এই ব্যাধি কল্পান্তকালে সংহার-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রকৃতির বাহ্যছবিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রকৃতির সুব্যক্তমূর্ত্তিস্বরূপ এই চিজ্জড়াত্মক সংসার প্রত্যেক চতুর্যুগের মধ্যে এই কলিনামক মহারোগকে দেবমানে ১২০০ এবং মানবমানে ৪৩২০০০ বর্ষ ভোগ করে। এই কালসংখ্যা যোগবলে নির্ণীত হইয়াছে এবং উহাই কলির পরিমাণ। এইবর্ত্তমান কলিযুগের ঐরূপ ৪৩২০০০ বর্ষ কালের মধ্যে

কেবলমাত্র ৪২৮৪ বর্ষ গত হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ৪২৭০১৬ বর্ষ গত হইলে পুনঃ সত্যযুগ প্রবর্ত্ত হইবে। স্বভাবের পরিবর্ত্তনই এইরূপ। উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পর উন্নতি। এখন ধর্ম্ম ও ভোগবিষয়ে জগতের অবনতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা সমাপ্ত না হইলে সহসা উন্নতি হইবে না। তাহা কাল-সাপেক্ষ। ঋষিরা তাহার যথার্থ কালটী যোগবলে জানিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহার সত্যতার প্রতি তুমি কেবল সন্দেহই করিতে পার, তদ্ভিন্ন তোমার বিদ্যাবুদ্ধির সমস্ত অভিমানের সহিত আর কিছুই করিতে পার না।

এই কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের সংখ্যা লইয়াও বিস্তর বিবাদ। এক দিকে পাশ্চাত্য-বিদ্যা সম্পাদ্য কালসংখ্যা গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে আমাদের বৃদ্ধমনোরঞ্জন পঞ্জিকাও চলিতেছে। পঞ্জিকার ধৃত শ্বেতবরাহ কল্পাব্দা, কলির সংখ্যা এবং কলির গতাব্দা দেখিয়া নবোরা একেবারেই অবিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা কল্পনা নহে। গ্রহনক্ষত্রের পরিক্রমের সহিত তাহার যদি কোন সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে, সে সকল গণনা এখন দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু যুগ ও কল্পসংখ্যা যোগবললব্ধ—এ কথায় আমাদের উত্তর নাই।

বিগত সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলির গত অংশে এই ভারতবর্ষে কত রাজা হইয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ভারতবর্ষ আজিকার নহে। ইহাই সমস্ত মানবকুলের বীজভূমি। পাশ্চাত্য বিদ্যা তাহা হয়তো ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিবেন। ভারতের পতনোন্মুখ সময়ে ইওরোপের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এত আধুনিক হইয়াও যদি ইওরোপ আপনার আরম্ভ কালের অব্দ স্থির করিতে না পারেন, তবে পুরাবৃত্ত নাই বলিয়া তাঁহারা ভারতকে কেন দোষ দেন? অথচ ইহা একবারও মনে ভাবেন না যে, ভারতের পৌরাণিক তত্ত্বসমূহ হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়া পরম্পরা তাঁহাদের বাইবেল-শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ সংরচিত হইয়াছিল। সামান্য বোধে ইহার সর্ব্বশেষ শাস্ত্র পুরাণসমূহ। সেই পুরাণসমূহও ৪০০০ বর্ষের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল। বেদান্ত, স্মৃতি ও দর্শনের তো কথাই নাই। এই সকল শাস্ত্র যে কতদিনের তাহা সামান্য বুদ্ধিতে স্থির হইতে পারে না। ঋষিরা

যোগবলে এইমাত্র নিরূপণ করিয়াছেন যে, কি বেদাঙ্গ, কি স্মৃতি, কি দর্শন, কি পুরাণ, সকল শাস্ত্রই বেদার্থজ্ঞাপক এবং নিত্য। তৎসমূহ, প্রত্যেক মহাযুগে প্রবাহুরূপে প্রণীত হইয়া থাকে।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিগতাব্দার যেরূপ দীর্ঘকাল সংখ্যা, তাহাতে তদ্‌ভুক্ত সমস্ত রাজাদিগের নাম ও রাজ্যকাল প্রভৃতি সহকৃত সম্পূর্ণ সাংসারিক পুরাবৃত্ত প্রত্যাশা করা অসম্ভব। ঋষিরা এখনকার অদূরদর্শী ও অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ন্যায় সাংসারিক অর্থশাস্ত্র ও অনর্থক রাজ-শাসন-বিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা অনিত্য জানিয়া সে সমস্ত তুচ্ছ করিয়াছিলেন এবং এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহা হেয় করিয়া থাকেন। সুতরাং যেরূপ শাস্ত্র লিখিলে রাজাদিগের দৃষ্টান্তে বেদার্থ প্রচারিত হয় তাঁহারা তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। নতুবা, তুমি পারস্য অথবা ইংরাজি বিদ্যাতে পণ্ডিত হইয়া তোমার সাংসারিক রুচিতৃপ্তিকর ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত অন্বেষণ করিবে, তাহার প্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন নাই।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের পরিমাণ মানবীয় ৩৮৮৮০০০ বর্ষ। কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে ইক্ষ্বাকু অবধি কৌরবসেনাপতি বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় কেবল ৯৬ পুরুষমাত্র পাওয়া যায়। ইক্ষ্বাকু সত্যযুগে প্রথম রাজা ছিলেন এবং বৃহদ্বল কলির আরম্ভেই কুরুদিগের একজন সেনাপতি হন। সুতরাং সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে উক্ত ৯৬ পুরুষ মাত্র হয়। যদি শাস্ত্র না বুঝিয়া সহসা ঐ মূলটী লইয়া কাল নিরূপণ কর, তবে তোমার গণনা যথার্থ হইবে না। কেহ বলিতে পারেন যে, প্রতি পুরুষে উর্দ্ধ গড়ে ৬০ বর্ষের হিসাবে ঐ ৯৬ পুরুষের রাজ্যকাল অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগত্রয়ের বর্ষসংখ্যা, ৫৭৬০ বর্ষ অথবা বড় উর্দ্ধ ৬০০০ বর্ষ হয়। কিন্তু এরূপ গণনা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। কেননা জানিতে হইবে যে, উপরি উক্ত বংশাবলিতে কেবল কতিপয় প্রধান প্রধান রাজার নামমাত্র ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপ্রসিদ্ধ বৈদিক-দৃষ্টান্তের অযোগ্য, সমুদয় নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। যথা—বিষ্ণু-পুরাণে (৪.৪) ইক্ষ্বাকু অবধি বৃহদ্বল পর্য্যন্ত সূর্য্যবংশীয় মূলপ্রবাহ কীর্ত্তন-পূর্ব্বক পরাশর কহিতেছেন—"বৃহদ্বলঃ যোঽর্জ্জুনতনয়েনাভিমন্যুনা ভারতযুদ্ধে ক্ষয়মনীয়ত। এতেহীক্ষ্বাকুভূপালা প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ। এতেষাঞ্চরিতং

শৃন্বন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥” অর্থাৎ যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় সেই সময় অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু, এই (সূর্য্যবংশীয় শেষ রাজা) বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছেন। এই আমি তোমার নিকট ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান প্রধান ভূপাল গণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কহিলাম। যিনি এই সমুদয় রাজগণের চরিত শ্রবণ করেন তিনি সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন”।' মহর্ষি পরাশরের “প্রাধান্যেন ময়োদিতা” উক্তিতেই প্রমাণ হইতেছে যে, অপ্রধান সমস্ত রাজগণের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণেও ইক্ষ্বাকুবংশের বিবরণ সাঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন “এতে বৈবস্বতে বংশে রাজানো ভূরিদক্ষিণাঃ। ইক্ষ্বাকুবংশ-প্রভবাঃ প্রাধান্যেন প্রকীর্ত্তিতা।” এই আমি আপনাদের নিকটে বৈবস্বত মনুবংশীয় ইক্ষ্বাকুবংশজ ভূরিদক্ষিণ রাজগণের বিষয়, প্রধানতঃ কীর্ত্তন করিলাম। এতাবতা স্থির হইতেছে যে, সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যত রাজা সূর্য্য বা চন্দ্রবংশে হইয়াছিলেন শাস্ত্রে তাঁহাদের মধ্যে কেবল কতিপয় ভূরিদক্ষিণ ও বৈদিক দৃষ্টান্তের উপযোগী প্রধান প্রধান রাজার নাম মাত্র আছে। অবশিষ্ট সমুদয় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পুরাণশাস্ত্রের এতাদৃশ স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বে পুরাণের লিখিত পুরুষ-সংখ্যার আনুমানিক পরমায়ুর দ্বারা ভারতের কাল-নিরূপণ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ মানবের ১০০ বর্ষ পরমায়ু শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও তাহা কেবল সাধারণ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ হইবে। কেননা পূর্ব্বকালে ভারতে যোগাচারের অত্যন্ত প্রচার ছিল। অনেক রাজা যোগবলসম্পন্ন থাকায় তাঁহাদের বিস্ময়-জনক দীর্ঘপরমায়ু ছিল। সুতরাং পরমায়ুর গড়-হিসাব সংলগ্ন হইবে না। যাঁহাদের বাইবেল অনুসারে সৃষ্টির গতাব্দা ৬০০০ বর্ষমাত্র, তাঁহারা ভারতের সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিগত অংশকে যতদূর পারেন তাহারই মধ্যে সঙ্কোচ করেন, ইহা শোভা পায়; কিন্তু কোটি কোটি বর্ষের সুসভ্য ভারতসমাজের স্বীয় সম্মানরক্ষা করাই পরমধর্ম্ম। এই সত্য ধারণ করা উচিত যে, যিনি যতই গণনা করুন, মানবসমাজ অসীম কাল হইতে প্রবাহিত আছে। প্রচুর ফল শস্যে পূর্ণা, গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী দ্বারা উর্ব্বরা, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অধিত্যকা, উপত্যকা, গিরিগহ্বর এবং গিরিরাজ হিমালয় দ্বারা শোভিতা ভারতভূমিই সেই সমাজের অভ্যুদয়স্থান। আদি প্রজাপতিগণের শুভাদৃষ্ট

অনুসারে ঈশ্বর এই স্থানকে তাঁহাদের বংশবিস্তারার্থ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। ইরাণ বা পারস্যদেশ হইতে আর্য্যগণের ভারতে আগমন হইয়াছিল বলিয়া যে একটা আধুনিক ধুব উঠিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়।

সে যাহা হউক, ভারতের কালনিরূপণে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অতিশয় সাবধান হইতে হইবে। এই কলিযুগের ৪৯৮৪ বর্ষ গত হইয়া গিয়াছে। এই অঙ্ক কল্পিত নহে। পঞ্জিকার সৃষ্টি আজ হয় নাই। ভারতসমাজের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে উহা সনাতন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কলিযুগের আরম্ভ হইতেই পঞ্জিকাতে বর্ষে বর্ষে উহার অব্দ লিখিত হইয়া আসিতেছে। উহাতে উক্ত অঙ্কপাত সম্বন্ধে ভ্রম ও কল্পনা স্থান পাইতে পারে না। বিশেষতঃ কতিপয় সর্ব্ববাদীসম্মত ঘটনা কলিগতাব্দাটীকে প্রমাণ করিতেছে। বিখ্যাত রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে আছে, "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষুচ ভূতলে। কালের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।" কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ জন্মগ্রহণ করেন। পুরাণে আছে (বিঃ পুঃ ৪। ২৪; ভাঃ বঃ ১২। ৩) সপ্তর্ষিমণ্ডল ১০০ বর্ষ করিয়া প্রতি নক্ষত্র ভোগ করে এবং পরীক্ষিতের রাজ্যকালে উহা মঘানক্ষত্রে ছিল। কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণে আছে "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ। ষড়্‌দ্বিক্ পঞ্চদ্বিযুত শকঃ কালস্তস্য রাজস্য।" যুধিষ্ঠিরের রাজ্য সময়েও সপ্তর্ষিগণ মঘাতেই ছিল। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে যুধিষ্ঠিরের অব্দ ২৫২৬ ছিল। তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে থাকা অনুমান হইতেছে। মঘা হইতে পুনর্ব্বসু পঞ্চবিংশ। সুতরাং ২৫২৬ বর্ষই হইতেছে। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে সম্বৎ আরম্ভ। এখন সম্বৎ ১৯৪৩ অব্দ। উভয়ের যোগে এখন ৪৪৬৯ যুধিষ্ঠিরাব্দ হইতেছে। যুধিষ্ঠিরের জন্মের ৬৫৩ বর্ষ পূর্ব্বে কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দুই অঙ্কের সমষ্টি ৫১২২ বর্ষ হইতেছে। কিন্তু এখন কলিগতাব্দা ৪৯৮৬। অতিরিক্ত ১৩৬। এই অতিরিক্ত ১৩৬ বর্ষ হয় সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রভোগ কাল গণনার ন্যূনাধিক্য নয় অন্য কোন কারণবশতঃ পঞ্জিকা হইতে পরিত্যক্ত হইয়া থাকিবে। ফলতঃ কলিগতাব্দার অঙ্কপাত যে অভ্রান্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

এখনও ৪২৭০১৪ বর্ষ কল্কির স্থিত্যব্দা। এই সুদীর্ঘ ভাবিকালের মধ্যে

ধর্ম্ম, শান্তি, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি মানসিক প্রকৃতি; বল, আরোগ্য প্রাণ, পরমায়ু, ভোগ প্রভৃতি দৈহিকী প্রকৃতি; এবং শস্য, জলবায়ু, গৃহপালিত পশু, ভোক্তাভোজ্যের ভোগদা শক্তি প্রভৃতি বাহ্যপ্রকৃতি; এ সমুদয় ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে চলিল। প্রায় সমস্ত পুরাণেই কলিসম্বন্ধে একই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী সকল দৃষ্ট হয়। যথা—কলিযুগে ক্রমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত হইবে, ধর্ম্মদীক্ষা উঠিয়া যাইবে, সকল ব্যক্তির বাক্যই শাস্ত্রতুল্য হইবে, অর্থাৎ শাস্ত্রের মর্য্যাদা থাকিবে না, কেশই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যস্থানীয় হইবে, গৃহনির্ম্মাণেই ধনসঞ্চয় বলিয়া মনে হইবে, ধনোপার্জ্জনার্থ সকলে ব্যগ্র হইবে, উপার্জ্জিত ধন নিজ উপভোগেই পর্য্যবসিত হইবে, জ্ঞানধর্ম্মের উপার্জ্জনে মতি থাকিবে না, অতিথিসংকার উঠিয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রে ভেদ থাকিবে না, মানবগণ স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে, স্ত্রীলোকেরা বহু সন্তান প্রসব-পূর্ব্বক দুর্ভাগ্যবতী হইবে, গুরুজন ও ভর্ত্তাকে অবজ্ঞা করিবে, তাহারা বিলাসপ্রিয়, সংস্কারহীন, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাভাষিণী হইবে, প্রজাগণ শুল্কভারে ও করভারে পীড়িত হইবে, যাহার যে ব্যবসা সে তাহা ত্যাগ করিবে, অনেকে কারুকর্ম্মোপজীবী হইবে, যে সকল দেশে যব ও গোধূম প্রভৃতি কদন্ন জন্মে মানবগণ সেই সকল দেশ আশ্রয় করিবে, অল্পবয়সে নারীগণের সন্তান হইবে, পাষণ্ডদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, ষড়ঋতু বিপর্য্যস্ত হইবে, মেঘ সকলে অল্প বৃষ্টি হইবে, বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে কেবল বায়ু প্রবাহিত হইয়া মেঘ সকল ছিন্নভিন্ন করিবে এবং মেঘ হইতে ইতস্ততঃ কর্কর বর্ষিত হইবে, মেঘে এমন আশ্চর্য্য বর্ষণ করিবে যে, বলিবর্দ্দের এক শৃঙ্গ সিক্ত ও অপর শৃঙ্গ শুষ্ক থাকিবে। সলিল লাভের নিমিত্তে লোকে নদীবেগ রোধ করিবে, ভূমিমাত্রেই উষর ও নীরস হইবে; শস্যসমূহে অল্প ফল হইবে, ফল শস্যের আস্বাদ ও তেজ অল্প হইবে, বৃক্ষসমূহ প্রায় নিষ্ফল হইবে, ধান্যসমূহ অপুষ্ট হইবে, গাভিদুগ্ধের অভাব হইবে, ছাগদুগ্ধ ব্যবহৃত হইবে, পুরুষের শ্বশুরই গুরু হইবে, শ্যালকই পরম মিত্র হইবে, পুত্রগণ পিতামাতাকে অবজ্ঞা করিবে, পুত্রগণ পিতৃদিগকে এবং বধূ শ্বশ্রূদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিবে, শণ সূত্রের বস্ত্র ব্যবহৃত হইবে, কেবল সূত্রধারণই ব্রাহ্মণের চিহ্ন মাত্র হইবে, মুখে সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিবে, কার্য্যে শিশ্নোদরপরায়ণ

থাকিবে, সকলেই অভক্ষ্যভোজী, নির্লজ্জ, নির্ঘৃণ ও অজিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিবে, বাক্যের চপলতাই পাণ্ডিত্য মাত্র হইবে, পরিবার পোষণই দক্ষতা হইবে, যশের জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠিত হইবে, প্রায়ই অনাবৃষ্টির ভয় উপস্থিত হইবে, মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, ঘোরতর যুদ্ধ, প্রবল ঝটিকা ও ভয়ঙ্কর অতিবৃষ্টি হইবে, এই প্রকার ক্রমে ক্রমে সকল ধর্ম্ম, সকল সুখ, সকল তেজ, সকল ভোগ ক্ষয় হইয়া আসিলে কলির শেষ হইবে। অত্যন্ত অবনতির পর উন্নতি স্বাভাবিক। তাহা ঈশ্বরের নিয়ম। ঘোরতর গ্রীষ্ম হইলে যেমন ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হয়, তাহার ন্যায় ধরণীতে অধর্ম্মের একশেষ হইলেই প্রকৃতির শুভধর্ম্মরূপ পর্ব্বকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। তখন সেই শুভ পর্ব্বটী যেন ভগবানের জাজ্বল্যমান মূর্ত্তি স্বরূপে উদিত হয়। অতএব কথিত আছে যে, সেই সময়ে ভগবান অষ্টৈশ্বর্য্যগুণান্বিত হইয়া সত্ত্ব মূর্ত্তিতে কলিকলুষনাশক কল্কী নামে অবতীর্ণ হইবেন। তিনি সেই ঘোরতর যুগক্ষয় ও অধর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে শুভ সময় সূচক দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ ও হস্তে তমোনাশক করাল তরবারি ধারণ পূর্ব্বক প্রজাদ্রোহী নৃপচিহ্নধারী কোটি কোটি তমোস্বভাব যুদ্ধ ও কলহ প্রিয় দস্যুগণকে নিহত করিয়া সমগ্র প্রজাদিগের মনকে পবিত্র ও শান্ত করিবেন। পূর্ণ সত্ত্ব-ধর্ম্মের আবির্ভাব প্রভাবে তখন হইতে আবার সাত্ত্বিক প্রজা সকল প্রসূত হইবে, সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, প্রজাদিগের শ্রী, শান্তি, ভোগ, পরমায়ু, বল, বীর্য্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। তখন সেই পূর্ণসত্ত্ব মূর্ত্তির শুভাগমন প্রভাবে কালে পর্জ্জন্য বর্ষণ করিবে, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণ হইবে, গাভী সকল হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া সুমধুর দুগ্ধদান করিবে, বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইবে, পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ ঋক্‌মন্ত্র, সামগান ও যাগ যজ্ঞ দ্বারা ধরাতলকে স্বর্গতুল্য করিবেন।

প্রাগুক্ত প্রকার পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ সত্ত্বধর্ম্ম বিশিষ্ট সর্ব্বশুভকর পর্ব্বকাল আগমনের এখনও ৪২৭০১৬ বর্ষ অবশিষ্ট আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এখন কলির প্রাতঃকাল মাত্র। শাস্ত্রে আছে (বিঃ পুঃ ৪।২৪।১০, ভাঃ বঃ ১২।২।২৩) "যদাচন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ তথাতিষ্যা বৃহস্পতি। এক রাশৌ সমেস্যন্তি ভবিষ্যতি তদাকৃতং।" যে সময় চন্দ্র সূর্য্য ও বৃহস্পতী এক রাশিতে থাকিয়া পুষ্যানক্ষত্রে মিলিত হইবেন, সেই সময়ে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

এ সমস্ত ঋষিগণের যোগবললব্ধ গণনা। সামান্য জ্যোতিষে তাহার প্রকরণ যদি কখনও থাকিয়া থাকে, তাহা এক্ষণ দুষ্প্রাপ্য।

কলিযুগটী তমোধর্ম্মী। সত্যযুগারম্ভ যেমন সত্ত্বগুণের উদয়সূচক সন্ধিকাল, কলিযুগারম্ভ সেইরূপ তমোগুণ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হওয়ার সন্ধিকাল, কলির শেষ সেইরূপ তমোগুণের অস্ত হওয়ার সন্ধিকাল। সকল ঘটনারই উদয়, ভোগকাল ও অস্তকাল আছে। প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয়, সমস্ত দিন তাহার ভোগ, দিবান্তে অস্ত। তাহার পর রজনীর তমোমূর্ত্তি তদন্তে পুনঃ প্রাতঃসন্ধি। এইরূপ নিয়মে দিবারাত্রি, পক্ষ, ষড়ঋতু, বর্ষ, যুগাদি, কল্প, কল্পান্ত চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে; ঐ রূপ নিয়মে সত্বরজঃ ও তমোগুণ, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে জীবমাত্রকে অধিকার করিতেছে; প্রাতে মানবের ধাতু সত্বপ্রধান, মধ্যাহ্নে রজঃপ্রধান, এবং রজনীতে তমোপ্রধান, সেইরূপ সত্যযুগে সার্ব্বভৌমিক মানবীয় ধাতু সত্বগুণে পুষ্ট হয়, ক্রমে কলিযুগে তমোগুণলাভ করে এবং পুনঃ সত্যারম্ভে সত্বগুণের সহিত আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। সত্বগুণ প্রকাশ-ধর্ম্মীবিধায় তাহা শুক্ল বর্ণ বলিয়া কল্পিত হয়, রজোগুণ কামনা-প্রধান বিধায় তাহা রক্ত ও পীতবর্ণরূপে গৃহীত হয়, এবং তমোগুণ আলস্য ও প্রলয়-ধর্ম্মী হেতু তাহা অন্ধকার ও কৃষ্ণবর্ণরূপে কথিত হয়।

সার্ব্বভৌমিক সমষ্টি যুগধর্ম্ম এই রূপে শুক্ল সত্বের সহিত সমুদিত হইয়া, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্নের রক্তিম ও পীত বর্ণ স্বরূপ রাগরঞ্জন প্রদর্শন পূর্ব্বক কলিতে কৃষ্ণ রাত্রি স্বরূপ তমোগুণে পর্য্যবসিত হয়। সেই সমষ্টি-যুগধর্ম্ম গুণভেদে ও বর্ণভেদে ভগবানের দেহ ও বর্ণ স্বরূপ। কেননা ভগবানই সমষ্টি জৈবিক ধর্ম্মের আশ্রয় স্থান। অতএব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ। শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ'। ভগবান বাসুদেব সকল যুগেই কলেবর পরিগ্রহ করেন। বিগত সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যথাক্রমে তাঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন প্রকার বর্ণ ছিল। এখন এই কলিযুগে তিনি কৃষ্ণ বর্ণ হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি স্বয়ং বর্ণ ও গুণের অতীত কেবল মানবের যুগধর্ম্মের আশ্রয়রূপে ঐ সকল গুণের অনুসারে তাঁহার রূপগ্রহণ।

খড়্গপুর শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

হেমচন্দ্র।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এই মাত্র এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই, এখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া দুই এক ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছে। রাত্রি দশটা বাজিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে দশটা রাত্রি—নীরব, নির্জ্জন, নিঃস্তব্ধ। প্রায় জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। অনেকেরই বাড়ী অন্ধকার—অনেকেরই প্রায় একঘুম হইয়া গেল। কেবল শনিবার বলিয়া তখনও দুই একটি গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, কলিকাতা হইতে স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় কেবল ক্লিপ্তবেশা দুই একটি যুবতী উন্মুক্তগবাক্ষে বসিয়া উৎসুক মনে ও চঞ্চল-নয়নে তখনও রাত্রি জাগিতেছিল। আ ছি ছি ছি! এত সাধেও কি বাদ সাধিতে আছে গা? বৃষ্টির পোড়ার মুখ!

সেই গ্রামের পূর্ব্ব পাড়ায় একটি প্রকাণ্ড বাড়ী। তাহা অন্ধকারে ভীষণ দেখাইতেছিল। বাটী নিঃস্তব্ধ, অন্ধকারময়। কেবল নীচের একতম প্রকোষ্ঠে তখনও একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছিল, সেই আলোক অপেক্ষাও ক্ষীণতর একটি রুগ্না তখন অকাতরে বিছানায় নিদ্রা যাইতেছিল; আর একটি বালিকা বসিয়া ধীরে ধীরে সেই রুগ্নার পায়ে হাত বুলাইতেছিল। রুগ্না বালিকার মাতা। আজ বারো দিন হইল তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে,—পেটে কি এক ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে—বৃদ্ধাকে কাতর করিয়া তুলিয়াছে। রীতিমত চিকিৎসা হওয়া দূরে থাকুক, দেখিবার লোক পর্য্যন্তও নাই। পাড়ার লোকের কথা ছাড়িয়া দাও। তাহারা তো বসন্তের কোকিল। আজি যদি কর্ত্তার শ্যালকপত্নীর অতিবোদ্দলে একটুও মাথা ধরিত, দেখিতে, পাড়ার কত ইনি-উনি-তিনি দলে দলে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন; কিন্তু হতভাগিনী দরিদ্রার দুঃখ দেখিতে তাঁহারা আসিবেন কেন? যাহারা বা মুখের আলাপ করিতে আসিবার ইচ্ছা করিত, গৃহিণীর ভয়ে সর্ব্বদা আসিতে

সাহস করিত না। বালিকারা যে বাটিতে থাকিত, তাহাতে পরিবার অনেক, গণনা করিলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা দ্বাদশটির কম হইত না; কিন্তু তাহারা বড় মানুষের ঝি বউ; দুঃখীর জন্য কষ্ট করিতে হয়, তাহা তাহারা জানিত না। অথবা, জানিলেও করিতে ভালবাসিত না। সুতরাং দেখিবে কে? পুত্র নিকটে নাই, এক মাত্র কন্যা—মাতা বিছানায় পড়িয়া—তাহারও সংসারে অশেষ কাজ। পরের সংসার, বিশ্রামের অবসর নাই। সুতরাং রুগ্নাকে দেখিবার লোক কোথায়?

বালিকারা নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয়া ছিল না। তাহার মাতা কর্ত্তার আপনার মাতৃশ্বসা। কিন্তু দূরকুলাগত নববধূ বা তাহার শাখা প্রশাখাগণ এ কথা বুঝিত না, বাবুও তাহাদিগকে কখনও ভাল করিয়া বুঝাইতেন না। বালিকার মাতা দরিদ্র ঘরের মেয়ে, দরিদ্র ঘরের বউ ছিলেন। কোনও মতে দিনপাত হইত মাত্র। স্বামীর মৃত্যুতে একবারে অকুল পাথারে ভাসিলেন। দ্বাদশ বৎসরের বালক ও অষ্টম বৎসরের বালিকা লইয়া বিধবা পথের কাঙালী হইল। বুঝি, পেটের দায়ে জাতি যায়! লোকলজ্জায় হউক, নিজের উপকারের জন্য হউক, অথবা দয়া বা কর্ত্তব্যের অনুরোধেই হউক, ব'নপো মাসিকে আপন সংসারে আনিলেন। বিধবা তথায় আসিয়া দেখিল, পাচিকার কর্ম্ম তাহার জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। কি করিবে? আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া তাহাতেই নিযুক্ত হইল। বাড়ীর এক এক জন এক এক প্রকার—অতি কষ্টে সকলের মন যোগাইয়া হাড়মাটি করিয়া বৃদ্ধা আপন সন্তান দুটি মানুস করিতে লাগিল। তবুও লাঞ্ছনা, তিরস্কার, মুখভার, প্রভৃতি কম ছিল না। বড় কষ্ট হইলে বিধবা তাহা পুত্রকন্যার মুখ দেখিয়া ভুলিত। পুত্রটি নিকটবর্ত্তী একটি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। ক্রমে অনেকে তাহার মেধা ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল। বিধবা যখন তাহা শুনিত, আনন্দে হৃদয় নাচিয়া উঠিত, যুক্তকরে পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিত, স্বামীর জন্য নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিত, নিঃশব্দে তাহা মুছিয়া আপন কার্য্যে চলিয়া যাইত।

দেখিতে দেখিতে পুত্রটি এণ্ট্রেন্স পাশ করিল। ১৫ টাকা জলপানি বাহির হইল। বালক তখন মাতার নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিয়া

কলেজে পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধা পুত্র সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন; কিন্তু কন্যার জন্য সদাই ভাবিতেন। কুলীন কন্যা—কন্যার পিতা মুখ্য কুলীন ছিলেন; অনেক কষ্টে একটি পাত্র জুটাইয়া আট বৎসর বয়সেই কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার কিছু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কুলীন জামাতা সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে তাহাই হইয়াছিল। স্বর্ণলতা কণ্টকবৃক্ষে জড়িত হইয়াছিল, মুক্তার হার বানরের গলায় উঠিয়াছিল। বিবাহের পর বার কএক মাত্র জামাতা দেখা দিয়াছিলেন! কন্যার যেমন রূপ গুণও সেইরূপ—তেমন স্বামীকেও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাহারি সেবায় শরীর মন ঢালিয়া দিত। বিধবা তাহা যখন দেখিত, মনে মনে একটু কাঁদিত, কন্যার জন্য কাতরে ইষ্টদেবতার করুণা ভিক্ষা করিত। কুলীন জামাই কন্যাকে নিজালয়ে লইয়া যাইত না। বালিকার বয়সও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। নিজে যেরূপে হয় চলিয়া যাইত, এমন বয়ঃস্থা কন্যা লইয়া পরগৃহে থাকা বড় ভাবনার কথা। কন্যাও ভাবিত। স্বামীর স্বভাব ভাল ছিল না তাহা সে জানিত, বয়স্যাগণ আপন আপন স্বামীর কথা পাড়িলে কষ্টে তথা হইতে সরিয়া যাইত। আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিত, কিন্তু সে জন্য স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কখনও কিছুই বলিত না। ভাবিত, নিজে কাছে থাকিলে তাঁহার চরিত্র শোধরাইতে পারে,—কিন্তু স্বামী লইয়া যাইতেন না। এই জন্য এক এক বার স্বামীগৃহে যাইতে বড় ইচ্ছা হইত; আবার, মাতার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার কাছছাড়া হইতে ইচ্ছা করিত না। সে দেখিত, মাতা বৃদ্ধা—এই বৃদ্ধাবস্থায় পীড়া বশতঃ এক দিনও না পারিলে কেহ তাঁহার কাজ করিত না, সমস্ত কষ্ট ঠেলিয়াও তাঁহাকে এত লোকের রন্ধনাদি করিতে হইত। বালিকা সর্ব্বদা তাঁহার সাহায্য করিত। আপনি পারিলে মাতাকে পাকশালায় যাইতে দিত না। আজ কয়দিন মাতার পীড়া হইয়াছে, দুই বেলাই বালিকা রন্ধনাদি করে। রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত রন্ধনাদি করিয়া সকলকে আহার করাইয়া বালিকা ভাত লইয়া গৃহে আসিল। মাতা তখন নিদ্রা যাইতেছিলেন। কর্ম্মবশতঃ অনেকক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে পারে নাই, অনেকক্ষণ তাঁহার কাছে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে পারে নাই— চক্ষের জল মুছিয়া বসিয়া বালিকা মাতার পায়ে

বুলাইতে লাগিল। শনিবার—ভ্রাতার আসিবার কথা ছিল। সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে,—এখনও ভ্রাতা আসিলেন না। বালিকা বড় ভাবিতা হইল। বৃদ্ধা সন্তানের কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—বালিকা তাহার পার্শ্বে বসিয়া উন্মনা হইয়া ভ্রাতার জন্য ভাবিতে লাগিল।

দুপ্ দুপ্ দুপ্। বাহিরে দরজায় আঘাতের শব্দ হইল। রুগ্নার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল—নিকটে কন্যা বসিয়া রহিয়াছে। বলিল—"মনোরমা, মা, হেম কি আসিয়াছে?" বালিকার নাম মনোরমা। মনোরমা বলিল—"না মা, দাদা এখনও আসেন নাই। বাহিরে কে দরজা ঠেলিতেছে, আমি যাই।"

বৃদ্ধা বলিল—"হাঁ, মা, দরজা খুলে দাও গে। আহা! বাছা না জানি বৃষ্টিতে কত কষ্ট পেয়েছে!

মনোরমা অন্য একটি প্রদীপ জ্বালিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। ডাকিল 'দাদা!'—কেহ উত্তর দিল না। দরজার নিকটে গেল। দেখিল, দ্বার মুক্ত! কে মুক্ত করিল কিছু বুঝিল না। কিন্তু একি? মনোরমার কথা সরিল না। দেখিল—স্বামী।

এই সময়ে আর একটি বালিকা ধীরে ধীরে বৃদ্ধার ঘরে আসিল। বৃদ্ধা পথ চাহিয়া ছিল, বলিল—"কে হেম এলি!" বালিকা বলিল—"না, তিনি এখনও আসেন নাই।" বৃদ্ধা বুঝিল, এ মনোরমা নয়। মনোরমা নয়—বিরাজ। বলিল, "মা, তুমি এখনও ঘুমাও নি!" বালিকা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল—"আপনার জামাই আসিয়াছেন।"

"কে, রামকৃষ্ণ!"

"হাঁ।"

বৃদ্ধা শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'মা'!—ধীরে ধীরে ধীরে কতক্ষণ পরে হেম আসিয়া ডাকিল—'মা!' আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা অমৃত মাখিয়া এমন শব্দ গড়িয়াছিল

রে? রণে হউক, বনে হউক, রোগে হউক, শোকে হউক, দুঃখযন্ত্রণা পরিপূর্ণ এই সংসারে আসিয়া যে কখনও প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকে নাই, তাহার বৃথায় জন্ম! এমন কথা আর আছে কি? চিন্তায় আশা, দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে শান্তি—এমন কথা আর আছে কি? যাহা উচ্চারণ মাত্র সকল যন্ত্রণা দূরে যায়, যাহা যখন বলি তখনি যেন অমৃত ঝরিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, হৃদয় পবিত্র ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া কি এক অভূতপূর্ব্ব সুখ উথলিয়া পড়ে—এমন কথা আর আছে কি? শব্দসাগরের বাঞ্ছা সামগ্রী, মনুষ্যহৃদয়ে ভক্তির শেষ সীমা, কলুষিত পৃথিবীতে অমরাবতীর পবিত্রতা—অমৃতময়ী সন্তাপনাশনী এমন কথা আর আছে কি? প্রবাসে দারুণ কষ্টের পর বাটি আসিয়া একবার 'মা-মাখা' কথায় মা বলিয়া ডাকিয়া যে কত সুখ—কত আনন্দ তাহা যে কখন অনুভব করিয়াছে সেই জানে। হেমচন্দ্র এ জগৎসংসারে থাকিয়া তাহা ভিন্ন অন্য সুখ কখনও ভোগ করে নাই,—অন্য সুখও তাহার তত স্পৃহনীয় ছিল না। হেম ডাকিল—'মা!'

সে মধুর শব্দ তাহার মাতার কর্ণে পশিল। রুগ্না বসিয়া ছিল, দেখিল হেম সম্মুখে 'মা' বলিয়া ডাকিতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে রোগের ভয়ানক যন্ত্রণাও ভুলিয়া গেল। আনন্দে হৃদয় আপ্লুত হইল, অনিমিক্ নয়নে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একবিন্দু অশ্রু নয়নকোণে দেখা দিল। উঠিতে গেল, পারিল না। হেম তাহা দেখিল, বলিল,—"মা, উঠিও না, অসুখ বাড়িবে—শুইয়া থাক।" রুগ্না শুইল না, বসিয়া রহিল। পুত্রকে একবার ভাল করিয়া দেখিল। দেখিল, হেমের শরীর শীর্ণ, সেই শীর্ণ শরীর জলে ভিজিয়াছে, পায়ে পাদুকা নাই, বুঝি মাথায় ছাতিও ছিল না, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। হাতে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ—তাহাও ভিজিয়া ভারি হইয়াছে। নিকটে বিরাজ দাঁড়াইয়া ছিল; হাত হইতে ব্যাগটি লইয়া ভূমে নামাইয়া রাখিল। কি ভাবিয়া বিরাজ তথায় আর দাঁড়াইল না, গৃহের বাহিরে গেল। বৃদ্ধা এ সকল দেখিল, চক্ষের জল মুছিয়া বলিল—"পোড়া বিধাতা হতভাগীর মরণ লিখিলে না কেন?"

হেম বলিল—"এখন কেমন আছ মা?"

"আমি ভাল আছি। যাও, বাবা, আগে কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে এস।

হেম গৃহের বাহিরে আসিল। দেখিল—জল, গামছা, কাপড়—প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই সজ্জিত রহিয়াছে। একপার্শ্বে বিরাজ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বুঝিল, এ সকল বিরাজের কর্ম্ম। হেম বিরাজকে জানিত—বুঝিল, বিরাজ কেন তখন হঠাৎ গৃহ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। বলিল—"বিরাজ! এখনও যে শোও নাই?"

ধীরে ধীরে বিরাজ বলিল—"শুইয়াছিলাম, ঘুম হয় নাই।"

হে। কেন?

বি। তোমার যে আসিবার কথা ছিল। কি জানি যদি দোর খোলা না পাও?

হে। কেন, মনোরমা কি ঘুমাইয়াছে?

বি। হেম, মনোরমা বড়, না আমি বড়?

হে। তুমি বড়। কিন্তু সে কথা কেন?

বি। সে আমাপেক্ষা ছোট। সে যদি জাগিতে পারে আমি না পারিব কেন? হেম, তুমি কি আমায় পর মনে কর?

হেম অপ্রতিভ হইল। বলিল—"আমি তাহা বলি নাই। রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখনও শোও নাই জানিলে, তোমার দিদি যে তোমায় বকিবেন।"

বিরাজ বুঝিল, হেমের কথা সত্য। বিরাজ মনোরমা বা মনোরমার মাতার সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করে ইহা বিরাজের মাতা বা তাহার দিদি ভাল বাসিতেন না। তাঁহারা ভাল না বাসিলেও বিরাজ তাহা করিতে ছাড়িত না। সে তাহা না করিয়া কেমন করিয়া থাকিবে? বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণটী যখন পরের জন্য কাঁদিয়া উঠিত, তখন সে কোন মতেই স্থির থাকিতে পারিত না। তোমরা এ বালিকাকে দোষ দিও না। সে জন্য তাহার মাতা ও ভগ্নী সময়ে সময়ে তাহাকে নিকটে ডাকিয়া কতই ভৎর্সনা করিতেন। কিন্তু কেন তাঁহারা এরূপ করিতেন, বিরাজ সরল মনে তাহা

বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বিরাজ বুঝিল, হেমের কথা সত্য। বলিল—"সে জন্য ভাবিও না, দেখিয়া আসিয়াছি, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।"

হেম আর কিছু বলিল না। হাতে, মুখে, চোখে, কপালে, পায়ে জল দিয়া কাপড় ছাড়িল।

হেম গৃহে আসিলে তাহার মাতা তাহাকে কিছু খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু কি দিবেন? কিছুই নাই। চক্ষে জল আসিল। একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল—"বিধাতা রোগ দিলে, মৃত্যু দিলে না কেন?" হেম উঠিয়া মায়ের কাছে বসিল। বলিল—"মা, মনোরমা কোথায়?"

"বুঝি বাহিরে আছে। রাম কৃষ্ণ আসিয়াছেন।"

হেম মাতার গায়ে হাত বুলাইতেছিল। বৃদ্ধা বলিল—না বাবা এখন থাক। আহা! মুখখানি শুখাইয়া গিয়াছে! যাও, আগে রামকৃষ্ণকে ডাকিয়া দুই জনে কিছু খাও, আমি দেখি।

হেম রামকৃষ্ণকে ডাকিতে উঠিল। দরজার নিকট না যাইতেই বিরাজ আসিয়া বলিল—একটু ব'স। এই খাবার আনিয়াছি খাও।"

হে। ইহা তুমি কোথায় পাইলে?

বি। যেখানে পাই না কেন, দিতেছি খাও।

হে। না, আমি খাইব না। তোমার খাবার আমি খাইব কেন?

বি। আমার অন্য খাবার আছে। তুমি ইহা খাও, না খাইলে বড় কষ্ট পাইব।

হেমের মাতা বলিল—সে কি মা! হেমের ভাত আছে, হেম তাহা খাইবে, তুমি কি খাইবে মা?

বি। না, মা! আমি তো বলিতেছি, আমার অন্য খাবার আছে, ইহা আমি উঁহার জন্যই আনিয়াছি।

হেমের মাতা বৃদ্ধা, তত দূরদর্শী ছিলেন না। তায় সন্তান ক্ষুধিত, আহারও নিকটে রহিয়াছে। পুত্রকে এ সময়ে খাওয়াইতে পারিলে মহা সন্তোষ—এতক্ষণ তাহা পারেন নাই বলিয়া দুঃখের সীমা ছিল না। বৃদ্ধা সকল ভাবিল না, বলিল—"আহা! বিরাজ আমার লক্ষ্মী মেয়ে! তা বিরাজ অত করিয়া বলিতেছে, হেম তুই কেন খা' না, বাবা।

হেম দেখিল মাতাও বিরাজের পক্ষ, বিরাজও ছাড়িতেছে না। হেম আর কিছু বলিল না। তখন, রামকৃষ্ণের জন্য তাহা হইতে এক ভাগ রাখিয়া দিয়া, মহানন্দে বিরাজ তাহা এক একটী করিয়া হেমের হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল। ক্ষুধারও উদ্রেক হইয়াছিল, হেম আহার করিল। হেম জানিল না, ইহা ভিন্ন বিরাজের অন্য খাবার ছিল না। জানিল না যে, ইহা তাহার দশমীর খাবার। বিরাজ বালবিধবা। পরদিন একাদশী।

মথুরায়।

আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই!
গুঞ্জরিয়া গেল অলি,
প্রজাপতি গেল চলি,
শুকান বকুল গাছে ফুলে ফুলে গেল ছাই!—
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
মলয় বহিল ধীরে,
জোছনা ঘুমাল নীরে;
শিখিনী নাচিল ডালে, পাখী উড়ে গেল গাই!—
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
হরিণী নয়ন মেলে,
তরুতলে গেল খেলে;
তটিনী কূলেতে দুলে ব'লে গেল যাই যাই!—
আমারি হ'লো না গান আমারি বাঁশরী নাই।
কৃষক বাজায়ে বাঁশী,
চলে গেল হাসি হাসি;

বালিকারা ঘরে গেল, মালার মতন ফুল পাই!—
আমারি হ'লো না গান, আমারি বাঁশরী নাই।
সবি ভেসে গেল চোখে,
সবি কেঁপে গেল বুকে!
প্রাণে র'য়ে গেল সুর, ভাবের পেশ্‌না খাই!
বসন্ত যে এল গেল, ব'সে আছি শূন্যে চাই!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

প্রণয় ও বঙ্গীয় কবি।

মনুষ্য-হৃদয় কবির বড়ই আদরের সামগ্রী। আর ইহা ব্যতীত মনুষ্যেরই বা আছে কি? মনুষ্যের জীবন যেমন প্রয়োজনীয়, হৃদয়ও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। হৃদয়হীন মনুষ্য সজীব বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। জীবন আমাদিগকে মাত্র জড়প্রকৃতি হইতে পৃথক রাখে, কিন্তু হৃদয় আমাদিগের সেই জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। মনুষ্যদেহের পক্ষে জীবন যেরূপ, জীবনের পক্ষে হৃদয়ও সেইরূপ। এ দেহ হইতে জীবন চলিয়া গেলে যেমন এ দেহের আর কিছুই রহিল না, সেইরূপ জীবন হইতে হৃদয় বাদ দিলে এ জীবনের আর কিছুই থাকিল না। মূল কথা হৃদয় জীবনের জীবনস্বরূপ। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, মনুষ্য-হৃদয় কবির বড়ই আদরের সামগ্রী।

যিনি এই হৃদয় বিশ্লেষণ কার্য্যে যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন, তিনিই তত উচ্চদরের কবি। এই হৃদয়ই কবির অন্তঃপ্রকৃতির সারসর্ব্বস্ব, এবং ইহাই কাব্য-কাননের গোলাপ ফুল। যে কবি মাত্র বাহ্যপ্রকৃতিকে সারসর্ব্বস্ব করিয়াছেন, তিনি কখনই উচ্চদরের কবি হইতে পারেন নাই। হৃদয়ের বৃত্তি সকল, কবি যেমন সুন্দররূপে পৃথক পৃথক করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পারেন, অন্য কেহ আর সেরূপ পারেন না।

প্রণয় মনুষ্যহৃদয়ের একটী প্রধান বৃত্তি মধ্যে গণ্য। ইহা সর্ব্বপ্রধান না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণারাম ও প্রীতিপদ। এমন মনুষ্য কে আছে যে পবিত্র প্রণয়ের পবিত্র ছবি দেখিলে মোহিত না হয়? লৌহের সহিত চুম্বকের যেরূপ সম্পর্ক, হৃদয়ের সহিত প্রণয়েরও সেইরূপ সম্পর্ক। উভয়ের কেহই অপরের বিরহ যেন সহ্য করিতে পারে না, সেই জন্যই নিকটে পাইলেই যেন কোলে টানিয়া লয়। আবার প্রণয় যেরূপ আমাদিগের হৃদয়কে কোমল করে, অন্য কোন বৃত্তি সেরূপ করিতে পারে না। প্রণয়কে যিনি যেরূপ চক্ষে দেখুন না কেন, কিন্তু আমরা এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, যে প্রণয়ই হৃদয়ের হৃদয়ত্ব রক্ষা করিতেছে। এবং হৃদয়ের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তির প্রণয়ই জন্মদাতা। সেই জন্য এই প্রণয় লইয়াই সকল কবি উন্মত্ত; এবং আমরাও কবির অমানুষিক কল্পনাশক্তি প্রভাবে প্রণয়ের অপূর্ব্ব ছবি চিত্রিত দেখিয়া মোহিত হইয়া যাই। যদি হৃদয়ের সহিত প্রণয়ের একটা বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকিবে—তবে কল্পনাপ্রসূত প্রণয়ের ছবি দেখিয়া আমরা এতদূর মোহিত হইব কেন? সেই জন্যই কবিরা অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা এই প্রণয় বৃত্তিকে হৃদয়ের মধ্যে উচ্চাসন দিয়াছেন।/

(বঙ্গদেশে আর যাহা কিছুর অভাব থাকুক না কেন, কবির অভাব কখনই হয় নাই। অভাব দূরে থাকুক, বরং কবির কিছু বেশী ছড়াছড়ি ও বেশী বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণও আছে। বাঙ্গালি বড়ই হৃদয়বান, সেই জন্যই বাঙ্গালায় কবির সংখ্যা অল্প নহে। কিন্তু কবিত্বের এরূপ ছড়াছড়ি ও বাড়াবাড়ি দেখিয়া অনেকেই ভীত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করিয়া থাকেন, বুঝি কোন দিন বা কবিতার স্রোতে বঙ্গদেশ ভাসিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু আমরা সেরূপ মনে করি না, কারণ বাঙ্গালায় কবির সংখ্যা অধিক হইলেও উচ্চদরের কবির সংখ্যা অতি অল্প। তুমি আমি দুই চারি ছত্র অমিত্রাক্ষর বা মিত্রাক্ষর লিখিয়া এত বড় একটা দেশকে কোন ক্রমে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারি না। বাঙ্গালায় কবির সংখ্যা যদি এতদূর অধিক হইত তাহা হইলে আমরা আজ উপরোক্ত শীর্ষ দিয়া এইরূপ প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না। কয়েকজন বঙ্গীয় প্রধান কবি

প্রণয়ের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন মাত্র তাহাই দেখাইতে আমরা এই প্রবন্ধে চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালার আদি কবিদিগের কথা মনে হইলেই বৈষ্ণব কবিরা আসিয়া পড়ে। এই সম্প্রদায়ের কবিদিগের নিকট বাঙ্গালা ভাষা বিশেষ ঋণী। ইহাদিগের কবিতায় কবিত্বশক্তিরও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় বর্ণনায় অনেক স্থলে প্রণয়ের বড় সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম কবি জয়দেব। কিন্তু জয়দেবকে আমরা বঙ্গীয় কবি মধ্যে ধরিতে পারি না। যদিও অনেকে "চল সখি কুঞ্জং" প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালা ভাষার ছায়ামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালার প্রথম কবি বলিয়া ধরিব। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও অনেকে অনেকে কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইনিও বাঙ্গালি নহেন, মিথিলায় ইঁহার নিবাস, সেই জন্যই ইঁহার কবিতায় হিন্দির এতদূর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এ স্থলে সে সকল গবেষণার অবতারণা করিব না। বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দির ভাব অধিক পরিমাণে মিশ্রিত বলিয়া অনেক স্থলে তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না সত্য, কিন্তু বোধগম্য না হইলেও তাহার সুরে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, মন মুগ্ধ হইয়া যায়, হৃদয়ের স্তরে স্তরে একটী আনন্দলহরী যেন খেলা করিয়া বেড়ায়। বাস্তবিক, যখনই আমরা সেই কাব্য কাননে প্রবেশ করি, কোথা হইতে যেন সেই কবিতা-কুসুমের স্বর্গীয় পরিমল বহিতে আরম্ভ করে, সেই পরিমলের কি যে মোহিনীশক্তি তাহা জানি না, কিন্তু তাহাতেই আমাদের মন গলিয়া আর্দ্র হইয়া যায়।

এখন, বিদ্যাপতি এ প্রণয়ের কিরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, দেখা যাউক। একস্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারনু

নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোয়ায়লু
না বুঝলু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ইহাই প্রণয়ের মুগ্ধকর ছবি। যে প্রণয় গভীরতায় অগাধ, অতলস্পর্শ তাহাই এই স্থলে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। প্রণয়িনী প্রেমের কথা যতই বলিতেছে, ততই যেন নূতন হইতেছে, সে কথা যেন কখন পুরাতন হয় না। প্রণয়পাত্রকে দেখিয়া তাঁহার নয়নের তৃপ্তি হইতেছে না, সেরূপ দেখিয়া আর চক্ষু অন্য দিকে ফিরিতেছে না, তাঁহার কথা শুনিয়াও তাহার কার্য্য পরিতৃপ্ত হইতেছে না, যত শুনিতেছে ততই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে, কত রাত্রি প্রেমালাপনে কাটিয়াছে তথাচ তাহার বিষয় সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার হৃদয় জুড়াইতেছে না। প্রণয়িনীর সকলি হইয়াছে, তথাচ তাহার যেন কিছুই হয় নাই। ইহা প্রণয়ের চরমোৎকর্ষ না হইলেও মুগ্ধকর বটে।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলেই প্রণয়ের এইরূপ সুন্দর ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহার কোন কোন স্থলে অনেকের মতে অশ্লীলতা দোষ স্পর্শ করিয়াছে, বর্ত্তমান সুরুচির ভয়ে সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে সাহস হয় না। স্থানে স্থানে ভোগাভিলাষ পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সময়কার সমাজ ও শিক্ষার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমরা কবিকে দোষী করিতে পারি না। আর বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রেম সর্ব্বব্যাপী প্রেম, সুতরাং এই ধর্ম্মমতে সে প্রেম নিষ্কলঙ্ক। বিদ্যাপতি সেই প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া অনেক প্রেমিকহৃদয়ের ক্ষুদ্র তরণী নাচাইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে অশ্লীলতাবর্জ্জিত, সুরুচিপরিচারক, প্রণয়ের সুন্দর দৃশ্যও অনেক আছে। তাহা আমরা বারান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

[ক্রমশঃ]

হেমচন্দ্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তার পর, হেম রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত বাহিরে গেল। বৈঠকখানার দ্বার ঈষন্মুক্ত ছিল, ভিতরে আলোক জ্বলিতেছিল; হেম সেই আলোক-নিঃসৃত মুক্তপথ দিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, দুঃখের দৃশ্য! সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় ভ্রূকুটীভীষণ রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার পদতলে কুসুমময়ী বালিকা মনোরমা লুণ্ঠিতা হইতেছে। দেখিয়া হেমচন্দ্রের হৃদয় ব্যথিত হইল, ব্যথিতহৃদয়ে নিঃশব্দে তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। শুনিল, মনোরমা বলিতেছে—"ক্ষমা করুন, না জানিয়া বলিয়াছি, আর বলিব না।"

কর্কশ স্বরে রামকৃষ্ণ বলিল—"আমি বেগের গাঙ্গুলি, ইচ্ছা করিলে সহস্রটা বিবাহ করিতে পারি; এখনও খাতা দেখিয়া গণিলে ৫০।৬০ টার কম হইবে না; কিন্তু কৈ, কখনও তাঁহাদের কাছে গিয়াছি কি? আমি যে এখানে এক একবার আসি এই কত ভাগ্য! তা নয়, লইয়া যাইতে চাহিতেছি, তবুও অমত!"

ম। অমত!—দেবতা জানেন, আপনার নিকট থাকিয়া আপনার চরণ সেবা করিতে পাইলে আমার কত আনন্দ।

রা। "আনন্দ কি না, তাহা তুমিই জান আর তোমার দেবতাই জানেন। আমি তাহা জানি না, জানিতেও চাহি না। এখন জানিতে চাহি, তুমি যাবে কি না।"

ম। যাইতে কি অসাধ? কিন্তু মনে করুন, আমি না থাকিলেও আমার দিদিরা আছেন, তাঁহারা আপনার সেবা করিবেন, কিন্তু আমার মার আর কে আছে? তার তাঁর এই পীড়ায়—

রা। আবার—আবার ঐ কথা! তোমার মা-ই এত বড়, আর আমি

বুঝি কেহই নই! কুলীন-সন্তানের যেখানে এত অপমান সেখানে থাকিতে নাই। ভাল, তুমি থাক, আমি চলিলাম, এমন জানিলে আসিতাম না।"

রামকৃষ্ণ যাইবার উপক্রম করিল, ব্যাকুলতার সহিত মনোরমা তাহার পা জড়াইয়া ধরিল, চক্ষের জলে সে পদতল প্লাবিত হইতে লাগিল। জোরে রামকৃষ্ণ সে পা ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিল; বালিকা তাহা ছাড়িল না। লিখিতে কলম বাধিয়া আসিতেছে, পাষণ্ড সেই কোমল অঙ্গে পদাঘাত করিল।

হেমচন্দ্র ইহা দেখিল। আর দাঁড়াইতে পারিল না; ধীরে ধীরে মাথা ধরিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

এইখানে রামকৃষ্ণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। রামকৃষ্ণ বেগের গাঙ্গুলি, মুখ্য কুলীন। পিতার নাম ৺ রামহরি গাঙ্গুলি; পিতামহ ৺ রামরতন গাঙ্গুলি, প্রপিতামহ ৺ বাঞ্ছারাম গাঙ্গুলি—ইত্যাদি ইত্যাদি। কেহ জিজ্ঞাসিলে তাহার কুলজী আওড়াইয়া রামকৃষ্ণ এইরূপে নিজের পরিচয় দিত। কিন্তু সময়ে সময়ে গ্রামের কয়েকজন দুষ্ট লোক বিষম গোলযোগ তুলিয়া তাঁহার পিতৃ-পরিচয় সম্বন্ধে একটা সন্দেহ রটাইয়া দিত। মাতামহের গৃহে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণ যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁহার মাতামহী একদিন পাড়ার পাঁচ সাত দশ জন স্ত্রীলোক জড় করিয়া অনেক কৌশলে (কিছু একটা পরিপাকের জন্য) বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, তাঁহার জামাতা—কে জানে কেন ইতিপূর্ব্বে একদিন হঠাৎ অনেক রাত্রে আসিয়া আবার ভোর না হইতেই চলিয়া গিয়াছিলেন। অনেকে সে কথা বিশ্বাস করিয়াছিল; কিন্তু পাড়ার দুই একটা জটিলা কুটিলা আজও সে বিষয় লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক করে, আজও তারা কানাকানি করে, চোক মটকাইয়া হাসে, এবং পরস্পরে বলাবলি করে—"দেবতা জানেন! কিন্তু সেই বিয়ের রাত্রি ভিন্ন তো আর রামহরি গাঙ্গুলিকে তাহার শ্বশুরালয়ে কেহ কখন দেখে নাই।" বাস্তবিক, আমরাও বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সেই বিবাহরাত্রির পর রামকৃষ্ণের উপনয়নের দিন রামহরি শ্বশুরালয়ে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন। কন্যা প্রসব হইয়াছে শুনিলে রামহরি কখনই সেমুখো হইতেন না, কিন্তু পুত্রের জন্ম সংবাদে সানন্দচিত্তে শ্বশুরগৃহে গমন করিলেন।

যথারীতি উপনয়নকার্য্য হইয়া গেল। কুলীন ব্রাহ্মণ লোভ সামলাইতে পারিল না; লাভের পণ্যদ্রব্য বিবেচনায় পুত্রটি স্ত্রীর নিকট চাহিয়া লইল। বলা বাহুল্য, বালকের মাতৃপক্ষ কেহই তাহাতে আপত্তি করিল না। অতঃপর রামকৃষ্ণ পিতৃগৃহে আসিলেন। রামহরির শেষ দিন ফুরাইল। রামকৃষ্ণও শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে ঘটক ঘটকীর কচ্‌কচিতে তাঁহার বাড়ীতে টেকা ভার হইল। রামকৃষ্ণ আপনার পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। রামকৃষ্ণ মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়াই কুলের অধিকারী, সুতরাং লেখা পড়ার সময় কোথায়? রামকৃষ্ণ বয়সে কখনও কালির আঁচড় পাড়েন নাই; কুলীনোচিত নবগুণের সহিতও তাঁহার একটা বিশেষ লাঠালাঠি ছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? নবগুণ অধঃপাতে যাউক; বল্লালসেনের নাম অক্ষয় হউক, দেবীবর ঘটক অনন্ত স্বর্গ ভোগ করুন; তাঁহাদিগের প্রসাদে তাঁহার অকলঙ্ক কুলে কিছুতেই কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। সমাজে মান্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। কুলীন মহলে, ঘটকের দলে তাঁহার বিশেষ একটা প্রতিপত্তি ছিল। যেখানে দলাদলি হইত, সেইখানে রামকৃষ্ণ আগে দলপতি; যেখানে বিবাহাদির সভা হইত, সেখানে মালাচন্দনের ভাগ আগে তাঁহার প্রাপ্য; পঙ্‌ক্তিভোজনে যে পাতে বৃহৎকায় মৎস্যমুণ্ড শোভা পাইত, সকলেই বুঝিত, সে পাতের মালিক—রামকৃষ্ণ শর্ম্মা। রামকৃষ্ণ কুলের গৌরবে মাটিতে পা দিত না। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস, তাহার পায়ের ধূলায় অনেক বাড়ী পবিত্র হইত, অনেক অব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হইয়া যাইত। রামকৃষ্ণ দুই একটা ছিটা টানিতে অভ্যাস করিয়াছিল। অভ্যাসদোষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিবাহের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছিল। রামকৃষ্ণের সকল খবর জানিয়াও মনোরমার পিতা কুল-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অনেক করিয়া মনোরমাকে তাঁহার হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। এখন রামকৃষ্ণের অভ্যাস অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, রামকৃষ্ণ একটি প্রকাণ্ড গুলিখোর। নিজের আহারের সংস্থান ছিল না, কোনও স্ত্রীকে বাটী লইয়া যাইবে কেমন করিয়া? গুলির পয়সার অভাব হইলেই রামকৃষ্ণ একবার স্ত্রীমহল চারিদিকে ঘুরিয়া আসিত। যে কৌশলেই হউক যাহার কাছে যাহা পাইত লইয়া প্রস্থান করিত।

আপনার অভিপ্রায় সাধন-উদ্দেশেই রামকৃষ্ণ আজ মনোরমার নিকট আসিয়াছিল। কোনও স্থল খুঁজিতে হইল না; বালিকা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার অব্যবহিত পরেই মাতার পীড়ার কথা সকল কাঁদিয়া বলিয়াছিল। অবসর বুঝিয়া রামকৃষ্ণ তাহাকে লইয়া যাইবার কথা পাড়িল। সে জানিত তাহার মাতার এই উৎকট পীড়ার সময় সে কখনই যাইতে স্বীকৃত হইবে না, অথচ তাহার কথাও টালিতে পারিবে না; সুতরাং বালিকা বিষম সঙ্কটে পড়িবে; রামকৃষ্ণ তাহার মতলব হাসিল করিবার সুযোগ পাইবে।

রামকৃষ্ণ যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই হইল। দেখিল, তথাপিও বালিকা উঠিল না; সেই পায়ের উপর মাথা লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ সে বালিকাকে চিনিত, আর কিছু বলিতে সাহস করিল না; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল। কতক্ষণ পরে বলিল—"মনোরমা, একটা কথা বলি, উঠ।"

সুখস্বপ্নের মত সে কথা কয়টি বালিকার কর্ণে পশিল। সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া বালিকা বলিল—"কি কথা আছে, বলুন।"

তখন অতি গম্ভীর ভাবে রামকৃষ্ণ বলিতে লাগিল—"দেখ মনোরমা, আমার অন্য সহস্র স্ত্রী থাকিলেও তোমাকেই আমার একমাত্র স্ত্রী বলিয়া জানি। তাহা জানি বলিয়াই অন্য কাহারো কাছে না গিয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম। শুন, আমার অর্থের প্রয়োজন, আমি সেইজন্য বিদেশে যাইতাম; তোমাকেই গৃহে রাখিয়া যাইবার বাসনা ছিল। অন্য কাহাকেও আমার বিশ্বাস হয় না, তারা থাকা না থাকা সমান; তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু কি করিব, তোমার যাওয়া ঘটিতেছে না; কাজেই আমারও বিদেশে যাওয়া হইতেছে না। কিন্তু অর্থের বিশেষ আবশ্যক। তুমি স্ত্রী, তোমার কাছে লুকাইয়া কি হইবে? আজ কয়দিন আমার আহার হয় নাই।" রামকৃষ্ণের বোধ হয় আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এক চক্ষের দুই ফোটা জলে সকল কাজ সম্পন্ন হইল।

বালিকা মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার দেখিল, তাহার চতুর্দ্দিকে সকল পদার্থ ঘুরিতে লাগিল; জলে চক্ষু পুরিয়া আসিল। কাঁদিয়া বলিল—"তবে কি হইবে।"

'কি হইবে কেন, মনোরমা? যতদিন্ না তুমি যাইতে পারিতেছ, ততদিনের জন্য আমায় কিছু দাও। তোমার ভাই তো আজকাল জলপানি পাইতেছে।"

তিনি যা পান "তাতে তাঁরই কুলায় না, আবার মার ডাক্তারখরচ আছে, পথ্য আছে।"

রামকৃষ্ণ রাগিল। বলিল—"তবে সত্যই আমি তোমার কেহই নহি, ভাল, বিদায় হইলাম।"

বালিকা কাঁদিল। বলিল—"রাগ করিবেন না, আমার আর কে আছে, আমি দুঃখের কথা কাহাকে জানাইব? আপনি অনাহারে থাকিবেন, ইহা আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব? কিন্তু আমি কাঙালিনী, কোথায় কি পাইব? তবে, পৈতা কাটিয়া অনেক দিন হইতে দুইটি টাকা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা চরণের যোগ্য নয়, যদি বলেন, আনিয়া দিই।"

রামকৃষ্ণ ভাবিল, যথা লাভ; আর পীড়াপীড়ি করিলে কোন্ ফল হইবে না। বলিল—"তুমি সাধ্বী ভাল, আর তুমি কোথায় পাইবে?"

আশ্বাস পাইয়া বালিকা ধীরে ধীরে উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেলা দশটা বাজিয়াছে। একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মাথার উপর দিয়া সূর্যদেব হেমচন্দ্রদের বাড়ীতে আলো দিতেছেন। আজ আর বৃষ্টি নাই, আকাশ বেশ পরিষ্কার, ক্বচিৎ দুই এক খানা আধভাঙা মেঘ আকাশের গায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ক্বচিৎ দুই একটা ক্ষুদ্র পাখী সেই মেঘের কোলে থাকিয়া থাকিয়া "ফটিক জল, ফটিক জল" বলিয়া চীৎকার ছাড়িতেছে। ক্রমেই রোদ বাড়িয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বিধবারা মনে মনে প্রমাদ গণিল। বুঝি, আজ একাদশী জানিয়াই দুঃখিনীদিগকে কষ্ট দিবার জন্য সূর্যদেব এ খরমূর্তি পরিগ্রহ করিলেন। দূরে গ্রাম্য পাঠশালায় ১১টা বাজিল। ম্লানমুখী বিষন্নচিত্তা বিরাজ উপরে তাহার ভগিনীর নিকট গমন করিল। মহামায়া বড় একটা

নীচে নামিতেন না, উপরেই তাঁহার বাস ছিল। বিরাজ গিয়া দেখিল, মহামায়া আপনার ঘরে একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া রহিয়াছেন; এখনও অবদ্ধচিকুরদাম অগ্রবন্ধনী লইয়া পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, কামিজের উপর চারি অঙ্গুলি-বিস্তারিত কালাপাড় সিমলার ধুতি খানি বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে; চাবিরিংটি সযতনে বামস্কন্ধের উপর নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একমনে একখানি কার্পেট বুনিতেছেন। ফাঁসের পর ফাঁস উঠিতেছে, হস্ত অবিরত সূচ লইয়া ঘুরিতেছে; নিকটে থাবা পাতিয়া বসিয়া অলকার মা একদৃষ্টে সেই সকল লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার দেখিতেছে, আর অনন্ত সুরে অনন্ত শব্দে তাহার প্রশংসা করিতেছে। দূর হইতে দাঁড়াইয়া বিরাজ ইহা দেখিল; একবাটি নুন বা দুপলা তেল যাহা হয় অলকার মার যে একটা গূঢ় মতলব ছিল তাহাও বুঝিল; কিন্তু বাটীতে এমন সমুহ বিপদের সময়ও মহামায়া নিশ্চিন্ত-ভাবে কিরূপে তেমন করিয়া বসিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিল না। আর অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে গিয়া বলিল—"রান্না কখন হইবে? ১১ টা বাজিয়াছে, অরুণ কাঁদিতেছে।" অরুণ মহামায়ার তৃতীয় পুত্র।

মহামায়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"এখনও হাঁড়ি চড়ে নি!"

"কে করিবে?"

"যে বার মাস ত্রিশ দিন করে।"

অলকার মা বলিল "হেমের মার নাকি বড় শক্ত ব্যাম।"

মহামায়া সে কথায় কোন উত্তর দিলেন না। উত্তেজিত সুরে বলিলেন "কেন, তার মেয়ে তো র'য়েছে।"

অলকার মা না বুঝিয়া হেমের মার পীড়ার কথা পাড়িয়াছিল; একটু অপ্রতিভ হইল। পাছে স্বার্থসিদ্ধির কিছু ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়ে আর কিছু বলিল না। বিরাজ বলিল, "মনোরমা কেমন করিয়া পারিবে? আজ যে তার মার বড় ব্যাম বাড়িয়াছে। হেম সেই ভোরে উঠিয়া ডাক্তার আনিতে গিয়াছেন, বৃদ্ধা ক্ষণে ক্ষণে চক্ষু কপালে তুলি-তেছে, প্রলাপ বকিতেছে; বোধ হয় রক্ষা পাইবে না।" স্বভাব-কোমলা বিরাজ আর অধিক বলিতে পারিল না; কাঁদিয়া ফেলিল।

অবসর পাইয়া অলকার মা মুখ খুলিল। বলিল, "ওমা তা তুমি কাঁদ কেন? এতে-যে আপনাদের অকল্যাণ হয়।"

মহামায়া বলিল, "ঐ দেখ না; সব খেয়ে বসেছেন; আছে কটা ছেলে; তারা শেষ হ'লেই হাড়ে বাতাস লাগে।"

বিরাজের মনে বড়ই ব্যথা লাগিল। নিঃশব্দে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। এই সময়ে গৃহের ছাদ হইতে অরুণ আবার কাঁদিয়া উঠিল। অলকার মা বলিল "তাইত গা, মাগী যদি রক্ষা না পায়, বাছাদের এই বেলা খাওয়াইয়া নিলে হইত।"

মহামায়া বলিল "রান্না না হয় তা'তে আর আমার কি? ওরই তো সব —জামাই, মেয়ে, ছেলে,—ওরই তো এক পাল; আমার কিসের ভাবনা, এখনি দু পয়সার চিড়ে আনাইলে চলিয়া যাইবে।"

অলকার মা জানিত, মহামায়ারই সকল, মহামায়ারই পাঁচদিকে পাঁচটা— সে নিজে, তাহার স্বামী, তাহার পুত্র কন্যা, তাহার ভাই ভাজ ইত্যাদি শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ১৫। ১৬টী, অথচ মহামায়া বলিল তাঁহার কটা, অলকার মা সকল জানিত, কিন্তু ফুটিয়া বলিতে সাহস হইল না। বলিল—"তা বৈ কি।"

দেখিয়া শুনিয়া বিরাজ অবাক্ হইল। কতক্ষণ পরে বলিল—'তবে যাই, আমি রাঁধিগে।' ইহা বলিয়াই বিরাজ যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার মা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বলিল—"কোথা যাবি, বিরাজ?"

বিরাজ তাহার ভগ্নী অপেক্ষা মাকে বড়ই ভয় করিত. একটু থতমত পাইয়া বলিল—"রাঁধিতে হইবে।"

বৃদ্ধা জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—"উঃ সোহাগ যে বড় বেড়ে উঠেছে; এই একাদশী—দুপুর রৌদ্র, আগুনতাতে না গেলে হ'বে কেন? কেন-র্যা, ওদের হ'য়েচে কি? মাগীর ওসব কেবল ঠাট বৈতো নয়।"

বিরাজ বলিল—"না, মা, তুমি অমন কথা বলিও না; আজ তাঁর অসুখ বড় বেড়েচে।"

"হালো, তুই যেমন দেখ্চি আমি তো আর তা নই; অমন আমরা ঢের জানি।"

বিরাজ তাহার মাতার কথা শুনিয়া হৃদয়ে বড়ই কষ্ট পাইল; একবার কাঁদিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু ভয়ে পারিল না। নিঃশব্দে স্থিরভাবে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার মাতা তাহা বলিবার অবসর না দিয়া বলিলেন, "যাও, শোওগে যাও, এই দারুণ একাদশী, এখনই মুখখানি শুখিয়ে গেছে, আগুনতাতে গেলে আর বাঁচ্‌বে কি!"

বিরাজ আবার কথা কহিল। মার কোমল মূর্ত্তি দেখিয়া কতকটা ভরসা হইল। বলিল—"কি করিব? ছেলেগুলো যে খেতে না পেয়ে টা টা ক'রে মারা যাবে।"

বৃদ্ধা দেখিল, বিরাজ শুনিবার মেয়ে নয়। রাঁধিতে তাহার বড়ই জিদ। বাস্তবিক, সে বালিকা প্রাতে উঠিয়াই দেখিয়াছিল হেমের মাতার পীড়া বড় বৃদ্ধি হইয়াছে, একরাত্রে এত বাড়িয়াছে যে সে দিন কাটা ভার। হেম ভোরে ডাক্তার আনিতে গিয়াছে, মনোরমা মার মুখের নিকট বসিয়া কেবল চক্ষের জলে ভাসিতেছে। ইহা দেখিয়া বালিকার সেই ক্ষুদ্র হৃদয় কত কাঁদিয়াছিল তাহা কি বলিব? মুহূর্ত্তের মধ্যে বালিকা সকল ভাবিল। বুঝিল, আজ মনোরমা এক দণ্ডের জন্যও মার কাছছাড়া হইতে পারিবে না। কিন্তু এত লোক থাকিতে আর যে কেহ হাঁড়ি হানুশালের কাছে যায় তাহা বুঝিতে পারিল না। এতগুলা পরিবার আজ না খাইয়া মরিবে, ইহা ভাবিতে বালিকার কষ্ট হইল; তাহার আরও কষ্ট, না জানি এইজন্য তাহার দিদি মনোরমাকে কতই কথা শুনাইয়া দিবেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সমস্ত ভাবিয়া বিরাজ আজ আপনি রাঁধিবে স্থির করিয়াছিল। এ প্রচণ্ড রৌদ্রে একাদশীর উপবাস করিয়া রাঁধিতে আগুনতাতে অবশ্যই তাহার বড় কষ্ট হইবে, কিন্তু তাহার নিজের জন্য কিসের কষ্ট? আহা মনোরমার সেই কাতর মুখখানি—সেই অশ্রুপূর্ণ লোচন—সেই নিতান্ত ভগ্নহৃদয়খানি—আহা যদি আবার এই ব্যথার উপর কেহ তাহাকে তিরস্কার করে! বড় দুঃখে আহা বলে মা ভিন্ন সে বালিকার এমন আর কেহই নাই, সেই মা আজ চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন! মনোরমা যে কষ্ট পাইতেছে, বিরাজ যদি পারিত, প্রাণ দিয়াও তাহা দূর করিতে চেষ্টা পাইত। বিরাজ মনোরমার জন্য ভাবিয়া আকুল হইতেছিল, তাই আজ নিজে পাক করিবার জন্য অত পীড়াপীড়ি করিল।

বিরাজের মাতা বলিল —"কি করিব, আমিতো তেমন মা নই। আমার নিতান্ত পোড়া কপাল, না হইলেই বা পেটের ছেলে পর্য্যন্ত আমার কথা শুনিবে না কেন!" বৃদ্ধা এইখানে চক্ষের জল ফেলিল।

মহামায়া এতক্ষণ কিছুই বলে নাই, মাতার ক্রন্দন দেখিয়া বিরাজকে বকিয়া উঠিল; অলকার মাও সে অবসর ছাড়িল না, যথাসাধ্য সে ভৎর্সনার পোষকতা করিল। বিরাজের ভয় হইল, আর কিছু বলিতে সাহস করিল না; দুইবিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই সময়ে মনোরমার অনুচ্চ ক্রন্দন শব্দ বিরাজের কর্ণে পশিল; পরদুঃখকাতরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না; দৌড়িয়া উপর হইতে নামিয়া আসিল।

তখন, মহামায়া ও তাহার মা দুইজনে কান বাড়াইয়া দিয়া সে ক্রন্দন শব্দ মুহূর্ত্তের জন্য শ্রবণ করিল। অচিরাৎ রুগ্না যাহাতে যমভবনে গমন করিতে পারেন সে জন্য উভয়ে অনেক প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিল। তার পর, মায়ে ঝিয়ে মিলিয়া, কি করিয়া বিরাজের স্বভাব শোধরাইতে পারিবে তাহার পরামর্শে ব্যাপৃত হইল। বলা বাহুল্য, অলকার মা বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান পরামর্শ সে ক্ষেত্রে বিলাইয়া দিল। অলকার মা বড়ই পরহিতৈষিণী!

দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।'
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

ভগবদ্গীতা ৯। ২৪॥

ভগবান কহিতেছেন। দেবতারূপে আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং

ফলদাতা। দেবতারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, যাহাদের এরূপ বোধ, তাহারা এবম্ভূত আমাকে তত্ত্বজ্ঞানযোগে জানিতে পারে না। তাদৃশ যথাবৎ জ্ঞানাভাবে তাহারা পুনরায় সংসারগতি লাভ করে। কিন্তু (স্বামী) "যেতু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে।" যে ব্যক্তি সর্ব্বদেবতাতে আমাকে অন্তর্যামি স্বরূপ দৃষ্টি করিয়া অর্চ্চনা করে, তাহার আর সংসারগতি প্রাপ্তি হয় না। গীতাশাস্ত্রের এই বচনটি উহার পূর্ব্ব ও পরের বচনের সহিত ঐক্য করিয়া পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, ইন্দ্র, বায়ু রবি অথবা দুর্গা, লক্ষ্মী, গণপতি, কি বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবগণকে যাঁহারা পরস্পর স্বতন্ত্র জ্ঞানে পূজা করেন তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গতি হয় না। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে সমস্ত দেবগণকে একই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তাঁহারা তাদৃশ জ্ঞানযোগে কোন এক দেবতার নামরূপ অবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন, অথবা তাদৃশ কোন এক দেবতার অন্তর্যামীরূপে ব্রহ্মকেই দৃষ্টিপূর্ব্বক ব্রহ্মেরই পূজা করিয়া থাকেন। তাদৃশ মহাত্মাদিগের অপকৃষ্ট গতি হয় না। এস্থলে যেরূপ দেবগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবেচনা করা দোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ শাস্ত্রান্তরে প্রতিমাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞান করাও বন্ধনের হেতু কহিয়াছেন।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

এ বচনের প্রচলিত অর্থ এই যে, "যে সকল মূঢ় ব্যক্তি মৃত্তিকা ধাতু প্রস্তর কাষ্ঠাদি বিরচিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বুদ্ধি করে, তাহারা স্ব স্ব তপস্যা দ্বারা কেবল ক্লেশ পায়, মুক্তি পায় না।" যাঁহারা এমন ইচ্ছা করেন যে প্রতিমা পূজা দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, তাঁহারা উক্ত বচন দ্বারা এইরূপ বুঝেন এবং উহা প্রমাণ দিয়া অন্যকে বুঝান যে, ঈশ্বরের পূজার নিমিত্তে প্রতিমা প্রয়োজনীয় নহে। প্রতিমা অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করা দোষ। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞেরা উহার ওরূপ অর্থ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, সকলেই কিছু নিরাকার নিরঞ্জন পরমাত্মার উপাসনা করিতে পারে না। অতএব অধিকাংশ লোকের নিমিত্তেই প্রতিমার আশ্রয় প্রয়োজনীয়; কিন্তু যেমন দেহকে আত্মজ্ঞান করা মূঢ়তা, সেইরূপ প্রতিমাকে অর্থাৎ প্রতিমারূপ জড়

দেহটীকে ঈশ্বর জ্ঞান করা মূঢ়তা। আত্মা যেমন দেহের অন্তর্যামী—শাস্ত্রীয় বিধি ব্যবস্থানুযায়ী ও সাধকের দৃষ্টিতে, ভগবান সেইরূপ প্রতিমাতে আবির্ভূত। উপাসক, ভক্তি ও জ্ঞানযোগে সেই আবির্ভাবের আরাধনা করিবেন; নতুবা জড় মূর্ত্তিটিকেই যে, একটী সাক্ষাৎ জড়ময় ঈশ্বর জ্ঞান করিবেন এমত অভিপ্রায় নহে। যাহারা তাহা করে, তাহারা অজ্ঞান পাশে বদ্ধ। তাহারা স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি বিহীন হইয়া সেরূপ জড় প্রতিমার সেবায় কেবল কষ্ট মাত্র ভোগ করে, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরোপাসনার আনন্দ পায় না। অতএব জড়স্বরূপ প্রতিমার পূজা করিবে না, কিন্তু প্রতিমাতে ও প্রতিমা-উপলক্ষিত উৎসবে চৈতন্যময় ভগবানের আবির্ভাব দর্শন করিবে। অর্থাৎ প্রতিমা পূজা করিতে গিয়া যেন জড় উপাধিস্বরূপ তৃণকাষ্ঠ ধাতু প্রস্তরের পূজা না করিয়া বসে, কিন্তু যে ভগবানেতে প্রতিমা পূজার অসাধারণ উদ্দেশ্য তাঁহাকে যেন লক্ষ্য করে। ফলে, জড়প্রতিমা মাত্র দেবতা এরূপ বোধ করে এমন মূর্খ বোধ হয় নাই। তথাপি কি জানি যদি কেহ থাকে তবে তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রে এই শাসন দিয়াছেন, "প্রতিমায়াং শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি দেবতার প্রতিমাতে প্রস্তরাদি জড়ত্ব বুদ্ধি করে সে নরকে যায়। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তজনের গতিস্বরূপ ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া কোন নামের বিধি-বিহিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা গেল; কিন্তু যদি পূজা করার সময় কেহ সেই ভগবানকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল জড়বোধে প্রতিমার পূজা করে, তবে তাহার পক্ষে সেই প্রতিমা দর্শন বা পূজা করিতে যাওয়া আর সং দেখিতে যাওয়া একই কথা। কেন না পূজা উদ্দেশ না করিয়া কত স্থানে কত দেবতার সং নির্ম্মিত হয়। সে সকল সংকে লোকে জড় বলিয়াই দেখে। সেই সংকে শিলা বা মৃত্তিকা বুদ্ধি করা দোষ নহে। কিন্তু ভগবানের পূজার উদ্দেশে যে সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব জ্ঞান না করা কিন্তু কেবল সং-বৎ শিলা বা তৃণ মৃত্তিকা-বিরচিত এক একটা আধার মাত্র বোধ করা মহাপাপ। সেইরূপ প্রতিমা পূজাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে কোন দেবতার পূজা করা যাউক তাহা ভগবানেরই পূজা—সে সকল দেবতা তিনিই। আর যে কোন প্রতিমার পূজা করা যাউক—

পূজা তাঁহারই আবির্ভাবের।* পূজা মৃত্তিকারও নহে, পাষাণেরও নহে, নামেরও নহে, রূপেরও নহে।

যিনি প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধিপূর্ব্বক প্রতিমা পূজা করিয়া মনে করেন জড়ময় শিলামাত্রের পূজা করিলাম তিনি অপরাধী। ঈশ্বরজ্ঞান বিহীন দেবারাধনা মাত্রই দোষ। ঈশ্বরোদ্দেশ্য বিহীন প্রতিমাপূজা মাত্রই দোষ। ঈশ্বর-লক্ষিত অপ্রতিম বা সপ্রতিম নিষ্কাম-দেব-উপাসনা অবশ্য দোষজনক নহে; কিন্তু তাদৃশ সকাম-উপাসনা নিন্দনীয়। কেবল ফলকামনাবর্জ্জিত, হৃদয়-ব্যাকুলতাযুক্ত, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট সপ্রতিম বা অপ্রতিম দেবোপাসনা অথবা পরমাত্মীয় স্বরূপোপাসনা মুক্তির হেতু। তদ্ভিন্ন সমস্ত উপাসনাই হয় জড়ের, নয় ফলের উপাসনা। ঈশ্বরের নহে। তাহাই শাস্ত্রে নিন্দনীয় হইয়াছে। নতুবা প্রতিমা ও নামরূপ আশ্রয় পূর্ব্বক উপাসনা করিলেই যে দোষ হয় এমত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের রূপ নাই। তাহা উপযুক্ত অধিকারীকে বুঝাইবার নিমিত্তে শাস্ত্রে কহিয়াছেন "অরূপবদেব হি তৎ-প্রধানত্বাৎ" (শারীরকে ৩।২।১৪)। ব্রহ্মের রূপ নাই। সমস্ত শ্রুতি তাঁহার অরূপত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। তবে কোন কোন শ্রুতি যে, তাঁহাকে

* ৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে খৃষ্টীয় মিশনরিগণ হিন্দু-দেবদেবীগণের নিন্দা ঘোষণা করায়, জেনেরেল ষ্টুয়ার্ট নামক সুবিখ্যাত সেনাপতি হৃদয়ে বড় বেদনা পাইয়া তৎপ্রতিবাদার্থ আকবর বাদসাহের সুযোগ্য মন্ত্রী আবলফজলের এই সিদ্ধান্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"Abulfuzle that enlightened minister of a great and enlightened monarch, Akbar, the glory of Eastern potentates, thus speaks of the Hindoos—"They one and all believe in the unity of the Godhead: and although they hold images in high veneration yet they are by no means Idolators as the ignorat suppose". (General Stuart's vindication of the Hindoos. P 47. 1810. London.)

জেনেরল ষ্টুয়ার্ট লিখিতেছেন যে—ধরণীর পূর্ব্বভাগের সম্রাটগণের মধ্যে মহামহিমান্বিত ও সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন অতি মহৎ আকবর বাদসাহের মহাজ্ঞানী মন্ত্রী আবলফজল হিন্দুদিগের সম্বন্ধে ইহা লিখিয়াছেন যে—"হিন্দুরা প্রত্যেকে এবং সকলে পরমেশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করেন। এবং যদিও তাঁহারা প্রতিমা পূজাকে অত্যন্ত আদর করেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কোন মতেই জড়োপাসক নহেন—যেরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া থাকে।

সগুণ অর্থাৎ রূপবিশিষ্ট কহিয়াছেন সে কেবল তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি ও আশ্চর্য্য কীর্ত্তির বর্ণন মাত্র। "প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ" (শারীরকে ৩।২।১৫)। অগ্নি যেমন বস্তুতঃ হ্রস্ব, দীর্ঘ, বক্র, না হইয়া কাষ্ঠের হ্রস্ব, দীর্ঘ ও বক্রতাতে হ্রস্ব দীর্ঘ বা বক্ররূপে প্রকাশ পায়, সেই রূপ প্রকৃতির বিবিধ রূপ অনুসারে ঈশ্বর নানা প্রকারে প্রকাশের ন্যায় হন। এইরূপ তাঁহার প্রকাশবৎ ভাব স্বীকার না করিলে স্বগুণশ্রুতির বৈয়র্থ্য হয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন এই অবলম্বনে লোকে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিকার্য্য ও দশদিকে প্রস্ফুটিত বিচিত্র শক্তি অনুসারে ঈশ্বরকে বিবিধরূপে দর্শন ও বরণ করে তাহাতে সাধকের মনোভাব ও শ্রুতির সগুণ বর্ণন যুগপৎ সার্থক হয়। "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" (শারীরকে ৩।২।১৮)। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। যেমন জলে তরঙ্গ উঠিলে একই সূর্য্য নানা রূপে প্রকাশিত হন, সেইরূপ ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি যে মায়া, তিনি একদিকে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রস্ফুটিত হইয়া এবং অন্যদিকে বিচিত্র স্বভাব মানব-প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া তদুভয়ের যোগে ব্রহ্মকে নানা করিয়া দেখান। এতাবতা সূর্য্যাদির ন্যায় ব্রহ্মে উপমা হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রকৃতি ও নরহৃদয়গত প্রকৃতি যিনি মহামায়া শব্দের বাচ্য তিনিই ব্রহ্মকে নানারূপ কল্পনা করেন; অথবা ইহাই বল যে, সেই মহামায়ার প্রভাবে মায়াচ্ছন্ন জীবের মনে ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হন বা নানামূর্ত্তি ধারণ করেন; অর্থাৎ মায়াকার্য্যের যোগে ব্রহ্ম মানবের মনে আপনাকে রূপবিশিষ্টের ন্যায় দেখান, ফলতঃ তাঁহার নিজের রূপ নাই। যে দিক্ দিয়া হউক, প্রকৃতিই তাহার সংঘটক। এই হেতু জ্ঞানীকে মায়া কল্পনা হইতে মুক্তি দিবার নিমিত্ত শারীরকে (৩।২।২২) কহিলেন "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততোব্রবীতিচ ভূয়ঃ।" এইরূপে ব্রহ্ম প্রকৃতির মধ্যে যে পরিচ্ছিন্ন হইলেন, নেতি নেতি শব্দ দ্বারা তদন্তর্গত প্রত্যেক রূপের ও স্বগুণ ভাবের নিষেধ করিবেক। কিন্তু পুনশ্চ উপাসনার সুবিধার নিমিত্তে কহিলেন "অঙ্গেষু যথাশ্রয়ং ভাবঃ।" (শারীরকে ৩।৩।৬২)। সূর্য্যাদি দেবগণ এবং জগদ্ব্যাপী নানা শক্তিতে ব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব অনুভবপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিরাট পুরুষের অঙ্গরূপে আশ্রয় করত তাঁহার উপাসনা করিবেক। তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে না।

শাস্ত্রে দেব ও প্রতিমা পূজার যত বিধিই থাকুক বা নিষেধই থাকুক, স্তত্যর্থবাদই থাকুক আর নিন্দার্থবাদই থাকুক, একটি সার কথা এই যে, যদি অগতির গতি দীননাথকে পাইবার নিমিত্তে সাধকের বিশেষ ভক্তি ও হৃদয়ব্যাকুলতা থাকে, তবে জলে স্থলে ভূধরে, তৃণপত্র তরুবরে, ধন ধান্য পশুধনে, অহংচিত্ত বুদ্ধি মনে, নরনারী বৃদ্ধবালে, প্রাতঃমধ্য সন্ধ্যা-কালে, পর্ব্বদিনে মহোৎসবে, অশনির ভীমরবে, অনল শশী তপনে, শক্তি আদি দেবগণে, জীবশূন্য মৃতকায়ে, প্রতিষ্ঠিত প্রতিমায়, সর্ব্বত্রে সর্ব্বাধারে সেই বিশ্বাধার সারাৎসার পরমেশ্বর সাধকের সন্নিধানে বিশেষরূপে স্বীয় ভুবনমোহন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। নতুবা সামান্যরূপে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন তাহা কে না জানেন! কেবল বিশেষ আগ্রহেতেই বিশেষ বিশেষ দেশ কাল আধারে বা স্বীয় বিশ্বাধাররূপে তাঁহার দর্শন মিলিয়া থাকে। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নামরূপাত্মক সমস্ত জগৎ, সুতরাং তদন্তর্গত বিধায় দেহ, দেব ও প্রতিমাদি মায়াকল্পনা হইলেও এইরূপ বিশেষ ভক্তিযুক্ত হৃদয়ব্যাকুলতা জন্য সেই নামরূপাত্মক আধারে ব্রহ্মদর্শনে ঐ মহামায়া ভেদ হইয়া থাকে। তাহাতে নর-আত্মা ক্রমে মুক্তির অভিন্ন স্বরূপ ব্রহ্মাত্মাকে লাভ করেন। যদি উপাসনাধিকারে সমদর্শীর পক্ষে সর্ব্বত্রেই ভগবদ্দর্শন-সম্ভব হয়, তবে সেই ভগবানেরই পূজা করিবার নিমিত্তে তাঁহার উদ্দেশে যে সমস্ত নাম বা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেই সকল পবিত্র দেব-মূর্ত্তিতেও ব্রহ্মদর্শন সম্ভব। এ কথার বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্ম্মাশ্রায়ী মহাত্মাদিগের কোন কথা নাই। কিন্তু নব্যদিগের মধ্যে অনেকের আপত্তি আছে। আমি তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল তাঁহাদের হৃদয় ও মনকে স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। হে নব্য! বারাণসী ধামে অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমির সকল অঞ্চলের কোটি কোটি বালক বৃদ্ধ যুবা কুলবধূগণ উচ্চৈঃস্বরে মাতা পিতা বলিয়া ভগবানকে যে ডাকিয়া আসি-তেছেন, বল দেখি, সেখানে তাঁহাদের ডাকে পাপীর গতি দীনবন্ধু কর্ণপাত করেন কি না? বৃন্দাবনক্ষেত্রে সমস্ত হিন্দুকুল সমবেত হইয়া পূর্ব্বকাল হইতে তাঁহাকে প্রাণসখা বলিয়া যে পূজা দিতেছেন, বল দেখি, সর্ব্বসাক্ষী

ভগবান তাহা গ্রহণ করেন কি না? যে দেশে, যেখানে, যে কোন প্রকার রূপ নাম বিশেষণে ভগবানের পূজা ও নাম গান হইয়া থাকে তাহা কি "পৌত্তলিকতা" বলিয়া দ্বেষভাবে বা ক্রোধবশে দীননাথ উপেক্ষা করেন? যদি বল কেবল তাঁহার নিরঞ্জন "অপৌত্তলিক" উপাসনাই তিনি গ্রহণ করেন, আর ঐ সকল "অজ্ঞান দুর্ব্বলাধিকারীদিগের" "পৌত্তলিক পূজা" তিনি গ্রহণ করেন না, তবে তিনি কি দীনদয়াল নহেন? আর যদি বল ঐ সকল পূজা তিনি অবশ্যই গ্রহণ করেন, তবে ধীর হইয়া বুঝিয়া দেখ দেখি, সেই সকল মূর্ত্তিতে দেবালয়ে ও অর্চ্চনায় তাঁহার গুহ্যতম আবির্ভাব রহিয়াছে কি না? একটু ধীরভাবে ও ধ্যানযোগে দেখিলেই তোমার হৃদয় ভগবৎ-ভাবে ভরিয়া যাইবে। সেই ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিলে তোমাতে নরপ্রকৃতিস্থ উপাসনা প্রবৃত্তি সম্যক্ স্থান লাভ করিবেক, তোমার অনিত্য কলেবর লোমাঞ্চিত হইবেক, তোমার আত্মা সফলতা অনুভব করিবে, অহঙ্কার বিদূরিত হইবেক, এবং তখন সেই দেবালয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিতে তোমার আর কোন আপত্তি থাকিবে না। হে নব্য! তুমি যদি তর্ক বা দ্বেষ পূর্ব্বক ক্রিয়া ও দেবোপাসনা পরিত্যাগ কর, তবে তোমা কর্ত্তৃক সমাজ-হিতকর বহুপরীক্ষিত স্থাপিত ব্যবস্থা বিনষ্ট হইবে। ভগবানের তত্রত্য বিশেষ আবির্ভাব উপেক্ষিত হইবে এবং কোটি কোটি লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অবমানিত হইবে। হে ভ্রাতঃ! তুমি তোমার স্বীয় আত্মাতে মনেতে বা জগতে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব পূর্ব্বক পূজা করিতেছ ইহা অতি উপাদেয়। কিন্তু কোটি কোটি লোকে তাঁহাকে যে নানা নামে, নানা দেবালয়ে, ও উৎসবক্ষেত্রে ডাকিয়া স্ব স্ব আত্মাতে তাঁহাকে অনুভব পূর্ব্বক পূজা করিতেছে, তাহার প্রতি যে কিছু মাত্র মর্য্যাদা বা শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে চাহ না এ বড় আক্ষেপের বিষয়! সেখানে যে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে তাহা জানিয়াও যে তুমি যত্ন পূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিতেছ এ অতি আক্ষেপের বিষয়। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অসংখ্যাসংখ্য লোকের আহ্বানে, আরাধনায়, প্রতিষ্ঠায়, বরণে, আরতিতে যে মূর্ত্তি, মন্দির উৎসব ও স্তোত্রবন্দনা, ভগবানের সুপবিত্র স্মরণ-মাখা হইয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন দুবেলা সমস্ত হিন্দুকুলের হৃদয় ভাণ্ডারে ভগবৎ

স্মরণরূপ সুরসাল ভোক্ষ্যভোজ্য যোগাইতেছে, তাহা যে তুমি পরিত্যাগ করিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে! বিশেষতঃ তাহা তুমি আপনিই পরিত্যাগ করিয়া ক্ষান্ত হও নাই, কিন্তু লোককে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি দিতেছ, এবং যাঁহারা তাহাতে লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা করিতেছ, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে! ফলে যাঁহারা নির্ব্বেদযুক্ত হৃদয়ে সব ত্যাগ পূর্ব্বক সমাধি অবস্থাতে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হন, তাঁহাদের পক্ষে কাজে কাজেই বেদাদি শাস্ত্র, পূজা, পাঠ, তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মোপাসনা, দেবতা দেবালয় প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু হে নব্য! তুমি না সর্ব্বত্র ব্রহ্মাদর্শনক্ষমজ্ঞান যুবা, না সমাধিস্থজ্ঞান বৃদ্ধ। তুমি দুগ্ধপোষ্য বালক হইয়া কোন্ সাহসে দেবতা ত্যাগ ও দেবোপাসনার দ্বেষ কর! অগ্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের পদানত হও, শাস্ত্র পাঠ কর, শাস্ত্রকথা শুন, হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃতি অন্বেষণ কর, বিষয় বাসনা বিদূরিত হউক, ব্রহ্মেতে আত্মা স্থিরীকৃত হউক, তবে দেবতা ত্যাগ করিও। হৃদয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও বৈরাগ্য না উদয় হইলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও বেদ পরিত্যাগরূপ নির্ব্বেদভাব উপার্জ্জিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নহে। খান দুই ইংরাজি দর্শন পড়িয়া যদি ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিত, তবে আর ভাবনা ছিল না। যদি ব্রাহ্ম হইতে চাও তবে ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করাই তোমার প্রথম কার্য্য। তাহার পর বিচারপূর্ব্বক তোমার জ্ঞাত হওয়া উচিত যে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই ব্রহ্ম-শক্তির আবির্ভাব। এইরূপ ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগতের মায়িকত্ব তিরোহিত হইবে। তখন "সর্ব্বং খল্বিদং" ব্রহ্মজ্ঞান তোমাতে উদয় হইবে। তখন যে কোন পদার্থের অবলম্বনে তোমার ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হইবে। সুতরাং প্রতিমা-উপলক্ষিত পূজা অর্চ্চনায় ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব অনুভব করিতে তোমার বিপ্রতিপত্তি হইবে না। বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ, এমত ক্ষেত্রে তুমি জড়স্বরূপ উপাধিকে ব্রহ্মজ্ঞান করিতেছ না, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই ব্রহ্ম জ্ঞান করিতেছ। মহাত্মা রামমোহন রায়ও এতাদৃশ বিচারস্থলে শ্রীমদ্ভাগবৎ অবলম্বন পূর্ব্বক কহিয়াছেন "আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক!" (গোস্বামিজীর সহিত বিচার গ্রন্থে ৪৩ পৃঃ ১২২৫ বঙ্গাব্দ)। এই বাক্যটি উপলক্ষ করিয়া আমরাও

বলি যে, যিনি বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বভূতকে ব্রহ্মজ্ঞান করিতে পারেন তিনি কি প্রতিমা-উপলক্ষিত পূজাকে সেই জ্ঞান হইতে দূরে রাখিবেন? ব্রহ্মজ্ঞানই সার। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে তিনি প্রতিমা পূজাকে কেন হেয় করিবেন? আহা! আমাদের উন্নত ভ্রাতারা তৃণ অবধি উচ্চতরুবর পর্য্যন্তে, শিশির-কণা অবধি সাগর পর্য্যন্তে, ভূপৃষ্ঠ অবধি গগনমণ্ডল পর্য্যন্তে, সর্ব্বস্থানে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া কেবল কি দেবতা ও দেবালয় এবং শঙ্খঘণ্টা-নিনাদিত বেদমন্ত্রপূত উৎসব-ক্ষেত্রকে শূন্য দেখিবেন? জানি না কেমন তাঁহাদের "হৃদয়", কেমন তাঁহাদের "সহজ-জ্ঞান", কেমনই বা "বিশ্বাস" এবং কেমনই বা "আত্ম প্রত্যয়!" হা ভগবন! ভারতের এই তমোনিশাকে প্রভাত কর। হে ভ্রাতঃ! সরলচিত্ত ও নিঃস্বার্থভাবে এই সকল কথা চিন্তা কর—যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্ব্বক আমার উক্তি সকলের মধ্যে যদি দোষ পাও—বাহির করিতে ত্রুটী করিও না। তজ্জন্য আমাকে দণ্ডনীয় করিতে ত্রুটী করিও না। কিন্তু আমি এই মাত্র বুঝিতেছি যে, তুমি একটু সরল-ভাবে চিন্তা করিলেই তোমাতে যোগীজনসাধনীয় সমদর্শিতা জন্মিবে এবং তোমা কর্ত্তৃক ভারতীয় ধর্ম্মপিপাসু জনগণের অশেষ কল্যাণ হইবেক। তোমাকে আমি মূঢ়দিগের ন্যায় সকাম-উপাসনা-প্রতিপাদক বেদবিধির দাস হইয়া সঙ্কল্প ও ফলকামনাপূর্ব্বক দেবগণের সপ্রতিম বা অপ্রতিম অর্চ্চনা করিতে কহিতেছি না। তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেই অনুরোধ করিলাম। সেই ব্রহ্মজ্ঞানের মর্য্যাদার নিমিত্ত তোমার প্রতি সদুপদেশ এই যে, ফলকামনা বিহীন ঈশ্বরোদ্দিষ্ট দেবার্চ্চনা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না হইয়া বরং চরিতার্থকর হইয়া থাকে। তুমি এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞ হও, তোমারি ভগবৎ-নিষ্ঠা ও পবিত্র আচার ব্যবহারে ভারত জননীর হৃদয় প্রফুল্ল হউক।

২২এ ফাল্গুন }
১২৯২ }

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু
খড়্গপুর।

বসন্ত।

আজ বসন্ত আসিয়াছে। বসন্তের বাতাস জগতের প্রাণের চাবি খুলিয়া দিয়াছে। আজ স্বর্গ-মর্ত্তের কোলাকুলির দিন। প্রাণ আসিয়া প্রাণে মিশিয়াছে। আর কি জগৎ হৃদয়ের পাষাণ কপাট বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে! আজ জগৎ আমাদের আহ্বান করিতেছে। জগতের নূতন গৃহে আমাদের আজ নিমন্ত্রণ। আজ বসন্তোৎসব। অর্থাৎ আজ জগতের উৎসব। জগৎ স্বয়ং জগদীশ্বরের পূজা করিতেছে। কি মহোৎসব! এরূপ মহান জীবন্ত বিশ্বপূজা কে কোথায় দেখিয়াছে? এ পূজা বসন্তের —প্রকৃতির। দেখ, কেমন বাসন্তী প্রকৃতি-শয্যা পড়িয়াছে! জ্যোৎস্নার আলোয় বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-রাজ্য যেন আজ একখানি জ্যোৎস্না-জগৎ! নবীন মলয় সঞ্জীবনীর বাতাস করিতেছে। ক্ষুদ্র পিক বসন্ত-জগৎ তরঙ্গায়িত করিয়া মধুর উদ্দীপনার সুরে ঝঙ্কার আরম্ভ করিয়াছে! তটিনী রাণী সহচরীগণ লইয়া নানাবিধ অস্ফুট কবিতারবে চরণ ধুইয়া দিতেছে! কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের মন্দির হইতে তাঁহার মহিমা-গান আজ একটি সুরে গীত হইতেছে! আজ আমি স্নেহময়ী প্রকৃতির কোলে বসিয়া সেই আনন্দময় বিশ্বেশ্বরের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

বসন্ত আসিয়াছে।—কোথাকার কোন্ সুরপুরের কোন্ ঘুমন্ত শশিমুখী সুরসুন্দরীর স্বপ্ন-জাত হাসির সৌন্দর্য্য চুরি করিয়া জগতে আনিয়াছে। বসন্ত স্বর্গের আভাস—বসন্ত প্রাণ—বসন্ত গান—বসন্ত কবিতা—বসন্ত সৌন্দর্য্য—বসন্ত কবির উচ্ছ্বাস—নারীর যৌবন আর আমার অতীত-সুখ-স্বপন।

তাই বুঝি কতদিনের পর!—কি কতদিনের পর?—আমার এই পুরাণ ভগ্ন রুদ্ধ গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল! তাই বুঝি মৃত তরুতে আবার ফুল ফুটিল! তাই বুঝি আজ এই মধুর প্রাণ-উন্মাদিনী জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে স্মৃতির নদীর উপর কার একখানি সুন্দর মধুর মুখের ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে! এ বসন্ত কোথাকার? আর কখন এমন এই হৃদয়ের সুরের সঙ্গে একতান হইয়া বসন্ত আসে নাই। এ বসন্ত যেন আমার। কার মধুর হাসিতে এ বসন্ত ফুটিয়াছে! এ বসন্ত আমার কত আপনার! যেন এক গৃহে দুজনে কত কাল ছিলাম! কে তাহাকে আজ আমার এত আপনার

—প্রাণের প্রাণ করিয়া দিল! আমার প্রাণের এত কথা সে কি করিয়া জানিল! সে যে আমার সব কথা—অতীতের সমস্ত কথা জগতের প্রতি পত্রে পত্রে চিত্রিত করিয়া দিয়াছে! কে তাহাকে শিখাইল? কোথায় সে?

বুঝিয়াছি। এ বসন্ত আমার অতীত। আমার অতীতের জীবন্ত বসন্ত-মূর্ত্তি। আবার আজ—পাইলাম। আমারি অতীতের আজ নবজীবন। আজ আমার বসন্তের এই নূতন কাব্যের মধ্যে অতীতের সেই অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতীতের আধফুটন্ত কথা.—অতীত যাহা বলি-বলি-মনে করিয়া বলিতে পারে নাই, সেই সব কথা বসন্ত আসিয়া বলিয়া দিয়াছে। বসন্ত তাহার হৃদয়ের। বসন্তের সে আত্মা। কে সে? কে জানে কে!

বসন্ত অতীতের স্মৃতি—স্মৃতির জানালা। এই মধুর গীতিময়ী জানালায় বসিয়া কতকালের কথা—কত পুরাণ গান—কত স্নেহের ছায়া—কত সুখের স্মৃতি—কত অজানা সৌন্দর্য্যের কি-এক মোহিনী অদৃশ্য কায়া এবং আরও কত কি যে হৃদয়ের চারিদিকে অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে তাহা বলিতে পারি না! আমি এই বসন্তের গৃহে বসিয়া সকলের প্রাণের কথা বুঝিতে পারি। এবং জগতের অপূর্ব্ব বাসন্তী শ্রীমূর্ত্তি দেখি। সরস্বতী কি? জগতের বসন্ত—অর্থাৎ জগতের আলো। সরস্বতীভাব—সৌন্দর্য্যের সাকারা বাসন্তী স্ফূর্ত্তি।

এ জগতে মৃত্যু নাই তাহা আমরা বসন্ত দেখিয়া বুঝিতে পারি। শীতের কুজ্ঝটিকায় যাহা অদৃশ্য হইয়াছিল বসন্তে আবার তাহা ফুটিয়া উঠিল। বসন্তে আমরা জগতের অতীত আর-একটি অদৃশ্য আদর্শ জগতে বাস করি। সে জগৎ আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তথাকার বাতাস আমরা বেশ উপলব্ধি করি। সেখানকার মনুষ্য অমর। যাঁহারা জগতের আদর্শ, তাঁহারা সেইখানে বাস করেন। বসন্তে আমরা তাঁহাদের দেখিতে পাই। সেই জন্য বসন্ত আমাদের এত প্রিয়। সেই জন্য বোধ হয় অতীতের স্বপ্নময় বিচিত্র বাতাস কেবল এই বসন্তকালে কখন কখন পাওয়া যায়। তাই আজ আমি বসন্তের ছবির মধ্যে কে কোথা আছে অনুসন্ধান করিতেছিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ।

দ্রব্য কাহাকে বলে, দ্রব্য কত প্রকার, দ্রব্যের কোন্ অংশ কোন্ সময়ে গ্রহণীয় ইত্যাদি বিষয় "আর্য্যচিকিৎসা" নামক খণ্ড প্রবন্ধে ইতিপূর্ব্বে কল্পনায় বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। এখন, যে সমস্ত দ্রব্য সচরাচর এ দেশে আহার ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নাম, পর্য্যায়, ক্রিয়া, প্রয়োগরূপ ও মাত্রাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অকারাদি বর্ণক্রমে অনতিবিস্তারে বর্ণিত হইতেছে।

অধুনা এ দেশে বিবিধ রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এবং যথোপযুক্ত অর্থাভাবে লোকে যেরূপ প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এ দেশজাত মহোপকারী দ্রব্য সমূহের গুণ ও ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা গৃহীমাত্রেরই পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার অনায়াসলভ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দ্রব্য রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই সমস্ত দ্রব্যের সম্যক্ আলোচনা ও ব্যবহারাভাবে ক্রমশঃ উহাদের মহোপকারিতা লোকসমাজে গণনীয় হইতেছে না। ক্রমাগত এ বিষয়ের গবেষণায় যত্নসহকারে নিয়োজিত থাকিলে, এ দেশের অনেক দুঃখ যন্ত্রণা অপসারিত ও অনাদৃত ভৈষজ্য-বিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষতা সম্পাদিত হয়। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সুনিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকগণ বহুবিধ মূল্যবান ঔষধদ্বারা যে সকল পীড়া আরাম করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল রোগ সামান্য দুই চারিটী দ্রব্যের সাহায্যে, অতি সহজে দূরীকৃত হইয়াছে। কথায় কথায় গৃহস্থঘরে চিকিৎসক আনয়ন করা কিছু সহজ নহে। এ জন্য ভরসা করি, আমাদের পাঠকবর্গ ইহাতে বর্ণিত দ্রব্যাদির পরীক্ষা ও অনুসন্ধানাদিতে সমধিক যত্নবান হইবেন।

অগুরু।

অপর নাম—বংশিক, শৃঙ্গজ, অগর।

পর্ব্বতজাত বৃহৎ বৃক্ষের সুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ। চন্দনের ন্যায় গোলাকার খণ্ডে খণ্ডে বাজারে বিক্রীত হয়। ইহা কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য এবং

বলকারক, বায়ু ও কফ নাশক। চক্ষু কর্ণ ও মুখরোগে হিতকর। ইহার প্রলেপ স্নিগ্ধকারক। ব্রণে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কৃষ্ণ ও পীতবর্ণভেদে অগুরু দ্বিবিধ। যাহার সার কৃষ্ণবর্ণ ও গুরু তাহাকে কৃষ্ণাগুরু, আর যাহা পীতবর্ণ ও লঘু তাহাকে পীতাগুরু বা অগোর বলে। পীত অপেক্ষা কৃষ্ণাগুরু অধিক গুণশালী। ইহা হইতে এক প্রকার অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট উদ্বায়ী তৈল উৎপন্ন হয়, তাহাকে চন্দনী আতর কহে। নারায়ণ তৈল, হিমসাগর তৈল শ্রীগোপাল তৈল, লবঙ্গাদি চূর্ণ, চ্যবনপ্রাশাবলেহ, কন্দর্পসুন্দর রস প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ মতের বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অঙ্কোটঃ।

অপর নাম—ধল আঁকড়া, আকোড়, ঝিকুড়ে।

দীর্ঘপত্র মধ্যাকৃতি পীতসার বৃক্ষবিশেষ। ঔষধার্থে সচরাচর ইহার মূলই ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু, স্নিগ্ধ, রেচক, কফ বায়ুহারি, বিষ-লূতাদি দোষনাশক। মাকড়সার গরলে বাটীয়া লেপ দিলে উপকার হয়। ইহার ফল শীতল, স্বাদু, শ্লেষ্মা নাশক, গুরু, বলকারক, বিরেচক, ধাতুপোষক। বাত, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও ক্ষয়রোগে উপকারক। ফলের বর্ণ পক্কাবস্থায় ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও তন্মধ্যস্থ শাঁস লিচু ফলের ন্যায় হয়, ইহার কাষ্ঠে অল্প পরিমাণ তৈলবৎ পদার্থ আছে।

ধল আঁকড়া মূল জলে পিশিয়া নস্য লইলে কামল (ন্যাবা) রোগ আরোগ্য হয়।

অজশৃঙ্গী।

অন্য নাম—মেষশৃঙ্গী, ছাগলবেঁটে, মেড়াশিঙ্গে।

সক্ষীর লতা বিশেষ। ইহার ফল ও মূল ব্যবহার্য্য। মূল কটু ও তিক্ত। কফ, অর্শঃ, শূল বেদনা, শোথ (ফুলা), হৃৎপীড়া, শ্বাস, কুষ্ঠ ও চক্ষু রোগে হিতকারী। ইহা হুঁকার জলে বাটীয়া সেবন ও দংশন স্থানে লেপন করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহার ফল তিক্ত, উষ্ণ, কটু, অগ্নিদীপক, কফ বাত নাশক, পরম রুচিকারক। দেখিতে ছাগশৃঙ্গ সদৃশ। ফলের মধ্যে

একরূপ তুলা জন্মে। এবং উহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা দৃষ্ট হয়। ইহার পত্র গোল ও ঈষৎ শুক্লাভ। পুষ্প ক্ষুদ্র ও শুক্ল বর্ণ, গুচ্ছাকারে অধোমুখে থাকে। এই জাতীয় আরো ২।৩ প্রকার লতা আছে, অনেকে তাহাদের কোন একটীকে অজশৃঙ্গী অনুমান করিলেও করিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন মেষশৃঙ্গী ও অজশৃঙ্গী এক জাতীয় নহে। অজশৃঙ্গী পূর্ব্বোল্লিখিত লতা, মেষশৃঙ্গী দুই তিন হস্ত পরিমিত শুক্লবর্ণ আটাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরু। ইহার ফলও শৃঙ্গাকৃতি, দেখিতে অতি সুন্দর। গুচ্ছাকারে উর্দ্ধমুখে জন্মে। আমরাও ইহাই বলি। ডাক্তার অম্বিকাচরণ রক্ষিত কৃত "ভারত ভৈষজ্য তত্ত্বে"ও মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

অনন্তমূল।

অন্য নাম—শ্যামা, সুগন্ধা।

স্বনামখ্যাত লতা বিশেষ। ইহার মূল উগ্র সুগন্ধ বিশিষ্ট। ঈষৎ তিক্তাস্বাদ। বলকারক, পরিবর্ত্তক, রক্তপিত্তনাশক, মূত্রকর, স্বেদজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, পুরাতন বাত, পারাদোষ, উপদংশ, জীর্ণজ্বর ও চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী। ইহা বাটীয়া লেপ দিলে ক্ষত হইতে পুঁযাদি নিঃসৃত হইয়া থাকে। চেলোনী জলে বাটীয়া সেবন করিলে ধসন্ত রোগ নষ্ট হয়। অনন্তমূল, বাসকমূল ও রক্তশালী তণ্ডুল একত্রে বাটীয়া কাঁজি ও দুগ্ধের সহিত ঋতুকালে ভক্ষণ করিলে নারীদিগের বাধকদোষ নিবারণ হইয়া অপত্যোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর হয়। অনন্তমূল, কুড়, উৎপল ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটীয়া ঘৃত ও তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও আধকপালিয়া রোগ বিনষ্ট হয়। অনন্তমূলের ক্বাথে * ৫ রতি নিশাদল মিশাইয়া সেবন করিলে ন্যাবা ভাল হয়। অনন্তমূল, রক্তচন্দন, লোধ ও দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথ চিনির সহিত পান করিলে নারীদিগের গর্ভাবস্থার জ্বর নিবারণ হয়।

---

* ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম এইযে, যতগুলি দ্রব্য হইবে, তুল্যাংশে সর্ব্বসমষ্টির পরিমাণ ২ তোলা লইতে হইবে। ঐ দুই তোলা দ্রব্য অল্প কুটিয়া আধ সের জলে মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশেষ থাকিতে নামাইয়া, ছাকিয়া অল্প মধুসহ ২।৩ বারে সেবন করিতে হয়।

অণ্ড।

অন্য নাম—ডিম্ব, আণ্ডা।

সচরাচর মৎস্য, পক্ষী ও কূর্ম্মাণ্ডই ব্যবহৃত হয়। এই সকল অণ্ড স্বাদু, কটু-পাক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধকারক, পোষক, বাত কফ নাশক। রসকর্পূর, তুঁতিয়া প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হইলে অণ্ডলাল দ্বারা বিষ নষ্ট হয়।

অন্ন।

(ভাত ইতি লোকে)

অন্ন প্রস্তুত প্রণালী সকলেই অবগত আছেন। তণ্ডুলের গুণানুসারে অন্ন বিবিধ গুণবিশিষ্ট হয়। সামান্যতঃ অন্ন পুষ্টিকারক, বুদ্ধি, প্রীতি, শুক্র, ধাতু ও ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাজনক, গুরু, কৃশতা, ক্ষুধা ও ক্ষয় রোগ নাশক। নূতন চাউলের অন্ন শ্লেষ্মাকারী, গুরু, সুস্নিগ্ধ, স্বাদু ও বলকারক। পুরাতন চাউলের অন্ন রুক্ষ, অগ্নিকর, বিরস। নবজ্বর ভিন্ন প্রায় সর্ব্ব রোগেই সুপথ্য। ঈষৎ উষ্ণ অন্ন প্রশংসনীয়, অগ্নিকারি, বাতশ্লেষ্ম নাশক, রক্তপিত্ত প্রকোপ-কারি। অত্যুষ্ণান্ন বলহানিকর। শীতশুষ্কান্ন (কড়কড়ে ভাত) দুর্জ্জর, সহজে জীর্ণ হয় না। অতি ক্লিন্নান্ন (পচা ভাত) বিশেষ গ্লানিজনক। জলধৌত সদ্যান্ন অতিশয় লঘু, শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বাসি জলযুক্তান্ন (পান্তা ভাত) ত্রিদোষ কোপকারি, রুক্ষ। পর্য্যুসিত অন্নের আমানি অগ্নি-কারক, তৃপ্তিজনক, মুখপ্রিয়। হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও কৃমি রোগে হিতকারক। পরমান্ন- সারক, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, মিষ্টরসযুক্ত, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্ত-কারি। সূক্ষ্ম তণ্ডুল দুগ্ধ বা জলমিশ্রিত দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে চিনি কিস্‌মিস্ প্রভৃতি প্রক্ষেপ দিয়া নামাইয়া লইলে পরমান্ন প্রস্তুত হয়। অন্ন মণ্ড—ভাতের মাড়—অর্থাৎ যাহাতে কিছু মাত্র শিঠি থাকে না, কেবল জলবৎ অথচ কিঞ্চিৎ গাঢ়। ইহা সদা সুপথ্য, ঘর্ম্মকারক, অগ্নির উদ্দীপক, গ্লানি-নাশক, ধাতু সকলের সমতাকারক। মণ্ড কিছু শিঠির সহিত থাকিলে, তাহাকে "পেয়া" বলে। "পেয়া" ক্ষুৎপিপাসাজনিত দেহের অবসন্নতা ও দৌর্ব্বল্য নাশক। উদরবেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরাদি রোগে সুপথ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিরাজ।

রাম বসু।

প্রথম প্রস্তাব।

সালিকা-নিবাসী জয়নারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র বসু, ওরফে রাম বসু, ১৭৮৭ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৪২ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; অর্থাৎ, ১৮২৯ খ্রীঃ পরলোক গমন করেন। নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাসু নৃসিংহ, † নিত্যানন্দ বৈরাগী, গৌর কবিরাজ, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, গোরক্ষ নাথ, নবাই ঠাকুর, কেষ্টা মুদি প্রভৃতিরা তাঁহার সমসাময়িক কবি ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নিধুবাবু ও হরু ঠাকুর সুপ্রসিদ্ধ। রাম বসু যখন জন্ম-গ্রহণ করেন, তখন নিধুবাবুর বয়স ৪৬, ও হরু ঠাকুরের ৪৮ বৎসর ছিল। সুতরাং রাম বসু যখন তাঁহাদের সহিত কবিত্ব সমরাঙ্গনে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা বৃদ্ধাবস্থাপন্ন।

কবি-গাহনা কাহাকে বলে, এখনকার হয়ত অনেকেই জানেন না। পূর্ব্বে কোন স্থানে কবি গাহনা হইবে শুনিয়া, শুনা গিয়াছে, এমন কি দশ ক্রোশ দূর হইতে লোক আসিত। আসর "ন স্থানং তিল ধারয়েৎ" হইয়া যাইত। এখনকার যাঁহারা "হাফ্ আকড়া" দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবি-গাহনা কতকটা অনুভব করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে, দুইটী দল আসরে নামিয়া, এক দল ধরতা বা চাপান (প্রশ্ন) গাহিত; অন্য দল তাহার উত্তোর (উত্তর) গাহিত। উপস্থিত রচনা-শক্তি কবি-গাহনার একটী আশ্চর্য্য মুগ্ধকরী ক্ষমতা। রাম বসুই আসরে উত্তর রচনা করিবার প্রথা সৃষ্টি করেন। তৎপূর্ব্বে, প্রতি-পক্ষের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া পূর্ব্বেই উত্তর প্রস্তুত করা হইত।

কবিদলের মধ্যে হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, ভবানী বেণে, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, গুরু দুঃখে, রামসুন্দর সেকরা, বলরাম বৈষ্ণব, নীলমণি পাটুনি, এবং মোহনলাল সরকারের দল সুবিখ্যাত ছিল।

---

† রাসু এবং নৃসিংহ দুই জনে সহোদর। উভয়ের নাম একীভূত হইয়া ব্যবহৃত হয়।

কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ গীত ভৈরবী, বিভাস, জয়জয়ন্তী, বেহাগ এবং জংলা সুরে গ্রথিত।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাসীতে কি রকম একটা ফাঁকা গোছের যুদ্ধ হইয়াছিল। অথচ জেতাদিগকে ১৮২৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দিল্লীর বৃত্তি-ভোগী একজনকে ভারতেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হইত!—যাহা হউক, এ যুদ্ধের সুফল আমরা ১৮৩০ খ্রীঃ হইতে ভোগ করিতেছি। ১৭৫৭ হইতে ১৮৩০, এই কিঞ্চিদধিক সপ্ততিবর্ষব্যাপী সময়কে আমরা বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালা সমাজের একটী স্বতন্ত্র যুগ বলিতে পারি।*

আবার ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আর কলিকাতায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়। ১৭৬০ হইতে ১৮২৮, এই প্রায় সপ্ততিবর্ষ-ব্যাপী সময়কে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী স্বতন্ত্র যুগ বলিতে পারি। †

যৎকালে বঙ্গদেশ, মিশি-খাওয়া বিধর্ম্মীদিগের হস্ত হইতে এক অজানিত নব বিধর্ম্মীদিগের হস্তে গিয়াছে, হেমন্তের সহনীয় কুজ্ঝটিকা শীতের সূচীভেদ্য কুজ্ঝটিকায় মিশিতেছে;—রাম বসু সেই যুগের লেখক, শীতের কোকিল। তখন ইংরেজ রাজত্বের মধুর বসন্ত—কৈনিং-রাজত্বের পর-সীমায়; —বহুদূরে।

আবার এ সময়ের সমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। নিজের অস্তিত্ব ত গিয়াছেই, আবার মুসলমান-সমাজের উপসর্গ গুলি জুটিয়াছে। বহুবিবাহ প্রচলিত; লাম্পট্য একটী গুণ; বেশ্যারাখা বাবুয়ানা ও ধনীর লক্ষণ। রাম বসু এই সমাজের লোক; তাঁহার আবার দুই স্ত্রী।

Carlyle বলেন,—"প্রত্যেক ব্যক্তির কার্য্যকলাপের জন্য সেই ব্যক্তি যতটা দায়ী, সমাজ তদপেক্ষা দায়ী।" Emerson বলেন,—"একজন মহৎ

* ১৮১৬ খ্রীঃ হিন্দু কালেজ এই মহা নগরীতে স্থাপিত হয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের সুফল স্বরূপ ইংরেজি সুশিক্ষিত যুবক-বৃন্দ, এই কালেজ হইতে, ১৮৩০ খ্রীঃ বহির্গত হয়েন।

† ঈশ্বর গুপ্ত ১৮০৯, মদনমোহন ১৮১৫, বিদ্যাসাগর ১৮২২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহন রায় এই যুগের মধ্যবর্ত্তী সত্য, কিন্তু তিনি যুগানুবর্ত্তী লোক নহেন।

ব্যক্তি, সামাজিক ঘটনানুরূপ মহৎ হয়েন। সে সময়ের সমাজ তাঁহাতেই চিত্রিত থাকে।” তবে—যখন জগতের চিরপূজ্য কবিগণ সমাজের দোষ গুণ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকিতে পারেন নাই, রাম বসু ত কোন্ দূরের কথা!

আমার বিশ্বাস, দেশের উন্নতির যুগে সমাজের সুস্থাবস্থায় যদি তিনি জন্মাইতেন, তাহা হইলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা রচয়িতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, তাঁহার লেখা অন্য ভাষায় অনুবাদিত হইত। তিনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি, এই মাত্র আমি স্বীকার করি। কিন্তু অসামান্য নহেন।

আবার, কবি-গাহনা রাম বসুর জীবিকা ছিল। তাঁহাকে একজনমাত্র রাজা বা ভূস্বামীর মুখাপেক্ষা করিতে হইত না। সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইত। সাধারণের সহিত কবিকে যখন মিশিতে হইবে, তখন তাঁহার অধোগতি হইবে; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

এই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খল-যুগের সাহিত্য একটু মনোযোগ করিয়া পড়িলেই দেখা যায়, সে সাহিত্যও বিশৃঙ্খল, আদর্শ-হারা। এ সময়ের সাহিত্যকে আমার একটী স্বাভাবিক স্রোত বলিয়া বোধ হয়। সে স্রোতে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির দুই একটী ভাব ঢেউয়ের মত আসিয়া পড়িয়াছে; ভারতচন্দ্রের ভাষাও দুই একটি আবর্ত্তের মত ঘুরিতেছে সত্য; কিন্তু বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ যে সমুদ্রমুখে, ভারতচন্দ্র যে উপসাগর মুখে গিয়াছেন, সে সাহিত্য সে সমুদ্রমুখে সে উপসাগরমুখে যায় নাই, বা তাঁহাদের স্রোতে উপনদীর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়ে নাই। এ স্রোত স্বাভাবিক; ইহা অভূতপূর্ব্ব আকুলতা। ভবিষ্যৎ যুগের ভিত্তি।

এই যুগের তিনটী তান বাঙ্গালা-সাহিত্যের চির গৌরব। নিধুর টপ্পা, হরুঠাকুরের সখী-সম্বাদ, এবং রামবসুর বিরহ। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে, একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি রামবসুর বিরহ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার যদি টাকা থাকিত, রাম বসুকে লাখ্ টাকা দিতাম।”*

“রামবসুর গানের ভাব যেমন স্বাভাবিক, সময়োপযোগী এবং সুন্দর; শব্দ-

* বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

বিন্যাসও তেমনি প্রাঞ্জল, সুকৌশলসম্পন্ন, সুতরাং পরিপাটী ও মনোহর।"†
রাম বসুর ভাষা প্রাঞ্জল হইবার তিনটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১মতঃ, ইহ গান, সরল হওয়াই উচিত। ২য়তঃ, ইহা সাধারণের জন্য। ৩য়তঃ, ভারতচন্দ্রের পরে, নহিলে কেহই শুনিতে চাহিত না, বুঝিতে পারিত না। এই কারণে কবিওয়ালাদিগের প্রত্যেক গানই প্রায় প্রাঞ্জল এবং সরল।—কিন্তু অনুপ্রাসের ছটার বিশেষ ধুম। আবার বিদ্যাফলান এক রকম মুন্সীগিরি ছিল।—

"এ বসন্তে সখি, পঞ্চ আমার কাল্ হোলো জগতে।
কবে পঞ্চ দুখে দাহ, পঞ্চভূত দেহ, পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে॥
পঞ্চ যাতনা প্রায় নিশি পঞ্চ প্রহরেতে।
যদি পঞ্চামৃত করি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ, হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ;
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম কোরেছিলেন যার, এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে।
ইত্যাদি—ইত্যাদি।

আবার, রামবসুর প্রণয়চিত্র উচ্চ-মুখীন নহে। যে সঙ্গীত পবিত্র হোমাগ্নি-শিখার ন্যায় হৃদয়কে স্বর্গমুখে লইয়া যায়, ইহা সে প্রণয় নহে। যে প্রেম-গীতি পাঠ করিলে ইচ্ছা করে দুই দণ্ড বসিয়া ভাবি, কি ভাবিব অথচ জানি না; বুঝি দুই দণ্ড একা বসিয়া ভাবিলে প্রাণের কোথাকার কতকটা ঘোর-ঘোর ভার লাঘব হইবে,—এ গানে তেমন একটা সাধের বিষাদ-ভাব নাই। সহজ কথায়—ইহাতে তন্ময়ত্ব নাই, আত্ম-বলিদান্ নাই, প্রাণের সরলতা নাই, কর্ত্তব্যপরায়ণতা নাই। চণ্ডিদাসের রাধিকার ন্যায় ব্যাকুলতা নাই, বিদ্যাপতির রাধিকার ন্যায় আক্ষেপ নাই। ইহাতে রোহিণী হীরার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য আছে; ভারতচন্দ্রের বিদ্যার লুকাচুরী আছে; মল্লিকা মালতীর ছড়া আছে; বৃন্দাদূতির প্রগল্‌ভতা আছে, কোকিলের কুহুস্বর আছে, মলয় সমীরণ আছে, ভ্রমর গুঞ্জন আছে, প্রিয়সখী আছে, মদন-জ্বালা আছে। তবে—দীর্ঘ দীর্ঘ দ্বিগত নাই, কথায় কথায় প্রাণত্যাগ নাই; ঘন ঘন মূর্চ্ছা নাই। তাই রক্ষা। তবে, আরো কিছু আছে। সে কথা পরে দেখিব।

† সারস্বত কুঞ্জ।

তাঁহার কবিতা পৃথিবীর ধূলামাখা। তাঁহার যুবতীরা মদনের পঞ্চশরে, প্রাণনাথের বিচ্ছেদ-শরে সারা হয়েন। বিরহে রতিপতি কুলনাশক, প্রাণপতি প্রাণনাশক। উভয় শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহারা সখীকে বলেন,—

"আপনার পতি হ'য়ে বুঝিল না বেদনা,
রতিপতি বুঝ্‌বে কেন পর-নারীর বেদনা?"

কেহ বা আক্ষেপ করেন,—

"আমার ধনের সম্ভোগী যে জন
করিলা রক্ষে; দেখিল বিপক্ষে
রক্ষা করি যেন যক্ষের ধন।

সখীর প্রবোধ শুনিয়া বলেন,—

"আমি সাধে কি সাধিনা তায়।
দেখ্‌লে সই আমায়, শত্রু ফিরে চায়;
সে যেন—চোখের মাথা খায়।"

কেহ বা ভালবাসায় ত্রিরাত্রি না যাইতে যাইতে বিড়ম্বনা দেখিতে পান,—

"আগে মান খোয়ালেম, কুল মজালেম,
শেষে দেশ বিদেশে অপমান।"

ইহাদের যত দুঃখ জ্বালা যৌবনের, বসন্তের এবং মদনের।

"যৌবন জনমের মত যায়,
সেতো আশাপথো নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণ সখি, রাখিব উহায়?
জীবন যৌবন গেলে আর, ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার,
বাঁচিতো বসন্ত পাব, কান্তি পাব পুনরায়।
হায় ষোলকলা পূর্ণ হলো যৌবনে আমার।
দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে বিফলেতে যায়॥ ইত্যাদি—ইত্যাদি।

উদ্দাম হৃদয়।

১

হায়, কেমনে বলিব বারেবার—
তোমার ও মুখখানি সরল কুসুম সম
সাজের কোমল কায়ে আলোক-প্রচার।
প্রাণের আঁধার মোর যায়না যায়না হায়
তোর ও আলোক দানে;
তোর ও সরল স্নেহ, তোর ও কোমল প্রাণ
পশেনা—মেশেনা মোর প্রাণে।
আঁধার আঁধার মোর হৃদি,
গভীর অগাধ মোর তৃষা,
কেমনে মিটিবে বল কেমনে জুড়াবে বল
হৃদয়ের দারুণ পিপাসা!
ক্ষু—দ্র কুসুম তুই, ক্ষু—দ্র তারাটি সম
ক্ষু—দ্র, ক্ষু—দ্র তোর প্রাণের লহরী;
বিরাট হৃদয় মোর, প্রলয়ের মেঘ প্রায়
চরাচরে প্রসারিয়া ঘোর বিভাবরী।

২

কিছুতে মেটে না সাধ, বসিবার স্থান তার
পায় না—দেখে না মোর উদ্দাম হৃদয়;
ব্যাকুল ঝটিকা মত আকুল সাগর সম;
নিরন্তর হু হু হু হু বহে চলে যায়!
কেন রে পাগল মন কিসের করিয়া আশ?
কোন্ সাধ বল তোর মেটে না হেথায়?
কাহারে খুঁজিয়া বল গরজি গরজি উঠে
আশায় অশনি তোর দিকে দিকে ধায়!

আঁধারের মাঝে তুই দেখিয়া কাহার মুখ—
কার প্রেমে উচ্ছ্বলিত—কার প্রেমে বল!
কাহারে কল্পনা করি হৃদয়ে অনল জ্বালি
নিজের অনলে তুই দগ্ধ অবিরল!

৩

জানি নাক যাহা আমি তাহার হৃদয়-মাঝে
আছে গো কতই শোভা।
অজানা খনির গলে অপরূপ আলো জ্বেলে
আছে কত মণি মনোলোভা।
আঁধার সাগর পারে কতই বিচিত্র দেশ,
কত দ্বীপ জাগে ভাসে তায়,
অপূর্ব্ব কুসুম ফোটে, স্বরগ সংগীত ছোটে,
বহে কত অপরূপ বায়।
কালের সাগরে এই পায়নি হৃদয় মোর
জুড়াবার স্থান,
চরাচর গ্রাস করি ঘুরিয়া বেড়াই তাই
অগ্নিময় প্রাণ।

৪

তুমি সখি এতটুকু রজত নীহার-ধার,
কোমল কুসুম-হৃদে তোমার আসন;
এসনা আমার কাছে শুকাইয়া যাবে তুমি,
প্রদীপ্ত ভাস্কর মোর অতৃপ্ত জীবন।
আমার প্রচণ্ড প্রেম উড়াইয়া দেয় কত
রাজ্য আর রাজার সম্পদ।
অতৃপ্ত বাসনা সুখে আসে গো যখন যাহা
ঘটে তার বিষম বিপদ।
অনলের মত দহে দারুণ দুরন্ত প্রেম
বহে যায় ঝড়ের সমান;

অতল জলধি জল নিভাতে পারে না তারে,
নিশি তায় করে না নির্ব্বাণ।
অতৃপ্ত কঠোর উগ্র জগতে আছে গো যাহা
আমার প্রাণের কাছে মানে পরাজয়;
জলধি অনল বায়ু গরল পিপাসা ক্রোধ
আমার হৃদয় সম উগ্র তীব্র নয়।
বাঁধিতে পারে না তারে স্বরগ নরক—ধরা,
অবস্থার অদৃষ্ট লহরী;
উধাও উধাও ধায় জীবন-উৎপাৎ মোর
চরাচর সকল বিদারি।

৫

এমন হৃদয় সখি কি ক'রে তোমার হবে
ঘুমে-ভরা আঁখি দুটি তোর;
দুরন্ত জলন্ত প্রাণ কেমনে রাখিবি ধ'রে
গোধূলি-স্বপনে তুই ভোর।
যাও সখি ফিরে যাও তোমার মঙ্গল ধামে,
যেখানে সায়াহ্ন-রবি হাসে,
কুবলয় আঁখি দুটি রাখিয়া আকাশ পানে
চেয়ে থেক সন্ধ্যার উদ্দেশে।
সায়াহ্ন-সরসী যথা আঁধারি ঘনায়ে উঠে
সন্ধ্যার বাতাস পেয়ে গায়।
প্রশান্ত মু'খানি তোর হইবে প্রশান্ত আরো
রবি যবে চাহিবে বিদায়।
ফুটিবে সাঁজের তারা উঠিবে তোমার গান,
বায়ু তারে চারি দিকে দেবে ভাসাইয়া;
শিশুর অধরে হাসি, কোমল শৈশব স্মৃতি
ফুল গুলি সেই সুরে উঠিবে জাগিয়া।

৬

আমি যাই খুঁজিবারে বিশাল জগৎ মাঝে

কোথা ফুটে আছে মোর সাধের স্বপন্।
কোন্ আকাশের মাঝে মোর তারা উঠিয়াছে,
সন্ধান পেয়েছে প্রাণ—দেখেনি নয়ন!
কোন্ দিকে, কোন্ খানে, কোন্ সাগরের পারে
নূতন পৃথিবী মোর নব মহাদেশ।
কোন্ প্রভাতের মাঝে পূরবের স্বর্ণ দ্বারে
অমর দিনের শিরে উঠিছে দিনেশ।
খুঁজিবরে—খুঁজিবরে স্বপ্নমাখা নদী তীরে
বনের গোধুলিময় আলোকে আকুল,
কার পথ পানে চেয়ে নাগবালা খুলিয়াছে
সুবর্ণসায়াহ্ন-ভরা নয়ন-মুকুল।
আঁধার পরাণ নিয়ে বনের আঁধারে যাব
শত ধ্বনি নিয়ে তার ডাকিব উচ্ছ্বাসে;
বনের আঁধার কায়া তারকা নয়ন খুলে
কহিবে না কোন কথা আমার সকাশে।
তবুও না পাই যদি সে দেশের ঠিকানারে
যেথায় স্বপন মোর নহে ত স্বপন,
কোথাও না মেলে যদি সে উজ্জ্বল উপমাটি
আঁধার ভাবের মোর নির্ম্মল দর্পণ,
পাখী ফুল তারাদের মুখপানে চেয়ে চেয়ে
কিছুতে পারিনে যদি করিতে স্মরণ
সে মধুর কথাটিরে, পূর্ণ করে দেবে যাহা
এ জীবন-পয়ারের অপর চরণ।—
মিশাব আকুল প্রাণ আকুল বায়ুর সনে,
অতৃপ্ত জীবন দিয়া পৃথিবী ঢাকিব।
আশায় মরিয়া পুন, আশায় বাঁচিয়া পুন,
নিরন্তর হু হু হু হু বহিব—রহিব।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান।

(দ্বিতীয় ব্যাখ্যান)

"তপাংসি সর্ব্বানিচ যদ্বদন্তি।" (কঠঃ শ্রু) সর্ব্ব প্রকার দেবদেবীর পূজা অর্চ্চনা ব্রহ্মতেই উদ্দিষ্ট। "ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।" (শাঃ সূ) আদিত্যাদি দেবগণে ব্রহ্ম দৃষ্টি পূর্ব্বক উপাসনা উৎকৃষ্ট দৃষ্টিঃ।

"যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং॥" (গীতা ৯।২৩)

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করে সে আমারি পূজা করে। তবে সে, ফলকামী বিধায়, কেবল যাগফল মাত্র পায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্ব দেবতাতে অন্তর্যামি জানিয়া পূজা করে সে মুক্তিলাভ করে।

১৭৫০ শকাব্দা ৬ ভাদ্র বুধবারে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে পূজ্যপাদ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে যে প্রথম ব্যাখ্যান পাঠ করেন * তাহাতে আছে "পরমেশ্বরের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ বস্তু রহিয়াছেন, অতএব পরমেশ্বর বোধে যে কেহ যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে পরমেশ্বরেরই উপাসনা হয়; এবং প্রত্যক্ষও দেখিতেছি যে, যে সকল ব্যক্তিরা পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্ত্তিবিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণ বোধে, বৃক্ষকে বৃক্ষ বোধে, নদীকে নদী বোধে, ও মূর্ত্তি বিশেষকে কেবল মূর্ত্তিবোধে উপাসনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বর বোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবির্ভাব স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ও গ্লানি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ সর্ব্বথা অযোগ্য হয়। যদ্যপিও তাঁহারা পরম্পরা উপদেশ দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন বোধে উপাসনা করিতেছেন, তথাপি সে উপাসনা সর্ব্বথা পরমেশ্বরের উপাসনা নহে এমত কহা যায় না, যেমন মনুষ্য খট্টাতে, কিম্বা অট্টালিকাতে কিম্বা বৃক্ষোপরি শয়ন করিলে সে শয়নের

---

* ১৭৫০ শকে মুদ্রিত।

আধার পৃথিবীই পরম্পরা হইয়া থাকেন। এবং শ্রুতিতেও স্পষ্ট দেখিতেছি "তপাংসি সর্ব্বানিচ যদ্বদন্তি।" (কঠ) তপস্যাদি কর্ম্ম সকল যে কোন প্রকার হউক পরমেশ্বরের প্রাপ্ত্যর্থ হইয়া থাকে।" * বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উক্ত ব্যাখ্যানে এই কথাগুলি কহিয়া তৎপরে নানাশাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা দর্শাইয়াছেন যে, "সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয়;" পশ্চাৎ উপসংহারে কহিয়াছেন "অতএব ইহাঁদের (আত্মোপাসকদের) সহিত অন্য কোন উপাসকের বিরোধ সম্ভাবনা রহিল না, যে হেতু ইহাঁরা বিরোধে উদ্যত অন্য উপাসককে কহিতে সমর্থ হইবেন যে 'তোমরা স্ত্রী রূপ বিশিষ্টকে কিম্বা পুরুষাকৃতি বিশিষ্টকে অথবা অন্য যাহাকে উপাসনা করহ তাঁহাকে জগৎকারণ ও জগতের নির্ব্বাহ-কর্ত্তা কহিয়াই উপাসনা করিয়া থাক; যদি তোমাদের সেই উপাস্য জগৎকারণ হন, তবে তিনি সুতরাং আমাদের অর্থাৎ "আত্মোপাসকদের" উপাস্য হইলেন,' অতএব আমাদের সহিত তোমাদের বিরোধের বিষয় নাই।" "এইরূপ আত্মোপাসকদের দ্বেষ অন্য অন্য উপাসকের প্রতি সম্ভবে না, কেন না ইহাঁদের বিশ্বাস এই যে ঐ সকল উপাসকেরা যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাহাতে ব্রহ্মবোধ বিনা উপাসনা হইতে পারে না। অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল যে, দ্বেষ ও বিরোধ যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত দূষণীয় হয় তাহা অন্যের প্রতি আত্মোপাসকের হয় না।" কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের এই প্রাচীন ব্যাখ্যানটি ও মহাত্মা রামমোহন রায়ের অনুষ্ঠান গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা বুঝিতেছি যে তখনকার ব্রাহ্মদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে, যে কোন উপাসক যে কোন বস্তুর উপাসনা করেন তাঁহাতে ব্রহ্মবোধ করিয়াই উপাসনা করিয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মবোধ পূর্ব্বক বা ব্রহ্মের আবির্ভাব স্মরণ পূর্ব্বক যাঁহারা প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের পূজা করেন তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মদিগের দ্বেষ সম্ভবে না। এ সিদ্ধান্ত বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বা মহাত্মা রামমোহন রায় নূতন করেন নাই; কিন্তু তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রানুমোদিত ভারতীয় সনাতন সিদ্ধান্ত। এই সনাতন সিদ্ধান্ত এইক্ষণ-

* রামমোহন রায়ও স্বয়ং স্বীয় অনুষ্ঠান গ্রন্থে ৫০৭ প্রশ্নের উত্তরে ও তাহার প্রমাণ-প্রকরণে ঠিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাঃ মোঃ রা বাঙ্গালা গ্রন্থাবলি। ১৭৯৫ শক। ৪০৮ ও ৪০৯ পৃ।

কার অধিকাংশ ব্রাহ্মদিগের বুদ্ধিতে সংলগ্ন হয় না। সুতরাং দ্বেষ ও বিরোধ-বশতঃ ভারতীয় ধর্ম্মরাজ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। এই বিরোধের প্রতিকারার্থে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক।

নব্যগণ যদি একবার হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উল্লিখিত প্রাচীন মত সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। ফলতঃ চিত্র বিচিত্রিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরবোধ করে এমন লোক ভারতে প্রায় নাই, এবং শাস্ত্রে কোথাও মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বলেন নাই। গীতা স্মৃতিতে আছে "যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যেসক্ত মহৈতুকম্। অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামস মুদাহৃতম্॥" স্থূল শরীরই আত্মা এবং প্রতিমাই ঈশ্বর এরূপ অভিনিবেশ এবং এ প্রকার যুক্তিবিরুদ্ধ ও পরমার্থাবলম্বনশূন্য যে বোধ তাহা অতি তুচ্ছ। তাহা শিষ্টগণ কর্ত্তৃক তামস স্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে। অতএব মূর্ত্তি কখনও ঈশ্বর নহে। কেবল উপাধিমাত্র-মূর্ত্তিকে মূর্খেরা ঈশ্বর বোধ করিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র শ্রদ্ধা বা বোধ আছে তাঁহারা মূর্ত্তির অবলম্বনে ভগবানেরই আবির্ভাব অনুভব করেন। মূর্ত্তিপূজার ভক্তিব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া মানব আপনার অনিত্য দেহ ও অনিত্য সংসার স্মরণপূর্ব্বক ভগবানকে সকাতরে আহ্বান করেন। তাঁহার অনুরাগের সম্মুখে দীননাথের আবির্ভাব হয়। সেই আবির্ভাবই দেবালয়ের জীবন্ত দেবত্ব এবং নিরবয়ব ঈশ্বর। নতুবা মূর্ত্তিই যে স্বয়ং ঈশ্বর এমন অভিপ্রায় নহে। তবে সকল পদার্থেই ঐশী শক্তির আবির্ভাব। ঈশ্বর তৎসর্ব্বত্রেই পূর্ণ। সে ভাবে মূর্ত্তিকে ঈশ্বর জ্ঞান করা স্বতন্ত্র। তাহাতেও ভূতমাত্রোপাধি-ঘটিত মূর্ত্তি তিরস্কৃত হয়। পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্মই গৃহীত হন। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব-বেশিষ্যতে" (ঈশোপনিষদে-শান্তিবচন) 'পূর্ণস্য' কার্য্যাত্মনোব্রাহ্মণঃ 'পূর্ণং' পূর্ণত্বং 'আদায়' গৃহীত্বা আত্মস্বরূপৈ করমত্বমাপাদ্য বিদ্যয়া ভূতমাত্রো-পাধিং তিরস্কৃত্য 'পূর্ণং' 'এব' অনন্তরমবাহ্যং প্রজ্ঞানৈক রস স্বভাবং কেবলং ব্রহ্ম অবাশীষ্যতে।" (শাঙ্কর ভাষ্য)। ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, জ্ঞানযোগে অথবা ভক্তিযোগে জগতের যে কোন বস্তুতে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে সে বস্তুর ব্যবহারিক সত্তার অসদ্ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং

ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ—এই জ্ঞানযোগে ভক্তিপূর্ব্বক যখন প্রতিমাকেও ব্রহ্ম বোধ হয় তখনও আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই গৃহীত হন, ভূতমাত্রোপাধিবিশিষ্ট প্রতিমা মিথ্যা হইয়া যায়। "তে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম" (শারীরিক সূত্র) তাদৃশ ভূত-মাত্রোপাধি হইতে যিনি স্বতন্ত্র ও নির্লিপ্ত তিনি ব্রহ্ম।

ভগবানের স্বীয় বশীভূত মায়া-কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন ঐচ্ছিক রূপকে, আর সৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত মায়ার অঙ্গবিশেষ উপলক্ষিত তাঁহার অন্তর্যামাধিদৈবাদি রূপকে, আদর্শপূর্ব্বক ভারত সমাজে যত দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সে সমুদয়ই পবিত্র। সমুদয়ই ভগবানের অনির্ব্বচনীয় শক্তির, অপার করুণার, বৈরাটিক মহিমার এবং প্রকৃতিগত অধিষ্ঠাতৃত্বের স্মরণ-মাখা। তাদৃশ কোন এক মূর্ত্তি যখন স্থাপিত হয়, তখন তাহার সহিত ভগবানের ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও পবিত্র নাম সংযুক্ত হইয়া সেই মূর্ত্তি, তদুপলক্ষিত পূজা, হোম, বলিদান, চণ্ডিপাঠ, আরতি, দক্ষিণান্ত, ব্রাহ্মণ ও অতিথি অভ্যাগত-ভোজন, দান, ধ্যান যাত্রা,বাদ্যোদ্যম, স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলগান, এবং সমস্ত দেবালয়কে আশ্চর্য্য-রূপে পবিত্র করিয়া তুলে। সেই সেই পবিত্র ঐশ্বরীয় ভাব কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া পাপী তাপী, মুমুক্ষু সকলেই আপন আপন মনের কথা ভগবানকে বলিবার নিমিত্তে শ্রীমন্দিরের দ্বারে গমন করেন; এবং তথায় সেই প্রাণ-সখাকে—সেই স্নেহময়ী জগজ্জননীকে প্রাণ ভরিয়া ডাকেন। হে ভ্রাতঃ! অভিমান ত্যাগ করিয়া বল দেখি, তিনি কি সেবকের ত্রাণ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন না? যদিও ফলদান নিমিত্ত সকাম-উপাসকের নানা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, কিন্তু সরল মনে বল দেখি ব্যাকুলচিত্ত ভক্তগণের আহ্বানে, তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্তে, সেই সমস্ত দেবতাতে ও দেবালয়ে তাঁহার বিশেষাবির্ভাব হয় কি না? ফলে যিনি সর্ব্বত্রে সমান তাঁহার এইরূপ বিশেষ আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব? এরূপ আশঙ্কার সমাধানার্থে গীতা স্মৃতিতে ভগবান কহিয়াছেন, "সমোঽহং সর্ব্ব ভূতেষু নামদ্বেষোঽস্তিন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তিতুমাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহং।" যদিও সমস্ত ভূতে আমি সমান এবং সেজন্য কোন স্থানে আমার বিশেষ আবির্ভাব নাই, আমার প্রিয় ও অপ্রিয়ও নাই, তথাপি আমার ভক্তির এমনি স্বভাব, যে তদ্দ্বারা উপাসক ব্যক্তি, যেমত আমাতে যুক্ত হয়, আমিও

ভক্তদারা তাহার প্রতি সেইরূপ সদয় হই। "মস্তক্তেরেবায়ং মহিমেতি" আমার ভক্তিরই এই মহিমা। ইহা আমার সার্ব্বভৌমিক নিয়ম। ফলে এ নিয়ম কেবল সৃষ্টিস্থিতিসম্বন্ধাধীন, সুতরাং মায়িক। বেদান্ত সূত্রে ভগবান ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন "মায়িকত্বাতু নবৈষম্যাৎ"। লোকে কোন স্থানে অর্থাৎ দেবালয়াদিতে যে ঈশ্বরের বিশেষ অধিষ্ঠান দর্শন করে সে কেবল মায়িক, নতুবা ভগবান কোথাও অল্প-অধিষ্ঠিত, কোথাও অধিক-অধিষ্ঠিত নহেন। তবে ঐ ভক্তির নিয়ম এমনি আশ্চর্য্য যে, যেমন দৃষ্টি-ব্যভিচার বশতঃ রজ্জুকে সর্প ভাবিয়া এক জনের আতঙ্ক হয়, আবার কণ্ঠমালা ভাবিয়া অন্যের আনন্দ হয়, সেইরূপ ভক্তির আশ্চর্য্য নিয়মানুসারে ভগবদ্-ভক্তজন, স্বীয় উপাসনা-মণ্ডপে, দেবালয়ে, গঙ্গাস্নানে, সূর্য্যচন্দ্রে ভগবানের বিশেষ আবির্ভাব দেখেন। যদিও এ প্রকার দর্শন আংশিক এবং কর্তৃতন্ত্র (Subjective) কিন্তু তাহা পরিপূর্ণ ও বস্তুতন্ত্র (Objective) ভগবদ্দর্শনের ন্যায় ফলদান করে। কেন না ভগবানকে স্বরূপতঃ কে জানিতে পারে? ভক্তির গুণে তাঁহার যে আবির্ভাব দৃষ্ট, যে আদেশ শ্রুত ও হৃদয়ঙ্গমিত হয়, তাহাই তাঁহার দর্শন, তাহাই তাঁহার আদেশ। তিনি সর্ব্বত্রে সমানরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও সাধক কেবল মায়াজন্য তাঁহাকে উপাধিবিশেষে দর্শন ও অবস্থাবিশেষে তাঁহার আদেশ শ্রবণ করেন। এরূপ মায়িক, আংশিক বা কর্তৃতন্ত্র দর্শনে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বের হানি হয় না, এবং তাদৃশ দর্শন পূর্ণব্রহ্মতেই সমন্বিত। স্থূল কথা এই যে, ভগবান সাধককে দর্শন ও আদেশ দিবার নিমিত্ত সর্ব্বঘটেই বর্ত্তমান। কিন্তু সাধক, সৃষ্টিঘটিত উপাধির ও ভক্তির তারতম্য বশতঃ কেবল বিশেষ বিশেষ স্থলে ও অবস্থায় তাঁহার দর্শন লাভ ও ভগবানের আবির্ভাব সন্নিধান লাভ করায় সাধক সম্বন্ধে ভগবানের আবির্ভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তেরা অবিচলিতচিত্তে বলিয়া থাকেন যে, দেবদেবীর পূজায় অথবা দেবালয়ে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব হয় এবং ভক্তের হৃদয়ে তিনি কথা কহেন। যদি ভাবুক হও, তবে হে পাঠক! তুমিও ঐ কথা স্বীকার না করিয়া পারিবে না। মনে কর, তুমি এই পরম গুহ্য ভাবটি বুঝিতে পারিলে; বুঝিয়া কি মূঢ়ের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিবে? ভগবানকে ঐ দেবমন্দিরে ও ভক্তিব্যাপারে কি

তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিবে না? সেই যোগীজন-দুর্লভ ভগবদাবির্ভাব লাভ ও স্মরণ করিয়া "পৌত্তলিক-অপবাদের" ভয়ে কি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? একবার ধীরভাবে বুঝিয়া দেখ। যে পরম দেবতার উপাসনায় উদ্দেশে প্রতিমার স্থাপন, সর্ব্বপ্রকার দেবার্চ্চনার মধ্যে' তাঁহাকেই দর্শন করা সার কর্ম্ম। তাদৃশ দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিমা হেয় হইয়া ব্রহ্মই প্রকাশিত হয়েন, ঠিক সেইরূপ যেমন বৃক্ষশাখার অবলম্বনে চন্দ্রদর্শনের কালে বৃক্ষশাখা হেয় হইয়া থাকে। ইহাই প্রতিমা পূজার মুখ্য উদ্দেশ্য। নচেৎ ইহা উদ্দেশ্য নহে যে কেবল "মূর্ত্তিটি" মোক্ষ দান করিবে।

ব্রহ্মজ্ঞানীর সকাশে যদি কোন দেবদেবীর উপাসক, পরমার্থের জিজ্ঞাসু হন, তবে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ত্তব্য যে, প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রতিমাপূজার যথার্থ প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এবং তাঁহার স্বীয় অজ্ঞাত অথচ তাঁহার অন্তরের গভীরতম যে লক্ষ্য তাহা বুঝাইয়া প্রতিমার অতীত, অতীন্দ্রিয়, "অবাঙ্‌মনসগোচরং," "একাত্মপ্রত্যয়সারং," পরব্রহ্মের জ্ঞানোপদেশ করিবেন। "অন্বয়" * দ্বারা ঈশ্বরাবির্ভাব-যুক্ত প্রতিমা পূজা ও দেবালয়ের পবিত্রতা বিজ্ঞাপন করিবেন এবং "ব্যতিরেক" * দ্বারা প্রতিমারূপ-উপাধির প্রতিষেধ করিবেন। তাঁহাকে বেশ করিয়া ভাঙ্গিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে, শাস্ত্রে যত স্থানে প্রতিমা পূজার বিধিও প্রশংসা আছে সে সমস্তই "অন্বয়" ন্যায়ানুগত। আর যত নিষেধ ও নিন্দা আছে সে সমস্তই "ব্যতিরেক" ন্যায়ানুযায়ী। এই "অন্বয়," "ব্যতিরেক," প্রভৃতি পরিভাষার জ্ঞান সমস্ত তাঁহাকে "ভক্তি" ও "দর্শন" উভয়ের সাহায্যে প্রদান করিবেন। কিন্তু যাহাতে প্রতিমা-উপলক্ষিত ঈশ্বর-পূজার প্রতি দ্বেষ হয়, এমন উপদেশ দিতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিবেন। কেন না, যাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভে যোগীগণ অক্ষম হন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে কিরূপে স্বরূপতঃ বুঝিবে? এই জন্য পরম যোগীরা যাঁহাকে হৃদয়ধামে স্বরূপতঃ সাক্ষাৎকার করেন, সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের লোকেরা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানাভাবে, মায়ার সহকারিতায়,

* এক পদার্থে অন্য পদার্থের যোগকে "অন্বয়" কহে। এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরকে বিয়োগ করাকে ব্যতিরেক কহে। ঈশ্বরাবির্ভাব, প্রতিমা বা কোন সগুণ পদার্থের সহ যুক্ত হইলে প্রতিমা বা তাদৃশ সগুণ পদার্থের পবিত্রতা জন্মে। বিযুক্ত হইলে একমাত্র বিগুণ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন।

গুণোপসংহারপূর্ব্বক নানা আকার প্রকারে তাঁহাকে আত্মবৎ সেবা করিয়া থাকেন। সাধকদিগের হৃদয়ে তাদৃশ পূজা দ্বারা যে ফল সঞ্চিত হয় ব্রহ্মই সে ফলের বিধাতা। নতুবা প্রতিমূর্ত্তি কখন মোক্ষ বা অন্য ফলদাতা নহে। গীতাতে কহিয়াছেন "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং।" যে যে ভক্ত আমার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করে আমি অন্তর্যামীরূপে সেই সেই শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া দেই। 'সতয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতেচ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥" সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাদৃশ দেবারাধনাদ্বারা যে ফলপ্রাপ্ত হয় তাহা আমাকর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়া থাকে। কেননা সে দেবতারা আমারই স্বরূপ এবং আমাতেই সমন্বিত।

অধিকন্তু ভগবানের পূজার নিমিত্তে যত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সে সমস্তই তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও পবিত্র বিভূতি-জ্ঞাপক। ঐ সমস্ত মূর্ত্তি, গ্রন্থ-লিখিত উপদেশের ন্যায় নানাপ্রকার পারমার্থিক অর্থে সমন্বিত। সাধকেরা প্রতিমা-উপলক্ষিত ভগবদুপাসনা দ্বারা এক দিকে যেমন স্বীয় স্বীয় ভক্তি ও প্রীতি বৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করিবেন, অন্যদিকে ঐ প্রকার পারমার্থিক অর্থরূপ ফললাভও করিবেন ইহাই অভিপ্রায়। ফলতঃ কেবল মায়া জন্যই ভগবানের এই সমস্ত রূপগ্রহণ। মায়াই প্রকৃতি। সেই অনির্ব্বচনীয় মায়া-স্বরূপিনী প্রকৃতিরূপ মহাপটে যেমন মহত্তত্ত্ব অবধি বালুকাগুলি পর্য্যন্ত চিত্রিত রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ মায়াকেই আশ্রয় করিয়া ভগবান সামান্যতঃ মহত্তত্ত্ব অবধি সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আব্রহ্মস্তম্ব পরিমিত সমুদয় দৈবী-শক্তি সম্পন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কিন্তু যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় তখন জন সমাজে তাঁহার বিশেষ আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। তখন যদিও তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণার্থে, দুষ্কর্ম্মীদিগের বিনাশার্থে এবং ক্ষয়প্রাপ্তধর্ম্মের পুনঃ সংস্করণার্থে মায়া-নির্ম্মিত রূপ পরিগ্রহ করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভক্তদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-স্থিতিভঙ্গরূপ তত্ত্ব সকল উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার উপযোগী তাবৎ শক্তিকে স্বীয় রূপের দ্বারা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। তাঁহার যতপ্রকার মায়িকরূপ লোকেতে প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত হইতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের গুণ ও শক্তির উপদেশ পাওয়া যায়। মহা মহা

ভক্তেরা এইরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে ভগবানের স্বরূপ জ্ঞানে আরোহণ করেন। ভগবানের শক্তিরূপিণী মহামায়া এই প্রকারে ভাগ্যবান পুরুষকে উপকৃত করিয়া তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বিগত হন। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত প্রাকৃতিক চিত্রপট এবং ভগবানের সমস্ত রূপ অন্তর্দ্ধান করে। ভগবানের রূপ সমস্তই মায়া-নির্ম্মিত এবং সৃষ্টিতত্ত্বে সমন্বিত। সাধক, বিষ্ণুর প্রতিমূর্ত্তি দর্শনমাত্রে একদিকে যেমন ভক্তি ও প্রেমে প্লুত হইবেন, অন্যদিকে সেইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্বের জ্ঞানে দীক্ষিত হইবেন। সমস্ত দেবারাধনার ইহাই উদ্দেশ্য। সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্বের জ্ঞান দানে উক্তরূপ মূর্ত্তি সকল, গ্রন্থের ন্যায় এবং অধিকারী বিশেষে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের ন্যায় কার্য্য করে। ভগবানের এই সকল শক্তি, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও কীর্ত্তিকে ভক্তির যোগে হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেয় বলিয়া তাঁহার প্রতিমা ও দেবালয় সমূহ দেবত্ব ও পবিত্রতা লাভ করে। যাহা কিছু তাঁহার স্মরণরূপ চন্দন মাখা তাহাই পবিত্র। তাঁহার অধিষ্ঠান সহকারে তাহাই দেবতা নামে অভিহিত হয়। তন্মধ্যে তাঁহার বৈরাটিক অলঙ্কার সমূহ এবং তৎ-সমন্বিত তাঁহার মায়াকল্পিত মূর্ত্তি সকল জন সাধারণের দৃষ্টিতে যত পবিত্ররূপে গণ্য হয়, এমত অন্য কিছু নহে। অগ্নি প্রবেশে যেমন কাষ্ঠ তৃণাদি অগ্নি হইয়া যায়; ভগবানের স্মরণ স্পর্শে—তাঁহার সৃষ্টি ও কীর্ত্তি-ঘটিত বৃত্তান্ত সংযোগে—স্থান, পদার্থ ও মূর্ত্তিবিশেষ দেবত্ব লাভ করে। তাদৃশ দেবত্ব ও পবিত্রতা অন্বয় ব্যতিরেকে ভগবানেরই জ্ঞাপক হয়। নতুবা সে পদার্থ প্রতিমা বা স্থান স্বতন্ত্র দেবত্ব-জ্ঞাপক নহে। এই কারণে দেখিতে পাই যে, পরমহংস, সন্ন্যাসী ও যোগীগণ অনেকেই বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র সমূহ আশ্রয় করিয়া আছেন। কেন না সেই সকল পীঠের এমনি মাহাত্ম্য যে, তথায় সর্ব্বক্ষণই ভগবান স্মৃতিপথারূঢ় হয়েন। সেরূপ ভগবৎ-স্মরণে তাঁহা-দের তাবৎ মায়া ধ্বংস হইয়া যায়। সেই সমস্ত জ্ঞানীরা তথায় সেই অরূপী নারায়ণের সন্তাপহর শীতলস্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকেন। এই ধারা অনুসারে এই ভারতবর্ষে সনাতন হইতে সবল ও দুর্ব্বলাধিকারীদিগের ব্যবহার চলিতেছে। এখন—এই বর্ত্তমান কালে যাঁহারা আপনাদিগের একেশ্বরের উপাসক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কোন্ সাহসে তদ্বিপরীতা-

চরণ করেন বলিতে পারি না। আমাদের বুদ্ধি এই যে, যদি ভগবানকে মানিতে হয় তবে তাঁহার উদ্দেশে যে স্থান বা যে কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে সমস্তকেই আদর পূর্ব্বক তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতে হইবেক। যখন যথার্থ দৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে যে এক ব্যক্তি ব্যাকুলিত চিত্তে সেই পরম তত্ত্বকেই উদ্দেশ করিয়া শিবদুর্গার পূজা করিতেছে, তখন তুমি যদি এমন মনে কর যে সে ব্যক্তি ঈশ্বরের পূজার পরিবর্ত্তে "সয়তান" অথবা 'শূন্যের" পূজা করিতেছে, তবে তুমি নিশ্চয়ই মানব-প্রকৃতি-গত উপাসনাবৃত্তির স্বরূপ পরিচয় পাও নাই, সুতরাং সেই সর্ব্বসন্তাপহর ভগবানের সহিত বিশ্বজনীন সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বুঝিতে পার নাই। যদি তাহা না পারিয়া থাক তবে কেন অর্থ না বুঝিয়া "সহজজ্ঞান" ও "আত্ম প্রত্যয়" প্রভৃতি শব্দ সমূহের অপব্যবহার করিতেছ? কেনই বা নববিধ সমাজ-কল্পনা ও হেতুবাদ-মোহিতা বুদ্ধি-ক্রীড়া দ্বারা সহস্র সহস্র লোকের বুদ্ধিভেদ করিতেছ? মহাত্মা রামমোহন রায় এ প্রকার কোন স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ-সংস্কার দ্বারা ভারতবাসীদিগের বুদ্ধি ভেদ করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল শাস্ত্র সকল মুদ্রাঙ্কিত করিয়া চারিদিকে প্রচার করিয়া-ছিলেন এবং যাহাতে ভারতবাসীরা মৃত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠ তৃণাদি-নির্ম্মিত বা মনঃকল্পিত মূর্ত্তি মাত্রকে ঈশ্বর অথবা দেবতা জ্ঞান না করে, যাহাতে দেহ ও মূর্ত্তির অতীত একমাত্র আত্মার উপাসনায় লোকের নিষ্ঠা হয়, যাহাতে দেবগণকে স্বতন্ত্র জ্ঞান না করে, যাহাতে একমাত্র আত্মাকেই সর্ব্ব দেবতা-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, যাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি সমস্ত আকার এবং স্থাবর জঙ্গমাদি নাম রূপাত্মক সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়া-কল্পনা বলিয়া বোধ জন্মে, যাহাতে ফলকামনা ও তদ্বিশিষ্ট বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্ম হইতে লোক সকল উদ্ধার পাইয়া নিষ্কাম বৈদিক কর্ম্মে ব্রতী হয়, অথবা তাদৃশ সর্ব্ব কর্ম্ম ব্রহ্মেতে অর্পণ করে এমত সকল মুক্তিপ্রদ উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার এ নব্য ব্রাহ্মধর্ম্মে সে ভাব সে শাস্ত্রজ্ঞান সে হিতাহিত বোধও কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ইংরাজি সমুদয় ব্যাপারই দ্রুত-গতি-শীল, সেইরূপ ইংরাজি ধাতুতে বিরচিত বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মও দ্রুতগামী। যেমন

ইংরাজদিগের রেল-শকট দ্রুতগামী, তাড়িত-বার্ত্তা-বহ দ্রুত-শক্তি-বিশিষ্ট, কাজ কর্ম্ম অসম্ভব দ্রুত, চাল্ চলনও অত্যন্ত দ্রুত, সেইরূপ এই ইংরাজি ব্রাহ্মধর্ম্মও ভয়ানক বেগবান। কেন না আজ্ তাহা কলিকাতায় প্রচার হইতেছে, কাল মাদরাজ ও বম্বাই নগরে প্রচার হইয়া গেল, পরদিন ইংলণ্ডে যেমন বক্তৃতা হইল অমনি শত শত লোক উক্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বক্তৃতা সকল ছাপা হইয়া দেশ বিদেশে চলিয়া গেল, এবং তাহার দ্বারায় এক একটা গ্রন্থালয় ভারাক্রান্ত হইল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া দুঃখ হয়। কেননা যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত হয় না, আর যে চিত্তশুদ্ধি সম দম বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্পদে প্রতিষ্ঠিত, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এত সুলভ!!! কিন্তু মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব উহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দান জন্য অধিকাংশতঃ কেবল শাস্ত্রই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বহুশাস্ত্র মুদ্রাঙ্কন করিয়া এবং শাস্ত্রীয় বহু বিবরণ লিখিয়া জন সমাজে প্রচার করাতে কবিতাকার নামক একজন প্রতিবাদী তাঁহাকে দোষ দেন। তাঁহার উত্তরে রামমোহন রায় কহিয়াছেন—"এরূপ পুস্তক বিতরণ আমরা শাস্ত্রানুসারে করি, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ামক শাস্ত্র হইয়াছেন। আহ্নিকতত্ত্বে স্মার্ত্তের ধৃত গরুড় পুরাণের বচন—বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রানি ধর্ম্মশাস্ত্রানি চৈব হি। মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দদ্যাদেতি সবৈদিবং। যে ব্যক্তি বেদার্থ ও যজ্ঞশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইহাকে মূল্য দ্বারা লেখাইয়া দান করে সে স্বর্গে যায়। এবং বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে লিখেন—সযোঽন্যা মাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্যোৎস্যসীতি। যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্যকে অর্থাৎ দেহ ও মূর্ত্তি প্রভৃতি উপাধিকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কহিবেন যে তুমি ঐ সকল অনিত্য উপাসনা দ্বারা বিনাশকে পাইবা। এইরূপ শত শত প্রমাণানুসারে আমরা আত্মা হইতে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিদিগে আত্মনিষ্ঠ হইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা কহিয়া থাকি। এবং নবুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং। অর্থাৎ অজ্ঞান কর্ম্মি-ব্যক্তির বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেক না। এই বচনানুসারে যাহাকে দেখিবে যে এক ব্যক্তি কেবল কর্ম্মি বটে এমত নহে বরঞ্চ অজ্ঞান কর্ম্মি, তখন তাহাকে উপদেশ করিতে ক্ষান্ত হই। অতএব কবিতাকার যেন আর উদ্বেগ না

করেন।" মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ বিচারের মর্ম্ম কি এখনকার দ্রুতগমনশীল নব্য ব্রাহ্মেরা ধারণ করিয়া চলিতে পারেন? তদনুযায়ী জ্ঞানধর্ম্ম প্রচার তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ দ্রুতবেগে তো হইবে না, তাহা ভারতের সনাতন ধাতুর অনুযায়ী, অধিকারানুসারে, ধীরে ধীরে হইবেক। শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা ত্বরিততার কর্ম্ম নহে। কিন্তু পদে পদে জ্ঞান, ভক্তি, অধিকার প্রভৃতি অধ্যাত্ম-ধর্ম্মের যোগে অতি সঙ্গোপনে তাহা একাত্মা হইতে অন্য আত্মায় এবং শাস্ত্রও গুরু হইতে শিষ্যে, প্রচারিত হইয়া থাকে। ভগবান করুন, ক্রমে শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার হইয়া তদালোকে আমাদের অস্থির প্রকৃতিবর্গের চঞ্চলা বুদ্ধি অভিভূতা হউক এবং সমগ্র ভারতবর্ষ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা কর্ত্তৃক উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

অতীতের কথা।

আমি অতীত। সাগর যেমন একটি দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া থাকে, আমিও তেমনি সেই চির-জ্যোতির্ম্ময়ী চিন্ময়ী আধ্যাত্মিক আদ্যাশক্তির কি-এক অনির্ব্বচনীয় অদৃশ্য কারণ-আজ্ঞায়, নদ নদী পর্ব্বত, সাগর উপ-সাগর, নগর উপনগর, দেশ মহাদেশ, দেবতা মানব, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ কোটি কোটি প্রাণী-পরিবেষ্টিত এই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনকে হৃদয়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে অসীম ধৈর্য্যের সহিত চির দিন একইভাবে অনন্ত শয়নে শয়ান রহিয়াছি। কে আছে, এস আমার এই অননুকরণীয় অকারণ অদৃশ্য অনন্তমূর্ত্তি ধারণ করিবে। আমার সৃষ্টি

---

* অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ। তাৎপর্য্য এই যে অনধিকারীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেই না।

নাই, বিকার নাই, মালিন্য নাই। আমি অব্যক্ত, অবিকৃত, নির্গুণ, সর্ব্ব-দেশব্যাপী, অখণ্ড এবং চিন্ময়।

আমার কথা তোমাদের ভাল লাগিবে কি-না জানি না। আমি জানি, আমার কথার গৃহগুলি শ্মশানভূমির উপর রচিত বলিয়া তোমরা তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নারাজ। কিন্তু তাহা হইলে যে, আমার কথা বাকি থাকিয়া যায়। আমার যে না-বলিলেই নয়। আমার কথা আমি না-বলিলে আর কে বলিবে! আজ—কি-জানি-কেন—কি অদৃশ্য শক্তি-বলে আমার প্রাণের পাষাণ দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রাণের অবরুদ্ধ ঢেউ উথলিয়া জগতে আসিয়া পড়িয়াছে। তোমরা কেউ আর তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইও না। আমার হৃদয়ের মধ্যে কত কথা—কত বাল্যকালের সুখস্মৃতির কথা—কত অশরীরী আশার অতুল রূপের প্রতিধ্বনিময় সুখ-দুঃখের কথা—কত জীবনের না-বলা কথা—কত অশ্রু-পূর্ণ চির মুকুল-মূর্ত্তি—কত ভাঙ্গা ঘরের জ্যোৎস্না—কত বিদায়ের বিবিধ-কবিতা সৃজনকারী নিশ্বাস—কত দুদণ্ডের গান—কত অসম্পূর্ণ প্রেমের চির যন্ত্রণা—কত প্রেমিক প্রেমিকের দুদণ্ডের দেখাশুনা—নিভৃতনিকুঞ্জে সন্ধ্যা-সমীরণের কাহাকে খুঁজিবার জন্য তাহার প্রতিদিনের সুখ-বিকম্পিত লুকাচুরী খেলার ছবি—কত চিরবিস্মৃত মৃত প্রণয়ের সুখস্বপ্ন—কত সোণার দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি—কত সায়াহ্ন-গগনের সেই পলকে-নূতন লাবণ্য-মূর্ত্তি—কত অপরিস্ফুট কৌমুদী—কত নাক্ষত্রিক জগতের নৃত্য—কত রমণী-চক্ষের প্রতারণা-গর্ভ সৌন্দর্য্য—কত নৈশ সমীরণের বিরহ-জাগান গান—কত সেই জ্যোৎস্না, গান, প্রাণ ও বসন্তের বাতাসের একীকরণ মূর্ত্তি—জড় জগতের কত ভীতিময়ী সংহার মূর্ত্তি—আবার তাহার শান্তিপ্রদায়িনী চিন্ময়ী মূর্ত্তি—কত জীবন-কাব্যের শেষ অধ্যায়—কত মরণের যমযাতনা—অসীম নীরবতার মধ্যে একাকী বসিয়া কত বিরহীর নির্ম্মল প্রাণের গভীর রহস্যময় মধুমাখা গানের মোহিনী কান্না—এইরূপ আরও কত শত কি-যে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়ায় তাহা বলিতে পারি না। জগতের সকল জিনিসই চঞ্চল। সকল জিনিসই পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আমার গর্ভে যাহা একবার আসিয়া পড়ে তাহার আর কখন গতি থাকে না। তখন তাহা একবারে অচল। আমি

যে পাষাণ। আমার হৃদয়ের প্রস্তরে একবার যাহার ছাব পড়ে, কালের সাধ্য কি যে তাহা মুছিয়া ফেলে!

সেই জন্য আমার প্রাণের কথা তোমরা কেহ বুঝিবে না। আমার সব কথা বাসি। তোমাদের ভাষার অনুর্ব্বরা উদ্যানের মধ্যে কি আমার এই বাসি-কথা-গাছে ফুল ফোটে? তোমাদের ভাষা কেন, আমি জগতের কোন ভাষার ক্ষুদ্র সসীম গৃহের মধ্যে থাকিতে পারি না। আমি অসীম-অনন্ত। জগৎ অপূর্ণ, আমি পূর্ণ। জগতের কোন-কিছুর মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু আমার কোলে জগৎকে দেখিতে পাইবে। আমি অতীত, জগৎ বর্ত্তমান। আমি না থাকিলে জগৎ বাঁচিতে পারে না। জগতের আমি বন্ধন।

প্রকৃতিশক্তি কর্ম্মাত্মিকা। এখানে কাহারও অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। প্রকৃতি তোমার দ্বারা তাহার কাজ করিয়া লইবেই। সেই জন্য আমি তোমাদের বলি যে, তোমরাও সর্ব্বদা সতর্ক থাক। প্রকৃতির কাজের সঙ্গে তোমাদেরও কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা কর। তাহা না করিলে, তোমার কাজের সময় জীবনের মধ্যে আর পাইবে না। প্রকৃতিশূন্য সময় কোথায়? আমারও কাজ আছে। আমার কাজ অতি সামান্য। আমার কাজ বর্ত্তমানের চঞ্চল প্রাণের মধ্যে কোন-কিছুর ছিদ্র না-রাখা। আমার কাজ আত্মবিসর্জ্জন। আমার কাজ তোমার বর্ত্তমানের প্রতিষ্ঠা। মৃত আমি, প্রস্ফুটিত-জীবন বর্ত্তমান হওয়াই ত আমার কাজ। আমি যত মরিব, অর্থাৎ আমার বয়স যত বাড়িবে, তত বর্ত্তমানের সুখ-গান-সীমা অসীমায় পরিণত হইবে। বর্ত্তমান বড় চঞ্চল। বর্ত্তমান আদ্যাশক্তির চাঞ্চল্য-মূর্ত্তি। চঞ্চল বলিয়া তাহার কার্য্য পূর্ণতা পায় না। সেই জন্য আমি তাহার কার্য্যের উপর বিশ্বাস করিতে পারি না। বর্ত্তমানের অনুদার সঙ্কীর্ণ মন্দির আমি ভাল বাসি না। কিন্তু আবার আমি তাহাকে যত ভালবাসি, এত ভাল আর কে বাসে? বর্ত্তমানকে আমি শরীর দিয়া তাহার পিছনে ছায়া হইয়া আছি। বর্ত্তমানের গৃহ-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিবে যে তাহার চারিদিকে অতীতের মূর্ত্তি বিরাজিত। আমিই ত বর্ত্তমান-বাঁশীর একমাত্র গান।

বর্ত্তমানকে কি মজাইয়াই রাখিয়াছি! বর্ত্তমান আমার জন্য উন্মত্ত! আমাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার জীবন এক-মুহূর্ত্তও নয়। সে অবিরত আমাতে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই ত আজ এই বর্ত্তমান লেখক বাসনার বিচিত্র গৃহে বসিয়া আমার কথা শুনিতে আসিয়াছে। আমাকে না-পাইয়াই ত সে দিন সেই প্রতিভাশালী কবি জগতের চোকের উপর "প্রকৃতির প্রতিশোধ" দিলেন। আমার জন্য সদাসর্ব্বদাই এইরূপ কত-কি ঘটে। তাহা বলিয়া আমি করিব কি আর বল! আমার কর্ত্তব্য আমি করি? আমি বুঝিতে পারি যে, তোমরা মিথ্যার পরদা দিয়া আমার চক্ষু ঢাকিবার চেষ্টা কর। কিন্তু আমার চক্ষু ঢাকিবার তোমাদের সাধ্য কি। আমি সর্ব্বজ্ঞ, ইহা মনে থাকে যেন।

আমি জগতের মালি। অনন্তকাল ধরিয়া বসিয়া বসিয়া মালা গাছি গাঁথিতেছি। হায়! একটি ফুল তুলিতে গিয়া কত ফুলই নষ্ট করি! হায়! একবার দেখি না যে, ফুল কোথাকার—কার। আমি,—অতীত; আমার তাহা জানিবার আবশ্যক কি? যতদিন না মালা শেষ হয় ততদিন ফুল তুলিয়া গাঁথিব। এ মালা যে কবে শেষ হবে তাহা কে বলিতে পারে?

আমি বড় নিষ্ঠুর। কারণ আমি কাহারও মন রাখিতে পারি না। আমার এই চিরপ্রবহমান হৃদয়-গর্ভে সকল জিনিসের সমাধি হয়। সৎ, অসৎ, ভাল, মন্দ সব আমি কোল পাতিয়া লই। আমি ত তোমাদের সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূর করিবার স্থান। তবু তোমরা আমাকে নিষ্ঠুর বল! বুঝিয়াছি। তোমাদের স্বভাব একজনকে কাঁদান এবং আর একজনকে হাসান। দুই জনকে হাসাইবার ক্ষমতা তোমাদের বড় দেখি না। এই জন্য জগতের মহৎ ব্যক্তির মধ্যেও তোমরা নিষ্ঠুরতার বীজ দেখ। যাহা হউক, ইহাতে আমার কোন ক্ষতি দেখি না। আমার মত এত মহৎ কাজ আর কার আছে? চতুর বর্ত্তমান আমার অদৃশ্যগৃহের অবারিত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া কত শত বিবিধ রত্ন, কত শত সৌন্দর্য্য চুরি করিয়া আপনার বলিয়া যে, গৌরব-গিরির সর্ব্ব-উচ্চ চূড়ায় বসিয়া জগতের কিছুই দৃক্‌পাত করে না, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? হায়! আমি সব বুঝি। বুঝি বলিয়াই ত চুপ করিয়া থাকি। জানি ক্ষুদ্রের কাজই এইরূপ। কি

আশ্চর্য্য! এই ক্ষুদ্র পিপীলিকারাই জগতের চক্ষে ধুলা দিয়া বেড়ায়! তাহারা জানে না যে, সে ধুলার জীবন দুদিন! জগতের চক্ষে কি কখন মিথ্যা টিকিতে পারে? জগতই যে, একটি জীবন্ত মহান্ সত্তা। সত্য কখন মরে না। সত্যই জীবন। এ জীবন্ত সত্য-জগতে মিথ্যার স্থান নাই। সত্যের পরীক্ষা সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যুর কাছে হয়। সে পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, তাহাকে এই আমার হৃদয়-মন্দিরে স্থান দি। আমি যদি না থাকিতাম, তাহা হইলে যে, কত সত্য, কত প্রতিভা, কত গুণ কালের অনন্ত সাগরে লয় পাইত, তাহা আর আমি বলিতে পারি না। আমি না থাকিলে গুণ-গান কে করিবে? তাই বলি, আমার মত মহৎ কাজ আর কারও নাই।

এ জগতের আমি ইতিহাস। আমার এই যুগ-যুগ-ব্যাপী জীবনের প্রতি পত্রে জগতের সব কথাই'ত লেখা। আমার গৃহে বসিলে জগতের ইতিহাসের মানচিত্র দেখিতে পাইবে। জগতের গলায় আমি ইতিহাস-মালা। এ মালা শুকায় না। সেই জন্য জগতের এত শোভা—এত আদর। জগতে অতীত না থাকিলে, এ মহান্ধকার জগৎ-অরণ্যে কেহ প্রবেশ করিত না।

আমি অতীত। মনুষ্যে যে কথা বলে না, সেই কথা আমি বলি। যখন জগতের পর-পারে, জগতের কোন-কিছু আসে, তখন তাহাতে আমি হাত দি। অর্থাৎ জগতের কাজ ফুরাইলে আমার কাজের আরম্ভ। আমি নিদ্রিত কথার ভাষা।—অনন্ত কাল-সাগরের সোপান।

আমি—অতীত পুরুষ—অসীমের গৃহ ত্যাগ করিয়া তোমাদের অন্ধকার অন্তঃপুরে মাঝে মাঝে প্রবেশ করি। জগতের ভুল শুধরাইয়া অনন্তের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য আমি আসি। তোমরা আমাকে দেখিতে পাও না। আমি তোমাদের সব দেখিতে পাই—বুঝিতে পারি। আমি সত্য-দৃষ্টি। আমার উপর সমুদয় জগৎসংসার চলিতেছে। আমি জগতের নয়নের নয়ন—জ্যোতির জ্যোতি—সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য। আমাকে তোমরা কখন ভুলিও না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

রমণীমূর্ত্তি।

পাই যদি কভু গঠিতে রমণী
প্রাণ ভরে গঠি তায়।
ছাঁকিয়া নবনী চাঁদের আচলে
গঠি সুকোমল কায়!
নিবিড় মেঘের লুকান আঁধার
বাছিয়া বাছিয়া ধরি,
সে তনুর পিঠে চরণ চুম্বিয়া
চিকুর-প্রপাত করি।
ছায়ার বিকাশ গোছা গোছা তুলি
এলায়ে এলায়ে তায়,
রচিয়া কুন্তল ঘুরায়ে উড়ায়ে
রাখি ললাটের গায়।
নীরব নিশীথে পশি সিন্ধুতলে
আধ-শশী তুলে আনি,
সে কুন্তল কোলে ঢালি ধীরে ধীরে
গঠি সে ললাট খানি।
খুলি দলগুলি ঘুমান পদ্মের
ঘুম তার করি খালি,
তুলিয়া স্বপন সে ললাট গায়
ঢল ঢল করি ঢালি।
শিরীষ-কেশরে রচিয়া তুলিকা
লয়ে মখমল ফাঁকি,
সে ললাট তলে ধীরে ধীরে ধীরে
সেই দুটি ভুরু আঁকি।

সে ভুরুর কোলে অকূল করিয়া
খুলে দেই দুটি আঁখি
অবশ-পলক, যেন ভেসে যায়
আকাশের শেষে পাখি।
সে উদাস চ'খে উঠিবে উথলি
চাহনি আপনা-হারা,
যথা গঙ্গাপুরে প্রপাতের শিরে
ভাসে গোদাবরীধারা।
আনন্দের ঝারা সে চাহনি হ'তে
উথলিবে অবিরল,
পুরুষ পাষাণ পড়ি তার তলে
গলিয়া হইবে জল।
গোলাপের আভা অরুণ কিরণে
করি তিল অন্তরল,
ফুট ফুট ক'রে অফুট রাখিয়া
গঠি দুটি গণ্ডতল।
পূর্ণিমা নিশীথে নিরঞ্জন হ'তে
ছানিয়া মল্লিকা রাশি,
ওষ্ঠাধরে তার দিই মাখাইয়া
ফুটায়ে মোহিনী হাসি।
প্রথম প্রভাতে ঘুমমাখা চ'খে
ধবলার রেখা দেখে
যেই আলু থালু সুখের উচ্ছ্বাস
উঠেছিল এই বুকে,
সে সুখ তুলিয়া ঢালি সে অধরে
মিশায়ে সে হাসি তায়,
মূর্চ্ছিত করিয়া কল্পনা আমার
রেখে দিই তার গায়।

দূর বংশীরবে নিদ্রিত নিশায়
শুনি যে স্বপ্নের গান,
ধরিয়া তাহায় রচি মৃদু ভাষ
করি সে অধরে দান।
কবিহৃদি খুলে নেশা আনি তুলে
মুছি মলা পিপাসার;
সন্তানের ক্ষুধা মাখায়ে তাহায়
রচি সে উরস তার।
নব বসন্তের রুচি লজ্জাবতী
খুলিলে হৃদয় খানি,
তুলিয়া সরম অঙ্গে অঙ্গে ঢালি
ঢাকি সেই মূর্ত্তি খানি।
দেখিলে সে নারী ছুঁইলে সে নাই
ছুঁইলে পড়িবে ঢলে।
নয়ন ছাপিয়া বদন প্লাবিয়া
বুকে সে যাইবে গলে।

ঈশান।

আত্মমর্য্যাদা।

অনেকে আমাদের অধঃপতনের অনেক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন অনৈক্যতা অবনতির কারণ, কাহারও মতে জাতিভেদ অবনতির কারণ, কাহারও মতে গৃহবিচ্ছেদে বলবীর্য্যহানিই ইহাঁর মূল কারণ। এইরূপে নানা লোকে নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক মূল কারণ হইতে যে অন্যান্য কারণ উৎপন্ন হইয়াছে, এক প্রবল স্রোতঃস্বতী হইতে যে শত শত শাখা বহির্গত হইয়া নানাদিকে প্রবাহিত

হইয়াছে, ইহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। আজ কাল প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার কথা লেখায়, বক্তৃতায়, কথোপকথনে, শয়নে, স্বপনে শুনিতে পাওয়া যায়; চারিদিকে হিন্দু ধর্ম্মের হিন্দু সাহিত্যের, হিন্দু রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হইতেছে। কিন্তু এ সব গর্ব্ব কেবল মুখের। আমরা পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব মহত্ত্ব হারাইয়াছি বলিয়াই সে সকলের বিশেষ অভাব বশতঃই আমাদের এত আস্ফালন, এত গর্ব্ব। কেন আমরা এত গুণ হারাইলাম? কিসে আমাদের অতুল গৌরব ধ্বংস হইল? আমাদের এ অসার, নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম ঘোর অলসভাব কোথা হইতে আসিল? কি কারণে আমাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন, মহৎ লক্ষ্যহীন হইয়াছে? আমাদের জীবনীশক্তি আদৌ নাই কেন? ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানের বিলোপই সকল অনর্থের হেতু। আমরা বিদেশীর নিকট নিজত্ব বিক্রয় করিয়াছি; রাজ্য ধন বিসর্জ্জন দিই নাই। আত্মমর্য্যাদাবোধ থাকিলে রাজ্য, ধন, ক্ষমতা সব থাকিত; এ ধন পায়ে ঠেলিলাম বলিয়া সমস্তই চলিয়া গেল।

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই গঠিত। যে সকল বৃত্তি অন্য কোনও প্রাণীতে নাই, এবং যে গুলি অন্য প্রাণীতে অল্প পরিমাণে আছে, সেই সকলের সম্যক অনুশীলন, বিকাশ ও কার্য্যই ত মনুষ্যত্ব। অথবা সেই সকল বৃত্তির কোন একটী চরিতার্থ করিতে গিয়া যখন মানুষ সকল নিকৃষ্ট বৃত্তি সংযমিত করে, নিজ স্বার্থ বিস্মৃত হয়, অবিরক্ত চিত্তে, উল্লাসে, উৎসাহে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহার সেই কার্য্যকেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলা যায়। তবেই বলিতে পারি, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান সকল মহৎ বৃত্তির উত্তেজক, সকল মহৎ বৃত্তির প্রসূতি। যতই আমাদের নিজত্ব প্রসারিত হয়, যতই আমরা নিজ মহত্ত্ব অনুভব করিতে থাকি, ততই আমরা নিঃস্বার্থ হই। ততই আমাদের উচ্চভাবসমূহের বিলক্ষণ অনুশীলন হয়, সে গুলি ততই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান সকল উচ্চ বৃত্তির সহিত একগ্রন্থে গ্রথিত, এ জ্ঞানের লোপ হইলে সে সকলের অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একতা লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। একতা ব্যতীত যে আমাদের কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না, একতা ভিন্ন যে আমরা একটী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না, একতা

ব্যতীত যে কোনও জাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারে নাই, এ কথা আবাল-বৃদ্ধবনিতার মুখে শুনা গিয়াছিল। কথাটিতে কাহারও মতদ্বৈধ হইতে পারে না বটে; কিন্তু তাহার কোনও ফল হয় নাই কেন? বৃক্ষের মূল ছাড়িয়া অগ্রভাগে জলসেচন হইয়াছিল বলিয়াই কোনও ফল হয় নাই। আত্ম মর্য্যাদা-বোধ না জন্মাইলে কাহাকেও একসূত্রে আবদ্ধ করা যায় না। যখন আমরা আপনার হীনতা অন্তরের অন্তর হইতে অনুভব করিব, যখন অন্যের হীনতায় আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখনই বুঝিব, এই মহানুভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, তখন আমাদের মধ্যে প্রকৃত একতা জন্মিবে; তখনই আমাদের দ্বারা যথার্থ কার্য্য—মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। পরস্বার্থে নিজস্বার্থ মিশিয়া যাওয়াই একতা। আত্মমর্য্যাদা-বোধ যখন হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাইবে, তখন সেই মহৎভাবকে লক্ষ্য করিয়া পরস্বার্থরক্ষাকে নিজস্বার্থরক্ষা মনে করিতে সক্ষম হইবে। আবার সেই মহানুভাবে যাঁহার হৃদয় ভরপুর, তাঁহার নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল আপনা হইতেই সংযমিত হইয়া যায়। নীচ দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয় না। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরের ক্ষতি তাঁহার উন্নত মনে স্থান পায় না। সুখৈশ্বর্য্য ইহার নিকট অতি তুচ্ছ। ইহার বিন্দুমাত্রও অঙ্গহানি করিয়া তিনি সুখ সম্পদ লাভের চেষ্টা করেন না। এই বলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি দারিদ্র, যন্ত্রণা, ক্লেশ অকাতরে সহ্য করেন।

কালের পরিবর্ত্তনে এ ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নূতন শিক্ষা প্রভাবে এভাব নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। এখন আত্মমর্য্যাদা বলিতে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা বুঝায় না। যিনি যত নম্রতা, বিনয়, প্রীতি প্রভৃতি উচ্চভাব সকল হৃদয় হইতে দূর করিয়া অহঙ্কারী, উদ্ধত হইতে পারেন, তাঁহার তত আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান বাড়িতে থাকে। এখন মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া আত্মমর্য্যাদার বৃদ্ধি হয় না; মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া এই ভাবের স্ফূর্ত্তি করা হয়। এখন আপনাকে মস্ত লোক ভাবা এবং আপনি ব্যতীত সংসারশুদ্ধ লোককে নিজাপেক্ষা সর্ব্বাংশে হীন মনে করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য ব্যতীত, কোনও বৃত্তির কণামাত্র অঙ্গহানি না করিয়া যে আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না,

আত্মমর্য্যাদার স্ফূর্ত্তি হয় না, এ কথা আমরা একবারে বিস্মৃত হইয়াছি একজন সুশিক্ষিত অল্পশিক্ষিতের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে, তাঁহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিলে, আত্মমর্য্যাদা নষ্ট হইয়া যাইবে, মনে করেন তাঁহার বিশ্বাস, লোকে বলিবে, ইনি তত জ্ঞানী ও বিদ্বান্ হইলে অল্প শিক্ষিতের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিতেন না, ইঁহার মন এখনও তত উন্নত হয় নাই। উচ্চপদস্থ লোক নিম্নপদস্থ লোকের সহিত একাসনে বসিয়া কথা কহিতে, তাঁহার সহিত নম্রভাবে ব্যবহার করিতে বড়ই কুণ্ঠিত হন; পাছে তাহাতে তাঁহার পদমর্য্যাদার বিশেষ ক্ষতি হয়, পাছে তাঁহাকে তাঁহার মত লোক আর খাতির না করেন, এবং পাছে সেই নিম্নপদস্থ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা, ভয়, ভক্তির ত্রুটি হয়। ধনী নির্দ্ধনের দিকে ফিরিয়া চান না, তাঁহাকে কৃপার পাত্র মনে করেন, পাছে সমাজে তাঁহার মান্য কমিয়া যায়। ক্রমে এই নূতন প্রকারের আত্মমর্য্যাদা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, এখন পুত্র পিতাকে শ্রদ্ধা করে না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মান্য করে না। মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়াই এখন সকলের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং বিবেচনাশক্তি পরিপক্ব হয়। এখন কেহই পরাধীন হইতে চান না। পুত্র পিতার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করা দূরে থাকুক, পিতার আজ্ঞাবহন করা আত্মমর্য্যাদাহানিজনক মনে করেন। এখন কোন কার্য্য করাইতে হইলে জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠের নিকট, 'আমার এই উপকারটি করিবে?' এই ভাবে অনুরোধ করিতে হয়। কারণ, তিনি self-respect নামক যে একটী মুকুট শিরে বহন করিতেছেন, তাহার প্রতি সর্ব্বদা নজর রাখা চাই। এই Self-respect-এর নিকট গুরু লঘু নাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তি নিচয় এখানে উঁকি মারিতে পারেন না। এই Self-respect নামক অদ্ভুত পদার্থটি কি জানি কোন্ মহাদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ইহার মূল Individuality নামক একটী দিগ্‌গজ শব্দ। Individuality বাক্যটি আসলে মন্দ নহে। কিন্তু আমরা ইহাকে নূতন ভাবে—বিপরীত আকারে মহাধূমধামের সহিত, ঘোর কোলাহল করিয়া ইহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম এবং অবশেষে ইহাকে আমাদের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বে যে আত্মবিক্রয়ের কথা বলিয়াছি, Individuality তাহাই

করিতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক ভাল জিনিষ যেমন বিকৃত—নকল অবস্থায় আমাদের দেশে আসিয়াছে, এটিও সেইরূপ। এটির অর্থ আমরা এখন এইরূপ করিয়াছি। "আপনাকে মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ ভাবিতে হইবে, আমি কোন বিষয়ে কাহারও অধীন মতাবলম্বী হইয়া নিজত্ব হারাইব না, কারণ স্বাতন্ত্র্যই উন্নতির মূল।" যিনি যত উদ্ধত, যিনি যত গর্ব্বিত, যিনি যত সর্ব্বজীবে অশ্রদ্ধাবান্, তাঁহার Individual-ত্ব ততই বাড়িতে থাকে, ততই বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইহার মূলে কত গলদ আছে সহজেই বুঝা যাইতেছে এবং ইহার পরিণাম যে বিষময় হইয়াছে তাহা বিচিত্র নহে। যে পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে বড় ভাবিয়া রাখিয়াছে, সে কখনই আপনাকে বড় করিতে পারে না। আমরা আপনাকে বড় ভাবি বলিয়াই আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে দিন দিন ছোট হইতেছি। প্রকৃত আত্মমর্য্যাদা মনুষ্যত্বের প্রহরী। মনুষ্যত্বের গায়ে যাহাতে একটুও আঁচড় না লাগে আত্মমর্য্যাদা সতত সেই চিন্তায় চিন্তিত। এ কথা আমরা বুঝাইয়াছি, আমরা ইহাও বুঝাইয়াছি, যে নম্রতা, বিনয়, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ প্রভৃতি মহৎবৃত্তিগুলির অনুশীলন ও সামঞ্জস্যরক্ষাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু যে, বিজাতীয় Self-respect বা Individuality আমাদিগের এ সকল বৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব না বাড়াইয়া অনবরত কমাইতেছে, তাহার ফল যে বিষময় এ কথা বলা বাহুল্য। নকল জিনিষ বলিয়া কাজও নকল হইয়াছে। যেখানে Self-respect-এর প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র, সেখানে ইহা একবারে অন্তর্ধান হইয়াছে। আমরা এস্থলে কেবল একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালী-জীবনের প্রধান লক্ষ্য চাকুরী। বাঙ্গালী স্কুল কলেজে পড়েন, গ্রাজুয়েট হন—চাকুরীর জন্য; বাঙ্গালী যে প্রাণান্ত করিয়া বিশাল জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিতেছেন তাহার পরিণাম সেই চাকুরী। বাঙ্গালীর লক্ষ্য এতদপেক্ষা উন্নত হয় না। বাঙ্গালীর উচ্চাভিলাষের, আশার সীমা এইখানে। এই কেন্দ্রস্থানে থাকিতে থাকিতে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়েন। এখানে আত্মমর্য্যাদার আর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি পিতার ভর্ৎসনা অনুযোগ সহ্য করিতে পারেন না; তখন Self-respect

মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আফিসের প্রভু কারণে বা অকারণে যতই কেন ভর্ৎসনা করুন না, গালাগালী পর্যান্তও তিনি অকাতরে অসঙ্কোচে সহ্য করেন। প্রভুর আজ্ঞার অপেক্ষায় তিনি সর্ব্বদা সসম্ভ্রমে হাজির থাকিতে পারেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট ক্ষণেকের তরেও ওরূপে দাঁড়াইতে তাঁহার বড়ই যন্ত্রণা বোধ হয়; তখন তাঁহার মনে হয়, "ভৃত্যের মত এরূপভাবে আমার অবস্থান করা কি উচিত হইতেছে?" পিতা, ভ্রাতা, জেঠা, খুড়া যে কোন গুরুজন যখন যে কাজ করিতে বলেন, তাহা করিবার পূর্ব্বে হিতাহিতজ্ঞানের সহিত পরামর্শ করেন; তখন ধর্ম্মবুদ্ধি (conscience), সহজ বুদ্ধি (common sense) প্রভৃতি পারিষদবর্গ উপস্থিত হন, কিন্তু সাহেবের আজ্ঞাপালনের সময় এ সব পারিষদবর্গ আগেভাগে রণে ভঙ্গ দেন। ইহাই আমাদের চূড়ান্ত আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান! ইহাই আমরা শিখিতেছি, ইহাই আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

আত্মমর্য্যাদা কাহাকে বলে, আমরা একরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এই মহৎ গুণ হারাইয়া অবধি আমরা যে সুখ, স্বাধীনতা সর্ব্বস্ব হারাইতেছি; দিন্ দিন্ পশুবৎ হইতেছি, বারান্তরে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

হেমচন্দ্র।

দিবা অবসান প্রায়। সূর্য্য ডোব ডোব হইয়াছে। আকাশের পশ্চিম কোনে খানকতক রাঙা মেঘ ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবী হইতে গ্রীষ্মের যেন একটা ভাব উঠিতেছে। দিন যায় যায়। হেম সেই যে ভোরে উঠিয়া ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে এখনও আসিল না কেন? মনোরমা কাঁদিতে লাগিল। বিরাজ বড়ই ভাবিতা হইল। বৃদ্ধার অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে, আর সময় কাটে না। বৃদ্ধা অনেক দিন হইতে

রোগ ভোগ করিতেছিল, শরীর বড়ই ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু তথাপিও এতদিন তাহার জীবন স্তিমিতপ্রায় প্রদীপের ন্যায় একরূপ কাটিয়া গিয়াছিল। পুত্রের মুখখানি দেখিবার জন্য বৃদ্ধা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। হঠাৎ একেবারে পুত্র ও জামাতাকে দেখিয়া আর অহ্লাদের সীমা রহিল না। কিন্তু সে রুগ্নাবস্থায় সে ক্ষীণ দেহে তত আহ্লাদ সহিল না—শেষ রাত্রি হইতে বৃদ্ধার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়িল। বৃদ্ধা শ্বাস টানিতে লাগিল। এতদিন কোনও ঔষধ পড়ে নাই—কে চিকিৎসা করাইবে? হেম তাহা ভাবিয়া কাঁদিল, আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ রামকৃষ্ণকে মার নিকট রাখিয়া দূর গ্রামে ডাক্তার ডাকিতে গেল। ক্রমে সকাল হইল, রোদ বাড়িল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস আরও বাড়িয়া উঠিল। কে দেখিবে? এক বিরাজ ভিন্ন বাড়ীর আর কেহই উঁকি মারিয়া দেখেন না; একা বিরাজ কি করিয়া উঠিবে? মনোরমা বালিকা, সে সেই সকাল হইতে কেবল অজস্রধারে কাঁদিতেছে। রামকৃষ্ণ এ অবস্থায় কখন পড়ে নাই, তায় সে বিদেশী, কারি কাছে যাইবে? পাড়ার দুই এক জন এক আধবার দেখিতে আসিল, অনেক দুঃখ জানাইল, কেহবা দু এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেও ত্রুটি করিল না; বলা বাহুল্য, কেহই বৃদ্ধার শয্যা স্পর্শ করিল না, দূরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনাদিগের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল। অনেকেই যাইবার সময় জানাইয়া গেলেন, তাঁহাদের যাইতে কোনমতে ইচ্ছা ছিল না, কেবল 'পোড়া সংসার' চলে না বলিয়া কাজেই চলিয়া যাইতে হইল। কয় দিন ধরিয়া কর্ত্তাও বাড়ীতে ছিলেন না।

মনোরমা, বিরাজ ও রামকৃষ্ণ তিনজনে বৃদ্ধার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধার যন্ত্রণা তখন অপরিসীম, মুহুর্মুহুঃ জল চাহিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া জলের জন্য 'হা' করিতেছে। তাহা দেখিয়া তিনজনে আরও কাঁদিতেছে। বৃদ্ধা বারবার হা করিয়াও জল পাইল না, তখন কথা কহিবার শকতি ছিল না, গেঙাইয়া গেঙাইয়া বলিল—"জ-অ-ল।" মনোরমা উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল—"মা, আজ যে একাদশী।" হঠাৎ কি যেন লুপ্তস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, বৃদ্ধা সে কথা শুনিয়া ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল।

অন্তিম তৃষ্ণা আবার জোর করিল, চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধা স্থির থাকিতে পারিল না, আবার হা করিল। মনোরমা কাঁদিয়া বিরাজকে বলিল—"কি করিব, দিদি?" বিরাজ বলিল—"যে পাপ হয় আমার হইবে, একবিন্দু গঙ্গাজল দাও।" মনোরমা পাত্রে গঙ্গাজল লইয়া দিতে গেল। বৃদ্ধা হা করিল। রামকৃষ্ণ রাগিয়া উঠিল; বলিল—"জল দিও না, কেন পরকাল নষ্ট করিবে?" মনোরমা ভাবিতা হইল, মার গালে জল দিতে পারিল না, হাতের জলপাত্র কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধা তাহা বুঝিল, একবার সেই জলপাত্রের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টে চাহিল, নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ডস্থলে গড়াইয়া পড়িল। 'মা গো' বলিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। স্বভাবকোমল বিরাজ সে দৃশ্য আর দেখিতে পারিল না। বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে তথা হইতে উঠিয়া চলিল।

পাড়ার অতি নিকটেই বনমালি ভট্টাচার্য্যের গৃহ। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'বিজ্ঞ' বলিয়া বড়ই একটা নাম ডাক ছিল। সে গ্রামের সকলের ধ্রুব বিশ্বাস, বনমালি ঠাকুরের ন্যায় অগাধবিদ্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণ লোক কলিকালে আর জন্মিবে না। কথিত আছে, বনমালি একদিন তাঁহার গুরুর উপানহ-প্রহার ভক্ষণ করিয়াই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠেন। মনু তাঁহার মুখাগ্রে; ন্যায়, অলঙ্কার সকল নখদর্পণ; নিদানশাস্ত্রেও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। অনেক দিন হইতে ভট্টাচার্য্য গোটাকতক অনুষ্টুপ ছন্দ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ন্যায়, অলঙ্কার, স্মৃতি যে কোন বিষয়ের বিচার উপস্থিত হইলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া হাসিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাত নাড়িয়া মাথা ঘুরাইয়া দুই একটি অনুষ্টুপ ছন্দ বলিতেন; দর্শকমণ্ডলী, শ্রোতৃমণ্ডলী অবাক্ হইয়া তাঁহার বিদ্যার প্রশংসা করিত। এক দিন নাকি তাঁহার মনুর বিচার সময়ে পাড়ার একটা এণ্ট্রান্স পাশ করা দুষ্ট ছেলে তাঁহার শ্লোক শুনিয়া বলিয়াছিল, তাহা বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক। বলা বাহুল্য, সেজন্য সে ছেলেকে অনেকের নিকট তিরস্কার খাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রাম যুড়িয়া একটা বড় খ্যাতি ছিল। চাষা ভুষো পর্য্যন্ত সকলে বিপদ আপদে তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে যাইত। গৃহের দাবায় বসিয়া,

রুদ্রাক্ষমালা গলে, চন্দনটিপ কপালে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাভারত পাঠ করিতেছেন ; চারি পাশে বসিয়া পাড়ার বর্ষীয়সীগণ সেই 'অমৃত সমান' কথা শুনিতেছে, আর মাঝে মাঝে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গুণপনার প্রশংসা করিতেছে ; এমত সময়ে বিরাজ সেইখানে উপস্থিত হইল। বিরাজ মধ্যে মধ্যে অনেক ব্রত নিয়ম করিত, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক দক্ষিণা হস্তগত করিয়াছেন, তাঁহার গৃহে অনেক নৈবেদ্য আসিয়াছে ; ফলতঃ বনমালি ঠাকুর সে জন্য বিরাজকে স্নেহ করিতেন। বিরাজ কাঁদিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সকল জানাইল। একবার নাড়ি ধরিয়া দেখিয়া আসিবার জন্য অনেক অনুনয় করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালবিলম্ব না করিয়া নামাবলি লইয়া তাহার সঙ্গে গমন করিলেন।

রুগ্নার তখন শ্বাস প্রবল হইয়াছে ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার শিয়রে বসিয়া বামহস্তের নাড়ি টিপিয়া ধরিলেন। নাড়ি বুঝি পলাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল ; বৃদ্ধ মুখ বিকৃত করিয়া একটু সরিয়া বসিয়া অধিকতর জোরে চাপিয়া ধরিলেন। পরে তাহাদিগকে বলিলেন "আর অধিক বিলম্ব নাই, অন্তিম সময় উপস্থিত।" বালিকা মনোরমা এতক্ষণ একদৃষ্টে বৃদ্ধের নাড়ি পরীক্ষা দেখিতেছিল, সে কথা কর্ণে যাইবামাত্র 'মা গো' বলিয়া চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। বিরাজও কাঁদিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া ভট্টাচার্য্য বলিলেন,"বাপু হে ! শোকের এ সময় নয়, ঘরে মারিও না, বাহির করিবার উদ্যোগ দেখ।" রামকৃষ্ণ গদগদস্বরে বলিলেন—"আমি একাকী, আর লোক কোথায় ?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই পরোপকারী—বলিলেন, "আমি লোক আনিতেছি, তুমি ততক্ষণ ইহাঁদের সান্ত্বনা কর।" ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

মনোরমা কিছুতেই সান্ত্বনা মানিতেছিল না, 'মা মা' শব্দে কেবল উচ্চে রোদন করিতেছিল। সে রোদন শব্দ উপর হইতে শুনিয়া মহামায়া তাঁহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মা, মাগী ম'লো নাকি ?" তাঁহার মাতা বলিলেন—"তাইত মা, এ যে মরাকান্নাই বটে !" মহামায়া একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন "বল কি, ঘরে ম'লো !" মা উত্তর করিলেন "ওমা—সত্যই তো !" এই সময়ে অরুণ নীচে যাইবার জন্য দৌড়াইয়

আসিতেছিল, মহামায়া তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন—"ছি বাবা! ওখানে যাইতে নাই।" অরুণ বলিল—"কেন ঐ যে মাঝি র'য়েছে।" এই কথা শুনিবামাত্র মায়ে ঝিয়ে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল; দুই জন বিরাজের উদ্দেশে সহস্র গালি দিল। বালক অরুণ তাহাদিগের ভাব দেখিয়া মারি খাইবার ভয়ে অন্যত্র চলিয়া গেল।

রোদ পড়িয়া গিয়াছে। প্রাঙ্গনে তুলসীতলায় রুগ্না অন্তিমশয্যায় শায়িত রহিয়াছে—তাহার চারি পাশে ভট্টাচার্য্যপ্রমুখ প্রতিবেশীগণ বসিয়া উচ্চে নাম ডাকিতেছেন; অদূরে বালিকা মনোরমা ধূলায় পড়িয়া চীৎকার ছাড়িতেছে; বিরাজ কখনও মনোরমার চক্ষের জল মুছাইতেছে, কখন আপনার চক্ষের জল মুছিতেছে: হেম সারাদিন অনাহার ও পথশ্রমের পর ডাক্তার লইয়া ফিরিয়া আসিল। সহসা কে যেন তাহার মাথায় বজ্রাঘাত করিল। সম্মুখের সে দৃশ্য দেখিয়া হেম দাঁড়াইতে পারিল না, "মা গো" বলিয়া তৎক্ষণাৎ আছাড় খাইয়া পড়িল। রুগ্নার শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি হেমের সে ডাক কর্ণে যাইবামাত্র অশ্রুপূর্ণলোচনে একবার চাহিয়া দেখিল। হেম আর স্থির থাকিতে পারিল না; বালকের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সে বক্ষের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। মার প্রাণ কত কাঁদিয়াছিল তাহা কে বলিবে? এই সময়ে আবার অন্তিম তৃষ্ণা জোর করিয়া উঠিল; বৃদ্ধা শত চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে পারিল না, হা করিল। নিকটে গঙ্গাজল ছিল, হেম তাড়াতাড়ি মুখে জল দিতে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার দুই হাত ধরিলেন। বলিলেন—"ছি! পরকাল নষ্ট করিও না; আজ একাদশী।" হেমের মাথা ঘুরিয়া গেল, কাঁদিয়া বলিল—"যে পাপ হয় আমার হইবে, আমি এ যন্ত্রণা আর দেখিতে পারি না।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"তুমি বালক; শাস্ত্র মানিতে হয়; ভাল, কর্ণমূলে গঙ্গাজল দাও।" সে কথায় হেমের মর্ম্মস্থলে কে যেন অঙ্কুশ ফুটাইয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তাড়িত বাহির হইতে লাগিল, দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল; ক্ষোভে হাতের সেই জলপাত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া উচ্চে কাঁদিতে লাগিল। রুগ্নার প্রাণ তখন বাহির হইবার পথ দেখিতেছিল; আবার হা করিল। হেম তাহা দেখিল, বুক ফাটিয়া যাইবার

উপক্রম হইল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া অঞ্জলি পুরিয়া মুখে জল ঢালিয়া দিল। জল গলাধঃকৃত হইল না। দুই কস বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

হিন্দুশাস্ত্রের শ্রাদ্ধ হইল!!

আকাঙ্ক্ষা।

ঐ যে বিশাল শূন্যমণ্ডল পবিত্র চন্দ্রিকারাশি বক্ষে করিয়া শুভ্র-সলিলা পূর্ণগর্ভা স্রোতস্বিনীর ন্যায় আপন মনে খেলিয়া বেড়াইতেছে, উহার সঙ্গে আমাদের জীবনের কি সাদৃশ্য আছে, তোমরা বলিতে পার কি? বলিতে পার কি, গগনতলে ঐ হাসিমাখা চন্দ্রাননখানি দেখিতে পাইলে, হৃদয়স্থ আকাঙ্ক্ষারাশি কেন এত স্ফীত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠে? যখনই আমি একটু আত্মস্থ হইয়া সুধাকরের কৌমদীজালবেষ্টিত শূন্যমার্গের দিকে লক্ষ্য করিয়াছি, তখনই যেন আমার বোধ হইয়াছে যে, আকাশের ঐ ভাবটুকু আর আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাগুলি যেন দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাপন্ন বিদ্যুদ্গর্ভ তাড়িত-পরিচালকের ন্যায় পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছুটিতে চাহিতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এরূপ আকাশের এত প্রণয় কিসের?

জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশমণ্ডল—সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-লহরী—চন্দ্রকর-প্রতিবিম্বিত বিশাল জলধিগর্ভ, এ সকলেরই সঙ্গে যেন আকাঙ্ক্ষার বড় ভাব। এত প্রণয় আমি কখন আর কোথায়ও দেখিতে পাই নাই। এত এক হইবার ইচ্ছা, এত মিলনার্থী, দর্শনে এত উত্তেজিত, স্ফীত, প্রণয়ী কি আর দেখিতে পাওয়া যায়? কিসের এত বন্ধুতা এ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। একবার মনে হয় যে, উহারা ঠিক একই প্রকৃতির। ঐ জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশমণ্ডলের ন্যায় আমার এ আকাঙ্ক্ষাও বিশাল অথচ সসীম, পরিষ্কার অথচ অস্ফুট। ঐ সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনির

ন্যায় ইহাও ধীরে ধীরে হৃদয়দেশে কিছুকালের জন্য ক্রীড়া করিয়া চিত্ত মাতাইয়া আবার শূন্যেতে মিলাইয়া যায়—ইহারও সুর অবিচ্ছেদী। আর ঐ চন্দ্রকর-প্রতিবিম্বিত বিশাল জলধিগর্ভের ন্যায় ইহার অন্তরদেশেও একটি সুন্দর প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়-ইহার প্রবাহও ঠিক ঐরূপ সতেজ অথচ মধুরতাময়। এই কি এত প্রণয়ের কারণ? কি জানি, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলাম না, তোমরা একথা বলিতে পার কি?

আমার এ আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি এতক্ষণে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। এ আকাঙ্ক্ষা ধনার্জ্জনের নহে—বিদ্যালাভের নহে—বুঝি সুখসম্ভোগেরও নহে। এ আকাঙ্ক্ষা ইহার স্বধর্ম্মী পদার্থ বা ভাবরাশির সঙ্গে মিলনের অভিলাষ—লীনহইবার ইচ্ছা। ইহাই কি আমাদের শাস্ত্রীয় মুক্তি—পরব্রহ্মে লীন হওয়া? শাস্ত্র জানি না, দর্শন পড়ি নাই, যোগ কাহাকে বলি বুঝি না, কিন্তু আমার যেন বোধ হয় যে আমার এ আকাঙ্ক্ষাগুলি এখন যেমন ক্ষণকালের জন্য ঐ কান্তিময় গগনমণ্ডলের সহিত মিশিতে চাহিতেছে—মিশিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, যদি কখনও চিরকালের জন্য এইরূপ অভিলাষী হয়, যদি কখনও সে অভিলাষ পূর্ণ হয়, তখন আমার আকাঙ্ক্ষার মুক্তিলাভ হইবে—আমিও মুক্ত হইব। আজ যেমন ঐ গগনমণ্ডল আমাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে, যখন জগতস্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে সামান্য বালুকণা আমাকে এইরূপ মুগ্ধ করিতে সক্ষম হইবে, আকাঙ্ক্ষাকে তৎসঙ্গ মিশিতে সাকাঙ্ক্ষ করিবে, তখনই আমার মুক্তি হইবে। যদি মুক্তির অর্থ এই না হয়, আমি সে মুক্তি চাহি না।

সৌন্দর্য্য উপলব্ধিই কি তবে মুক্তির প্রধান সহায়? যে যাহা বলে বলুক, আমার নিকট তাহাই বটে। প্রকৃতিস্থ সমস্ত পদার্থে সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখিয়া তাহাতে আত্মহারার নাম প্রকৃতিতে লীন হওয়া বা মুক্তিলাভ। তোমরা সৌন্দর্য্যকে এবং তাহার উপভোগকে সময়ে সময়ে বড়ই দূষণীয় মনে কর। আমার নিকট কিন্তু সৌন্দর্য্যে কোন পঙ্কিলতাই দৃষ্ট হয় না। ফুলটি দেখিলে যে তাহার স্পর্শসুখ বা ঘ্রাণগ্রহণ আমাদের লক্ষ্য হয়, সুন্দরী রমণী দেখিলে যে তাহার সম্ভোগের জন্য মন আকুল হইয়া উঠে, ইহাতেও সৌন্দর্য্যের সেই পবিত্র ভাবটুকু দেখিতে পাওয়া যায়। সৌন্দ-

র্য্যের সহিত আকাঙ্ক্ষা একেবারে মিলাইতে চাহে, তাই দূরে রাখিয়া তাহার সম্ভোগেচ্ছা নিবারিত হয় না। এ কথা বেশি বলিতে গেলে হয়ত অনেক কুরুচির কথা আসিয়া পড়িবে—তাহা বলিয়া তবে কাজ নাই। একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। * "পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, সৌন্দর্য্য তাহা করে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সূর্য্য-কিরণে উড়িতে ইচ্ছা হয়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের আরম্ভ কোথায়, তাহারই অন্বেষণে ঐ সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকে না। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়। দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দেয়।

"স্বর্গে মর্ত্তে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।"

সৌন্দর্য্যের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। এবং যে এই ব্যাখ্যা বুঝিতে পারে, সে না বলিয়া পারিবে না, যে সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি মোক্ষের প্রধান সহায়। আমি যে আকাঙ্ক্ষার কথা বলিতেছি তাহা এই সৌন্দর্য্য-সাগরাভিমুখে

* নবজীবন, প্রথম বৎসর, ২৫৩ পৃঃ।

বেগবতী নদীর ন্যায় সতেজে বহিয়া যাইতেছে। যেখানে ইহা, এই সাগরের অংশ দেখে, সেইখানেই ইহা ছুটিয়া মিশাইতে চাহে। সমষ্টি সৌন্দর্য্য ইহার লক্ষ্য—কিন্তু ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যেও ইহার চিত্ত উন্মাদ হইয়া যায়। ভাবিয়া দেখিলে ব্যষ্টিকেও সমষ্টি করা যায়। তাই চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত গগনদেশ, মনোমোহিনী সঙ্গীতমালা, অনন্ত-প্রসারিত সাগরবারি, পূর্ণ-সৌন্দর্য্যশালিনী প্রকৃতির আংশিক সৌন্দর্য্য হইলেও, আকাঙ্ক্ষা তাহাতেই মিশাইতে চাহে। এই আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রাণ—প্রকৃতিতে লীন হওয়াই ইহার অভিলাষ।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ।

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

অপরাজিতা।

অন্য নাম—বিষ্ণুক্রান্তা, সুপুষ্পী, বিষহন্ত্রী।

স্বনামখ্যাত পুষ্পলতা বিশেষ। শ্বেত ও নীল ভেদে ইহা দ্বিবিধ। ইহার পুষ্প সচরাচর দেবার্চ্চনার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল তিক্ত, কষায়, মূত্রকারক, পিত্তোপদ্রব, বিষদোষ, শোথ, কাস ও আমনাশক। চক্ষুর পক্ষে হিতকারী, ব্রণশোধক, এবং ত্রিদোষের সমতাকারি।

ইহার পাতার রসের নস্য করিলে পালাজ্বর নিবারণ হয়। শ্বেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে নারীদিগের অকালে গর্ভপাত হয় না। ঘৃত সহ বাটিয়া সেবন করিলে গলগণ্ড আরোগ্য হয়। গোমূত্রে বাটিয়া পান করিলে গণ্ডমালা উপশমিত হয়। চেলোনী জলে বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইহার মূলের রসের নস্য লইলে আধকপালে ভাল হয়। ইহার মূল ও আপাংমূল একত্রে পট্টসূত্র দ্বারা করে

বন্ধন করিয়া রাখিলে বীর্য্যস্তম্ভন হয়। নীল অপরাজিতার মূল ও পিপুল মূল একত্রে বাটিয়া লেপ দিলে শ্বেত কুষ্ঠ নষ্ট হয়। অপরাজিতার শিকড় কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

অপাঙ্গ।

অন্য নাম—অপামার্গ, আপাং, চিচ্চিড়ে, মর্কটী।

শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে ইহা দ্বিবিধ। আকৃতিতে উভয়ই সমান। কেবল বর্ণে ও শীর্ষে বিভিন্নরূপ। ইহা সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, তিক্ত, ধারক, মূত্রকারক। কফ, অর্শ, উদরাময়, মূত্রপীড়া ও বিষদোষ নিবারক। ইহার মূল অবিবাহিতা কন্যার হাতের সুতা দিয়া মস্তকে বাঁধিলে ঐকাহিক জ্বর নিবারণ হয়। চেলোনী জলে বাটীয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। আপাং মূল ২ তোলা পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে উন্মত্ত শৃগাল ও কুক্কুর দংশন জনিত বিষপীড়া নিবারণ হয়। ইহার মূল বাটিয়া সেবন করিলে হারিশ আরোগ্য হয়। আপাংমূল পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে নারীদিগের অতি রক্তস্রাব নিবারণ হয়। আপাংমূলের রস আঘ্রাণে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। আপাংমূল, অশ্বত্থছাল ও তেঁতুলছাল সমপরিমাণে একত্রে বা পৃথক্ পৃথক্ ভস্ম করিয়া মিশাইয়া সিকি তোলা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে দারুণ শূলবেদনা তৎক্ষণাৎ উপশমিত হয়। আপাংবীজ তণ্ডুলবারি সহ পিশিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ নিবারণ হয়। আপাং পাতার রস কাটা-স্থানে প্রয়োগ করিলে আশু রক্তরোধ হয়। ওলাউঠা রোগে ২।১ বার ভেদ হইয়াছে এমন সময় শ্বেত আপাঙ্গের একটী সমস্ত শিকড় সাতটী গোল-মরিচের সহিত জলে পিশিয়া আধ ঘণ্টা অন্তর তিন বারে সেবন করাইলে ভেদ বমন এককালে বন্ধ হইয়া যায়; অথচ তজ্জন্য উদর স্ফীত বা অন্য কোন উপসর্গ উপস্থিত হয় না। বৃশ্চিক দষ্ট স্থানে ইহার পাতা ও কোমল শাখাগ্র বাটিয়া লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। আপাং পাতার রসে মূলার বীজ পেষণ করিয়া লেপ দিলে ছুলী আরোগ্য হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, কবিরাজ।

বিনিময় ও মুদ্রা।

অতি পুরাকালে কোন দেশেই মুদ্রার প্রচলন ছিল না। বিনিময় দ্বারা প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই সংগৃহীত হইত। আমার তৈলের আবশ্যক হইল, আমি কতকগুলি তণ্ডুল লইয়া তৈলবিক্রেতার নিকট গমন করিয়া তদ্বিনিময়ে তৈল আনিলাম। অস্ত্রের প্রয়োজন হইল, বস্ত্র লইয়া অস্ত্র-বিক্রেতার নিকট গমন করিয়া—তাহার পরিবর্ত্তে অস্ত্র আনিলাম, ইত্যাকার ব্যবহার ঘোর পল্লীগ্রামের মধ্যে অদ্যাপিও কতক পরিমাণে বর্ত্তমান। কালক্রমে মনুষ্যের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধি সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় দ্বারা সকল বস্তু সংগ্রহ করণের অসুবিধা প্রতীত হইতে লাগিল। আমি দুগ্ধ ক্রয় করিবার মানসে কাষ্ঠাসন লইয়া গমন করিয়া দেখিলাম যে, দুগ্ধবিক্রেতার কাষ্ঠাসনের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং আমাকে বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষিন্ন-মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। অথবা অন্য কোন দূরবর্ত্তী স্থানে দুগ্ধের অনুসন্ধানে গমন করিতে বাধ্য হইতে হইল। যদিবা সামান্য বস্তু দ্বারা কোন মূল্যবান্ দ্রব্য বিনিময় করিবার প্রয়োজন হইল তাহা হইলে একেবারে সর্ব্বনাশ। বহুমূল্য বস্ত্র পাইবার জন্য মাসাবধি আমাকে কাষ্ঠ বহন করিয়া বস্ত্রবিক্রেতাকে দিতে হইবে। যদি আবার তাঁহার তত অধিক কাষ্ঠের প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলেই সমূহ বিপদ উপস্থিত। অকস্মাৎ কোন এক বস্তুর আবশ্যক হইলে যাঁহার সেই বস্তু আছে তাঁহার নিকট যাইয়া অনুসন্ধান লইতে হইবে যে তাঁহার কিসের অভাব; আমার যদি সেইটি না থাকে তাহা হইলে একেবারে মাতায় হাত দিয়া বসিতে হইল, অপর এক ব্যক্তির নিকট তাহা চেষ্টা করিতে করিতে হয়ত আমার অভাব দূর হইয়া গেল, এবং আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। চিকিৎসকের সহিত এ প্রকার বিনিময় প্রথা প্রচলিত থাকিলে, সময়ে সময়ে যে রোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন হইয়া উঠে তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। সকলেই বৃদ্ধাবস্থার জন্য কিছু না কিছু সংগ্রহ

করিয়া রাখেন, যেন সেই অসহায় অকর্ম্মণ্য অবস্থায় তাঁহাকে কষ্ট পাইতে না হয়। কিন্তু এই প্রথা প্রচলিত থাকিলে তিনি কি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন? যাহা কিছু সঞ্চিত থাকিবে তাহাই কালক্রমে পচিয়া যাইবে, অগ্নি লাগিলে ভস্মসাৎ হইবে, বা অন্য কোন দৈব ঘটনায় নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং যদি কোন বস্তু রক্ষা পায় তাহার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করা বৃদ্ধ বয়সে অসাধ্য হইয়া পড়িবে। মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে বৃহদাকার বাণিজ্য ব্যবসা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দেশ বিদেশের রাজস্ব নিরূপণ করিয়া তাহা নানা কার্য্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া কঠিন হইয়া উঠে। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায় মহাশয় আপনি কত ধনের অধিপতি, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নিজ দ্রব্যের ধারাবাহিক নাম ও পরিমাণ বলিতে হইবে তদ্ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এইরূপ মুদ্রার অভাবে যে কত অনর্থ উপস্থিত হয় তাহা কে সংখ্যা করিবে?

এই শিল্প বিজ্ঞানের দিনে সভ্যজাতিদিগের মধ্যে রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, ঘড়ি ও নানাবিধ কল আবিষ্কৃত হইয়া মানবজাতির অশেষ উপকার সাধন করিতেছে, আজ সেই বিনিময় প্রথা থাকিলে এই সকল মূল্যবান্ কল কোন মতেই ক্রয় করা যাইত না, এবং কোনও রূপে সংগৃহীত হইলেও চলিত না। হয়ত এই শিল্প ও বিজ্ঞানের জন্য উদ্যম ও চেষ্টা এককালে নির্ব্বাণ হইয়া যাইত। এক রেলগাড়ি লইয়া বিনিময়ের অসুবিধা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রেলওয়ের এক এক সমান্য ষ্টেশন হইতে দিবসের মধ্যে সহস্র সহস্র যাত্রী বিদেশে গমনাগমন করিতেছে। দিবসে ও রজনীতে কোন কোন ষ্টেশনে ১৫। ১৬ খানি ট্রেন যাতায়াত করে। যদি মুদ্রার প্রচলন না থাকিত, তাহা হইলে যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ মেষ, মহিষ, কেহ ছাগ, কেহ পক্ষী, কেহ তণ্ডুল, কেহ গোধূম, কেহ তৈল, কেহ ঘৃত, কেহ লবণ কেহ ডাল, কেহ মূল্যবান প্রস্তর, কেহ ধাতু ভাড়া স্বরূপ লইয়া আগমন করিত। তত্তৎ বস্তুর মূল্য নিরূপিত করিয়া তাহাদিগকে টিকিট দিতে হইলে মাসের মধ্যে গাড়ী একবার ছাড়া হইত কি না সন্দেহ। হয়ত মূল্য নিরূপিত হইতে অনেক পশু আহারাভাবে লয়প্রাপ্ত হইত ও অনেক দ্রব্য পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। চৌর্য্যবৃত্তির আধিক্য হইত ও বিবাদ কলহ

উপস্থিত হইয়া নানা অনর্থ আনয়ন করিত। এই সকল বস্তু রাখিবার জন্য ষ্টেশনে নিতান্ত অল্প স্থানের আবশ্যক হইত না। যতদিন পর্য্যন্ত যাত্রীরা টিকিট প্রাপ্ত না হইত, তাহাদিগকে ষ্টেশনের সান্নিধ্যে থাকিয়া আহারাদি নির্ব্বাহ করিতে হইত এবং নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছারখার করিয়া দিত।

শুদ্ধ, মুদ্রার প্রচলনে সকল প্রকার কষ্টক্লেশের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। মুদ্রা এত প্রয়োজনীয় পদার্থ যে ইহাকে নিঃসন্দেহে বাণিজ্যের যন্ত্র বলা যাইতে পারে। কি দ্রব্যে মুদ্রা প্রস্তুত করিলে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করিতে হইলে এমন একটি দ্রব্য বাছিয়া লইতে হইবে যাহাকে সহজে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যায়, অর্থাৎ যাহা সামান্য আকারে অধিক মূল্য ধারণ করে। কাষ্ঠ, প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতি পদার্থে মুদ্রা হইতে পারে না, এই সকল দ্রব্যে মুদ্রা প্রস্তুত করিলে সামান্য বস্তু ক্রয় করিবার জন্যও মুদ্রাবাহকের আবশ্যক হয়। প্রাচীনকালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন প্রকার দ্রব্য মুদ্রা-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত; যথা, চীনদেশে চা, আফ্রিকার কোন কোন দেশে ও প্রাচীন ভারতে কড়ি, আরবে গো মেষ, আবিসিনিয়ায় লবণ। কিন্তু ভূরিদর্শন দ্বারা ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে স্বর্ণ রৌপ্যই মুদ্রার উপযোগী; অপর কিছুতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে তাহা তাদৃশ সুবিধাজনক ও কার্য্যকারী হয় না। যে কোন পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি গুণ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

১। মূল্যবত্তা। পদার্থটির নিজের মূল্য না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এক রৌপ্য মুদ্রাতে ঈষদূন এক টাকা মূল্যের রৌপ্য থাকা উচিত। যদিও ব্যাঙ্ক নোট প্রভৃতির নিজের কোন মূল্য নাই, কিন্তু তাহারা মুদ্রার আদেশপত্র, প্রয়োজন হইবা মাত্র তাহার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায়। এবং পাছে কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় এই জন্য রাজা স্বয়ং দায়ী। অতি পুরাকাল হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য চাকচিক্য, স্থায়িত্ব ও ঘাতসহত্বের জন্য মূল্যবান বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে।

২। অনায়াসবাহ্যতা। যাহাতে পদার্থটি অনায়াসে এক স্থান হইতে প্রয়োজনমত ভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ইহা যেন আকারে অল্প হইয়া অধিক অর্থের পরিজ্ঞাপক হয়। হীরক সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান হইলেও আকারে এত ক্ষুদ্র যে সহজে হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ইহা মুদ্রা হইবার পক্ষে অনুপযোগী। আবার স্বর্ণ-নির্ম্মিত আধুলি সিকি দুয়ানি হইলেও সেই গোল। কাজে কাজেই স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত মুদ্রার প্রয়োজন।

৩। অবিনাশিত্ব। পদার্থটি যাহাতে সহজে নষ্ট না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। এই জন্যই কাষ্ঠ ও ডিম্ব প্রভৃতি মুদ্রা হইবার পক্ষে অনুপযোগী। পুনশ্চ, স্বর্ণ রৌপ্য মরিচা ধরিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

৪। মূল্যের সমতা। যে পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহার মূল্য এক হওয়া চাই। স্বর্ণ বা রৌপ্যকে শোধন করিলে তাহাদিগকে একই মূল্যের অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে নির্ম্মল বা দুই তিন আনা খাদ-বিশিষ্ট করা যাইতে পারে। কিন্তু হীরক বা অন্য কোন বহুমূল্য প্রস্তরকে তাহা পারা যায় না, ওজনে ও আকারে এক হইলেও ঔজ্জ্বল্যভেদে মূল্যের বিলক্ষণ তারতম্য হইয়া থাকে।

৫। খণ্ড সকলের মূল্যের অতারতম্যতা। পদার্থটিকে খণ্ড করিয়া ফেলিলেও যেন তাহার মূল্যের ব্যতিক্রম না হয়। একটি টাকাকে সমান আটটি অংশে বিভাগ কর, আটটি দুআনি হইবে। আটটি দুআনি একত্র কর একটি টাকা হইবে। একটি ডবল্ পয়সা ওজনে এক পয়সার দ্বিগুণ, মূল্যেও দ্বিগুণ। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতির ওজনের সহিত মূল্যের সমান অনুপাত। কিন্তু হীরক ও অন্যান্য প্রস্তরের পক্ষে তাহা নহে। এক আনা ওজনের এক হীরকের মূল্য ৪০৲ চল্লিশ টাকা হইলে দুই আনার এক খণ্ডের মূল্য ২×২×৪০=১৬০৲; তিন আনার এক খণ্ডের মূল্য ৩×৩×৪০=৩৬০৲ ইত্যাদি। হীরকাদি কোন কারণে ভাঙ্গিয়া গেলে উহাদের মূল্যের যৎপরোনাস্তি তারতম্য হইয়া থাকে।

৬। মূল্যের অপরিবর্ত্তনীয়তা। পদার্থটির মূল্য যেন সকল সময়ে সকল দেশে একই থাকে। জগতে যাবতীয় বস্তুর মূল্য পরিবর্ত্তনশীল। আজ এক প্রকার, কাল ভিন্ন প্রকার। মুদ্রার মূল্যের স্থিরতা না থাকিলে কে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া সন্দেহ-দোলায় সঞ্চালিত হওতঃ মধ্যে

মধ্যে হৃতসর্ব্বস্ব হইবে? স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্যের এত সামান্যরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হয় যে ইহারা অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা মুদ্রার জন্য বিশেষ উপযোগী। কোন এক দ্রব্য ওজনে অত্যন্ত লঘু হইলে তাহার মূল্যের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে সকল দ্রব্য ভারি তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে হইলে অনেক ব্যয় পড়ে। কাজে কাজেই স্থান বিশেষে মূল্যের বিশেষ তারতম্য হইয়া থাকে। খনির মুখে পাতুরিয়া কয়লার এক দর, আর ১২।১৪ ক্রোশ দূরে আর এক প্রকার। ব্যবসায়ীগণ এক মূল্যে বাহাদুরি কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া তাহার তিন চারি গুণ মূল্যে বিক্রয় করে। একটা জীবন্ত মৎস্যের মূল্য এক টাকা হইলে সেই আকারের একটা পচা মাছের দাম দশ বার পয়সার অধিক নহে। তণ্ডুল গোধূম প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব এত অধিক যে ফসল অল্প হইবার কথা দূরে থাক আমদানির বিলম্ব হইলেই বাজার চড়িয়া গেল, অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি হইল। এইরূপ সময়ে সময়ে আর আর সকল জিনিষেরই তেজি মন্দা দেখা যায়। কিন্তু স্বর্ণ রৌপ্য কেহ খাইয়া ফেলে না, বা অন্য কোন রূপে নষ্ট হয় না। দিন দিন স্বর্ণ রৌপ্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি কোন কারণে স্বর্ণ রৌপ্যাদির আমদানি তিন ভাগের এক ভাগ কমিয়া যায়, ইহাদের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার অভাব অপেক্ষাকৃত এত অল্প যে, তাহাতে তাহাদের মূল্যের বিশেষ কমবেশ হয় না।

৭। যাথার্থ্য নিরূপণীয়তা। যে পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইবে তাহা এমন হওয়া চাই, যাহাতে তাহা খাঁটি কি মেকি সহজে নির্ণীত হইতে পারে। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রের যাথার্থ্য ঘ্রাণ আস্বাদন ও শব্দ দ্বারা সহজে অনুমিত হয়। একটি টাকার যাথার্থ্য পক্ষে সন্দেহ হইল, বাজাইলাম, খাঁটি কি ভেল সহজে ধরা গেল। কিন্তু হীরকাদির মূল্য নির্দ্ধারণে কয়টি জহরী সক্ষম?

ঈদৃশ গুণবিশিষ্ট পদার্থে মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র ব্যতীত অপর কোন পদার্থে এই সাতটি গুণ সমধিক পরিমাণে লক্ষিত হয় না। প্রায় সকল দেশেই স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনেরই মূল্য স্থির আছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতবর্ষে রৌপ্যের মূল্য স্থির

রাখিয়া অপর দ্রব্য সকলের মূল্য নির্ণয় করা হয়। আজ কাল কোম্পানির মোহরের মূল্য প্রায় ২১৲ কিছু দিবস পূর্ব্বে ১৭ টাকাতেও পাওয়া যাইত। তাম্রের মূল্যের পরিবর্ত্তন বড় দেখা যাইতেছে না। কিন্তু ইংলণ্ডে স্বর্ণের মূল্য স্থির রাখিয়া অপর দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধার্য্য হয়। পূর্ব্বে গিনি ১০॥ টাকাতে পাওয়া যাইত, আজকাল ১ গিনির মূল্য প্রায় ১৩॥০ টাকা। ভারতবর্ষের রাজত্ব-প্রণালী পরিদর্শনের জন্য যে সকল ইংলণ্ডীয় কর্ম্মচারী বিলাতে আছেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে স্বর্ণমুদ্রায় বেতন পাইয়া আসিতেছেন, সুতরাং এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক রৌপ্যমুদ্রা তাঁহাদের বেতন স্বরূপ বিলাতে প্রেরিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের রাজকোষকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। যে বিলাতীয় কর্ম্মচারী ২৫ গিনি বেতন পান, তাঁহার জন্য পূর্ব্বে যদি ২৬২॥০ ভারত হইতে পাঠাইতে হইত, আজকাল তাঁহার জন্য ৩৩৭॥০ পাঠাইতে হইতেছে। এইরূপ টাকার বাঁটাকে এক্স্চেঞ্জ বলে। এক্স্চেঞ্জে আজ কাল রূপার দর এত কমিয়াছে, যে বিলাতী মাল লইয়া আমাদের দেশে বাণিজ্য ব্যবসা করা ক্রমে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, একটি টাকাতে ঠিক এক টাকা মূল্যের রৌপ্য নাই, বা একটি পয়সাতে ঠিক এক পয়সা মূল্যের তাম্র নাই। অর্থাৎ একটি রৌপ্য বা একটি তাম্র মুদ্রা এক টাকা বা এক পয়সার পরিজ্ঞাপক হইলেও তাহার যথার্থ মূল্য এক টাকা বা এক পয়সার কিঞ্চিৎ অল্প। এরূপ হইবার চারটি বিশেষ বিশেষ কারণ বুঝিতে পারা যায়।

১। রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রার পরিজ্ঞাপক মূল্য বাস্তব মূল্যের অধিক হওয়াতে, মুদ্রা প্রস্তুত জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়গ্রস্ত হইতে হয় না। এক রৌপ্য মুদ্রাতে যদি চৌদ্দ আনার খাঁটি রূপা থাকে, তাহা হইলে দুই আনা রাজার লাভ। সেই লাভের মধ্যে কিয়দংশ মুদ্রা প্রস্তুত জন্য ব্যয়িত হয়।

২। মুদ্রা প্রস্তুত জন্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাহা অতিরিক্ত থাকে, তাহা রাজকার্য্যে ব্যয়িত হয় এবং প্রজারা অতিরিক্ত করভার হইতে নিষ্কৃতি পায়। যদি মুদ্রার রৌপ্যের মূল্য ঠিক এক টাকা হইত, তাহা হইলে মুদ্রা

প্রস্তুত জন্য ব্যয়, ও রাজ্য শাসনের আংশিক ব্যয় যাহা এক্ষণে মুদ্রা প্রস্তুত করণের উপসত্ত্ব হইতে নির্ব্বাহ হইতেছে তাহা নির্ব্বাহ জন্য প্রজার উপর অতিরিক্ত করভার অর্পিত হইবার সম্ভাবনা হইত।

৩। রৌপ্য বা তাম্র মুদ্রাতে এক টাকা বা এক পয়সার অল্প রৌপ্য বা তাম্র থাকাতে লোকে মুদ্রাকে গলাইয়া অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে না। কে জানিয়া শুনিয়া একটি টাকাকে গলাইয়া দুই আনা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে? টাকায় খাদ না থাকিলে লোকে যথেচ্ছ গলাইয়া নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিত এবং রাজাকে অনবরত মুদ্রা প্রস্তুতকার্য্যে ব্রতী থাকিতে হইত, ও তাহাতে রাজার নিতান্ত অল্প ব্যয় হইত না।

৪। খাদ মিশাইলে মুদ্রা কঠিন হয়, ও সহজে ইহার আকার পরিবর্ত্তিত হয় না। মুদ্রাতে খাদ যে উদ্দেশেই দেওয়া হউক না কেন, ইহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েই উপকৃত।

মুদ্রা স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র নির্ম্মিত হওয়া উচিত ও তাহাতে খাদ থাকা উচিত, এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা গেল। এক্ষণে ইহার আকার গোল হইল কেন দেখা যাউক। সকল আকার অপেক্ষা গোল দেখিতে সুন্দর। মুদ্রা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হইলে তাহার কোণ দ্বারা অঙ্গাদি ক্ষত হইবার সম্ভাবনা আছে, ও কোণগুলি শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পাছে কেহ মুদ্রা চাঁচিয়া ওজনে কম করিয়া ফেলে অথবা কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করে এইজন্য রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও নানা প্রকার সূক্ষ্ম লতা পাতা ইহার উপর অঙ্কিত থাকে ও ইহার ধার কাটা কাটা থাকে। মুদ্রা ঠিক ওজনের না হইলে তাহা রাজদ্বারে গৃহীত হয় না, ও কেহ কোনও রূপ কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিলে তাহাকে বিচারালয়ে বিলক্ষণ শাস্তিভোগ করিতে হয়। এই সকল নানা উপায়ে মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে এবং মনুষ্যকে কষ্টসাধ্য অসুবিধাজনক বিনিময়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যার বিদায়।

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায় শিথিল কবরী পড়ে খুলে,—
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
চরণের পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে ;—
নীরবে-বিদায়-চাওয়া-চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লান-বধূ যায় বিষাদের বাসর-শয়নে।
সন্ধ্যাতারা পিছনে দাঁড়ায়ে চেয়ে থাকে আকুল-নয়নে।
যমুনা কাঁদিতে চাহে বুঝি কেনরে কাঁদেনা কণ্ঠ ভুলে,
বিস্ফারিত হৃদয় বহিয়া চলে যায় আপনার মনে।
মাঝে মাঝে ঝাউবন হতে গভীর নিশ্বাস ফেলে ধরা।
সপ্ত ঋষি দাঁড়াইল আসি নন্দনের সুরতরু-মূলে,
চেয়ে থাকে পশ্চিমের পথে ভুলে যায় আশীর্ব্বাদ করা'।
নিশীথিনী রহিল বসিয়া বদন ঢাকিয়া এলোচুলে।
কেহ আর কহিল না কথা, একটিও বহিল না শ্বাস ;
আপনার সমাধি মাঝারে নিরাশা নীরবে করে বাস ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাম বসু।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

রামবসুর সঙ্গীতাবলী পাঠ করিলে, তাঁহার একটী বিশেষ অভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সেটী সুশিক্ষার অভাব। শিক্ষা-রশ্মি অভাবে, কবি নিজের হৃদয়-জগতের চতুর্দ্দিক নিজেই সুস্পষ্ট দেখিতে পারেন না। তখন, অন্যকে চতুর্দ্দিক দেখাইবেন কি করিয়া ?

রাম বসু স্বাভাবিক কবি ছিলেন, সত্য। তাই, সময়ে সময়ে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় সুনীল আকাশে উড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, বা উঠিয়াছেন; কিন্তু অশিক্ষা-ডোরে পদ আবদ্ধ। আবার খাদ্য পেয় ভূতলে। সুতরাং, ঈষৎ আকর্ষণে বা বায়ু-কম্পনে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়াছেন। বিদ্যুতের ন্যায় মেঘ হইতে মেঘান্তরে ছুটিয়া—লুটিয়া সুখী হইতে পারেন নাই, কিম্বা ঝটিকার ন্যায় সমাজের সংক্রামক রোগে মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত করার সে আনন্দ-টুকু লাভ করিতে পারেন নাই।

তাঁহার লেখা পড়িলে বোধ হয়, অধিকাংশই গরজে বা ফারমায়েসে লেখা। উত্তর দিতে হইবে, বা চাপান গাইতে হইবে, ইহা ভাবিলে মর্ম্মস্পর্শী ভাবাপেক্ষা বাহাদুরী-আকাঙ্ক্ষা কেমন স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে। আর, ভাব—কবিতার প্রাণ—গরজে প্রসব করিবার সামগ্রী নহে। উটপক্ষীর ডিম্ব নহে, যে সূর্য্যোত্তাপেও ফুটিতে পারে। হায় রাম বসু প্রভৃতি!

বিরহ। "রাম বসুর বিরহ আমাদের দেশে অতি বিখ্যাত। অন্তর ও বাহ্যজগত বর্ণনে রাম বসুর যেরূপ নৈপুণ্য দেখা যায়, এমন বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প সংখ্যক কবির দেখা যায়। তাঁহার গীতগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে, এমন বোধ হয়।"*

"বালিকা ছিলাম, ছিলাম, ভাল ছিলাম, সই, ছিল না সুখ-অভিলাষ।
পতি চিন্‌তেম না, ও রস জানৃতেম না, হৃদিপদ্ম ছিল অপ্রকাশ।
এখন সেই শতদল হৃদয়-কমল, কাল পেয়ে ফুটিল,
পদ্মের মধু পদ্মে রেখে ভ্রমর উড়ে গেল!"

"একজন প্রকৃত বঙ্গ-মহিলার কথা এই। ইহাতে কাল্পনিক প্রেমের ভেল্কী নাই, প্রকৃত সত্যের জাজ্জ্বল্য প্রতিমা আছে।" †

"মনে রৈল সই, মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি, বলা হোল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম, সজনি,

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা।
† ভারতী, ৬ষ্ঠ খণ্ড। দেশজ প্রাচীন ও আধুনিক কবি।

অনাসে প্রবাসে গেল, সে গুণমণি ;
একি সখি হোল বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান।”

“কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মনোহর চিত্র!”*

“যাক্ প্রাণ, প্রাণনাথ যেন সুখে রয়।
থেকে দেশান্তর, দহে নিরন্তর, তারে নিন্দে করি পাছে পতিনিন্দে হয়।
আমি মরি সহচরি করিনে সে ভয়।

* * * *

এই খেদ্ তারে দেখে মর্‌তে পেলেম্ না।
আমায় চাক্ না চাক্, সখা সুখে থাক্,
কেন দেখা দিয়ে, একবার ফিরে গেল না।”

কিন্তু রাম বসুর অধিকাংশ বিরহ-সংগীত এ ধরণের নহে। প্রেমের নাম লইয়া, জগতে যে ভেজাল বস্তু, অর্থাৎ যে সাময়িক উত্তেজনা (Lust) প্রচলিত, তাঁহার অধিকাংশ কবিতা, তাহারই বিড়ম্বনা-জনিত আক্ষেপ, ব্যঙ্গোক্তি, বা বিরহ!

বিরহ প্রেমের মানদণ্ড। যে বিরহ প্রেম মন্দাকিনীর মধুর তরঙ্গ-লীলা; যে বিরহ প্রেমাপেক্ষা সুন্দর, প্রাণাকর্ষক, প্রেমবর্দ্ধক; রাম বসুতে তাহা নাই।

রাম বসুর বিরহের প্রাণ—অভিমান। প্রতারিতের আত্মাভিমান। বাস্তবিক, পার্থিব প্রেম যতটুকু জীবিত থাকে, মানাভিমানের খেলা লইয়াই। খুটিনাটি ভিন্ন ইহা থাকিতেই পারে না। শিশুর ন্যায় স্বতঃ চঞ্চল। বদ্ধ রাখিলে, বদ্ধ বায়ু—বদ্ধ জলের ন্যায় দূষিত হইয়া যায়।

প্রকৃত প্রেমেও অভিমান বা আত্মাভিমান আছে, সত্য। অভিমানে একটু বিশেষ সৌন্দর্য্য আছে। কেমন সাধ করিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়, আমি যতটা দিয়াছি, বুঝি ততটা পাই নাই। অর্থাৎ, তুমি যাহা দিয়াছ, তাহাতে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না। আবার, অভিমান করিয়া প্রেমিকের বুঝি একটু বিশেষ সুখ আছে। সে সুখটুকুর জন্য তোমার চির-

* সেকাল আর একাল।

হাসি-মাখা মুখ মলিন দেখিতেও প্রস্তুত। বা, সেই মলিন মুখখানিই যেন দেখিবার সাধ! তাই, সাধ করিয়া অভিমানে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, আরো কিছু আদায় করিতে হইবে! ইহা, মিলনে—বসন্ত সমীরণ-স্পর্শে, গ্রন্থির উপর একটী গ্রন্থি।

রাম বসুর অভিমান স্বতন্ত্র। তাহা স্থূল। শরতের মেঘ, বর্ষণের আশা দিয়া গর্জ্জনমাত্র করিয়া চলিয়া গেল। সবই ফক্কিকারী। হৃদয়ে একটুমাত্র রেখা দিয়া, সংসারে কলঙ্কের ছায়ায় আমায় চিরাবৃত করিল। শূন্য-হৃদয়কে দেহবিক্রেত্রী বলিল,—

"আগে দেখিয়ে বাড়াবাড়ি, করিলি ছাড়াছাড়ি, তুই,
আমার মাথায় তুলে দিলি কলঙ্কের ডালি।"

স্বগতঃ,—

"ক'রে না বুঝে লোভ, শেষে পেয়ে ক্ষোভ
বলি কারে, চোখে দেখে ঠেকেছি!"

ছদ্ম-প্রেমে প্রতারিত রমণীর (দুঃখ নহে) লাঞ্ছনা বা জ্বালা বর্ণনে রাম বসু সুনিপুণ। প্রতারিত সরলার দুঃখ, সে ত হৃদয়-ভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস। কাব্যের উপাদান, কবি-গাহনার নহে।

আবার পুনর্ম্মিলনে, তাঁহার বিরহিণীরা এমন একটু হৃদয়-ভেদী ব্যঙ্গ করে, যাহার প্রতি প্রয়োগ করা হয়, সেই লম্পটকেও যেন দায়ে পড়িয়া মুখ ঢাকিয়া পলাইতে হয়। প্রেমিক হইলে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। অশ্রু যেখানে কিছুই করিতে পারিল না, ব্যঙ্গ সেখানে শেষ উদ্যম। প্রাণ-ত্যাগ, উপন্যাস নাটক প্রভৃতির একচেটে; সংসারে বিরল।

"দৈবযোগে যদি, প্রাণনাথ, হোলো এ পথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোলো ও বিধুবদন॥
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লজ্জা কি?
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি, অনেকের দেখি।"

আবার,

"প্রাণ তুমি আর এ পথে এসো না।
শুধু দেখা দিবে, সখা, সেতো তা মনে বুঝবে না॥

এসো ব'সো বলা হোলো দায়, কি জানি কে গিয়ে, সখা, বলে দিবে তায়!
আমায় বরং সখা, দিও দেখা, যুগ যুগান্তে,
অনাদর নাহি কোরো সেই নূতন পিরীতে,
আমায় যেমন জ্বালিয়ে ছিলে, প্রাণ, তারে জ্বালা দিও না।"

স্বামীর চাটুবাক্য শুনিয়া বলেন,

"প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি!
মনে মনে মনাগুণে, আমি জ্বল্‌ব বই আর বলব কি।
প্রাণ গেলে, প্রাণ, নিজ দুঃখ তোমায় বলিনে,
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফল্‌বে কি!"

আবার,

"বঁধু, কার কখন্ মন রাখ্‌বে?
তোমার এক জ্বালা নয়, দুদিক রাখা, বল, প্রাণ, কিসে প্রাণ বাঁচ্‌বে?
কপট্ প্রেমে বল দেখি, প্রাণ, হাসাবে কায় কাঁদাবে?"

সখীর নিকট বলেন,

"হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ।
নামে ভার্য্যা, কাযে ত্যজ্যা, সই, লোকের যেমন নদীর চড়ার সনন্দ।"

রামবসু বহুবিবাহিতের প্রথমা পত্নীর, পম্পটের লরিণীতা রমণীর, কলঙ্কিনীর এবং প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার বসন্ত কালীন বিরহ বর্ণন করিয়াছেন। বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের কিছুই ব্যক্তব্য নাই। প্রতিভা আপনার পথ আপনিই খুঁজিয়া লয়। সে, আপনার গন্তব্য পথে যাইবেই; না যাইয়া থাকিতেই পারে না! পৃথিবী ধনমান-প্রলোভনে তাহাকে কি করিয়া বাঁধিবে? কোকিল গাহিবেই, তাহার হৃদয়ে সংগীত যে উছলিয়া পড়িতেছে! সে বিরহে গাহিবেই,

"প্রিয়জনে ত্যজে, প্রিয়জন আছে কেমনে!
কি ছিলাম, কি হলাম, আর বা কি হই!"

এই খানে আমরা, তাঁহার গুটীকত কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রত্যেক কবিতা হইতেই মাঝে মাঝে দুই এক স্থান পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। নহিলে টান থাকে না। "কোকিল" "মদন" আসিয়া পড়ে। কিন্তু,

এই গীতগুলি ইংরেজি বিরহ-কবিতা বা আধুনিক বাঙ্গালা কবিতার ন্যায় কতকটা চাঞ্চল্য, ছুটাছুটি, ব্যস্ত-সমস্তভাব, এবং শব্দাড়ম্বর-পূর্ণ নহে। ইহা বর্ষার গভীর রাত্রের ন্যায় নিস্তব্ধ, গম্ভীর, উদাসময়, আবেশপূর্ণ।

সরলা কিশোরী, না বুঝিয়া পুরুষের শঠতায় মজিয়াছে। বুঝিয়াছে। হৃদয়কে বাঁধিতে চেষ্টা করিতেছে।—মরুভূমে যেন সন্ধ্যা আসিয়াছে। নীল-কোমল হৃদয়াকাশে ঔদাস্য-রূপিনী শান্তি দেবী ধীরে ধীরে আসিতেছেন; কিন্তু, এখনও যেন তাঁহার চরণস্পর্শে উত্তপ্ত বালুকারাশি শীতল হয় নাই। বায়ুর তপ্তশ্বাস সময়ে সময়ে দূর হইতে শুনা যাইতেছে। হৃতসর্ব্বস্বা কাঁদিয়া বলিতেছে, কেন সে এ পথে গিয়াছিল!

"প্রেমে সুখী হব ব'লে সখি গো, সঁপিলাম পরে প্রাণ মন।
*　　*　　*　　কে জানে শেষে কাঁদাবে।" ইত্যাদি।

রমণী তাহার প্রেমকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছে। সুখসাধে তৃষ্ণা নাই। যেন, আপনার যোগে আপনি মগ্ন থাকিয়া সুস্থতা লাভ করিতে ইচ্ছা। প্রাণে যেন বৈরাগ্য-ধর্ম্মের বায়ু ঈষৎ লাগিয়াছে। ঘর্ম্মের পর প্রেম-জ্বর কমিয়া গিয়াছে। রমণী যাহাই বলুক, আমরা দেখিতেছি, জ্বরভোগের দুর্ব্বলতা এখনও ঘুচে নাই।

"বলিসনে, সখি, প্রেমে মজতে আর, ও সুখে নাহি প্রয়োজন।
শঠের প্রণয় হোতে বিচ্ছেদ ভাল, সই, জুড়াল প্রেমে কই জীবন?
প্রাণ বেঁচেছে গো সই, পিরীতি গেছে—পাপ গেছে,
হ'য়ে পরের পদানত, চক্ষের জলে নিত্য যেত,
যাহক মেনে এতদিনে, গায় বাতাস লেগেছে।
সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল ঘামদে জ্বর ছেড়েছে।" ইত্যাদি।

রমণী এখন প্রেম-সংসারত্যাগিনী যোগিনী হইয়াছে। হৃদয়ের কথা আর সখিকে বলিতে হয় না; স্বয়ং মুখের উপর নায়ককে বলিতে পারা যায়। যোগিনীর ন্যায় দূর হইতে আপনি পূর্ব্বে কি ছিল, কেমন ছিল, সম্পর্কশূন্যা হইয়া দেখিতেছে। সংসারত্যাগী যেমন দ্বাদশ বৎসরান্তে আপনার জন্মভূমি দেখিতে আসে, রমণী আজ যেন আপনার পূর্ব্ব-ক্রীড়াভূমি দেখিতে আসিয়াছে। প্রেম—বন্যার মত, ঝটিকার মত, পঙ্গপালের মত,

সুক্ষের মত—যে পথ দিয়া চলিয়া যায়, সে পথে জলমগ্ন দেশের মত, ভগ্ন গৃহের মত, দুর্ভিক্ষের মত, অত্যাচারের মত একটা না একটা চিহ্ন রাখিয়া যায়। প্রেম, হৃদয়ে যৌগিক মিশ্রণ নহে, রাসায়নিক মিশ্রণ। হৃদয় হইতে—প্রাণ হইতে প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিলেও হৃদয়ে,—প্রাণে কতকটা না কতকটা প্রেম মিশিয়া থাকিবেই। হৃদয়কে প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে প্রেমেও কতকটা হৃদয় প্রাণ থাকিয়া যাইবে! রমণী আজ আপনার আরোগ্যের গর্ব্ব করিতেছে, বটে; কিন্তু তাহার কথাতে স্মৃতির জ্বালা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

"পরের ভালবাসা প্রেমের আশা সকলি আকাশ!
কেবল হাসায় আর কাঁদায়, সদা প্রাণেতে জ্বালায়,
আজ্‌নে তোলে সিংহাসনে, কাল পথেতে বসায়।
পথে কেঁদে কেঁদে বেড়াই হয়ে আপনার ধনে আপনি চোর;
সে সব প্রবৃত্তি এখন নিবৃত্তি হয়েছে।
তোমার প্রেম হতে প্রাণ বিচ্ছেদ আমায় ভাল বেসেছে।" ইত্যাদি।

শুষ্ক পুষ্পে ও কতকটা মায়া থাকে। কবে এক দিন তাহার সুগন্ধ ছিল! জানি, তাহা আবর্জ্জনা, মারাত্মক। কিন্তু কে প্রাণ ধরিয়া প্রেমের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছে?

রামবসুর একটী প্রেম-বিজ্ঞান আছে,

"প্রেমবৃক্ষে দিয়ে আশা নীর, করিতেছ স্বজন;
দেখো লো—যেন হয় না শেষে বৃথা আকিঞ্চন।
বেড়া দাও সই প্রবৃত্তিকণ্টক, প্রেম-অঙ্কুরে আঘাত করে এমনি পোড়া লোক,
যদি থাকে ফলের বাসনা, বেশি জল দিয়ে জ্বালিও না,
সময়ে এক বিন্দু দিলে সুখসিন্ধু উথলে।
প্রেম তরুতে সখি চারটি ফল ফলে;
শুন ফলের নাম—সুখ, সৌখ্য, মোক্ষ, কাম,
সুজনের সু, কলঙ্ক কঠিনের কপালে।
গোড়া কেটে মরে কেউ আগায় জল ঢেলে;
চিনে মূল যে দিতে পারে জল, ঘটে তার ভাগ্যেতে প্রেমতরুতে হাতেহ ফল;

তরু মনের রাগে বুড়িয়ে যায়, বিচ্ছেদ ছাগে মুড়িয়ে খায়,
দেখ দেখ যত্নে রেখ ফল্‌বে না মূল শুখালে।"

একটী খেদ,—

"কথায় কথায় ক'রে অভিমান
তিলে ক'রে ব'স তাল,
ও ধনি, না জানি কেমন পুরুষের কপাল!"

আবার,

"নারী মিলতে যেমন, ভুলতে তেমন,
দু দিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে, চায় না ফিরে
আপনি হয় অন্তর।"

আমরা প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। আর, উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া, কোনও কবির প্রকৃত শক্তি কতটুকু বা কি, ঠিক বুঝা যায় না। রাম বসু নিজেই বলিয়াছেন,—

"যে ক'রেছে যার সহ পিরীতি ব্যাভার,
সেই সে বুঝেছে, সখি, মরম তাহার।

আমরা আশা করি, বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী সকলেই "প্রাচীন কবি-সংগ্রহ" এবং "গীত-সংগ্রহ" পড়িয়াছেন বা পড়িবেন।

অদৃষ্টবাদ।

ভারতবাসী চিরকাল অদৃষ্টবাদী বলিয়া বিখ্যাত। হিন্দুর পুনর্জ্জন্ম এবং পূর্ব্বজন্ম, বৌদ্ধের কর্ম্মফল—এ সমস্তই অদৃষ্টবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবনের দৈনন্দিন সাধারণ কার্য্যের মধ্যে এবং অসাধারণ বিশেষ সুখ দুঃখের সময়, আমরা যে অদৃষ্টবাদী তাহার শত শত প্রমাণ

পাওয়া যায়। অদৃষ্টবাদ আমাদের ধর্ম্ম এবং নীতির মূলে, অদৃষ্টবাদ আমাদের দৈনিক জীবনের মূলে। সম্পদের এবং সুখের সময় আমাদের গর্ব্ব এবং মাৎসর্য্য হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে—অদৃষ্টবাদ। সাংসারিক বিপদের তাড়নায়, জীবনের গভীর শোকান্ধকার আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা—অদৃষ্টবাদ। বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদ আমাদের হাড়ে হাড়ে মিশিয়া রহিয়াছে। এ বিশ্বাস আমাদের মর্জ্জাগত।

ইয়ুরোপে অদৃষ্টবাদ এবং স্বাধীনতাবাদ লইয়া বহুশতাব্দী হইতে তর্কবিতর্ক চলিতেছে; আজিও মীমাংসা হইয়া উঠিল না। তবে, কার্য্যতঃ স্বাধীনতাবাদের জয় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কতিপয় দার্শনিক পণ্ডিত ব্যতীত ইয়ুরোপের সাধারণ লোকমণ্ডলী স্বাধীনতাবাদী। অনেকের বিশ্বাস, ইয়ুরোপের যে আজ এত সুখসমৃদ্ধি ইহার কারণ এই স্বাধীনতাবাদ; আর আমরা যে পরপদানত, জীবনবিহীন এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত. তাহার একমাত্র কারণ আমাদের অদৃষ্টবাদ। অনেক ইয়ুরোপীয়ের নিকট আমরা এই জন্য কৃপার পাত্র।

আমি ভারতবাসী. আমি হিন্দু, আমি অদৃষ্টবাদী। সুতরাং এই সভ্যতার দিনে—এই আত্মনির্ভরতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দিনে, আমি আমার এই সেকেলে বিশ্বাসের কারণ দেখাতে বাধ্য। অমি আজ তাই অদৃষ্টবাদ-সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাত্মা জন্ ষ্টুয়ার্টমিল্ ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিচার করিতে গিয়া, তাঁহার নিজের মত কারণবাদের (Necessitarianism) সহিত অদৃষ্টবাদের পার্থক্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কারণবাদ ও অদৃষ্টবাদ্য এক নয়। অদৃষ্টবাদীকে তিনি দুই দলে বিভক্ত করিয়াছেন। এক দলকে তিনি Pure Fatalists বলিয়াছেন; ইহাঁদের মত যে, আমাদের কার্য্য সকল আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, কোনও উচ্চতর শক্তি আমাদের ইচ্ছাকে সর্ব্বদা উল্টাইয়া দিতেছে। দ্বিতীয় দলের মত, আমাদের কার্য্য সকল আমাদের চরিত্রের ফল, কিন্তু আমাদের কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী নহি। মিল্ তাঁহার নিজের মত সংক্ষেপে এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমাদের চরিত্র নৈতিক বাসনা সকলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, সুতরাং আমরা

ইচ্ছা করিলে, আমাদের চরিত্রের উন্নতিসাধন করিতে পারি। মিল্ মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, নিজের আত্মার দিক্ হইতে বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে তিন প্রকার মতের বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন, আমরা দর্শনের উচ্চতর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া, ব্যক্তি ছাড়িয়া জগতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, এই মতবিভাগ সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ইহাদিগের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই, এ তিন প্রকার মতের মধ্যেই সত্য আছে, এ তিন প্রকার মতই অদৃষ্টবাদের বিভিন্ন দিক্ মাত্র। দেখাইতে চেষ্টা করিব, আমরা যে দিক্ হইতেই দেখি, দেখিতে পাই যে, মানুষের নখাগ্র হইতে কেশান্ত পর্য্যন্ত নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ; দেখিতে পাই যে আমাদের হৃদয়ের অর্দ্ধস্ফুটিত ভাবকণা হইতে প্রলয়ের বিশ্ববিঘটন ঝঞ্ঝাবায়ু পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত শক্তিই অখণ্ড্য নিয়মের দ্বারা চালিত।

প্রশ্নটি যে অতিশয় গুরুতর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রশ্নটিকে নানা দিক হইতে দেখা যায়, এবং বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিলে আমরা বিভিন্নরূপ মীমাংসায় উপনীত হই। কেবল বৈজ্ঞানিক দিক হইতে দেখিলে আমরা যেরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হই, দর্শনের চক্ষে দেখিলে আবার আমাদের পূর্ব্ব মীমাংসার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। আমরা এই দুই প্রকার পথকে বিপরীত বা বিসম্বাদী মনে করি না। দর্শন আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে নষ্ট না করিয়া বরং তাহাকে পূর্ণতা দান করে। যেমন, সাধারণ সহজ জ্ঞান দ্বারা আমরা বস্তুতত্ত্ব যেরূপ বুঝি, বিজ্ঞান তাহাকে উল্টাইয়া না দিয়া তাহাকে সংশোধিত করে মাত্র, সেইরূপ দর্শন আবার আমাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে পরিশোধিত করিয়া তাহার সংস্করণ করে মাত্র। বিজ্ঞান এবং দর্শনের পরস্পরের কার্য্যক্ষেত্র এবং পরস্পরের সম্বন্ধ ভাল করিয়া না বুঝার কারণেই, এবং কেবল এক দিক্ দিয়া প্রশ্নটিকে দেখার জন্যই আজও পর্য্যন্ত আধুনিক ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এ প্রশ্নটি সম্বন্ধে এত তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এই একদেশদর্শিতার জন্য ইংলণ্ডের মনোবিজ্ঞানবিৎ এবং জড়বিজ্ঞানবিৎগণ অদৃষ্টবাদ এবং কারণবাদ স্থাপন করিতে গিয়া, আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। মিল্ (Mill), বেন (Bain), স্পেন্সর (Spencer) প্রভৃতি সকলেই এই জন্য

নিয়মের সম্মান রাখিতে গিয়া, কার্য্যকারণের অখণ্ড্য শৃঙ্খল দেখিয়া নিয়মের পশ্চাতে নিয়ন্তা দেখিতে পান নাই, কার্য্যকারণের পশ্চাতে জড়েরই খেলা দেখিয়াছেন। ইহাঁদের মতে আত্মা ভাবসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে; জগৎ মায়ার ক্রীড়াভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড়শক্তি এবং জড়ের নিয়মই জগৎকে চালাইতেছে। অপর দিকে আবার জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্ট (Kant) বৈজ্ঞানিক জগতের নিয়মের বাঁধাবাঁধি দেখিয়া, স্বাধীনতা এবং নীতির সমূল নষ্টের ভয়ে, একেবারে এ প্রকাণ্ড জগৎ ছাড়িয়া এক অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় রাজ্যে গিয়া আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন তাঁহার বিজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া তাঁহাকে এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া উপস্থিত করিয়াছে।

আমরা এই দুই বিপরীত মতের কোনটিকে সম্পূর্ণভাবে ঠিক মনে করি না। আমরা অদৃষ্টবাদী হইলেও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি, নিয়মবাদী হইলেও নিয়মের পশ্চাতে নিয়ন্তা দেখি, প্রকৃতির ক্রীড়াভূমিতে পুরুষের ক্রিয়া দেখিতে পাই। হিন্দু অদৃষ্টবাদী হইলেও বিশ্বাস করে যে, সে তাহার নিজের কর্ম্মের ফলে আজ ইহজন্মের সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে; সে অদৃষ্টবাদী হইলেও জানে যে, তাহার ভবিষ্যৎ তাহার হস্তে; সে মায়াবাদী হইলেও জানে যে, অসতের পশ্চাতে সৎ আছে, অপরা শক্তির মূলে পরা শক্তি বিদ্যমান। সুতরাং আমরা এই দুই বিপরীত মতের সন্ধিস্থল কোথায় তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সৎ অথবা পুরুষ * সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলিয়া, কোন প্রকাণ্ড জগতের অসৎ অথবা প্রকৃতির * কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিব। আগে বৈজ্ঞানিক ভাবে আমরা এ প্রশ্নটিকে দেখিব; তার পর, সেই বৈজ্ঞানিক মীমাংসাকে দার্শনিক যুক্তি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লইব। এক্ষণে দেখা যাউক, এই বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিলে আমাদের জীবনের অর্থ কি দাঁড়ায়।

* আমার বোধ হয়, ইংরাজি noumena অর্থে পুরুষ, এবং phenomena অর্থে প্রকৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্ততঃ আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

বহির্দৃষ্টিতে আমাদের জীবন কার্য্যসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইংরাজেরা যাহাকে actions বলেন, তাহা যেমন কার্য্য, তাঁহারা যাহাকে passions বলেন তাহাও যে সেইরূপ কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভেদ কেবল ক্ষেত্রে—বাহিরে আর অন্তরে। অন্তরে বাহিরে কার্য্যের পর কার্য্য করিতেছি এই তো জীবন। কিন্তু, কার্য্যের উৎপত্তি কিসে? আভ্যন্তরীণ এবং বাহিক এই দুই শক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতেই কার্য্যের উৎপত্তি। আমরা কখনও বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না। বাহ্য জগতের সহিত যতক্ষণ সম্বন্ধ ততক্ষণই তো জীবন। যদি কেহ বলেন যে, কবি যখন আপনার ভাবে আপনি মগ্ন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া স্বীয় স্বপ্নরাজ্য গড়িতে থাকেন, প্রেমিক যখন প্রিয়তমের চিন্তায় বাহ্য জগৎ ভুলিয়া যান, ভগবদ্ভক্ত যোগী যখন যোগরত হইয়া ভগবানের সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদের জীবন বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য। আমরা বলি, না, তখনও তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে বাহ্য জগতের সহিত সম্বদ্ধ। কবি তাঁহার স্বপ্নরাজ্য গড়িবার মালমসলা স্মৃতিসাহায্যে বাহ্য জগৎ হইতে গ্রহণ করেন, এবং পূর্ব্বে যদি তিনি কখনও বহির্জগতের দ্বারা আক্রান্ত না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার চিন্তা অসম্ভব হইত। প্রেমিক, অবশ্য কোন না কোন সময়ে, তাঁহার প্রিয়তমাকে দেখিয়া থাকিবেন, অথবা তাঁহাকে চক্ষু ব্যতীত অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত যোগীও বাহ্য জগতের উপর নির্ভর করেন তাঁহার প্রাণসখার চিন্তার জন্য। অনন্ত-তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডল দর্শন করিয়াই হউক, অথবা বিবেকের সুন্দর মোহনমূর্ত্তি দেখিয়াই হউক, ঈশ্বর-প্রেমিকের ঈশ্বরচিন্তার মূলে বাহ্য শক্তির গূঢ় সম্মিলন। শরীরযন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের আত্মা থাকিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন না তুলিলেও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ কার্য্যই দুই বিপরীত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে উৎপন্ন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা ইহারই প্রমাণ পাই। মানুষ জন্মিল এক শরীর লইয়া এবং এক বিশেষ মানসিক গঠন লইয়া; এই শারীরিক এবং

মানসিক শক্তির প্রকারভেদে বাহ্যজগতের সহিত বিভিন্ন বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। ইহা হইতেই তো কার্য্যের উৎপত্তি। এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শক্তি লইয়াই তো মানুষের জীবন। এখন, আমরা একবার, এই দুই বিভিন্ন শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব কিরূপ নিয়মের অধীনে তাহারা কার্য্য করে।

বাহ্য জগতের শক্তি সম্বন্ধে এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, সেখানে সমস্তই অখণ্ড্য নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ; কার্য্যকারণের সূত্রে সমস্ত ঘটনাই দৃঢ় সম্বদ্ধ। এমন এক সময় ছিল, যখন মানুষ বাহ্য জগতের বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যের পশ্চাতে বিভিন্ন শক্তির অবতারণা করিয়া তাহাদের পরিবর্ত্তনশীল এবং অনিয়মিত ইচ্ছা দ্বারা সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে এইরূপ মনে করিত। এখন আর সে বিশ্বাস সভ্য সমাজে নাই। এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি পদার্থ সকল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের উপর ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। জগতের সমস্ত ঘটনাই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে এ কথা সকলে স্বীকার করিলেও একদল লোকে মনে করেন যে অন্তর্জ্জগতে মানুষের ইচ্ছা শক্তি এই নিয়মের বহির্ভূত। ইহাদের মতে অন্তর্জ্জগতে এ নিয়মের আধিপত্য নাই। ভুল। যাহা দেখিয়া আমরা বহির্জ্জগতে কার্য্য কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হই, ঠিক্ তাহাই অন্তর্জ্জগতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও এ নিয়মের অব্যাপ্তি নাই। মানুষের ইচ্ছাশক্তি এ নিয়মের অনধীন নহে। আগামীবারে আমরা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ জিনিষটা কি তাহা দেখাইয়া ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

হিন্দু আচার-ব্যবহার।

(সামাজিক।)

বহুসংখ্যক মনুষ্য কতকগুলি সাধারণ নিয়মের শাসনে বদ্ধ থাকিলে সেই জনসমূহের সমষ্টিকে সমাজ এবং তন্নিয়ম পালনকে সামাজিকতা বলা

যায়। ঐ সব নিয়ম রাজ-ক্ষমতা-সম্ভূত নহে, কোনো ব্যবস্থাপক সভাকর্ত্তৃকও প্রায় বিধিবদ্ধ হয় না, সচরাচর উহা পরম্পরাগত প্রথাতেই জন্মে, অথবা ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশে বদ্ধমূল হয়। যে সকল মনুষ্য এইরূপে মিলিত, তাহাদের মূল ধর্ম্ম প্রায় একবিধই হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করিতে পারেন এক বংশোদ্ভব জনগণ লইয়াই একটী সমাজ হয়। কিন্তু সর্ব্বদা ও সর্ব্বদেশে তাহা নহে। তাহার সাক্ষী শিখ্ সমাজ। নানক ও নানকের শিষ্যগণ যখন শিখ্-সমাজ স্থাপন করেন, তখন একজাতি হইতে উপকরণ প্রাপ্ত হন নাই। বহুজাতির লোককে আপনাদের মতাক্রান্ত করিয়া সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন। ক্রাইষ্ট এবং মহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরাও যে বর্ণের, যে দেশের, যে বংশের লোককে লওয়াইতে পারিয়াছেন, তাহাকেই স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বলা যতদূর যুক্তি-মূলক, সমাজ বলা ততদূর ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনি প্রভৃতি বহুজনপদবাসী লোকদিগকে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক বলা যাইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে ভৌগোলিক ও রাজকীয় অবস্থা ভেদে প্রত্যেক স্থানের লোককে স্বতন্ত্র সমাজ বলা হয় এবং হয়তো তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে অধিক সমাজও অবস্থান করিতেছে। যেমন, ইংলণ্ড-মধ্যে ইংলিস-সমাজ ও য়ীহুদী-সমাজ। যেমন, আমেরিকাতে শ্বেত ও কৃষ্ণ, দুই পৃথক সমাজ। এ বিষয়ের জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত জন্য দূরে দৃষ্টি করিবার আবশ্যক নাই, কেন না আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ অনেক সমাজের মুখ দেখিয়াছেন। পূর্ব্বকালে অসভ্য আদিম অধিবাসীগণকে ধর্ত্তব্য না করিলে শুদ্ধ এক হিন্দু সমাজই বিশাল ভারতরাজ্যে বসতি করিত। জেতৃ যবনজাতির অধিকার ও অধিবাস অবধি হিন্দু যবন দুই সমাজ হইল। যবনজাতির অপ্রতিহত পরাক্রম বশতঃ তাহাদের স্বীয় সমাজ ও সামাজিকতা অটুটভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে এবং সেই অপ্রতিহত পরাক্রমের হিংস্র-স্বভাব জন্য তাহারা অধীন জাতির সমাজ, সামাজিকতা ও সামাজিকগণের সদ্গুণাবলী বিনষ্ট করিতে শত শত বৎসর বিজাতীয় আক্রোশের সহিত আক্রমণ করিয়াছে। সেই আক্রমণের ফল কি হইয়াছে? হিন্দু-সমাজ রাজকীয়-শক্তিতে বর্জ্জিত ও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবশেষে নির্ব্বীর্য্য

ও নিশ্চেষ্টবৎ সকল বিষয়েই অবনত ও বশীভূত হইল। তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগে সম্মত হইল না! মারিয়া ফেল, কাটিয়া ফেল, যন্ত্রণা দিয়া বধ কর, বাড়ী লও, ভূমি লও, ধন লও, ঐশ্বর্য্য লও, কিন্তু জাতি ও ধর্ম্ম লইতে পারিবে না—এ দুটী কদাচ দিব না—যখন অসির আঘাতে, অগ্নিতে, ফাঁসিতে, তোপের মুখে প্রাণ যাইবে, এ দুটী সেই সঙ্গেই যাইবে—সহস্র নির্য্যাতনেও যবনরাজ তাহা স্পর্শ করিতে পারিবেন না! এইজন্যই চিতোরের তেজীয়ান্ হিন্দুরা যখন দেখিল, যবন-দুর্গমে দুর্গ-রক্ষা আর সম্ভবে না, তখন ভয়ঙ্কর অনলস্তূপ করিয়া সপরিবারে নগরসুদ্ধ তাহাতে ঝম্পদানপূর্ব্বক যবনের অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারে অব্যাহতি পাইল! এমন ঘটনা একবার নয়, ভারতবর্ষে হিন্দুবংশে অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে!

এইরূপ অনুপম মানসিক সাহসের সহিত হিন্দুরা জাতি ও ধর্ম্ম-রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ ও সামাজিকতা ধর্ম্ম-মূলক। সুতরাং জাতি ও ধর্ম্ম-রক্ষা যাহাকে বলে, সমাজ ও সামাজিকতা রক্ষাও তাহাকে বলা যায়। যবনের অন্ন খাইলে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট হয় ও জাতি যায়, সুতরাং সমাজ ও সামাজিকতা হারায়! অপরাপর জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-নিয়ম, রাজকীয় নিয়ম ও সামাজিক নিয়ম পৃথক। এক স্মৃতিশাস্ত্র মধ্যেই হিন্দুদের রাজা, প্রজা, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, দাতা গৃহীতা সকলের ব্যবস্থা এবং পারমার্থিক, সামাজিক ও রাজকীয় সকল নিয়মই আছে। যবনাধিকারে রাজ্যশাসন কর্ত্তব্যটী হিন্দুর হস্ত হইতে অন্যের হস্তে গেল, কিন্তু সামাজিকতা ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে অপরজাতি, অর্থাৎ রাজ-জাতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিল না! হস্তক্ষেপ দূরে থাকুক, অদ্বিতীয় প্রতাপশালী দিল্লীর কোন সম্রাট কোন হিন্দু প্রজাকে তাঁহার অতুলৈশ্বর্য্যময়ী, রাজ্য, ধন, মান পদ-দাত্রী রাজপুরীতে এক দিনের জন্যও নিমন্ত্রণ করিয়া কিছু খাওয়াইবেন তাহার যো ছিল না! তাহা দূরে থাকুক, কোন যবন কোন হিন্দুকে স্পর্শ করিলে, সে স্নান করিয়া শুচি না হইয়া গৃহে যাইতে পারিত না!

কিন্তু কালের পরাক্রম ও অভ্যাসের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ। আজ যাহাকে পাপাত্মা অসাধু বলিয়া তাহার সঙ্গ-দোষের আশঙ্কায় তুমি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলে, যদি প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে হয়, তবে তত ভয়

তোমার থাকিবে না; যদি কার্যবিপাকে সর্ব্বক্ষণ তাহার সহিত একাসনে বসিতে, আলাপ করিতে, কি ব্যবহার করিতে বাধিত হও, তবে সে ক্রমে তোমার নিকট অসাধুর পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক সাধু হইয়া উঠিবে; ব্যাপক কালে তাহার সহিত এত বন্ধুতা হইতে পারে, যে, তুমি সহস্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধুচরিত্র হইলেও ক্রমে তাহার দোষগুলি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে আশ্রয় করিবে। একজন ব্যক্তির পক্ষে ইহা যেরূপ সম্ভব, এক জাতির পক্ষেও তাহার ন্যূন নহে। হিন্দুজাতি মুসলমানদের সহিত বহুকাল সহবাস করিতে করিতে তাহাদের প্রতি পূর্ব্বে যে ঘোরতর ঘৃণা করিত, তাহার বহুলাংশে পরিত্যাগ করিল। কিরূপে রাজা ও রাজপুরুষগণের অনুগ্রহ-ভাজন হইব, অনেকেই এই পন্থা দেখিতে লাগিল। সেই পন্থা স্বরূপ যাবনিক ভাষা হিন্দুরা পড়িতে আরম্ভ করিল; মুসলমান আমীর ওমরাহ রাজ-প্রতিনিধিদের দেখা দেখি বহু স্থানের বহু হিন্দু আপনাদের পৈতৃক বেশভূষা ও শিষ্টাচারের প্রণালী প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া যবনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল।

অনেকে বলিয়া থাকেন, বেশভূষা ও সম্বোধন অভ্যর্থনাদির রীতিতে কি আইসে যায়? সে সমস্ত কেবল সভ্যতার বাহ্যচিহ্ন বৈতো নয়। কিন্তু, আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তন ভিন্ন কি বাহ্য পরিবর্ত্তন হইতে পারে? যদিও তখনকার কোনো হিন্দুর মনে স্বীয় ধর্ম্মের প্রতি অণুমাত্র অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় নাই, কিন্তু সঙ্গদোষে অথবা সঙ্গ-গুণেই বল, সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে অজ্ঞানিতরূপে ক্রমে অনেক রূপান্তর ঘটিয়া উঠিল। অনেক হিন্দুরাজা, হিন্দু ভূস্বামী ও হিন্দুধনেশ্বরেরা আচার ব্যবহারেও সামাজিক পাপে নবাবী ধরণ ধরিলেন—অনেক অনেক মধ্যবিধ লোককেও সেই সংক্রামক রোগে ধরিল! দীন দরিদ্র ইতর লোকদিগের কথা উল্লেখযোগ্যই নহে; সমাজের উর্দ্ধস্তরে যে দোষ গুণ বর্ত্তায়, নিম্নস্তরে তাহার অগ্রবিস্তর অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামাজিক রীতি নীতির ভাবান্তর তো সহজ কথা, আশ্চর্য্য এই ধর্ম্মবিষয়েও হিন্দুরা কিঞ্চিৎ পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে হিন্দুর বাটীতে কথায় কথায় সত্যপীর, একদিল, গোরাচাঁদ, সাজন সাহেব, মুস্কিল আসানের সিন্নি ও করতা দেওয়া হইবে কেন? যবনেরা

বলপূর্ব্বক আপনাদের পীর পেকম্বরকে মানাইয়াছে, তাহা নহে। সামান্য হিন্দুরা পীর ও ফকিরের বুজরুগিতে মুগ্ধ হইয়া এবং স্ত্রীলোকেরা "ছেলে পুলে নে ঘর ক'ত্তে হয়, কোন্ দেবতা কোন্ ছলে কবে কার ঘাড় ভাংবেন" এই ভয়ে তটস্থ হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির দেবতাকেই মান্য করিতে ও পূজা দিতে লাগিল। হিন্দু পণ্ডিতেরা দেখিলেন, এ বিষয়ে সমাজের সাধারণ লোকের এবং আপনাদের ঘরে ব্রাহ্মণীদের এত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য আসিলেও তাহা আর খণ্ডিত হইবার নহে। কাজে কাজেই তাঁহারা স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা এমন পাত্র নহেন, যে, আপনাদের লভ্যাংশপাতে উপেক্ষা করিয়া কোনো নূতন পদ্ধতিকে প্রবিষ্ট হইতে দিবেন? তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সত্যপীরের সিন্নিকে শাস্ত্রমূলক দেব-পূজা করিয়া তুলিলেন! সংস্কৃত শ্লোকময়ী একখানি পুস্তিকা প্রস্তুত ও তাহাতে এই উপন্যাস রচিত হইল, যে, বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ দেখিলেন, কলিযুগে কেহই কঠোর তপ করিতে সমর্থ নহে, অথচ জীবের পরিত্রাণ ও আশু কামনা সিদ্ধির কোনো উপায় চাই; আর্য্যাবর্ত্ত এখন যবনের অধীন, যবনের মনস্তুষ্টির সহিত হিন্দুরা ভক্তি-মার্গে চলিতে পারে এমন উপায় করা আবশ্যক; এইজন্য তিনি ফকিররূপে দীনদ্বিজ বিষ্ণুযশাকে দর্শন দান পূর্ব্বক উপদেশ দিলেন, "আমি নারায়ণ পীররূপে কলিতে আবির্ভূত হইলাম; পঞ্চমোকামে কাঁচা পাকা সিন্নিতে আমার পূজা কর।" তদবধি সত্যপীর, সত্যনারায়ণ নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ভারতবর্ষের কোন কোন ভাগের হিন্দুরা পূর্ব্ব নিয়মের বহির্ভূত আচার ব্যবহারও অবলম্বন করিল। এমন কি, নিষিদ্ধ আহার্য্য ও পানীয় উপভোগেও সঙ্কুচিত হইল না। যে সকল স্থানে মুসলমানেরা অত্যন্ত নির্দ্দয়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় অধিকাংশ প্রধান লোককে বধ করিয়াছিল, পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লব দ্বারা যথাকার সমাজ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের বাস যেখানে বহুগুণে বেশী, যেখানকার প্রধানবর্গের সহিত যবননৃপতিগণের সমধিক আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, সেই সেই স্থলেই এবম্প্রকার দশা ঘটিয়া উঠিয়াছে। অদ্যাপি তত্তৎ স্থানের হিন্দু অধিবাসীদিগকে অর্দ্ধেক হিন্দু অর্দ্ধেক মুসলমান বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ ঘটনার বৈচিত্র্য, উপদ্রবের বৈচিত্র্য, ক্রমাগত দুর্দ্দান্ত একাধিপত্যের অধীনতা ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব অবস্থা, পূর্ব্বকার ঐক্যভাব সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। হিন্দুসমাজ উপর্য্যুপরি বহুশত বর্ষ ধরিয়া যে সকল বাহ্য আক্রমণ সহ্য করিয়াছে, ইহাতে যে এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাই অত্যাশ্চার্য্য। অন্য সমাজ হইলে কখনই জেতৃজাতির সমাজে লীন না হইয়া থাকিতে পারিত না। আর্য্যাবর্ত্তের অসীম বুদ্ধিশালী ঋষি প্রণীত সমাজ বলিয়াই আজো আমরা তাহার মুখাবলোকন করিতে পারিতেছি! এমন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতি, তাহাদের সমাজও বাহ্য আক্রমণে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজদিগের পূর্ব্ব পুরুষ স্যাক্সন সমাজকেও তাহাদের জেতৃজাতি গ্রাস করিয়াছিল। ভূমণ্ডলে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোনো জাতি এ বিষয়ে অধিক স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। কেবল দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের অবয়ব আছে বটে, কিন্তু ঘোরতর বৈরপাড়নে চূর্ণাস্থি ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া রহিয়াছে! রাজনৈতিক বিষয়ে যে হিন্দুজাতি সভ্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল, সে বিষয়ে সে হিন্দুজাতির জাতি পদতো অনেক দিন রহিত হইয়া গিয়াছে; অধিকন্তু ইহার সামাজিকতাও মিশ্রভাবাপন্ন ও ক্রমে নানা বিপজ্জালে জড়ীভূত হইয়া উঠিয়াছে!

সেই অবস্থাকে আমরা বিপদের অবস্থা বলি, যে অবস্থাতে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান দোষ সমাজ মধ্যে সঞ্চারিত হয়:—

প্রথম। (সমাজমধ্যে হঠাৎ কোন নূতন আচারব্যবহারের প্রবল স্রোতে তাহার পূর্ব্বতন আচারব্যবহার গুলি একে একে ধুইয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, লোকে বিভ্রান্তের ন্যায় যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে আরম্ভ করে— ইহা বড় কঠিন অবস্থা—ইহার অপর নাম স্বেচ্ছাচার। এই স্বেচ্ছাচার যে সমাজে প্রবল হয়, সে সমাজের শুভ-বন্ধন শিথিল হইয়া মহানিষ্টের উৎপত্তি হইতে থাকে।) হিন্দু সমাজে মুসলমানদের সময়েই স্বেচ্ছাচার প্রথম পদার্পণ করে, কিন্তু বিশেষ রূপে অথবা ভয়ানক আকারে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কোনো কোনো স্থলে তাহার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষিত হইত এই পর্য্যন্ত। তাহাও অন্যত্র বেশী নয়, কেবল কোনো

কোনো স্থানের বড় লোকের ঘরেই যাহা কিছু আদর পাইয়াছিল। বিশিষ্ট হেতুতে সেই সব বড় ঘরের নাম করা বিহিত নয়, কিন্তু উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রসিদ্ধ সংসারেই তাহার প্রচলন সংবাদ শুনা যায়। বঙ্গদেশে তৎকালে স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্য হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় সামাজিকগণ তাহাকে দূরে রাখিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এখন কিন্তু সেই দুরাত্মা তাহার প্রতিশোধ লইতেছে!

দ্বিতীয় দোষ স্বার্থ। স্বাধীন অবস্থায় স্বদেশানুরাগ ধর্ম্মটী লোকের পরমারাধ্য থাকে। আপনার পরিবার প্রতিপালন ও ধনবৃত্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা এক দিকে, রাজ্যের শুভাশুভ, প্রতিবাসীর মঙ্গলামঙ্গল ও সমাজের উন্নতি অবনতির তত্ত্বাবধান অন্য দিকে। অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্য, প্রতিভা ও জ্ঞানবান ব্যক্তিগণের এইরূপ যত্ন ব্যতীত দেশের কোনো প্রকার উত্তমতা থাকিতে পারে না। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বহুকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়া অনেক জাতি সে সদ্‌গুণে বঞ্চিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হিন্দু সমাজ সেই সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়াছে! যে জাতি এত নিঃস্বার্থ ও সমাজ-হিত-পরায়ণ ছিল যে, তাহার শাস্ত্রকারেরা নিঃস্বার্থপরতার এমনই বিধান করিয়া গিয়াছিলেন যে,

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥

যে জাতির ভোগত্যাগী ঋষিরা জনশূন্য তপোবনে বাস করিয়াও সমুদয় সংসারসুখে নিজে জলাঞ্জলি দিয়াও সমাজের হিতের জন্যই কেবল রাজসভা ও সামাজিকগণের ভবনে আগমন পূর্ব্বক রাজা প্রজা সকলের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গল কিসে সাধিত হইতে পারে, ইহার উপদেশ দিতেন, ধ্যান-ধারণা যোগতত্ত্বের মধ্যে তাহাও অনবরত চিন্তা করিতেন, এবং সমস্ত হিন্দু সমাজকে পরম নিঃস্বার্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন; স্বার্থের দিকে হিন্দুজাতির এতই অল্প দৃষ্টি ছিল যে, জিঘাংসা বৃত্তির সাক্ষাৎ শিষ্যরূপী, শস্ত্রমাত্রব্যবসায়ী হিন্দু ক্ষত্রিয় যোদ্ধারাও যুদ্ধকালে শত্রুকে কর-কবলে পাইলেও অন্যায় যুদ্ধে তাহাকে বধ বা পরাস্ত করিত না; বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই হিন্দুজাতি আজ স্বার্থের ক্রীতদাস—স্বার্থের নরক-কীট! রাজ্যের চিন্তা করিতে হয় না

বলিয়া কেহ আর আপনার ধনমানের বিষয় ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তাই করে না—কেহ কাহারো জন্য ভাবে না—সমাজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য কোনো চিন্তাই করে না, তজ্জন্য স্বার্থ ত্যাগ তো বাহুল্য কথা! যবন-নিষ্পীড়নে আমাদের যত হীনতা হইয়াছে, ইহার ন্যায় কোনোটীই বিশেষ মন্দকারী নয়! যে দিন এ ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া পুনর্ব্বার নিঃস্বার্থ সামাজিকতার সঞ্চার হইবে, সেই দিন জানিব, ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য আবার নব-অরুণ-বেশে তরুণ কিরণ দিতে আসিয়াছেন।

তৃতীয় দোষ, স্বজাতীয় ভাষার প্রতি বিরাগ ও পরকীয় ভাষাতে অযথা অনুরাগ। কবে যে সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রচলন রহিত হইয়া ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি ও ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু যে দিন তাহা হইয়াছে, সেই দিনাবধি ভারতের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত, সন্দেহ নাই। এক সংস্কৃত ভাষা সমুদয় বিভাগের মাতৃভাষা থাকাতে নিখিল ভারতবাসী সকলেই যেন এক মাতৃগর্ভজ ভ্রাতা ছিল। সংস্কৃতজাত বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন রাজ্যের মাতৃভাষা হওয়াতে সম্পর্ক একটু দূরবর্ত্তী হইল—এক মায়ের সন্তান না হইয়া পরস্পরে যেন এক মাতামহীর দৌহিত্র হইয়া উঠিল! সুতরাং সহোদর ভাই আর মাসতুতো ভাইতে যে প্রভেদ, তাহাই ঘটিল! তাহাতেও বড় একটা হানি ছিল না, প্রত্যেকের সেই মাতৃভাষা যদি সাধারণ জননী সংস্কৃত ভাষার অতুলৈশ্বর্য্যের অংশ পাইয়া স্বাধীনভাবে বর্দ্ধিত হইতে পারিত, তবে কয় ভগ্নী মিলিয়া জুলিয়া একটী সুখের সংসার চালাইতে এবং তত্তৎ-সন্তানগণের সমষ্টিতে এক বিপুল বিক্রমশালী মহাসমাজ নাম পাইতে সমর্থ হইত। কিন্তু ভাগ্য আর এক প্রকার ব্যবস্থা করিল! পরাধীনতা রাক্ষসীর তাড়নায় ভগ্নী কয়টীর অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়া শুকাইয়া গেল! তৎপরিবর্ত্তে বিজাতীয় লোকের রাজ্যাধিকারের সহিত পারসীক ভাষা তাহাদের সাম্রাজ্যের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিল। সংস্কৃত অধ্যাপকের আদর অপ্রকাশ্য, এবং পারসী ও আরবী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তির সম্মান প্রকাশ্য হইয়া উঠিল! তথাপি আর্য্য-হিন্দুজাতির ধর্ম্ম-বুভুক্ষা ও জ্ঞানানুরাগকে ধন্য বৈ, যে বিদ্যায় অর্থ, যশঃ, মান, রাজপদ ও বৈষয়িক উন্নতি অতি অল্প, সেই

সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাও তাঁহারা এককালে পরিত্যাগ করেন নাই! ব্রাহ্মণেরা বহু কষ্ট পাইয়াও অপ্রতিহত শাস্ত্রানুরাগে উত্তেজিত ছিলেন বলিয়াই আজও আমরা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, সাহিত্য, পুরাণ, জ্যোতিষ, কাব্য, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতির মুখ দেখিতে পাইতেছি। হিন্দুর দেব-দ্বিজ-শাস্ত্র-দ্বেষী এবং দেবালয়-ধ্বংসকারী কাল যবনেরা তত্তাবৎ নির্ম্মূল করিবার জন্য নৃশংস যত্নের কি কিছুমাত্র ত্রুটী করিয়াছিল? সেই উৎপীড়নে কত অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন যে এককালে মর্ত্ত্যলোক হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে মহা শোকে মগ্ন হইতে হয়। সেই সঙ্গে যে আমাদের ব্যাস, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাসকে হারাই নাই, ইহাই যারপর নাই সৌভাগ্য! কিন্তু রাজা বৈদেশিক, রাজ-সরকারে সংস্কৃতের আদর নাই—তাহার আলোচনায় আর পেট ভরে না; দেখিয়া শুনিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অর্থকরী রাজ ভাষার আরাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। ভারতের জ্ঞান ও ধর্ম্ম লোপ পাইতে আরম্ভ হইল, সে দিন হইতে ভারতের ঘোর দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমনোমোহন বসু।

হেমচন্দ্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ, নক্ষত্র, নীলিমা সকল স্তরে স্তরে অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িয়াছে। গৃহে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়াছে, গৃহে গৃহে সান্ধ্যকৃত্য আরব্ধ হইয়াছে। সেই সন্ধ্যার আঁধার ছায়ায় হেমচন্দ্রের মাতার মৃত্যুবিবর্ণীকৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। যাহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, একে একে চলিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণও কার্য্যান্তরে গিয়াছেন, হেমচন্দ্র একাকী সেই মৃতার পার্শ্বে বসিয়া চক্ষের জলে

ভাসিতেছেন। অদূরে ছিন্ন নলিনীর ন্যায় ধুলায় পড়িয়া বালিকা মনোরমা হাহাকার করিতেছে। বিরাজ কাঁদিতেছে, কখনও বালিকাকে শান্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছে, আবার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। রামকৃষ্ণ ফিরিয়া আসিলেন। হেম বলিল—"কি করিয়া আসিলে ?"

রামকৃষ্ণ মুখ বক্র করিল; বলিল—"কেহই গৃহের বাহির হইতে চাহে না।"

হেমচন্দ্র কাঁদিয়া উঠিল, বলিল—"উপায় !"

রামকৃষ্ণ নিরুত্তরে রহিলেন। হেম বলিল—"আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি; তুমি বস, আমি যাই।"

রামকৃষ্ণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন; হেম লোক ডাকিতে চলিলেন।

দ্বারে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন, কেহই দ্বার খুলিয়া দিল না, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না। হেম কাঁদিতে কাঁদিতে আরও অগ্রসর হইলেন; নিকটে একটি গৃহে তাঁহার এক বন্ধুর স্বর শুনিতে পাইলেন, আশ্বাসে বুকখানা শতহস্ত ফুলিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি দ্বারে গিয়া বন্ধুর নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কেহই সে ডাকের উত্তর দিল না। হেমচন্দ্র আর সে স্বর শুনিতে পাইল না, দ্বারে দুই একবার আঘাত করিল, এক বৃদ্ধা প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল, হেমকে দেখিয়া বলিল—"কে হেম; ব'সো বাবা, ব'সো।"

হেম বলিল—"বসিব না, আপনার পুত্র কোথায় ?"

বৃদ্ধা বলিল—"আহা, বাবা, সে কি বাড়ী আছে! সেই যে কাল কোথায় গিয়াছে আজও আসে নাই, আর ভাবিতেও পারি না, আমি অভাগী মরিব না। ভাগ্যধরী যে, সে এই সোণার চাঁদ ছেলে রেখে চলে গেল।"

বৃদ্ধা এইখানে হেমের মাতার মৃত্যু যে কত শ্লাঘার বিষয় তাহা বলিতে আরম্ভ করিল. এবং নিজে সেরূপ. মৃত্যু হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল; সেই দীপালোকে তাহার নয়নকোণে দুই বিন্দু অশ্রুও দেখা গিয়াছিল। অন্য সময় হইলে এ সকল কথা হেমের কেমন

লাগিত জানি না, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বড় ভাল লাগিল না। হেম বলিল—"আপনার পুত্র কি গৃহে নাই?"

বৃদ্ধা বলিল—"না বাবা, তা হ'লে তোমাকে—"তাহার কথায় বাধা দিয়া হেম বলিল—"আমি আসিবার সময় গৃহে যেন তাঁহার আওয়াজ শুনিয়াছি।"

বৃদ্ধা থতমত খাইল; বলিল—"সে বুঝি বৌমার ভাই।"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সে দারুণ দুঃখেও হেমের হাসি আসিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘৃণায় হেম সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

কতদূর গিয়া হেম তাঁহার বাল্যসখা মতিলালের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহে যাইবেন কি না অনেক ভাবিলেন, অনেক ইতস্ততঃ করিলেন। ঘৃণা, দুঃখ বা অনিচ্ছা থাকিলেও তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। হেম বন্ধুগৃহে গমন করিলেন। মতিলাল সাদরে হেমকে আলিঙ্গন করিলেন, হেমের দুঃখে তাঁহার যে যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইয়াছে তাহাও বিশেষ করিয়া জানাইলেন। হেমের ভগ্ন হৃদয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। এতক্ষণ কেহই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই; মতিলাল এখন হাত ধরিয়া কাঁদিতেছেন, হেম অনেক আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু আর অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অনুচিত; ক্রমেই রাত্রি বাড়িতেছে, কালবিলম্ব অসহ্য। হেম কাঁদিয়া বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মতিলাল এইখানে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিল, বন্ধুর এমন বিপদে সে যে কোনও উপকার করিতে পারিল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। মতিলালের স্ত্রী আজ আট মাস অন্তঃসত্ত্বা! হেমের মাথা ঘুরিতে লাগিল; তাহার আশা ফুরাইল, মতিলালের নিকট হইতে এ উত্তর পাইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। হেমের আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না, অবাঙ্মুখে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

হেম আর কোথাও না গিয়া বরাবর গৃহে আসিলেন। সম্মুখে সেই শোকের দৃশ্য—মাতার মৃতদেহ ভূপতিত রহিয়াছে। এখনও সৎকার হইল না, উপযুক্ত সন্তান জীবিত থাকিতে তাঁহার অস্থি গঙ্গায় পড়িল না। মহাদুঃখে হেম 'মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। ভ্রাতার রোদন শুনিয়া বালিকা আরও হাহাকার করিয়া উঠিল। বিরাজ তাহা-

দিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিরাজ হেমকে বলিল—"কাঁদিও না, কাঁদিয়া কি হইবে? চুপ কর, আমি লোক আনিতেছি।"

হেম বিরাজের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল; বলিল—"আমি বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এ রাত্রে কোথায় যাইবে?"

বিরাজ বলিল—"ভাবিও না, এখনই আসিতেছি।"

তৎক্ষণাৎ বিরাজ সেই ভট্টাচার্য্যের গৃহে গেল, তাঁহার পায় জড়াইয়া কাঁদিয়া সমস্ত জানাইল। ভট্টাচার্য্যের অন্য কোনও গুণ থাক বা না থাক, শরীরে বিলক্ষণ দয়া ছিল। তাঁহার দয়া হইল। গৃহে অনেক গুলি ছাত্র প্রত্যহ পাঠ অভ্যাস করিত। ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমি ইহাদিগকেই বলিতেছি, কিছু টাকার যোগাড় আছে তো? উহারা কিছু কিছু না পাইলে যে যায় এমন তো বোধ হয় না।"

ভট্টাচার্য্য যে এ কথা বলিবেন বিরাজ তাহা জানিত, সেই জন্য তাহার কিছু যোগাড়ও করিয়া আসিয়াছিল। অঞ্চল হইতে খুলিয়া এক গাছি বালা বৃদ্ধের পায়ে রাখিল। ব্রাহ্মণ অন্তরে বড় হৃষ্ট হইলেন; তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগকে আদেশ করিলেন। কিন্তু বালার ভাগ তাহাদিগকে কখনও দিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। রূপচাঁদ স্বর্ণকার বলে যে, তাহার দুই দিন পরে একগাছি বালা ভাঙ্গিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্রাহ্মণীর তাগা গড়িয়া দিয়াছে। সে যাহাই হউক, দুই দিন যে আর পাঠ বলিতে হইবে না, নিশ্চিন্তে কলার করিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে পারিবে ইহাই ছাত্রদিগের পরম লাভ। আজ্ঞামাত্র সকলে মহা আহ্লাদে পুথি গুটাইয়া বিরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলে মিলিয়া শব স্কন্ধে লইয়া 'হরিবোল' দিয়া গঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিল। অশ্রুপূর্ণ-লোচনে হেম যাইতে যাইতে ভাবিল, বিরাজ কি মানবী!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইয়াছে। কা'ল যেমন সূর্য্য উঠিয়াছিল আজও তেমনি সূর্য্য উঠিয়াছে, পূর্ব্বদিনের ন্যায় আজও তেমনি বায়ু বহিতেছে, গাছ

নড়িতেছে, পাখী গায়িতেছে, জল চলিতেছে, সংসারের নরনারীগণ আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। যেন কোথাও কিছুই হয় নাই, যেন কোথাও কোনও নূতন ঘটনা ঘটে নাই, প্রভাত কা'লও যেমন আসিয়াছিল, আজও তেমনি আসিয়াছে। কিন্তু মনোরমার নিকট আজ আর সে পুরাতন প্রভাত নাই, এ জীবনে সে কখন এমন সময় আর দেখে নাই; রাত্রি গিয়া যে কখন ভোর হইয়াছে তাহা পর্য্যন্ত বালিকার জ্ঞান নাই— ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন। তাহার চক্ষে সকলই যেন আঁধাররাশি—সূর্য্য যেন আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে, বিশ্ব ছায়ার আকারে পড়িয়া রহিয়াছে; আজ আর যেন বায়ু বহে না, পাখী গায় না, জল চলে না,—প্রকৃতি স্তম্ভিত; আর সেই স্তম্ভিত প্রকৃতি মধ্যে সেই শূন্য গৃহের শয্যা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে;—"মা মা, কোথায় তুমি" বালিকা উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার ছাড়িতে লাগিল। পূর্ব্বদিন কঠোর একাদশী গিয়াছে, এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত পেটে পড়ে নাই— সে বিষয়ে লক্ষ্য মাত্র নাই; বিরাজ অবিরল চক্ষের জলে ভাসিতেছে ও মনোরমাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা দেখিতেছে। রোদন শব্দ শুনিয়া প্রাতে পাড়ার ইনি উনি তিনি করিয়া অনেকে আসিয়া সেখানে জড় হইয়াছেন—যাহার যেমন ক্ষমতা সকলে আপন আপন সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন, কেহ স্বর্গীয়া বৃদ্ধার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, কেহ তাহা শুনিতে শুনিতে আপনার ছল ছল চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিতেছে; কেহ, তিনি যে হেমকে রাখিয়া হেমের মা হইয়া গিয়াছেন, এজন্য বড় সৌভাগ্যবতী বলিয়া প্রশংসাবাদ করিতেছে, কেহ বা তাহা শুনিয়া তাঁহার নিজের দীর্ঘজীবনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। মনোরমার এ সকল কিছুতেই মন ছিল না, ধূলায় পড়িয়া কেবল 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। সেই চীৎকার শব্দে—সেই রোদনধ্বনির মধ্যে একজন নবীনা তাহার গঙ্গাজলের গা টিপিয়া বলিল—"আঃ ছুঁড়ি যেন চিল চেঁচাইতেছে, মা যেন কারও আর মরে না।" গঙ্গাজলও সেইরূপ জনান্তিকে বলিলেন—"সত্য বলেছিস্, মাথা ধরিয়ে দিলে; চল্ ভাই, বাড়ী যাই।" কোনও প্রবীণা আসিবারকালে গুলের কৌটা আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং মনোরমার দুঃখে সহানুভূতি করা আর তাঁর সাজিল না, 'প্রত্যাগমনের উদ্যোগ দেখিতে

লাগিলেন। নবীর মা কোলের ছেলে ফেলিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মনটাও বড় উচাটন হইয়া উঠিল। মনোরমার একটা পোষা বিড়াল ছিল, সে মনোরমাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কাছে চুপ করিয়া বসিয়াছিল; নিস্তারিণীর খোকা সেই বিড়াল লইবার জন্য বড়ই আবদার ধরিল, কাজেই নিস্তারিণী কান্না ফেলিয়া ছেলে শান্ত করিতে মন দিল। বগলা চারুর মার কাছে অনেক দিন হইতে দুই আনা পাইত, হঠাৎ সে কথা মনে হওয়ায় বাম হস্তে চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে দক্ষিণ হস্তে চারুর মার গা ঠেলিয়া হাত পাতিয়া পয়সা কয়টি চাহিল। বলা বাহুল্য, চারুর মা সে কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রোদন আরম্ভ করিল। ক্রমে বেলা হইয়া পড়িল। মনোরমার রোদন থামিল না, পাড়ার সকলে এক এক করিয়া সরিতে লাগিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে, বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দিদি, উঠ, মুখে একটু জল দাও।"

মনোরমা কথা কহিল না; পূর্ব্ববৎ উচ্চে রোদন করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার কি মনে পড়িল, ধীরে ধীরে চক্ষু মুছিয়া বাষ্পবিকৃত কণ্ঠে বলিল—"দিদি, তুমি যে মারা পড়িলে, কাল একাদশী গিয়াছে, যাও, একটু কিছু খাওগে।"

বিরাজ কথা কহিতে পারিল না। নীরবে মনোরমার মুখের পানে চাহিল। বালিকা সেই শুষ্ক শীর্ণ উদাস মুখখানি তুলিয়া কাতর নয়নে বিরাজের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে—সে নয়নে জল উছলিয়া পড়িতেছে—পর-দুঃখকাতরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। বিরাজ কথা কহিতে পারিল না। নিঃশব্দে কোটা২ করিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। বিরাজ কাঁদিল।

মনোরমা বলিল—"দিদি, আর জন্মে তুমি আমাদের কে ছিলে ভাই?"

গদ্‌গদস্বরে বিরাজ বলিল—'কেন, মনোরমা?'

"আমরা বড় গরিব, আমাদিগের দিকে কেহ ফিরিয়া দেখে না; কিন্তু তোমার এত কষ্ট কেন?" মনোরমা বসনাগ্রভাগে আপনার চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিল।

বিরাজ কোন উত্তর দিল না। এ কথার উত্তর সে ব্যথিতের ভাষায় ছিল

না। মনোরমা কহিল—"সেই কাল সকালে নীচে আসিয়াছ, আর উপরে উঠ নাই, একবার যাও, তোমার মা যে তোমায় বকিবেন।"

বিরাজ বলিল—"আমি তোরে একবার উপরে গিয়াছিলাম, কেহ আমাকে একটা কথাও বলে নাই; আমি উপরে যাইব না।"

"ছিঃ অমন কথা বলিও না; আমরা তোমার কে? আমাদের জন্য কেন মা বোনের বিরাগভাজন হইবে।"

সে কথায় বিরাজের বড়ই দুঃখ হইল, বলিল—"মনোরমা, তুই কি আমায় ভালবাসিস্ নে?" স্বর বাষ্পবিকৃত হইয়া আসিল। মনোরমা আশ্চর্য্য হইল। দেখিল, তাহার সেই বড় বড় ভাসা ভাসা চক্ষু দুটি জলে পুরিয়া আসিয়াছে।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

জীবলীলা-পথে শ্রান্ত
কে ওই শায়িত পান্থ
অলসে নয়ন দুটী পড়িয়াছে ঢুলে।
প্রকৃতি নিস্তব্ধ মত
বুকে যেন ব্যথা কত,
জাহ্নবী কূলেতে লুটি কাঁদে ফুলে ফুলে।

আশার অস্ফুট কলি,
স্ফুটিত কমল গুলি,
শোভিবে কি আর ওই জীবন মৃণালে?
চিন্তার অঙ্কুর চয়
ফল পুষ্পে শোভাময়
হবে কি কখন আর কোনো ধরাতলে?

অথবা, ইহাই তোমার শেষ
মানব-জনমোদ্দেশ
এক মুষ্টি ভস্মশেষ সুরধুনী-তীরে!
প্রেমসিন্ধু হৃদি খানি
অমিয়া-সিঞ্চিত বাণী,
সমুজ্জ্বল জ্ঞানমণি—
সকলই বৃথা রে!

হায়! কে কবে কি অবশেষ!
আঁধার ভবিষ্য-দেশ,
রুদ্ধ তার দ্বারদেশ চলেনা দর্শন।
কালের বিশ্রাম ভূমে
নিদ্রিত অনন্ত ঘুমে,
কিজানি অক্ষয় আজি দেখে কি স্বপন!

কে বলে অক্ষয় ক্ষয়?
(জীবন-বিশ্বের লয়!)
সাহিত্য-গগনে চির উজ্জ্বল দিনেশ।
মহাকবি বিশ্বপাতা,
কে বুঝিবে তব গাথা
এ নাট্য সমাপ্তি কোথা নর-ভাগ্য-শেষ!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

নিশীথ-জ্যোৎস্না।

"What more felicity can fall to creature
"Than to enjoy delight with liberty."

নিশীথের জ্যোৎস্নার মূর্ত্তি কি সুন্দর!—ভাব কি প্রগাঢ়!—কবিতা কি মধুর!—কি নীরব! নিশীথের বিশ্বপরিপ্লাবিত ঘন বিচিত্র জ্যোৎস্নার

মধ্যে কবিতার মধুরহাসিনী জীয়ন্তমূর্ত্তি দেখিতে পাই। সৌন্দর্য্যের এত ছড়াছড়ি আর কখন দেখি নাই। জগতের কোন সাহিত্যে এ অপূর্ব্ব জিনিস নাই। ইহা প্রকৃতির। ইহা একখানি জীবন্ত কাব্য। যতই পড় না কেন, ইহার শেষ নাই। ইহা অনন্ত। মরি মরি কি প্রাণস্পর্শী নীরব ললিত গান! এমন গান কে শোনাতে পারে? আর এ গান বুঝিবার কাণ ক'জনের আছে? এ শান্ত গানের লয় শুনিয়া পর্ব্বত স্তম্ভিত!—বৃক্ষলতাদি পুলকে শিহরিত!—অনন্ত সিন্ধু মৃদু-উদ্বেলিত!—নিশীথ জ্যোৎস্না প্রকৃতির স্বপ্নের জাগরণ। মরি কি সুন্দর!—নিশীথের অনাবৃত কোলে শয়ন করিয়া, ঘুমন্ত প্রকৃতি চাঁদের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে জ্যোৎস্না-হাসি হাসিয়াছে! জ্যোৎস্না প্রকৃতির হাসি। এত হাসি তাহার কাহাকে দেখিয়া?

আজ নিশীথ-জ্যোৎস্না, আমার আত্ম-বিলোপকারী এই মধুময়ী নিশীথ-জ্যোৎস্না, অনন্ত অচেতন জগৎকে হৃদয়ের শয্যায় রাখিয়া, স্বয়ং জাগ্রত। এখনকার ভাব বড় প্রাণ-ঢালা। অনন্ত পৃথিবী, নিশীথ-জ্যোৎস্নার অনন্ত সুন্দর শান্তিময় কোলে নিদ্রিত; আর ভুবন-মোহিনী নিশীথ জ্যোৎস্না সেই অনন্ত ঘুমন্ত পৃথিবীর সুকোমল মুখের প্রতি স্নেহময়ী মার মতন কেমন অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে! নিদ্রিত সন্তানকে কি মা চোকের আড়াল করিতে পারে! এই অনির্ব্বচনীয় নিশীথ-জ্যোৎস্না-জগৎ জগদাত্মাতীত আত্মার এক অপূর্ব্ব সাক্ষ্য। এখন বোধ হইতেছে, অনন্ত প্রকৃতিশক্তি যেন চক্ষু চাহিয়াছেন।

এই নিশীথ-জ্যোৎস্নায় সুষুপ্ত জগতের প্রাণের কথা, স্বপ্নের আকার ধরিয়া তারকা-খচিত ঐ নীল শূন্য-পথ দিয়া অনন্ত রূপ-সাগরের মানুষকে দেখিতে যাইতেছে। কল্পনার রাজত্বের সময় এই। কল্পনার এ মায়া-রাজ্যে প্রবেশ করিলে পৃথিবীর মায়াময় দু দিনের ভাঙ্গাঘরে যাইতে মন আর চাহিবে না। আজ কত কথা—কত অপরিচিত হৃদয়ের সুখ দুঃখের কথা পরিচিত হইতেছে। যে কথা, কখন সচেতন অবস্থায় জগতের মধ্যে আসিত কি না সন্দেহ, তাহাও আজ এই অপরূপ সৌন্দর্য্য মহামেলার পূর্ণিমা নিশীথে স্বপ্নাকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য্য রুদ্ধ-হৃদয়ের চাবি প্রকৃতির কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। আজ আমার নিশীথ-

জ্যোৎস্নার গান শুনিয়া, হৃদয় বৃক্ষের শাখায় কত নব চিন্তাপ্রসূন সুধীরে এক একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। জ্যোৎস্না-রূপসী আজ আমাকে এরূপ আকুল না করিলে, বোধ হয় যে, এ পুরাতন বৃক্ষে আর কেহ নূতন ফুল ফুটাইতে পারিত না। আর কেন জ্যোৎস্না, আর তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া কেন দাঁড়াও! আর কি দেবে? কি আছে? সুখের বাঁশী ত অনেক দিন নীরব হইয়া গিয়াছে! কি গাহিব? কি ভাবিব? এ নবীন গৃহ আমার তুমিই ত ভাঙ্গিয়াছ, জ্যোৎস্না! হায়! এ জগতের সবই কি নিশীথ-স্বপ্ন!

মনে পড়িতেছে,—কবে একদিন ঠিক এইরূপ অনন্ত জ্যোৎস্নার রূপের সাগরে ডুবিয়া, পৃথিবীর গাছপালার মধ্য দিয়া কোথা/একখানি পোড়ো বাড়ীর ছাদের উপর সুখের আবেশময়ী একটি হাসি দেখিয়াছিলাম। সে উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার আলোয় হাসির অন্তঃপুর সুন্দর দেখিতে পাইয়াছিলাম। বোধ হইল, সে হাসি আমার কত পরিচিত! যেন আমারই নয়ন-কিরণে হাসি ফুটিয়াছে! দেখিলাম, সেই হাসির মধ্যেই আমার পূর্ব্ব জন্ম-কাহিনী লেখা রহিয়াছে! কি করিয়া বলিব সে কাহিনী কি? সে কাহিনীমালার ফুল ত আমার এ ভাবার বাগানে নাই। তাহা এ জগতের নয়। অথবা সেই কাহিনীই এই সমস্ত জগৎ।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোকের উপর দিয়া বিদ্যুৎ-গতিতে একখানি অজানা জগৎ চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময়, সে আমাকে ডাকিয়া গিয়াছিল। সে মিলন মুহূর্ত্তের। আর তাহাকে পাইলাম না। রেলগাড়ীতে চাপিয়া প্রকৃতির কত দেশ-বিদেশের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যাইতে যাইতে তাহার মধ্যে আমার স্বপ্ন-দৃষ্ট গ্রামের সজীব প্রতিরূপ দেখিয়া যেমন একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া নিশ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি, সে কাহিনীও ঠিক সেই রকমের। সে কাহিনী, চোক বুজিলে দেখিতে পাই, ভাবিলে বুঝিতে পারি। সে কাহিনী সৌন্দর্য্যের অসীমত্ব। বা হাসির আকারে অসীম সৌন্দর্য্য।

"সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ-বন্ধন।" বড় সত্য কথা। এ পৃথিবীতে সৌন্দর্য্য ভিন্ন আর এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার দ্বারা আমরা সত্যকে পাইতে পারি, বুঝিতে পারি। সৌন্দর্য্য জগতের ঐক্য। সৌন্দর্য্য আছে বলিয়াই আমরা জগতের ঐক্য-ভঙ্গকারী মিথ্যাকে জানিতে পারি।

এই মিথ্যা আমাদের চোকে ধূলা দিয়া রাখিয়াছে। সেইজন্য আমরা জগতের রাগিণী রক্ষা করিতে পারি না। আর সেই জন্যই আমরা আদর্শের জন্য এত হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছি। বাস্তবিক, সৌন্দর্য্য ভিন্ন আমরা কিছুই জানি না। সৌন্দর্য্য ঐক্য—সৌন্দর্য্য সত্য—সত্য জগৎ। ইহাই ত জগতের মূল তত্ত্ব। সৌন্দর্য্য-প্রেমিক কবি কীট্‌স (Keats) বলিয়াছেন—

Beauty is truth, truth beauty that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.

সেইজন্য যখন আমরা কি এক অদৃশ্য শক্তিবলে—সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে একবারে বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যাই, তখন আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তঃপুরে অনন্ত জগৎকে দেখিতে পাই। তখন আমাদের চারিদিকেই সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা। তখন সৌন্দর্য্যের সহস্র দ্বার দিয়া অনন্তের বার্ত্তা আসিয়া আমাদের প্রাণকে আকুল করিয়া ফেলে। সেই সময় স্মৃতি জাগিয়া উঠে। স্মৃতির অদৃশ্য মলয় পর্ব্বত হইতে তখন পূর্ব্বজন্মের এক মধুর বাতাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে থাকে। তখন আমরা বিশ্বে লীন! জগৎ তখন আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান। তখন সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের জ্যোৎস্নায় শয়ন করিয়া অনন্ত জাগ্রত নিদ্রায় চোক চাহিয়া বুঝিতে পারি যে, আমরা পূর্ব্বজন্ম-ফুল। অর্থাৎ অনন্ত সৌন্দর্য্যজাগরণই পূর্ব্বজন্মস্মৃতি। ইন্দ্রিয়াতীত-পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি-বাতায়ন এই জগদতীত সৌন্দর্য্য।

আজ এই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে ছাদের উপর একাকী বসিয়া রজতময় অনন্ত আকাশের রাণীর চাঁদ মুখের দিকে স্থির নয়নে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ কি একটা মধুর উদাসময় কথার আবছায়া ভ্রমরের ন্যায় হৃদয়-পুষ্পের চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কি কথা সে? আজ আমাকে সে কথা কে বলিয়া দেবে? এমন সুন্দরী নিশি সেই কথার বিরহে আজ শুধু নিশি। এ অনন্ত জগতে কি তবে আমার সে ছায়াময় কথা বলিয়া দিবার আর কেহ নাই? আছে। এ জগতে কথা ফুরায় না। একের পর দুই—শরীরের পর মন—সাকারের পর নিরাকার—মনুষ্যের পর প্রকৃতি। একে অনন্ত প্রাপ্তি। প্রকৃতি সর্ব্বদাই এই কথা কত রকমে বলিতেছে। জগতের পথে জগতের কথা কখন অদৃশ্য হইতে পারে না। নিশীথ জ্যোৎস্নাকে কেহ ভুলিও না। জ্যোৎস্না স্বর্গের সোপান। এ জগতে

অমরাবতীর এই একমাত্র পথ। এস, আজ এই সৌন্দর্য্যের অনন্ত জ্যোৎস্না-সাগরে ঝাঁপ দিয়া মরিতে মরিতে বাঁচি—

"To die for Beauty, than live for bread."

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

ফোঁটা ও তিলক।

বিষম সমস্যা। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতেছেন, বাপু হে, দশহরা, গঙ্গাস্নান করিয়াছ, একটা ফোঁটা কাট। ও দিকে আবার গোঁসাইদাস বাবাজি বলিতেছেন; না হে না, আজ প্রভুর পাদপদ্মে দ্রবময়ীর উদ্ভব—বড় উৎসবের দিন—একটা তিলক সেবা কর। কি করি—কাহার কথা রাখি? কখন ফোঁটাও কাটি নাই, তিলক সেবাও করি নাই—কি ভাল মন্দ বুঝি না—বিষম সমস্যায় পড়িয়া এদিক্ ওদিক্ করিতেছি; এমন সময়ে অদূরে মৃদুতালে খঞ্জনী বাজাইয়া কে গাহিল—

গৌর আমার শাঁখা শাড়ি।
গৌর আমার সিঁতের সিঁদুর, চুলবাঁধা দড়ি॥

আওয়াজটা বড় মিঠা লাগিল। বামাকণ্ঠ। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, এক প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবীর বয়েসটা এখনও একেবারে ঢলিয়া পড়ে নাই; শরীরখানি মাজামাজা, গোলগাল, কালোকোলো। পরণে একখানি কালাপেড়ে ধুতি। অঙ্গের মধ্যে কোথাও কোন অলঙ্কার দেখিলাম না। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে সহজে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। দেখিলাম, বৈষ্ণবীর তিল ফুলের ন্যায় নাসা, সেই নাসাগ্রভাগে মধুর রসকলি। তখন মনে মনে স্থির করিলাম, ভট্টাচার্য্যের কথাও শুনিব না, বাবাজির কথাও রাখিব না, যদি কাটিতেই হয়, তবে নাকের উপর ঐরূপ রসকলি কাটিব। কিন্তু, সে তো পরের কথা। তখনকার উপায়? তখন অন্য উপায় না দেখিয়া পলায়নের সুবিধা খুঁজিতে লাগিলাম। সুবিধা সহজেই

হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার দিকে চাহিয়া গঙ্গাস্তোত্র আওড়াইতে ছিলেন, "মাতঃ শৈলসুতে" বলিয়াই তাঁর স্তব পাঠ ঘুরিয়া গেল, একদৃষ্টে সেই বৈষ্ণবীর প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। বাবাজি বাম হস্তের তালুদেশে গঙ্গামৃত্তিকা গুলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দিয়া নাসিকার উপর তিলকসেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে আঙুল নাকের উপরেই থাকিল, তিলকসেবা হইল না, জড়ের ন্যায় বৈষ্ণবীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বৈষ্ণবী এ সব দেখিয়া কি ভাবিয়াছিল জানি না; মুখের হাসি মুখে মারিয়া, ভিজা কাপড়েই আমি সেই সুযোগে ঘাট হইতে পলাইয়া আসিলাম। সে দিন আর কিছুই করা হইল না।

তার পর কতদিন ভাবিয়াছি, কি করি, ফোঁটা কাটি, কি তিলক সেবা করি, কি রসকলি পরি। কিন্তু কিছুই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারি নাই। বৈষ্ণবীর দেখাদেখি একদিন রসকলি কাটিয়াছিলাম. কিন্তু তাহা দেখিয়া পাড়ার একটা ত্রিপণ্ড ছেলে, "কে, গো, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার সখী নাকি?" বলিয়া "শসাচুরি—শসাচুরি" করিয়া বড়ই জ্বালাতন করিয়াছিল; সেই দিন হইতে আর রসকলি কাটিতে মন নাই। ফোঁটা কি তিলক যেটা হয় একটা কাটিলে কাটিতে পারি, কিন্তু কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহা আজও স্থির করিতে পারিলাম না। ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তিলকের নিন্দা করিয়া ফোঁটার ব্যবস্থা দেন; আবার বাবাজিকে ফোঁটা কাটার কথা বলিবামাত্র, তিনি 'রাধে রাধে' বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। তাঁহার ফোঁটায় বিশেষ আপত্তি, ফোঁটা শব্দের পর কাটা শব্দ ব্যবহার হয় বলিয়া; বৈষ্ণবের কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিলেও পাপ জন্মে। কাহারও নিকট ইহার সদুত্তর পাইবার আশা নাই। দুজনেরই দোহাই—শাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্র কি তাহার জ্ঞানে দুজনেই সমান ব্যুৎপন্ন!

যাহা হউক, শাস্ত্রের কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ফোঁটাই বল, আর তিলকই বল, এ প্রথাটা কিছু আজ কালের নয়। অনেক দিন হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। অনুভব হয়, আর্য্য ঋষিরাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু ঋষিরা কোন একটা কাজ অনর্থক করিতেন না। দেহ-শোভার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁহারা যে অঙ্গবিশেষের শোভা

বৰ্দ্ধনের জন্য ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন এ কথা বিশ্বাস হইতে পারে না। তাহা হইলে, যে মহাদেব শ্মশানে মশানে ভস্ম মাখিয়া সাপ জড়াইয়া বেড়ান তাঁহার কপালে ইহার চিত্র দেখিতাম না। অঙ্গরাগের জন্য ইহার সৃষ্টি হয় নাই। ইহার কোনও গূঢ় গভীর অর্থ আছে।

সে অর্থ বুঝিতে পারা যায়, যদি আমরা স্থিরচিত্তে সেই প্রাচীন ঋষিদিগের প্রকৃতি একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি। যোগ সেই আৰ্য্য ঋষিগণের প্রকৃতির মূল অবলম্বন। সকলেরই লক্ষ্য সেই এক, গতি সেই এক পথে। কিন্তু সে পথ বড় দুর্গম, ও আয়াসসাধ্য। মনে করিলেই, যে ইচ্ছা, সে পথে সচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যোগ বড় কঠিন ব্যাপার। ইহাতে চিত্তকে লয় করিতে হয়। চিত্তের লয় না হইলে সমাধি হয় না। মহৰ্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"—অর্থাৎ মনোবৃত্তির নিরোধ করার নাম যোগ। মানুষের মনোবৃত্তি নানা প্রকার। সে সেই সকল বৃত্তির অধীন হইয়া এই জগতে আসিয়াছে। যে দিন সে সূতিকাগৃহের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই দিনই সে শিশু এই মনোবৃত্তির অধীন হইয়া তাহার হাত পা নাড়িয়াছে, তাহার ক্ষীণ স্বর উচ্চে তুলিয়া দুঃখের কান্না কাঁদিয়াছে। জন্মের সেই আদি দিন হইতে সেই শিশুশরীর যতই সংপুষ্ট হইতেছে, ততই এই সব মৃগচঞ্চল মনোবৃত্তির তাড়নায় সে ইতস্তত বিধাবিত হইতেছে। ইহা কখন তাহাকে আকাশে তুলিতেছে, কখন সাগরে ডুবাইতেছে, কখন অসাধ্য সাধনে শক্তি দিতেছে। সেই মনোবৃত্তির নিরোধ সহজ কথা নয়, সে কৰ্ম্ম সকলে পারে না। নিরুদ্ধাবস্থায় চিত্তের কোন অবলম্বনই থাকে না। দার্শনিকেরা বলেন, চিত্ত তখন দগ্ধ সূত্রের ন্যায় কেবল মাত্র সংস্কার-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মনের সম্পূর্ণ মরণ উপস্থিত হয়। যোগের জন্য চিত্তের এরূপ লয় সাধন কি সহজ কথা!

সহজ নয় বলিয়া ঋষিগণ মুমুক্ষুদিগের জন্য প্রথম কতকগুলি অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য ক্রিয়া-যোগের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল ক্রিয়াযোগ আবার সিদ্ধ করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক। একাগ্র হইয়া সাধনা না করিলে কোন কাজই সিদ্ধ হয় না। চিত্ত আপনার

চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য বিস্মৃত হইয়া, নিরবলম্বতুল্য হইয়া একমাত্র বস্তুতেই নির্ভর করিবে—তাহার সমস্ত জ্ঞান ডুবিয়া গিয়া, তন্ময় হইয়া, নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় কেবল একমাত্র বিষয়েই অবিকম্পিত ভাবে অবস্থিত থাকিবে, তবেই সে সাধনায় সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী। চিত্তের সে একাগ্রতাও যত্ন-সাপেক্ষ। বিষয়াভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া, চিত্তের অনন্তবৃত্তি রোধ করিয়া তাহার একতানবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। সেই যত্নকে অভ্যাস বলে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।"

ঋষিগণ কোন কিছুই অসম্পূর্ণ রাখেন নাই। এই অভ্যাসটী বিশেষরূপ সহজ ও স্বায়ত্ত করিবার জন্য আবার তদুপযোগী কতকগুলি প্রক্রিয়ার নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। যোগশাস্ত্রে তাহাকে ত্রাটক বলে। ইহা মনঃস্থৈর্য্যের প্রকৃষ্ট উপায়। সে প্রক্রিয়াগুলি এইঃ—

"নাসাগ্রং দৃশ্যতে যেন পদ্মাসনগতেন বৈ।
মনসো মরণং তস্য * * * ॥"

পদ্মাসনবদ্ধ হইয়া নাসিকার অগ্রভাগ দর্শন করিবে। তাহা হইলেই দৃষ্টি আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না। দৃষ্টি অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হইলে সহজেই চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইবে। ক্রমেই মনের মরণ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির লয় হইবে।

বাশিষ্ঠযোগ ও যাজ্ঞবল্ক্যীয়যোগসংহিতায় এইরূপ বিধান আছে।—

"সমগ্রীব শিরঃকায়ঃ সংযতাস্যঃ সুনিশ্চলঃ।
নাসাগ্রদৃক্ সমাসীনো যথোক্তং যোগমভ্যসেৎ॥"

অর্থাৎ গ্রীবা শিরোদেশ এবং দেহযষ্টি অবক্র ভাবে সমান রাখিয়া সংযতমুখে সুস্থির হইয়া নাসাগ্রভাগ দর্শন করিবে, এইরূপে উপবিষ্ট হইয়া যোগ অভ্যাস করিবে।

কিন্তু নাসাগ্রদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম অথবা সহজ প্রক্রিয়া। ইহা সিদ্ধ হইলে, তাহার পর একটু বেশী আয়াসসাধ্য—'ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টিঃ * * *।' —দৃষ্টি ভ্রূদ্বয়ের মধ্যগত বিন্দুমধ্যে আবদ্ধ করিবে; তাহা করিলে সমাধি সহজে জন্মে।

পাছে দৃষ্টি-বিভ্রম হয়, বা দৃষ্টি স্থির না থাকে, এই আশঙ্কায় এই

ত্রাটক সাধনাকে আবার সুগম করিবার জন্য সেই সকল ঋষিরা, যাহাতে দৃষ্টি সহজে আবদ্ধ হয় এই নিমিত্ত, সেই সেই স্থানে কোন একটী চিহ্ন বিন্যাস করিবার নিয়ম করিয়াছেন। ইহা হইতেই ফোঁটা বা তিলকের সৃষ্টি। রসকলি নাসাগ্র-দর্শন-সাধনার অতি সুন্দর উপায়। ফোঁটা ও তিলক একই কথা। ইহার ভেদাভেদ জ্ঞান মূঢ়তা মাত্র। যাহার যেরূপ অভিরুচি সে তাহাই ধারণ করিতে পারে। কাহাকেও ইহা ধারণ করিতে দেখিলে নব্য ইংরাজিনবীশগণ যে উপহাসের হাসি হাসিয়া থাকেন তাহার কোন কারণ দেখিতে পাই না।—সে কেবল তাঁহাদেরই চপলতা ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। দুঃখের বিষয়, এক্ষণকার অধিকাংশ বৈষ্ণব বা ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট আজ কাল ইহা কেবল "স্নানের সাক্ষী ফোঁটা" হইয়াছে!

দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ।

অর্জ্জুন।

অন্যনাম—অজন, বীরতরু, ইন্দ্রদ্রুঃ, কর্ণারিঃ।

স্বনামখ্যাত বৃহদ্বৃক্ষ। বীরভূম, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলায় ইহা বহুল পরিমাণে দেখা যায়। ফল ছোট কামরাঙ্গার মত। দেখিতে পেয়ারা গাছের ন্যায়। পাতাও পেয়ারা পাতার মত, তবে কিছু কোমল ও মসৃণ। ইহার বল্কল সচরাচর ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা কষায়, তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণশোধক, কফ, পিত্ত, শ্রম, তৃষ্ণা নাশক। বায়ু প্রকোপকারি, সংকোচক, বলকারক। অশ্মরী (পাথুরি) হৃৎপীড়া, ক্ষত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে উপকারী।

অর্জ্জুনছাল-চূর্ণ দুগ্ধ বা চিনিসহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ, পুরাতন জ্বর ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। অস্থিভঙ্গ ও আঘাতজনিত বেদনায় অর্জ্জুনছাল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে। অর্জ্জুনছাল ১ তোলা চেলোনী জলে বাটীয়া সেবন করায় অনেক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্যলাভ করিতে শুনা গিয়াছে। অর্জ্জুনছাল মধুর সহিত বাটীয়া লেপ দিলে ব্যঙ্গ রোগ দূরীকৃত হয়।

অলাবু।

অন্যনাম—লাউ, তুম্বী, কদু, মহাফলা।

বৃহৎ লতাফল বিশেষ। মিঠা, তিৎ ও বামনীভেদে ইহা তিন প্রকার। মিঠা লাউ মলভেদক, রুচিকারক, কফকারি, গুরুপাক, অতি শীতল ও বৃষ্য। তিৎ লাউ কটু তিক্ত, লঘুপাক। পাণ্ডু, কৃমি, বিষদোষ, শ্বাস, কাস, ব্রণ ও শোথ রোগে উপকারক। বেহার অঞ্চলে ইহাকে তুম্বীর বলে। ইহা আকারে দুই তিন হাত দীর্ঘ হয়। বঙ্গদেশে এক জাতি তিৎ লাউ আছে, উহা দেখিতে ঘটীর মত। বামনী (বাউনে) লাউ পিত্তনাশক। লাউশাক, গুরু, মধুর, মলভেদক, রুক্ষ, পিত্তনাশক, বায়ু ও কফবর্দ্ধক।

লাউশাঁস ও লোধ একত্র বাটীয়া লেপ দিলে যোনির শিথিলতা নষ্ট হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। কাঁচা লাউ আধপোয়া ✓।৹ সের দুগ্ধে সিদ্ধ করত ক্ষীরবৎ করিবে। ঐ ক্ষীর ৩।৪ দিন সেবন করিলে দারুণ প্রমেহ রোগ উপশমিত হয়। তিৎ লাউবীজচূর্ণ অল্প ঘোল বা জলের সহিত সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়। লাউফলের রসের নস্য গ্রহণে নাসা আরাম হয়। লাউ বিচির শাঁস ঘসিয়া জলের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ নিবারণ হয়।

অশোক।

অন্যনাম—বিশোক, বামা, শোকনাশ, সুভগ।

লোহিতপুষ্প স্বনামখ্যাত বৃহৎ বৃক্ষ। ইহার ছাল সচরাচর ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা শীতল, তিক্ত, গ্রাহী, কষায়। পিত্ত, দাহ, শ্রম, তৃষ্ণা, কৃমি, শোষ, গুল্ম, শূল, উদরাধ্মান ও বিষদোষ নাশক। ইহার বিশেষ গুণ রক্তরোধক ও সংকোচক। এ জন্য রক্তপ্রদরাদি রোগে বিচক্ষণ বৈদ্যগণ ইহা প্রায়ই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অশোকছাল ২ তোলা ও দুগ্ধ এক পোয়া, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিলে প্রবল প্রদর রোগ আশু উপশমিত হয়। অশোক ছালের কাথ দুগ্ধসহ পান করিলে রক্তপ্রদর আরোগ্য হয়। শোক-রাহিত্য কামনায় বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে ইহার কলিকা জলের সহিত পান করিবার বিধি আছে। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিরাজ।

সমালোচনা। *

গার্হস্থ্যপাঠ। শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম, এ, প্রণীত। প্রণেতাকে না চিনেন শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক অতি বিরল। বাঙ্গালীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যাঁহারা দৃঢ়ব্রত; বাঙ্গালীর নির্জ্জীবদেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে, বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্ব শিখাইতে যাঁহারা প্রাণপণ করিতেছেন; বাঙ্গালা ভাষার সহিত যাঁহাদের নাম থাকিবে, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। সমাজের অন্যান্য শিক্ষকদিগের ন্যায় তিনিও এতদিন শিশু ও বালক ছাড়িয়া, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকে শিক্ষা দিতেছিলেন; গৃহ ছাড়িয়া সমগ্র সমাজের সংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সমাজশিক্ষকগণ মূলের প্রতি তত লক্ষ্য রাখেন না বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণপণ যত্ন প্রায় সফল হয় না। তাই এ পর্য্যন্ত আমাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি জ্ঞানে হইয়াছে, কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অধিক কি ঈশ্বরকেও আমরা ভক্তিতে ও কর্ম্মে চিনি না, জ্ঞানে ও তর্কে চিনি। কিন্তু নরম মাটি ভিন্ন শক্ত মাটিতে কিছু গড়া যায় না। যে অবস্থা আমাদের চরিত্রগঠনের সময়, সেই অবস্থা আমাদের কত শোচনীয়, গোড়ায় কি গলদ তাহা সকলে বুঝিতে চেষ্টা করেন না। এতদিনে চন্দ্রনাথ বাবু সেই মূলে হাত দিয়াছেন। গ্রন্থকার ঠিক বলিয়াছেন, আমাদের ধাত্ বিগড়াইয়া গেলে,—আমাদের সংস্কার কলুষিত হইলে আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হয় বলিয়াই আমরা সর্ব্বত্র দুঃখ, যন্ত্রণা, ও ক্লেশ ভোগ করিতেছি। সেই জন্য আমরা এখন কোন মহদনুষ্ঠান করিতে পারি না। সেই জন্যই আমাদের মধ্যে কার্য্যে মহৎ লোক—আদর্শ-চরিত্র এত অল্প।

* দুই বৎসর পূর্ব্বে সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে নূতন ও পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনার কথা হয়। নানাকারণে সে প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন হইতে সেই সমালোচনা কল্পনায় রীতিমত প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে গৃহ পরিষ্কার রাখিবার কথা, গৃহসামগ্রীর কথা রান্নাঘরের কথা প্রভৃতি আট্‌টি পাঠ লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি দেখিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে, যে এত খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনার কি আবশ্যক ছিল? এ সব কথা ত সকলেই জানে। কিন্তু, এত যে জানা-কথা তাহাও কার্য্যে আমরা আদৌ পরিণত করিতে পারি না কেন? আমাদের সেই প্রকৃতিগত—অস্থিমজ্জাগত মহৎ দোষ গ্রন্থকার দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি তুচ্ছ বিষয় লইয়া নিজ শক্তির অপচয় করেন নাই। গৃহ পরিষ্কারের কথা, অন্ন ব্যঞ্জনের কথা, ভোজনের কথা, বড়ই গুরুতর কথা। ইহাতে আমাদের শরীর ও মনের উন্নতি ও অবনতির অধিকাংশই নির্ভর করে। ইহার প্রতি আমরা দৃষ্টি রাখি না বলিয়াই আমাদের ঘরে নিত্যই রোগ, নিত্যই ক্লেশ, নিত্যই হাহাকার; আমরা এত সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, এত স্ফূর্ত্তিহীন, এত ভীরু; আমাদের গৃহে এত বিশৃঙ্খলা, এত কলহ, এত অশান্তি। কিন্তু এ সমস্ত অনর্থের মূল আলস্য। আলস্যের কতদূর প্রভাব গ্রন্থকার আগাগোড়া চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া সেই মহৎ দোষ সংশোধনের উপায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

প্রথমে গৃহ পরিষ্কারের কথা।—"আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ সংস্কার যে মল, মূত্র, সক্‌ড়ি প্রভৃতি দ্বারাই গৃহ অপরিষ্কার হইয়া থাকে, এবং সেই জন্য সেই সব দ্রব্য অযথাস্থানে পড়িয়া না থাকিলেই তাঁহারা মনে করেন, যে গৃহ পরিষ্কার আছে।" অপরিষ্কারের ভাব কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত কি দরিদ্র সকলেরই প্রায় এইরূপ! তার পর তিনি অসদৃশ সামগ্রী একত্রে রাখার দোষ, যাহা দেখিতে খারাপ, তদ্দ্বারা গৃহ অপরিষ্কার হয়, হেথাহোথা জিনিষ ফেলিয়া রাখার দোষ, এবং এই সব কারণে পরিবারের কত অসুবিধা, কত কার্য্যহানি, অনর্থক কত সময় নষ্ট তাহা বুঝাইয়াছেন। এ সকলের মূলে সেই আলস্য বিরাজমান্! "গৃহ সুন্দর হইলে গৃহের লোকের মন প্রফুল্ল থাকে এবং মন প্রফুল্ল থাকিলে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়।" এ কথা কতদূর সত্য, সকলে ভাবিয়া দেখিবেন। গৃহ পরিষ্কার ও সুন্দর রাখার কথায় কেহ যেন না বুঝেন, এজন্য আলাদা দাসদাসী রাখিতে হইবে। সকলেই জানেন, অপরিষ্কার অট্টালিকা অপেক্ষা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সামান্য পর্ণকুটীর কত নয়ন-প্রীতিকর হইতে পারে। ইহার ভিতর আর একটি বড় হাসির কথা আছে। অনেকে তুষারধবল অট্টালিকায় বাস করেন, সদা পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করেন, দু'বেলা সাবানাদি দ্বারা গাত্র পরিষ্কার করেন; কিন্তু তাঁহার সেই ছবি প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত গৃহ নিষ্ঠীবনের দ্বারা কি প্রকার অস্বাস্থ্যকর ও কুদর্শন হয়, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এ সব ত সামান্য কথা, জানা কথা। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জনের গৃহে এ প্রকার দোষ নাই? কয়জন আলস্যের এই সব ভয়ানক দোষ পরিহার করিয়াছেন?

তার পর রীতিমত ও অবস্থামত গৃহ সামগ্রী না থাকায় কত কষ্ট সহিতে হয়, তিনি সুন্দররূপে তাহা বুঝাইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহী ও গৃহিণীর সে অংশ বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করা উচিত।

"বাড়ীর মধ্যে যে স্থান খুব সঙ্কীর্ণ, প্রায় সেই স্থানে সকলে রান্নাঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। আবার রান্নাঘরের পার্শ্বেই বাড়ীর অপরিষ্কার জল প্রভৃতি নির্গমনের নর্দ্দামা করা হয়—ইত্যাদি।" জিজ্ঞাসা করি, লক্ষপতি হইতে সামান্য হীনাবস্থ লোকের রান্নাঘর এরূপ কি না? যাহাতে আমাদের দেহের পুষ্টি, সুতরাং জীবন নির্ভর করিতেছে, সেই আহার প্রস্তুতের স্থান জানিয়া শুনিয়া এত কদর্য্য হয় কেন? যে সব বিষয়ে আমরা পিতৃপিতামহ হইতে ভুক্তভোগী, সে সব বিষয়ে আমাদের লক্ষ্য নাই কেন? আমরা আর বেশি বলিতে চাহি না। আশা করি, প্রত্যেক পরিবারের আবাল ৷ এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন। এ স্থলে কেবল আমরা বৃদ্ধ যুবা এবং বালক বালিকা একত্র ভোজন করিলে তাহার কি মহান্ ফল হয়, সেই স্থানটি সকলকে বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে এবং বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মাত্রকেই সে বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। সকলেই বুঝিবেন, গ্রন্থকার পরিবার-বন্ধন দৃঢ় করিবার কি উৎকৃষ্ট উপায় বাহির করিয়াছেন। সমস্ত পরিবারকে ভালবাসা, সহানুভূতি ও প্রীতির এক সূত্রে বাঁধিবার কি কোমল অচ্ছেদ্য পাশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থখানিতে আলস্যরূপ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইবে।

গৃহে তাহার আরম্ভ। এই আলস্য পরিহার করিতে পারিলেই আমরা নীরোগ, সুস্থ, সবল ও দৃঢ়কায় হইব; গৃহ শান্তি, সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও মানসিক উন্নতির প্রধান এবং প্রথম শিক্ষাস্থল হইবে। মহৎ জাতি হইবার যে সব গুণ শ্রমশীলতা, সতর্কতা, অধ্যবসায়, একতা, আত্মমর্য্যাদা প্রভৃতি গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও শিক্ষা হইতে পারে না। গৃহ ভিন্ন আমাদের চরিত্র গঠন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, এ পুস্তকখানি প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়ান উচিত, বালক ও তরুণ যুবকদের সুপাঠ্য পুস্তক আমাদের দেশে বিরল। শুনিয়া সুখী হইলাম, ইহার মধ্যেই কয়েকটী বিদ্যালয়ে ইহা পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এক্ষণে, প্রত্যেক গৃহস্থের প্রতি আমাদিগের অনুরোধ, তাঁহারা নিজ নিজ কন্যা প্রভৃতিকে সাতিশয় যত্ন সহকারে এই পুস্তকখানি পড়াইবেন। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ধর্ম্মচিন্তামালা। শ্রীমতী কাদম্বিনী মিত্র প্রণীত।—পুস্তক খানি ছয় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, কিন্তু ইহার মধ্যে ছয়টি কথা বাদ দিবার নাই। হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্রের মধ্যে যে কোটি কোটি অমূল্য নীতিরত্ন আছে, সেই সমস্তের মধ্যে কয়েকটী উৎকৃষ্ট রত্নে "ধর্ম্মচিন্তামালা" গাঁথা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রী বাল্যকালে স্বীয় পিতা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তের ভাগবত আলোচনা প্রত্যহ শুনিয়া যে জ্ঞান পাইয়াছিলেন, এ পুস্তকে তাহারই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বে লেখা। এত অল্প বয়সে ভাগবত শাস্ত্র বুঝা তীক্ষ্ণবুদ্ধির আবশ্যক। স্ত্রীলোকেরা কত শীঘ্র সুনীতি ও সুদৃষ্টান্ত ধারণা করিতে পারেন, ইহা দ্বারা তাহা প্রমাণ হইবে। যে পিতা এরূপ বালিকা কন্যার মনে ধর্ম্মপিপাসার উদ্রেক করিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠাকে আমরা ধন্যবাদ দিই।

এই পুস্তকখানি ১২৮৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। জানিতে পারিলে সুখী হইব, নবীনা গ্রন্থকর্ত্রী এই কয় বৎসরে আর কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন কি না।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত,
সাবিত্রী লাইব্রেরী।

কনকাঞ্জলি।

[গীতি-কাব্য*]

"Sooner or later that which is now life shall be poetry."

বাঙ্গালা সাহিত্যে "উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই" সত্য কথা। বাঙ্গালা সাহিত্য যে, বিলাসপূর্ণ গীতিকাব্যের আধিক্যে দিন দিন শক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাহারও আর অস্বীকার করিবার যো নাই। যে দেশের লোকে "বিদ্যাসুন্দরের" লেখককে "গুণাকর" উপাধি দিয়া, বিদ্যাসুন্দরী কবিতার মান বাড়াইয়াছিল, সে দেশের গীতি-কাব্য কতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। সেই জন্যই ত আজ বাঙ্গালা, বিলাসিতার জন্মভূমি। এরূপ গীতি-কাব্যকে আমরা কখন আদর্শ বলিতে পারি না। এইরূপ গীতি-কবিতা যদি বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষ হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, ইহা যত শীঘ্র এ পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া যায়, ততই আমাদের মঙ্গল। শ্রুতিসুখাবহ শব্দের মালাকে কবিতা বলিতে পারি না। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা, অন্তরের অন্তর-নিহিত লুক্কায়িত ভাব এবং সৌন্দর্য্য, যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে প্রাণের তুলি দিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন, সেরূপ কবিত্ব—সেরূপ কারিগরি তাঁহাদের পরবর্ত্তী কবিদের নাই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, গীতিকাব্যের জন্যই কি বাঙ্গালা সাহিত্যের এত দুর্দ্দশা? যদি তাহাই হয়, তবে য়ুরোপের সাহিত্য-জগতে গীতি-কবিতা লইয়া এত মাতামাতি কেন? তাহাদের গীতি-সাহিত্যের দিকে এত গতি কেন? যে প্রকৃত গীতি-কবিতার পূর্ণ সজীব মূর্ত্তি দেখিবার জন্য কত কাল ধরিয়া মহাকবি Shelley হইতে আজিকার কবিচূড়ামণি Tennyson এবং Swinburne প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা, নিশিদিন কল্পনা-কাননে বসিয়া আছেন, সে গীতি-সাহিত্যকে কখন আমরা উপহাস এবং "আর চাইনা" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। গীতি-কবিতা চাই। বাঙ্গালা দেশে এখন প্রকৃত গীতিকবিতা জন্মায় নাই। যত দিন না মানুষের আপনাকে এবং জগৎকে বোঝা সম্পূর্ণ হইবে, তত দিন গীতি-কবিতা

* শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। মূল্য আট আনা।

কবিতাপ্রবণ মনুষ্য-হৃদয়-কাননে ফুটিবে। মানুষের জীবনই গীতি-কবিতা। এ জগৎ-সাহিত্যে প্রত্যেক মনুষ্য এক একটি জীয়ন্ত গীতিকবিতা। দেশ যতই কেন সভ্য হউক না, তাহার জন্য কবিতা—গীতি-কবিতা কখন মরিবে না।

তবে বাঙ্গালার কথা বিভিন্ন। বাঙ্গালা দেশে প্রতিভাশালী কবি অতি অল্প জন্মিয়াছিলেন। যে দু-একজন জন্মিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাতে দেখি। তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম বাঙ্গালার শেষ প্রতিভাশালী কবি। তাঁহার পর আর কাহাকে প্রকৃত প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ হয় না। মুকুন্দরামের পর আমরা যে সব কবিতা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে শব্দ-বিন্যাসের চাতুরী ভিন্ন প্রায় আর কিছুই নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, সে গুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক। অথবা সময়ের ভুল। সময়ের এইরূপ ভুল মাঝে মাঝে হয়। একটা বড় প্রতিভা-ফুল ফোটাবার জন্য সময়কে কতকগুলি বাজে ফুল ফোটাতে হয়। সময়ের এ ভুল বাঙ্গালায় অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। তাই বাঙ্গালায় এত শাব্দিক কবি। ইহার আর এক কারণ শিক্ষার অভাব। তখন শিক্ষা আদৌ ছিল না।

কিন্তু জগতের সকল জিনিসই ত কালসাপেক্ষ। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্য কিছু আর জগৎ ছাড়া নয়। কালে, সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে আবার মধুসূদন উদিত হইল। মধুসূদনের গান কিছু নূতন ধরণের। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের সঙ্গে আর তত মিল নাই। হইবেই ত। মধুসূদন প্রতিভা-শালী - মধুসূদন শিক্ষিত। মধুসূদন পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিপ্লবের ফল। মধুসূদন দুয়েরই অতীত এবং নূতনের মিশ্রণ। এক রকম বলিতে গেলে মধুসূদনই আধুনিক গীতি-সাহিত্যের পিতা। য়ুরোপের যে লোকাতীত কবিত্ব, আজ বাঙ্গালার জীবিত প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি শিরায় বর্ত্তমান. সে লোকাতীত কবিত্বের সূত্র মাত্র মধুসূদনই করেন। কিন্তু তিনি সে কবিতার বীজমাত্র। সময়ে সেই বীজ হইতে দুইটি ফুল ফুটিয়াছে। একটি রবীন্দ্রনাথ, আর একটি অক্ষয় কুমার। অনেক দিনের পর বাঙ্গালার মলিন কাব্য-কাননে আবার ফুল দেখিতে পাইলাম। দুইটি ফুল। দুইটি কানন কেমন আলো করিয়া আছে! এ দুটির তুলনা নাই। আমার অদ্যকার আলোচ্য অক্ষয় কুমার।

"কনকাঞ্জলি"—বাস্তবিকই কনক-অঞ্জলি। ইহাকে কি বলিব? ইহা মূর্ত্তিমান স্বপ্ন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য-জগতে "কনকাঞ্জলি" অথবা ইহার ভাবুক রচয়িতার কতদূর আদর জানি না। আদর হউক বা না হউক, আমরা পুস্তক পাঠ করিয়া মুগ্ধ। কবি কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পাখায় চাপিয়া ভাব-আকাশের প্রতি তারকায় প্রকৃতির নিভৃত সৌন্দর্য্য পাঠ করিয়াছেন। ইহা এক নূতন—নূতন জগৎ। নূতন বলিয়াই ইহা আমাদের এত প্রিয়। এত প্রিয় বলিয়াই আজ জগতের কাছে ইহার কিছু পরিচয় দিলাম।

"কনকাঞ্জলির" কবি সৌন্দর্য্যের কবি। সৌন্দর্য্য তাঁহার একমাত্র উপাসনা। সৌন্দর্য্যের জন্য কবি পাগল। বাস্তবিক, কনকাঞ্জলির অক্ষরে অক্ষরে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত। ইহা সৌন্দর্য্যের আকর। সেই আকর হইতে কবির সৌন্দর্য্য-আকাঙ্ক্ষার একটি কুসুম-কোমল কল্পনা-চিত্র আমরা পাঠকবর্গকে না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহা কবির অনন্ত প্রাণের অদৃশ্য আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত। সেই রহস্যময় "অদৃষ্টচ্ছায়ার" ইহা চাবি—

আজি নিশি জ্যোস্নাময়ী, সৌরিভে আকুল বায়।
ঢুলে ঢুলে স্রোতস্বিনী কুলে কুলে ব'হে যায়।
চখে আসে ঘুম-ঘোর, মন কি ভাবিতে চায়।
আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথা যায়।
সমীরণে ভেসে ভেসে সুদূর অপ্সরা-গান,
অলস স্বপ্নের মত, যেন ছাইতেছে প্রাণ।
এই শ্রান্তির পরে, এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে!
উড়ে কেশ বায়ু ভরে, ঢল ঢল দু-নয়ান,
বুকেতে উছলে প্রেম,—তবু করে অভিমান!

২

কোথা তুমি—কোথা তুমি—প্রাণের অদৃষ্ট ছায়া!
স্বপ্নময়ী, স্মৃতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া!
নন্দনে, মন্দারকুঞ্জে, মন্দাকিনী-তীরে বসি,
অন্য মনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণশশী?

কোলে প'ড়ে পারিজাত, করেতে কুসুম-ডোর,
দূরেতে বিরহ-গান মন তাহে হ'য়ে ভোর!
না-জানি আসিছে অশ্রু, না-জানি কি ভাবি প্রাণে,
জ্যোৎস্নাময়ী দৃষ্টে বুঝি, চেয়ে আছ ধরা পানে!
কারে কি বলিতে সাধ, যেন গিয়াছিলে ভুলে!
জ্যোৎস্নায়, সৌরভে, গানে, স্মৃতি তার খুলে খুলে!

৩

পৃথিবীর আলিঙ্গনে পীড়িতা কল্পনা মোর,
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে, মূর্চ্ছায় স্বপনে ভোর,
মেঘেদের বাঁকাচোরা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
অবশেষে পৌঁছিয়াছে মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে!
দূর হতে দেখিতেছে, স্নধু সে দৃষ্টিটি তব!
পলকে পলকে ফুটে কত সুর নব নব?
জ্ঞান আর নাহি জ্ঞান,—তোমার দৃষ্টিটি হায়,
সাগরে, মগন-মুখী সরলা অবলা-প্রায়,
ধ'রেছে জড়ায়ে যত্নে কল্পনার গলা মোর!
জ্ঞান আর নাহি জ্ঞান, প্রাণে প্রাণে প্রেম-ডোর!

৪

দাঁড়াও অভেদ-আত্মা! পরলোক-বেলা-ভূমে,
বাড়ায়ে দক্ষিণ কর মৃত্যু-কুহেলিকা-ধূমে!
তোমাতে মিলিয়া যাই, দেখ তুমি চেয়ে চেয়ে,
সৌন্দর্য্যে মিলিয়া যায় কবিত্ব কেমন ধেয়ে!
শিখেছি তোমার চোখে সৌন্দর্য্যের মৃত্যু নেই,
বুঝিয়াছি এ ব্রহ্মাণ্ডে মত্ত ব্রহ্মানন্দ সে-ই?
নক্ষত্রে নক্ষত্রে, দেবি, হাহা ক'রে তোমা তরে,
ছুটিতে না হয় যেন আবার জনম-পরে!
এই মৃত্যু, শেষ মৃত্যু—হ'লো কি দেবতা মোর?
ধর ধর গীত-উৎস, ছিঁড়েছি জগৎ-ডোর!

বাঙ্গালায় এমন জিনিস আর নাই। ইহা পড়িয়া এক নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম। ইহা সৌন্দর্য্যের কনক-স্রোত।

সৌন্দর্য্য মানুষকে অমর করে। সৌন্দর্য্য প্রাণ। এই জগৎ সেই সৌন্দর্য্যের সাকার-মূর্ত্তি। কবি, সেই জগৎ-সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া মধুর ঈষৎহাস্যে অতি ধীরে ধীরে রমণীকে বলিতেছেন ;—

রমণি! তোমারে চেয়ে
ভেবোনা, কি গেছে গেয়ে
কি বকেছে ভুল—
সরল-হৃদয় কবি
যেখানে মাধুরী ছবি
সেখানে আকুল!

সুন্দর কথা—কবি-যোগ্য কথা। পাগল ভিন্ন এ কথা আর কেহ বলিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান-গীতি-সাহিত্য-জগতের রাজা, আমরা অক্ষয় কুমারকে তাঁহার সহিত তুলনা করিতে চাহি না। ইঁহারা দুই জনেই Tennysonর ছাত্র। কিন্তু Tennysonর ছাত্র হইয়াও, ইঁহারা উভয়ে স্বাধীন পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদের কবিতার মধ্যে একটি সুন্দর প্রভেদ-চিহ্ন দেখিতে পাই। ইঁহারা দুই জনেই পশ্চাত্য শিক্ষা-বিপ্লবের ফল। কিন্তু অক্ষয়কুমার বর্ত্তমান যুগের অধীন। তিনি এ যুগের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। বর্ত্তমান যুগ-সমাজ অপূর্ণ—লক্ষ্যহীন—আদর্শের জন্য প্রাণের অবিরাম আকাঙ্ক্ষা এবং বর্ত্তমানের সকল জিনিষেই অতৃপ্তি। "কনকাঞ্জলির" অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের উপর এ যুগের প্রভাব দেখা যায় না। একবার নাই যে, তাহা বলিতে পারি না। তিনি এ যুগের গতিশীলতার মেঘ ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন তিনি আদর্শ-কবিতা যুগের পথ-মুখে। অর্থাৎ তিনি সব যুগেই।

কবি অক্ষয়, স্বীয় প্রতিভা বলে কনকাঞ্জলির সকলগুলিই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার "বিভা", "অদৃষ্ট বালিকা," হিরণ্ময়ী" "মাধুরী" এবং "করুণার" তুল্য কবিতা বাঙ্গালাসাহিত্যের মধ্যে নাই। একরূপ কবিতা,

কেবল আমাদের এই নবীন কবিই লিখিতে পারেন। ইহা অক্ষয় বাবুর। আর কাহার হাতে এমন ফুটিতে পারে না। কনকাঞ্জলি একটি সুরের—দুঃখের প্রেম-গীতিতে পরিপূর্ণ। একটি সুরের হইয়াও ইহার মিষ্টতা ত কমে নাই! এ পুস্তক যখনই পড়ি, তখনই আর সমস্ত কাজ ভুলিয়া যাই। ইহাতে কবির প্রাণের পরিচয় পাই। কবি ইহাতে তাঁহার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। এখানি পুস্তকাকারে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল।

গীতি-কবিতার প্রথম গুণ, পদ-লালিত্য বা শব্দ-বিন্যাস-চাতুরী। সেই পদ-লালিত্যেই কনকাঞ্জলি প্রথমে মন কাড়িয়া লয়। তার পর যত পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করি, ততই ইহার কবিত্বে—কল্পনায়—ভাবুকতায় এবং মৌলিকতায় আশ্চর্য্য বোধ করি। কবির ভাবোদ্রেক করিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। নবীন কবির ইহা এক অসাধারণ গুণ। যখন আমরা অক্ষয় কুমারের কবিতা পড়ি, তখন সেই বাসন্তী পৌর্ণমাসী-রজনীর সুশীতল সুমধুর কাননের জাগ্রত নিস্তব্ধতার রাজ্যে বসিয়া প্রেমিক হৃদয়ের কি-এক অজ্ঞাত নিঃশ্বাসের নীরব কবিতা-কথা মনে পড়ে।

আমরা এ ক্ষুদ্রে-বৃহৎ পুস্তকের সমালোচনা করি নাই। আমরা সৌন্দর্য্য-কবির সুন্দর ছবি গুলি বুঝিতেছিলাম। গ্রন্থকার নবীন -প্রতিভাশালী। গ্রন্থকার এখন তাঁহার ছবির একদিক দেখাইয়াছেন। আর এক দিক এখনও বাকি। সেই জন্য ইহার সমালোচনা হইতে পারে না। যে দিন ছবি পূর্ণ হইবে, সমালোচনার কঠিন দিন সেই দিন আসিবে। আমরা ইহার কল্পনার ও কবিত্বের পরিচয় আর অধিক দিলাম না। মূল্য অতি অল্প, যাঁহারা ইহার আস্বাদ পাইতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উপাসক, তাঁহারা পুস্তকের মধ্যে প্রবেশ করুন। তাঁহারা নিরাশ হইবেন না। আমরা জানি, রবীন্দ্র ভিন্ন এত অল্প বয়সে এরূপ সুন্দর কবিতা আর কেহ লিখেন নাই। আমরা নবীন কবির দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। আমরা অতি শীঘ্রই তাঁহার এক নূতন গীতি-কাব্য পড়িয়া মোহিত হইবার আশা রাখি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দু-আচার ব্যবহার।

(সামাজিক।)

(পূর্ব্ব প্রাকাশিতের পর)

ক্রমে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় পূর্ব্বকীর্ত্তি, পূর্ব্ব-স্বাধীনতা, পূর্ব্বজ্ঞান ধর্ম্মের উন্নত অবস্থার জ্ঞান নিতান্ত স্থূল ও ভ্রান্তি-সঙ্কুল হইয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। সে জ্ঞানও যে লব্ধ হইত, সে কেবল গুণার্ণব কাশীরামদাস, পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মহিমান্বিত তুলসী দাস, তথা পুরাণ ব্যবসায়ী বঙ্গীয় কথকঠাকুরদিগের গুণেই! তাঁহারা যদি ভাষায় ভাষিত করিয়া না দিতেন, তবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির সহিত অন্যান্য দুরবগাহ শাস্ত্রের ভাগ্যাংশ ভোগ করিত সন্দেহ নাই। এই সকল উপায়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের বহু পূর্ব্বপুরুষের যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতেন, তাহা ইতিহাসের জ্ঞান লাভের ন্যায় নহে, তাহা অলৌকিক উপন্যাসবৎ অথবা ধর্ম্ম শাস্ত্রের অঙ্গ, এই ভাবেই পাঠ বা শ্রবণ করিতেন। হিন্দুরা যে এক কালে মহাভুজ বীর্য্য-শালী, অতুল্য কীর্ত্তিমান ধর্ম্মপরায়ণ স্বাধীন জাতি ছিলেন; যদি যবনেরা আসিয়া ব্যাঘাত না জন্মাইত, তবে অদ্যাপি হিন্দুদিগের তদ্রূপ বা তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা থাকিতে পারিত, এভাবে তাঁহারা সে সব পুরাণের বিবরণ গ্রহণ করিতেন না;— দুর্দ্দান্ত যবনের নির্য্যাতনে তাঁহারা এত নিস্তেজ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল, স্বজাতিত্ব ও স্বাধীনতা-ভোগেচ্ছা একবারে এত নির্ম্মূল হইয়াছিল, যে তাঁহাদের এমনি একটী ধ্রুবজ্ঞান জন্মিয়াছিল, যে, যখন পুরাণ-বর্ণিত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন হিন্দুরা পরের অধীনে, পরের সেব্যতা করিয়া, পরের মুখ চাহিয়া কেবল খাবে, পরিবে, থাকিবে. এই পর্য্যন্ত করিতেই ভগবান তাহাদিগকে অবনীতে রাখিয়াছেন। মহাভারত পাঠে তাঁহারা রাজা জন্মেজয় পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশের ইতিহাস জানিতেন, তাঁহাকেই ক্ষত্রকুলের শেষ কুলপ্রদীপ ভাবিয়া রাখিয়াছেন। সে দীপ

নির্ব্বাপিত হওয়াতে সব অন্ধকারময়—তাহার পরে আর কোনো ক্ষত্রিয় ভারতবর্ষে ছিল কি না ইহা তাঁহারা জানিতেন না, জানিবার জন্য অনুসন্ধানও করিতেন না। সুতরাং গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ; পুরু-ভূপতির অসাধারণ মহত্ত্ব-মূলক মাহাত্ম্য; দিল্লীশ্বর পৃথুরাজাদির বৃত্তান্ত; সমবেত ক্ষত্রিয়রাজগণ কর্তৃক গিজ্‌নীর দুর্দ্ধর্ষ মামুদের প্রথমতঃ পরাজয়, পরে অদৃষ্টচক্রের দুর্নিবার আবর্ত্তনে তৎকর্তৃক হিন্দু রাজলক্ষ্মী অপহরণ; সোমনাথে হিন্দুবীরগণের অসামান্য সাহস এবং পরবর্ত্তী শোচনীয় ঘটনা; পাল ও সেন বংশের বহু শত বৎসরের শাসন এবং মোগল সম্রাটগণের সহিত রাজপুত্রজাতীয়ের অসাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব; এ সকল তত্ত্ব তাঁহারা কিছুই রাখিতেন না। কেবল মধ্য সময়ের রাজচক্রবর্ত্তী বিক্রমাদিত্যের ঐতিহাসিক নাম ও ঔপন্যাসিক অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের কথা তাঁহাদের শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়াছিল, এইমাত্র! তাহাও কি ভাবে? তিনি নিজে মনুষ্য ছিলেন না, শিবানুচর তালবেতাল তাঁহার একান্ত আজ্ঞাপালক সহায় ছিল, এই ভাবে! সুতরাং বাদশাহের বাদশাই, যাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন নবাবের নবাবী, যাহার প্রভূত শাসনচক্রে তাঁহারা পেষিত হইতেন; রাজোপাধি ভূস্বামীবর্গের রাজাই, যাহার মোহকরী শক্তিতে তাঁহারা মুগ্ধ ছিলেন; ইহা ব্যতীত মনুষ্যের দ্বারা আর যে কখনো কিছু হইয়াছিল, কি অন্য দেশে হইয়াছে, কি এখন হইতেছে, কি এই দেশেই আবার হইতে পারে, ইহা তাঁহারা বড় বুঝিতেন না! তাঁহাদের সংস্কারের যোগ-ফল তবে এইরূপ;—ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, আধুনিক কলিযুগে তাহা আর হইতে পারে না; শাস্ত্রে লিখিত আছে, কলিতে ম্লেচ্ছাধিপতি হইবে ক্ষত্রিয়কুল নির্ব্বীর্য্য হইবে; ব্রাহ্মণ বেদহীন এবং শূদ্রের বেতন-ভোগী হইবে; বৈশ্য ও শূদ্র স্ব স্ব বৃত্তিত্যাগী হইবে; চাতুর্ব্বর্ণ আচারভ্রষ্ট হইয়া ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিবে, ইত্যাদি সকলই বিপর্য্যস্ত, শ্রীভ্রষ্ট, সকলই হীন দশাপন্ন হইবে। অতএব যাহা ঘটিয়াছে, শাস্ত্রানুসারেই ঘটিয়াছে, তাহাতে আর কথা কি? অধীনতা, এ দাসত্ব, এ হীনতা অবশ্যভাবী—অবশ্যই তাহা স্বীকর্ত্তব্য—অবশ্যই তাহা সহ্য করিতে হইবে! এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবং নিজ নিজ ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এককালে নিশ্চিন্ত

হইয়া পড়িলেন। চিন্তাহীনতার ফল জড়তা; সেই জড়তাবীজ উদ্যানময় ছড়াইয়া পড়িল — বিলাতী ভেরাণ্ডার ন্যায় একস্থান হইতে সকল স্থান ছাইয়া ফেলিল! লোকের হৃদয়-ভূমিতে স্বদেশানুরাগরূপ যে কল্পবৃক্ষ ছিল, তাহা শুষ্ক হইয়া গেল—স্বার্থনামা উজাড় বৃক্ষে বিশাল ভারতভূমি পরিপূর্ণ হইল!

এমন সময় চিরচঞ্চলা রাজকমলা ইন্দ্রিয়াসক্ত যবনকে পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ়ব্রত সুকর্ম্মঠ সভ্যতম ব্রিটীস-অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন! যবনাধিকারের শেষাবস্থা ও ব্রিটিসাধিকারের আদ্যাবস্থাতে হিন্দু সমাজের সামাজিক ভাব বড় বিভিন্ন হয় নাই। সামাজিকগণ সেই নিরুদ্যম, সেই নিশ্চিন্ত, সেই ভগ্নোৎসাহ, সেই হৃদয়-শূন্যই রহিল! ভদ্র বালকগণ গুরু-পাঠশালে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে লাগিল; অভদ্র বালকগণ গোচারণ, কৃষি বা পৈত্রিক ব্যবসায়ে পিতা ভ্রাতাকে সাহায্য করিতে লাগিল; ভদ্রযুবক ও প্রৌঢ়বৃন্দ অর্থোপার্জ্জনে রত; অভদ্র যুবক ও বৃদ্ধও তাই। পলিতচর্ম্ম ধবলকেশ ভদ্র প্রাচীন মহাশয়েরা আহ্নিক পূজা, সংসারের তত্ত্বাবধান, শিশু পৌত্র ও শিশু দৌহিত্রের মনোরঞ্জন, বৈকালে কেহ বা মহাভারত, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ পাঠে মগ্ন, কেহ বা পাষ্টি হাতে 'কচে বারো' বলিয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য! সায়ং-সন্ধ্যান্তে প্রথমা রজনীতে পরিণত বয়সের বয়স্যদল কাহারো চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া হয় খোসগল্প, নয় ভ্রমাত্মক নিরর্থক রাজকীয় বিষয়ে বিতণ্ডা, নয়তো দলাদলির ঘোঁট করিয়া (কুক্কুর-শব্দ ব্যতীত) নীরব গ্রামকে ঘোর নিনাদিত করিয়া তুলিতেন! এইতো আবাল বৃদ্ধ ভারতের দৈনিক জীবন ক্ষেপণের তালিকা, বড় ভাল কাজের মধ্যে পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ, দোল দুর্গোৎসব ও পুত্র কন্যার বিবাহ। বড় মন্দ কাজের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ, লাঠিয়াল দ্বারা দাঙ্গা হাঙ্গামা ও মালিমোকদ্দমা। তখন যথার্থ সামাজিকতা রত্নে দেশ বঞ্চিত; কেবল দলাদলিরূপ সামাজিকতা মাত্র অবশিষ্ট। কর্ত্তারা তাহাতেই চিরজীবনের সুপক্কবুদ্ধি, সংগৃহীতজ্ঞান এবং রাশীকৃত বহুদর্শন সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া সন্তৃপ্ত!

তাহার পর খ্রীষ্টান মিসনরীগণ আগমন করিলেন। তাঁহারা কে, তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি, সে সন্ধান হিন্দু সমাজের কেহই লইল না। কেইমাত্র দুই একটী হিন্দু যুবক পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নবাগত

শিক্ষকদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, অমনি যেন ভীমরুলের চাকে ঘা পড়িল! কিন্তু কেবল গল্প, জনশ্রুতি ও হা হতোস্মি বই অন্য কিছুই হইল না! একদিকে হাহাকার, অথচ অন্য দিকে প্রাণতুল্য সুকুমার হিন্দু-কুমারগণকে মিসনরী স্কুলে পাঠান হইতেছে! এ যদি অন্য দেশে হইত, তবে কি রক্ষা থাকিত? যাও দেখি বিলাতের এক গণ্ডগ্রামের এক পার্শ্বে একখানি টোল বাঁধিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ দেও দেখি—একটীমাত্র কৃষকের পুত্রকে খৃষ্টানি হইতে হিন্দুয়ানিতে কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মেই আন দেখি, দেখ দেখি কি ঘটে? দেখ দেখি, কেমন তোমার টোলে কি তোমার সমাজগৃহে আর একটী ছাত্রও পড়িতে আসে? তখনই তাহারা গ্রামশুদ্ধ জড় হইয়া সভা করিবে, তখনি তোমার টোল বা সমাজগৃহ উঠাইয়া দিবে, তাহা না পারে তো নিদান এমন ব্যবস্থা করিবে, যে একটী প্রাণীও তোমাদের নিকট আসিবে না! ইহা ভাল কি মন্দ, আমি তাহার বিচার করিতেছি না। সমাজের তীব্রতা ও একতা বুঝানই আমার অভিপ্রায়।

সে যাহা হউক, তাহার পরে রাজপুরুষগণ শিক্ষা ব্যাপারে মনোযোগী হইলেন। হিন্দু কলেজ প্রভৃতি বহু ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সমাজরূপ স্থির বারিধিও আলোড়িত হইতে লাগিল! ক্রমে শিক্ষা প্রণালী এরূপ দাঁড়াইল যে, মাতৃ-ভাষা শিক্ষা না করিয়া এবং স্বদেশের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছুই না জানিয়া হিন্দু বালকগণ একেবারে ইংরাজী আরম্ভ করিল। বাটীতে বৃদ্ধ পিতামহীর নিকট শুনিয়াছিল, আমাদের শাস্ত্রে বলে পৃথিবী ত্রিকোণ, চ্যাপ্টা, বাসুকীর মস্তকে স্থিত, বাসুকী আবার কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে আসন করিয়া আছেন, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে ভূগোল পাঠকালে প্রমাণ পাইল পৃথিবী গোলাকার, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে শূন্যে ভ্রমণশীল, মাধ্যাকর্ষণই ইহার অবলম্বন। তাহারা বাল্যাবধি শুনিতেছিল, রাহু নামক চণ্ডালের গ্রাসে চন্দ্র সূর্য্য পতিত হইলে গ্রহণ হয়; গঙ্গা দেবীর দৈবশক্তি বিশেষে জোয়ার ভাঁটা জন্মে এবং এবং আলেয়া নাম্নী পেতনী স্বীয় মুখ হইতে অগ্নি উদ্গীরণ দ্বারা পথিককে দিগ্‌হারা করিয়া অভিপ্রেত বিল মধ্যে লইয়া গিয়া পাঁকে মাথা পুতিয়া ঊর্দ্ধে পা তুলিয়া মারিয়া ফেলে। ইংরাজী পড়িয়া জানিল এ সমস্তই ভ্রান্তিমাখা কল্পনার বিজৃম্ভণ মাত্র। প্রকৃত তত্ত্বের সহিত এ সব

মূর্খতার কোনও সংস্রব নাই! অন্ধকূপে চির-কারারুদ্ধ ব্যক্তির চক্ষে হঠাৎ সূর্য্য-কিরণ লাগিলে যেমন অসহ্য হয়, অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াই জল পান করিলে যেমন সর্দ্দিগর্ম্মী হয়, আশাতিরিক্তরূপে এই সব প্রাকৃতিক তত্ত্বের সত্য সন্ধান সহসা লাভ করিয়া তাহাদের স্বীয় সমাজ ও পৈত্রিক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি ঘোরতর অশ্রদ্ধা জন্মিল, স্বদেশের আচার ব্যবহার সমুদায়ই তাহাদের অসহ্য হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সামাজিকতার প্রতি তাহাদের আন্তরিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল। তখন দেশে ঘোর তান্ত্রিক ও পৌরাণিক কাণ্ড ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মমধ্যে যে উচ্চতর ভাব আছে, তাহা এক প্রকার সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। তখন কাজে কাজে যাহারা কেবল বেশী ইংরাজী-পণ্ডিত, তাহারা পৈত্রিক ধর্ম্মের প্রতি এককালে প্রীতিশূন্য এবং ঘৃণাপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অবস্থায় তাহাদের মন কোনরূপ পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য যে লালায়িত হইবে, আশ্চর্য্য কি? তখন খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোনও বিশুদ্ধ শ্রেণীর সত্তা ও তত্ত্ব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত না, সুতরাং মগ্নতরীর ভাসমান লোকের কাষ্ঠফলকাশ্রয় সদৃশ সেই ধর্ম্মকে তাহাদের মধ্যে অনেকে আগ্রহ সহকারে আশ্রয় করিল। আবার তৎকালে যে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় খ্রীষ্টান এখানে আসিতেন, তাঁহাদের উচ্চ স্বভাব, সচ্চরিত্র, উন্নত ভাবময় বাক্য ও উদার কার্য্যকলাপ নবশিক্ষিত নবীন হিন্দুর চক্ষে দেব-ব্যবহারবৎ অনুভূত হওয়াতে তাঁহাদের ন্যায় বসন ভূষণ গ্রহণ ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার শিষ্টাচারের অনুকরণে তাহারা প্রবৃত্ত হইল।

তারপরে রাজা রামমোহন রায় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতিঃ অল্পে অল্পে প্রখর দীপ্তি ধারণ করিতে লাগিল। এই নব ধর্ম্ম পূর্ব্বপ্রচলিত পৌত্তলিক এবং নবোপদিষ্ট খ্রীষ্টান উভয় ধর্ম্মেরই প্রতিদ্বন্দ্বী বলীয়ান যোদ্ধৃবেশে রণ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু এই ধর্ম্মের সার বিবেচনা করিলে ইহা কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নহে. অথচ খ্রীষ্টান ধর্ম্ম বিস্তারের প্রতিবন্ধক এবং দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম-প্রকরণের সংশোধকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেন না খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণে হিন্দু সন্তানকে যেমন জাতি ও সমাজ-চ্যুত হইতে হইত, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে তাহার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তরুণবয়স্ক শিক্ষিত হিন্দুরা দেখিল, কিয়দ্দিন পূর্ব্বে তাহাদের যে শাস্ত্রকে ভ্রান্তিসঙ্কুল, অসত্য-

প্রাকৃতিক-তত্ত্ব-বাহক ও দুর্নীতি-বোধক পৌত্তলিক বলিয়া উপেক্ষা করা হই-য়াছে, তন্মধ্যেই পরম সত্য নিহিত আছে। তাহারা দেখিল, পৌরাণিক ধর্ম্মের ন্যায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মেও অবতার ও অলৌকিক ঐশ্বরিক ক্রিয়াদি রহিয়াছে ; কেবল দেশীয় জংলাভাব ও বিলাতী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যে প্রভেদ, নতুবা উভয় ধর্ম্মই প্রায় সম-ধর্ম্মাক্রান্ত। তাহারা দেখিল, নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সে দোষে মুক্ত এবং তদ্ধর্ম্ম অবলম্বনে সমাজ-চ্যুতিরূপ দুঃখ ও পিতৃ-মাতৃ-বর্জ্জনরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতে হয় না, অথচ দেশী বিলাতী পৌরাণিক ধর্ম্মের হাতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাহারা আরও কত কি দেখিল ; দেখিয়া, শুনিয়া, ভালরূপে বুঝিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আর বড় অগ্রসর হইল না—অধিকাংশ শিক্ষিতগণ ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিল।)

এ স্থলে বলা উচিত যে, আমরা সমাজের কথা বলিতেছি, ধর্ম্মের বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; আপন আপন পরকালের কল্যাণ উদ্দেশে যাঁহার যাহা ভাল বোধ হয়, তিনি সেই ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করুন। কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজকে নষ্ট করার অধিকার কাহারও নাই। (ঈশ্বরকে যিনি যে ভাবেই ডাকুন, কিন্তু ঐহিক উন্নতি ও সুখ লাভের জন্য সকলে সমবেত হইয়া এক মতে ও এক পথে চলিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মগণ ঠিক্ চলিতে পারিল না। কালে তাহাদের পদস্খলন আরম্ভ হইল। তাহাদের মধ্যে এক ঘোর অনিষ্ট আসিয়া জুটিল। ব্রাহ্মগণের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত হইল। আদি ব্রাহ্মগণ পূর্ব্ব সমাজ ও সামাজিকত্বাকে রক্ষা পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনার ইচ্ছুক। নব উন্নতিশীল ব্রাহ্মেরা সমাজ-বিপ্লব অভিলাষ করিতে লাগিলেন। মতের সামঞ্জস্য না হওয়াতে শীঘ্র তাঁহারা দুই দলে পৃথক্ হইলেন। শেষোক্ত সম্প্রদায় মধ্যে আবার মত-ভেদ আরম্ভ হইল। কতকগুলি লোক স্ত্রী-সমাজের পূর্ব্ব নিয়ম হইতে এককালে বহির্গত হইয়া নিতান্ত ইউরোপীয় ধরণের স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য লোলুপ হইলেন। এইরূপে হিন্দু সমাজ নিশ্চল ভাব হইতে এককালে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক উদ্যম শালিতায় উপস্থিত হইল। কিন্তু "ক্ষীণে বলবতী" কথাটা বড়ই ভয়ানক ইহার ফল প্রায়ই বিষময় হইয়া থাকে।)

* ইংলণ্ডে পিউরিটানগণ এক দিন বড়ই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রে

যেমন বলে এবং যুক্তিতে যাহা কিছু ন্যায্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইত তাহারা তদনুরূপ উপাসনা ও আচরণ করিতে সংকল্প করিল। দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম, রাজশক্তি, রাজ্যশাসনপ্রণালী ও সমাজিক আচারে তাহাদের যুক্তিতে অনেক দোষ লক্ষিত হইতে লাগিল, তাহারা সেই সমস্ত দোষের নিরাকরণ পূর্ব্বক যাহাতে সমাজে শাস্ত্রানুরূপ ও যুক্তিমূলক বিশুদ্ধ উপাসনা ও আচার-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যে বিষয় আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আইসে, সে বিষয় উঠাইয়া বল পূর্ব্বক অথবা যুক্তি দান পূর্ব্বক সহসা নব প্রথা প্রবর্ত্তিত করা কখনই হইতে পারে না। নবরীতি প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত শুদ্ধ শাস্ত্র প্রদর্শন ও যুক্তিমার্গ অবলম্বনই যথেষ্ট নহে। তজ্জন্য প্রবর্ত্তককে অগ্রে লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া আবশ্যক। তাঁহার অভিপ্রায় যে সাধু, তিনি যে যথার্থ সমাজের হিতৈষী, তিনি যে সকল রকমে একজন বিশেষ কাজের লোক, এমন বিশ্বাস অগ্রে জন্মাইয়া তাহার পর মাধুর্য্যভাবে সময় ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে লোকের হৃদয়কে পরিবর্ত্তনের বীজ ধারণের জন্য প্রস্তুত করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়। নতুবা লম্ফ দিয়া সমাজের গণ্ডী ছাড়িয়া সঙ্গীগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া অভিমান ও স্পর্দ্ধারূপ উচ্চ স্থান আরোহণ করিয়া বুকে হাত দিয়া বাহাদুরীস্বরে গলা ছাড়িয়া ডাকিয়া বলিলেই হয় না, যে,—"ওগো! তোমাদের আচার ব্যবহারে বড় দোষ; তোমরা জানিতে পার নাই, আমি জানিয়াছি; তোমরা এই দণ্ডেই আমার পথে আইস—আর অন্ধকারে থেকো না!" এ অবস্থায় তাহার কথা শুনিয়া লোকে গ্রাহ্য না করিয়া যে করতালি দান ও বিদ্রূপের বিকট হাস্য পূর্ব্বক তাহার গায় ধূলা নিক্ষেপ করিবে, সন্দেহ নাই! পিউরিট্যানদের সেই দশাই ঘটিয়াছিল। তাহাদের সেই শুভ-চেষ্টায় যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, দেশের অধিকাংশ লোক তাহাদের গোঁড়ামী, তীব্রতা, অসহিষ্ণুতা এবং অস্বাভাবিক তৎপরতা দেখিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল! (পিউরিট্যানেরা প্রায় হাসিত না, কোনো প্রকার সামাজিক আমোদ উৎসবেই লিপ্ত হইত না, শোভাকর বসন ভূষণ ধারণ করিত না, সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে থাকিত, সকল কথাতেই ধর্ম্মতত্ত্ব আনিত, সকল

কার্য্যেই ঈশ্বরকে ডাকিত! উঠিতে বসিতে, খাইতে, শুইতে তাহাদের অঙ্গ-ভঙ্গীও যেন কেমন এক প্রকারের ছিল! এই সব কারণে তাহারা নিয়ত হাস্যের আস্পদ হইয়া উঠিল! এমনি হইল যে, পিউরিট্যানকে দেখিবা মাত্রই লোকে হাসিত, অসভ্রমের কথা কহিত! তাহারা যেন সমাজের সং হইয়া উঠিল লোকে রাস্তা ঘাটে নাট্যালয়ে তাহাদিগকে বা তাহাদের কথা লইয়া রং করিতে লাগিল!)

এমন বিশুদ্ধ অভিপ্রায়ের এমন ফল হইবার কারণ কি? তাহার কারণ শুদ্ধ তাহাদের অতিগমন! সহজে অল্পে অল্পে স্বভাবের নিয়মানুসারে উন্নতি সাধন না করিয়া তাহারা একেবারে একদিন সকল দোষ ও সকল ক্রটী নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইল, একদিনেই মানব প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া সম্পূর্ণতা সাধন করিতে চেষ্টা পাইল, যে দেশাচারের মূল শিকড় শত হস্ত বর্দ্ধিত হইয়া পাতাল ফুঁড়িয়া বলিরাজার মস্তকে গিয়া ঠেকিয়াছে, এক দিনেই তাহাকে উৎপাটিত করিয়া, তৎস্থানে নবতরুকে বদ্ধমূল করিতে যত্ন করিল. সুতরাং অসম্ভবের সাধনে যেমন নিরাশ হইতে হয়, তাহাই হইল!

যাহাদের মনে বিচারশক্তি অপেক্ষা কল্পনাশক্তি সমধিক তেজস্বিনী—যাহারা "সু" ও "কু" যে দিকে যখন যায়, সেই দিকেই তখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত গতিতে গমন করে, তাহারা ভিন্ন সে দলে যোগ দিতে অন্যের রুচি হইবে কেন? প্রতি সমাজে এমন অতিগমনশীল লোক কজন থাকে? সুতরাং সাধারণ সমাজকে তাহারা আকর্ষণ করিতে অশক্ত হইবেই হইবে। লোকের মধ্যে তাহাদিগকে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হইয়া থাকিতে হয়।

যে পিউরিট্যানদের কথা বলা গেল, তাহারা ইংলণ্ডে তৎকালে এত প্রবল হইয়াছিল যে, রাজার সহিত ও শেষে পার্লামেণ্টের সহিতও যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে পারিয়াছিল। চার্লস ভূপতির দোষের বিচার করিয়া তাঁহাকে ফাঁসিতে বধ করিল এবং আপনারাই দেশাধিপ হইয়া উঠিল। এত করিয়াও তবু তাহাদের নবপ্রণালীকে স্থায়ী রাখিতে পারে নাই। যেই মাত্র ক্রমওয়েলের মৃত্যু হইল, অমনি পূর্ব্ব প্রণালী চতুর্গুণ বলের সহিত—পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ দোষ গুণের সহিত পুনঃস্থাপিত হইয়া উঠিল! "সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং" এই প্রাচীন জ্ঞানবাক্য কোথায় যাইবে? অতিশয়

গোঁড়ামী এবং লম্ফ-ঝম্প-বিশিষ্ট উন্নতির বিরাট মূর্ত্তি দেখিয়া সমাজ ভয় পাইল, প্রকৃতি রুষ্টা হইলেন, সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরও বিমুখ হইলেন! পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় পিউরিট্যানদের এত আড়ম্বর, এত রক্তপাত, এত উগ্র অনুষ্ঠান, সব ব্যর্থ হইয়া গেল!

(আমাদের সমাজেও এক্ষণে সেইরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ অাগমনের চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে। এই জন্যই পিউরিট্যান সম্বন্ধীয় কথা এত বাহুল্যরূপে বলিতে বাধ্য হইলাম! আমাদের উন্নতিশীল ভায়াদের এই ইতিহাসখণ্ডকে স্মরণ করিয়া এখনও সাবধান হওয়া উচিত। আমরা উন্নতির বিরোধী নহি। উন্নতির অভিলাষী! কিন্তু আমাদের সমাজকে ছাড়িয়া যদি যাই, তবে কাহাকে লইয়া উন্নতির রাজ্যে বসতি করিব? সমাজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে উন্নতি, তাহা যদি অবলম্বন করি, তবে তো সমাজদ্রোহী হইলাম—সমাজ আমাকে আর বিশ্বাস করিবে কেন? দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার তারতম্য বশতঃ এক দেশে এক অবস্থায় যাহা উন্নতি; অন্য দেশে, অন্য অবস্থায় তাহা অধোগতিও হওয়া সম্ভব। তাহা বিচার না করিয়া পরের দেখাদেখি উন্মত্ত হইলে কি হইবে? ল্যাপল্যাণ্ডের লোক প্যারিস ও লণ্ডন নগরের দেখাদেখি যদি সুদৃশ্য অশ্ব যানাদি তাহাদের দেশে লইয়া যায়, তবে বরফের উপর সেই গাড়ী ঘোড়া কি চলিতে পারে? না তদ্দেশীয় বল্‌গা-হরিণের গাড়ী প্যারিস, লণ্ডন ও কলিকাতায় ব্যবহৃত হওয়া সম্ভব?

সামাজিক পরিবর্ত্তনের ধর্ম্ম অতি আশ্চর্য্য। ভাষাই হউক আর লোকাচারই হউক, ইহা কাহারো আজ্ঞায়, কাহারো বিনয়ে, কাহারো অর্থে, কাহারো বল-প্রকাশে কখনই রূপান্তরিত ও অবস্থান্তরিত হইবার নহে। ইহা যখন পরিবর্ত্তিত হয়, (সুদিকে, কুদিকে যে দিকে হউক) তখনি যে কি কারণে কোথা হইতে কেমন করিয়া ঘটে, তাহার নির্দ্দেশ করা বড় দুরূহ। বড় বড় লোকের বড় বড় উদ্যোগে যেটী সিদ্ধ হয় না, হয় তো অতি সামান্যসূত্রে সামান্য লোকদিগের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়া উঠে! হ্যামিল্টন-নামা ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রবিৎ মহাশয় সামাজিক উন্নতি উপলক্ষে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, "সকলেই

জানেন, বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই বাড়িতে থাকে, কিন্তু সমস্ত দিবা রজনী সহস্র নর-চক্ষু প্রহরীরূপে নিযুক্ত থাকিলেও সেই বৃদ্ধি দেখিতে পাইবে না! অর্থাৎ যে চারা কল্য দুই অঙ্গুলি ছিল, অদ্য তাহা চারি অঙ্গুলি হইয়াছে, ইহা মাপিয়া পাইবে; কিন্তু কখন্ কতটুকু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা দর্শন করিবার সাধ্য নাই!" অতএব স্বভাবের এই নিয়মানুসারেই সমাজের উন্নতি হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন অন্য যত উন্নতি, তাহা অস্বাভাবিক, ক্ষণিক অথবা দোষান্বিত!)

উন্নতির বিরোধী আমরা নহি। উন্নতি চাই। কিন্তু তাই বলিয়া অস্বাভাবিক উন্নতি চাই না। যে সকল পরিবর্ত্তনের জন্য সমাজ প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা আমাদের সমাজের ধাতুতে সংলগ্ন হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে হউক। সেগুলি সিদ্ধ হইলে, অন্য উন্নতির জন্য সমাজ সহজেই আবার প্রস্তুত হইবে। এখন যাহাকে অস্বাভাবিক বলিতেছি, তখন সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর নূতনত্ব অনায়াসেই স্বাভাবিক হইয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পরিবর্ত্তনোন্মুখ বলিতেই হইবে। যাঁহারা পুরাতনের নিতান্ত ভক্ত, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, যে, শিক্ষার নূতন প্রণালী, যুক্তির নূতন প্রণালী এবং দৃষ্টান্তের নূতন প্রণালী যাহা বহুবৎসরাবধি হিন্দুসমাজমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আপনাপনিই আচার ব্যবহারের কিয়দংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আর কতকগুলি অংশে পরিবর্ত্তন না হইলে চলে না! সে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে, তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে কাহারো সাধ্য নহে! কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কোন্ বিষয়ে, কি পরিমাণে কতদূর হইবে, তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? এবং তাহাতে মঙ্গলামঙ্গল কতদূর সাধিত হইবে, তাহা এক্ষণে সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। এই মাত্র অনুমান হইতে পারে, যতদিন সেইরূপ কতকগুলি ভাবান্তর না ঘটিতেছে, ততদিন সমাজের যথার্থ সামাজিকত্ব স্থিররূপেও দাঁড়াইতেছে না।

\বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে অবস্থা, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহাকে সমাজ বলি, কি, কি বলি ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারি না। এই প্রবন্ধের

আরম্ভেই সমাজ কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে তাহা কৈ? সমাজের সে সব সর্ব্বজনমান্য নিয়ম কোথায়? এমন স্থান নাই যেখানে প্রাচীন নব্য ও শিক্ষিত অশিক্ষিত এক প্রকার নিয়মে চলিতেছে? এমন সংসার প্রায় দেখি না, যাহাতে পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্ত্রী পুরুষে এক ভাবে—এক প্রথায়—এক ব্যবহারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে! শূদ্রের বাটীতে একটী ব্রাহ্মণ আসিলেন, পিতা প্রণাম করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক আসন দিলেন; পুত্র "নন্সেন্স" বলিয়া হাস্য করিয়া চলিয়া গেল! পিতার বন্ধু আগত, পিতা নমস্কার করিলেন; পুত্রের বন্ধু আগত পুত্র "সেক্‌হ্যাণ্ড" করিলেন! মাতা সুবচনীর আলিপানা দিতেছেন, কন্যা বা পুত্রবধূ ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া পৌত্তলিকতার প্রতি বীভৎস-রসে গলিয়া যাইতেছেন! কর্ত্তা দশভূজার আরত্রিক সময় চামর হস্তে দেবীকে ব্যজন করিতেছেন এবং কর্ত্রী সন্ধিপূজাবসানে ঢাকের বাদ্যের সহিত পুত্র কন্যার কল্যাণে মাথায় ধুনা পোড়াইতেছেন; সেই কালে পুত্র স্বীয় ভগ্নী ও ভার্য্যার সহিত পোষাক পরিয়া ব্রাহ্মমন্দিরে গমন করিতেছেন! স্ত্রী আসনে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছেন, স্বামী পাদুকা পায় সমাগত হইলেন দেখিয়া স্ত্রী সভয়ে বিনীত ভাবে "উঁহুঁ" বলিয়া নিষেধ করিতেছেন! স্ত্রী গ্রহণের সময় তণ্ডুল, বস্ত্র উৎসর্গ করিতেছেন, স্বামী "হো হো" শব্দে হাসিয়া সেই সময় আহার করিতে বসিতেছেন! গ্রামস্থ বৃদ্ধ মহাশয়েরা "কলিকাল কলিকাল" বলিয়া নব্যতন্ত্রের ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রকাশ করিতেছেন; নব্যতন্ত্র এ সময়কে "সত্যযুগ" করিবেন, এমত আশা করিতেছেন, কেবল এই কয়জন স্থবিরের গতাসু হওনের অপেক্ষা!)

এরূপ দৃষ্টান্ত কত বলিব? এমন বিসদৃশ, বিরুদ্ধ জনাকীর্ণ জাতিকে কি সমাজ বলা যায়? যত দিন না ইহাদের সামঞ্জস্য হইবে—যত দিন স্বজাতীয় মধ্যে সম্পূর্ণ সমবেদনা ও সহৃদয়তা না জন্মিবে—যতদিন সামাজিকতাকে প্রাণাপেক্ষা রক্ষণীয় বলিয়া আবাল বৃদ্ধ নরনারী সকলের দৃঢ় মমতা ও সকলের মনেই এক সমাজকে আমাদের সমাজ বলিয়া প্রত্যয় হইবে, ততদিন হিন্দু-সমাজকে যথার্থ সমাজপদে স্থাপিত করা ভার! [ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন বসু।

গান।

১

ললিত—কাওয়ালি।

প্রাণ কেন এমন করে, (আমার)
কি হ'ল কি হ'ল রে অন্তরে।
ভ্রমি ত্রিভুবন মন
করে কার অন্বেষণ,
কাতর নয়ন কার তরে!
ত্যজি এই মর্ত্ত্য-ভূমি,
কোথা চ'লে গেলে তুমি
কি জানি কি অভিমান-ভরে।

২

ললিত—কাওয়ালি।

(অহহ!) সম্মুখে সুমঙ্গল একি!
দেবি, দাঁড়াও নয়ন ভ'রে দেখি;
ত্যজেছ মানব-কায়া,
আজো ত্যজ নাই মায়া
একি অপরূপ ছায়া—একি!
করুণ নয়ন দুটি
তেমনি র'য়েছে ফুটি
তেমনি চাঁচর কেশ বেশ,
মলিন্ মলিন্ মুখ
কেন গো কিসের দুখ,
ভালবাসা মরণে মরে কি!

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

অদৃষ্টবাদ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আগুণে হাত দিলাম, হাত পুড়িয়া গেল; জলে উত্তাপ দিলাম, বাষ্প হইয়া গেল; দুয়ারে আঘাত করিলাম, দুয়ার ভাঙ্গিয়া গেল, এ সকল স্থলেই এক একটী কার্য্যের পূর্ব্বে এক একটী কারণ বর্ত্তমান। আমরা আগুণকে হাত পোড়ার কারণ বলি, জল এবং উত্তাপকে বাষ্পের কারণ বলি, এবং আঘাতকে দুয়ার-ভাঙ্গার কারণ বলিয়া মনে করি। ইহা ব্যতীত অন্য কোন ঘটনাকেইবা তাহা বলি না কেন? অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে, আগুণ বা আঘাত এই উভয় শ্রেণীর কারণই তাহাদের কৃত কার্য্য সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী। এইরূপ সকল স্থলেই দেখিতে পাই যে, আমরা যাহাকে কারণ বলি তাহা তাহার কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকেই কারণ বলি না। হাত পোড়ার পূর্ব্বে, বাষ্প হইবার পূর্ব্বে, দুয়ার ভাঙ্গার পূর্ব্বে, অন্যান্য অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে, অথচ আমরা তাহাদিগকে কারণ বলি না। যেখানেই দেখিয়াছি, হাতে আগুণ লাগিয়াছে সেই খানেই দেখিয়াছি হাত পুড়িয়া গিয়াছে, যেখানেই দেখিয়াছি জলে আর উত্তাপে সংযোগ, সেই খানেই বাষ্পের উৎপত্তি; যেখানেই দেখিয়াছি দুয়ার ভাঙ্গিয়াছে, তাহারই পূর্ব্বে কোন না কোন প্রকার শক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাইয়াছি। এইরূপ সকল স্থলেই কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু রজনী দিবসের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। তবু আমরা রজনীকে দিবসের কারণ বলি না কেন? আমরা দেখি যে রজনী হইলেই যে পরে দিবস হইবে আর রজনী না হইলে যে দিবস হইবে না ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সূর্য্যোদয় না হইলে অনন্ত কাল পৃথিবীর মুখ অন্ধকারে ঢাকা থাকিলেও দিবসের উৎপত্তির কোন সম্ভাবনা দেখি না। অথচ আজ হইতে যদি সূর্য্যদেব অস্ত গমন না করেন, কখন রাত্রি না হইলেও চিরকাল দিবসের আলোক দেখিতে পাইব। অতএব দেখা যাইতেছে যে রজনীর পর দিবস হওয়া পক্ষে সূর্য্যো

দয় নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্য সূর্য্যকেই দিনের কারণ বলি, রাত্রিকে বলি না। কারণের কার্য্য নিরপেক্ষ (Unconditional) হওয়া আবশ্যক। সূর্য্যোদয় হইলেই দিন হইবে, সূর্য্যের এই ক্রিয়া আর কোন ঘটনার অপেক্ষা করে না।

সাধারণতঃ কার্য্যকারণের মধ্যে এই লক্ষণগুলি দেখান হইয়া থাকে। মিল কারণের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে এই কয়েকটী ছাড়া আর কোন প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন নাই।* কিন্তু, আজকাল, বৈজ্ঞানিকেরা কার্য্য এবং কারণের মধ্যে আর একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। সকল স্থলেই কার্য্য এবং কারণের মধ্যে প্রকার এবং পরিমাণগত একটি অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। অর্থাৎ কারণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ ভেদে কার্য্যেরও প্রকৃতি এবং পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। অর্থাৎ কতটা পরিমাণ উত্তাপে কতটা পরিমাণ আলোকের উৎপত্তি হইবে, অথবা কতটা পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তিতে কতটা পরিমাণে আলোকের উৎপত্তি হইবে ইহার একটি নিয়ম আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এই নিয়মটির সম্বন্ধে এক প্রকার মত ভেদ নাই, সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্যেই এই বিশ্বাসটি নিহিত †। এই নিয়মটি যেমন প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার কার্য্য কারণের নিয়মের নিত্যতা এবং সর্ব্বস্থল-প্রয়োগিতা ধরিয়া লইলে, তাহা হইতে যুক্তি দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে আমরা কার্য্য কারণের মধ্যে এই কয়েকটি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া থাকি।

১। কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকে।

২। প্রকৃত কারণের কার্য্য নিরপেক্ষ ভাবে হইয়া থাকে।

---

* We may define therefore the cause of a phenomenon to be the antecedent or concurrence of antecedents on which it is invariably and unconditionally consequent.

† The conclusion tacitly agreed on by physicists is not only that physical forces undergo metamorphoses, but that certain amount of each is the constant equivalent of certain amount of others.

H. SPENCER. *First Principles.*

৩। কার্য্য এবং কারণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ গত একটি অপরিবর্ত্তীয় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়।

কিন্তু এ সমস্তই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সীমা বর্ত্তমান এবং অতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং ভবিষ্যতে এই নিয়ম কতদূর প্রযুজ্য তাহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে বলিতে পারা যায় না। আমরা যে বিশ্বাস করি যে এই নিয়ম সকল সময়ে এবং সকল স্থলে খাটিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কখনও কোথায় যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবে তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। মিল্ প্রভৃতির মতে এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। কিন্তু সে কথা থাক। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান ইহার বেশি যাইতে পারে না; কেবল বিজ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইলে এ বিশ্বাসের ভূমি কেবল অভ্যাস (custom) ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, এখন আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, আমরা যে যে লক্ষণ দ্বারা জড়জগতের ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই, ঠিক্ সেই সেই লক্ষণ অন্তর্জগতের ঘটনাশৃঙ্খলের মধ্যেও লক্ষিত হইয়া থাকে। মাত্র তাহাই নহে। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের মধ্যে পরস্পরে যে সম্বন্ধ, তাহার মধ্যেও আবার এই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান। অর্থাৎ অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ যে স্বতন্ত্রভাবে এই নিয়মের অধীন, তাহা নহে, এই দুই জগৎ পরস্পরে পরস্পরের সহিত এই নিয়মে বদ্ধ। কখনও বহির্জগতের শক্তি অন্তর্জগতের উপর কার্য্য করিতেছে, কখনও অন্তর্জগতের শক্তি বহির্জগতের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে।

বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট থাকিয়া আমরা কখন কখন কোনও ব্যক্তিকে সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখি, কিন্তু তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করি না; কখন বা কাহাকেও দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হয়, কিন্তু সেই কৌতূহল নিবৃত্ত হইলেই তাহার আর কোনও তত্ত্ব লই না; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার যখন কোনও বন্ধুকে দেখিতে পাই, অমনি চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আমরা চিন্তা ভুলিয়া যাই, হৃদয়ে প্রেমের উদয় হয়, সাদরে বন্ধুকে আলিঙ্গন করি। প্রথমত, আমার মনের উপর মাত্র

ইন্দ্রিয়জ্ঞানজনিত একটু পরিবর্ত্তন হইল, তাহার কারণ অবশ্য কতক অন্তরে কতক বাহিরে। দ্বিতীয়ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর একটু দর্শনসুখ অনুভূত হইল, জ্ঞান হইতে ভাবের উৎপত্তি হইল। তৃতীয়ত, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পর ভাববোধ হইল, কিন্তু তাহাতেই ইহার শেষ হইল না; ভাবের আধিক্যবশতঃ তাহাতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিলাম; শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন বিশেষ উপস্থিত হইল, প্রেমের সহিত বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলাম। কেহ কেহ বলেন, ঐ খানেই কার্য্যকারণশৃঙ্খলের শেষ। উপযুক্তরূপ প্রাকৃতিক কারণ থাকিলেও ইচ্ছাশক্তির বিকাশ না হইতে পারে। কিন্তু এ কথা কতদূর প্রামাণিক বা সঙ্গত বলিতে পারি না। আমরা কি সকল স্থানেই দেখি না, অন্য কোন প্রকার বাসনা উপস্থিত না হইলে প্রেম আলিঙ্গনের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী? এইরূপ প্রত্যেক ইচ্ছা শক্তি প্রকাশের মূলেই দেখিবে কোন না কোন প্রকার প্রাকৃতিক কারণ রহিয়াছে। উদ্দেশ্যশূন্য বাসনাশূন্য, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ আমরা কোথা ত দেখি নাই। যেখানেই ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগ দেখি, সেই খানেই দেখি একটা না একটা বাসনা রহিয়াছে। বস্তুত এখানেও কার্য্যকারণ লক্ষণগুলি দেখিতে পাই। কষ্ট পাইলে তন্নিমোচনে যত্ন পাই, সুখ পাইলে তাহা ভোগ করিবার চেষ্টা হয়, রাগ হইলে আততায়ীর প্রতি আক্রমণ এবং উপকার পাইলে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন, অন্যায় কার্য্য করিলে আত্মগ্লানি এ সকল স্থলেই আমরা পূর্ব্বকথিত লক্ষণ গুলি দেখিতে পাই। এখানেও দেখি কার্য্যের পূর্ব্বে নিয়ত তাহার কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানেও দেখি কারণের প্রকৃতি ও পরিমাণ অনুসারে কার্য্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদ হয়। ক্রোধের পরিমাণানুসারে প্রতিশোধ-চেষ্টারও পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। উপকারের পরিমাণানুসারে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ ভেদ হইয়া থাকে। এখানে সকলকেই স্বীয় অন্তরেন্দ্রিয় সাক্ষীর উপর নির্ভর করিতে হইবে। যুক্তি প্রত্যক্ষ বিষয়ে কিছু বলে না। এই যে অনন্তবিস্তৃত জড় জগৎ আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, যদি কেহ চক্ষু খুলিয়া বলে যে সে ইহার কিছুই দেখিতেছে না অবশ্য যুক্তি দ্বারা তাহাকে ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায় না। কেহ বলিতে পারেন কেন আমি কি মনে করিলে বন্ধুকে দেখিয়া আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারিতাম না।—আমি বলি, হাঁ, মনে

করিতে পারিতাম, কিন্তু মনে করারও কোন কারণ থাকা আবশ্যক। আমি যাহা মনে করি সেইরূপই ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি বটে, কিন্তু আমি যেরূপ মনে করি সেইরূপ মনে করিতে পারি না। বাসনার রাজ্য ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। হইতে গেলে, অন্য কোন বাসনা দ্বারা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত হইতে হয়। ইচ্ছাশক্তির পূর্ব্বে বাসনার রাজ্য। মনে করুন, সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন যে, এই যে লুচি-মোণ্ডা-শোভিত পাত্র সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর তিনি একজন ব্রাহ্মণকুলতিলক সেখানে বসিয়া আছেন, আমাদের মতে এখানে যেরূপ কারণ সমাবেশ হইয়াছে, নিশ্চয়ই শীঘ্র জনার্দ্দনের সিংহাসন টলিবার কথা। কিন্তু তবে যে সম্পাদক মহাশয় কিয়ৎ কালের জন্য 'ভোজনেষু জনার্দ্দনঃ' এই শাস্ত্রীয় মহাবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমায় বলিতেছেন—কই এখানে যথেষ্টরূপ এবং বিশিষ্টরূপ কারণ সমাবেশ সত্ত্বেও তিনি তো স্বেচ্ছায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ বন্ধ করিলেন। আমি বলি, হে ব্রাহ্মণ-কুল-ধুরন্ধর যদিও ক্ষণকালের জন্য দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ শাস্ত্রীয় বাক্য লঙ্ঘন করিয়া নরক গমনের উপায় করিতেছেন, অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই মহাপাপের কোন কারণ আছে। নতুবা আপনার যে কুলে জন্ম আপনার পক্ষে এ মহাপাপ অসম্ভব। বাস্তবিক আমাকে তাঁহার ক্ষমতা দেখানই কি এই ব্যবহারের কারণ নয়? মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করিলে যে কি কষ্ট পাইতে হয় তাহা সম্পাদক মহাশয় বুঝিতেছেন। এবং বোধ হয় এই পাপের জন্য তাঁহার কিছুদিন নরক-ভোগ হইবে। বস্তুতঃ যেখানেই মনে হয়—কোন কারণ ব্যতীত কার্য্য করিতেছি সেইখানেই খুঁজিলে এইরূপ একটা না একটা কারণ আছে দেখিতে পাইব।

তবে, আমরা বুঝিতে পারিলাম যে অন্তর্জগতের নিয়ম সকলও সম্পূর্ণ রূপে এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের অধীন। কার্য্য-কারণের শৃঙ্খল যেমন বহির্জগৎ তেমনি অন্তর্জগতকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এতক্ষণ আমরা অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগতকে পৃথক করিয়া দেখিতেছিলাম। এইবার একবার উভয় জগৎকে একত্রিত করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলিয়াছি মনুষ্যজীবন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের ফল।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে প্রথমে আমরা মানসিক ক্রিয়া মনে করিয়া লইয়া তাহার সহিত ভাব ও ইচ্ছার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছি। এখন দেখা যাউক এই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সঙ্গে বাহ্যশক্তির কিরূপ সম্বন্ধ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কিছু দূর পর্য্যন্ত মানসিক শক্তিতে বাহ্যিক শক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে। বিশেষ মনোযোগের সহিত কোন কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিলে হয় ত ছোট একটা শব্দ কর্ণেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করিলেও শব্দবোধ না হইতে পারে। কিন্তু ইহার একটা সীমা আছে। মানসিক চিন্তা যতই প্রবল হউক না কেন কামানের আওয়াজ আমায় শুনিতেই হইবে। যাহা হউক মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা এক দিকে, অপর দিকে বাহ্যশক্তির ক্রিয়া এই দুইয়ের মিলনে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান। বাহ্য শক্তির উপর আমার হাত নাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমার মানসিক অবস্থা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মানসিক অবস্থা ও অন্য কোন বাহ্য শক্তির সংযোগে ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ যতই পিছাইয়া যাই, কোথাও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের শেষ পাই না।—কারণের পর কারণ, তার পর কারণ; এই করিতে করিতে জন্মের মূহুর্ত্তে পৌছিব। সেইখান হইতেই দুই শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়। যে মানসিক ঘটনা লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়। পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত। যে অবস্থার মধ্যে জন্মিলাম তাহাও আমার ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়। কিন্তু এই দুই অংশের একত্রীকরণেই জীবন। আমার ভবিষ্যৎ, সেই পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত মানসিক গঠন আর সেই পিতৃ-মাতৃ-কৃত অবস্থা ও সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে আরম্ভ হইল। তার পর, ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা আমাকে যেমন আক্রমণ করিতে লাগিল, আমার মধ্যে তেমনি পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; জ্ঞান, ভাব প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত জীবনকে পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।—আরও পিছনে দেখিলে দেখিব, আমার পিতা মাতার জীবন আবার সেইরূপ তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-দত্ত দেহ মন ও বাহ্য ঘটনা সমূহের ফল। এইরূপে দেখিতে দেখিতে বিশ্বব্যাপী কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল অনন্তের রাজ্যে গিয়া পড়ে। আত্মায়ত্তীভূত শক্তি যেমন আমাদের অনন্ত অনাদি কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের

মধ্যে ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ এই যে মসীপাত্র আমার সম্মুখে রহিয়াছে ইহাও অনন্তের শৃঙ্খলের একটি অংশ। অন্তর্জগতের উপর বহির্জগৎ, বহির্জগতের উপর অন্তর্জগৎ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করিতেছে। কত বাহ্য ঘটনা আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে? আবার কত আশা কত ভরসা এক দিনের ভৌতিক ঘটনায় নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। মানুষের ক্ষমতার অর্থ আর কিছুই নয়, বাহ্যশক্তির উপর আভ্যন্তরীণ শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত; মিলের (Mill) Fatalism ও আর কিছুই নয় আভ্যন্তরীণ জগতের উপর বাহ্যশক্তির ক্রিয়া ব্যতীত। জগতের সর্ব্বত্রেই এই দুই শক্তির ঘাত প্রতিঘাত। সামান্য বালুকাকণাটি স্থানান্তরিত করণ হইতে মহা মহা সমাজবিপ্লব পর্য্যন্ত এই দুই বিপরীত শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে উৎপন্ন। অন্তর্জগৎ, কি বহির্জগৎ কোথায়ও কার্য্য কারণের শৃঙ্খলের শেষ নাই।—আমাদের জীবনের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই দুই জগৎ আবার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেছে এবং উভয়ের ঘাত প্রতিঘাত আমাদের জীবনরূপ ঘটনা শ্রেণীকে উৎপন্ন করিতেছে। [ক্রমশঃ

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

হেমচন্দ্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গার উপর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার নাম আনন্দ গ্রাম। সচরাচর লোকে তাহাকে আন্দ গাঁ বলে। অনেক কালের প্রাচীন ভাঙা ঘাট। সেই ঘাটের উপর এক প্রকাণ্ড বটগাছ। বটমূলে দেবশিলা। তাহা আন্দ গাঁয়ের বাবাঠাকুরতলা বলিয়া বিখ্যাত। সেখানে পূজা দিবার জন্য বহুদূর হইতে যাত্রী আসিত। ঠাকুর বড় জাগ্রত। আজ সেই বাবাঠাকুর তলায় স্ত্রীলোকের ভিড় আর ধরে না। কেহ নবীনা—প্রীতিভরে কোমল

দেহ নত হইয়া পড়িয়াছে; কেহ প্রবীণা—আপনার শুষ্কদেহ আপনারই ভারস্বরূপ হইয়াছে; মাঝে মাঝে বালিকা—কেহ হাসিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, আবার কেহ বা ছুটিয়া আসিয়া সঙ্গিনীর অঞ্চল ধারণ করিতেছে। নিতান্ত বালিকা ব্যতীত সকলেই স্নাতস্নানা, আর্দ্র কেশরাশি শিথাবন্ধনী লইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছে। হাতে এক এক ঘটি জল, সেই জল একে একে বাবাঠাকুরের মাথায় ঢালিয়া দিতেছে। সকলেই যে দলবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে; কেহ জল ঢালিতেছিল, কেহ জল ঢালিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কেহ বা স্নানান্তে জল ঢালিতে আসিতেছিল। তথাপি সে ভিড় কমে না। প্রহর বাজিয়া গেল, দেখিতে দেখিতে ক্রমে ভিড় কমিতে লাগিল। বেলা যখন দশটা, তখন বাবাঠাকুরতলা প্রায় জনশূন্য। স্রোতের জলের ন্যায় সে জনতা কোথায় সরিয়া গিয়াছে। যে দুই এক জন করিয়া আসিতেছিল, ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। কতক্ষণ পরে, ধীরে ধীরে একটি বালিকা জলহস্তে সেই স্থলে আসিল। বালিকা একা। বয়স অনুমান এগার পার হইয়াছে। এ অল্পবয়সেই দেহে মাধুর্য্য ধরে না। বালিকা আসিয়া ধীরে ধীরে বাবাঠাকুরের মাথায় জল ঢালিতে আরম্ভ করিল। জল বাবাঠাকুরের মাথা হইতে গড়াইয়া গড়াইয়া বটমূল ভিজাইতে লাগিল।

অদূরে নদীর উপর একখানি ছোট ভাউলে। তাহা সেই বটবৃক্ষের শিকড়ে বাঁধা ছিল। মাঝিরা ডাঙ্গায় উঠিয়া তখন আহারাদির উদ্যোগ দেখিতেছিল। ভাউলের মধ্যে একটী বাবু ভিন্ন আর কেহই ছিল না। গাছতলায় স্ত্রীলোকের ভিড় দেখিয়া সে বাবুও অনেকক্ষণ ভাউলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন —অপূর্ব্ব দৃশ্য। তখন সূর্য্যের তেজ বাড়িয়াছিল; সূর্য্যের সেই স্বর্ণকিরণ বটপত্রের অগ্রভাগ হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া বালিকার মুখমণ্ডলে পড়িতেছিল; বাতাসে তখন বালিকার গায়ের কাপড় একটু একটু সরিয়া পড়িতেছিল যে চুল বিনানী খুলিয়া পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা উড়িয়া মুখের উপর ঝাঁপিয়া পড়িতেছিল। বালিকা ভক্তিভাবে একাগ্রচিত্তে বাবাঠাকুরের মাথায় জল ঢালিতেছিল, চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া বাবু

তাহা দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, বালিকার রূপ দেহে ধরে না, লাবণ্য উছলিয়া পড়িতেছে। উষার মৃদুকরস্পর্শে সদ্যঃপ্রোস্থিত শতদলের ন্যায় মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে। সেই মুখে সেই কৃষ্ণতার নয়নদুটি সেই টুকটুকে হাসিহাসি ঠোঁট দুখানি মুনিজনার মনোমোহন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, তাহা সৌকুমার্য্যের আগার স্বরূপ। পৃষ্ঠের উপরি রাশীকৃত কৃষ্ণ কেশের মধ্য দিয়া সে সৌকুমার্য্যের মধুরজ্যোতিঃ ফাটিয়া বাহির হইতেছে। অলঙ্কারের মধ্যে নাকে একটি নলক, হাতে গাছকতক বেলোয়ারি চুড়ি, আর পায়ে চারিগাছি মল। এ স্বর্ণপ্রতিমা সাজাইলে আরও না জানি কত শোভা ধরিত!

অতৃপ্তলোচনে বাবু দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। ঘাটে এক বৃদ্ধা স্নান করিতেছিল। সে বাবুকে তদবস্থ দেখিয়া একটু মৃদু হাসিল। সে হাসি নিরর্থক হইল না, বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন; তাহার অর্থও বুঝিলেন। বাল্যকাল হইতেই এরূপ মৃদু হাসির সহিত তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় ছিল। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না। বৃদ্ধা তাঁহার মনের ভাব বুঝিল। বলিল—"সেই পর্য্যন্ত রোদে দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছেন?" বৃদ্ধা উত্তর পাইল না। একটু নিকটে আসিল, আবার সেই প্রশ্ন করিল।

বাবুর চমক ভাঙ্গিল। কে জানে কেন মনের ভিতর আশার ঈষৎ বৈদ্যুতী খেলা খেলিল। তায় বৃদ্ধা আগে কথা আরম্ভ করিয়াছে, কথা কহিবার সুযোগও ঘটিল। বলিলেন—"এ মেয়েটী কাদের গা?"

বটমূলে বাবাঠাকুরের নিকট সেই বালিকাকে বাবু দেখাইলেন। বৃদ্ধা তাহা দেখিল। দেখিল, তখন বালিকা জল ঢালা শেষ করিয়া জানু পাতিয়া বসিয়াছে, বসনাগ্রভাগ চুলের উপর দিয়া গলা বেড়িয়া দুই হস্তে বদ্ধ হইয়াছে, সেই দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ, নয়ন মুদ্রিত, স্বর্গীয় প্রেমে মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। বালিকার সেই ভাব দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বৃদ্ধা অন্য কথা ভুলিয়া গেল, একদৃষ্টে সেই চিত্র দেখিতে লাগিল।

বাবু বলিলেন—"বল দেখি, এ দেখিলে রোদদৃষ্টি কি জ্ঞান থাকে?"

বৃদ্ধা বলিল—"সত্য, বসুমতী আমাদের যথার্থই লক্ষ্মী।

বাবু বলিলেন—"বালিকার নাম বসুমতী! মেয়েটির আর কে আছে?"

"আহা! সে কথা আর বল্‌বেন না। রাজা বাপের মেয়ে, দুই ভাই যেন সোণার কার্ত্তিক। সে বাপ ভাই বেঁচে থাক্‌লে আর কি ও মেয়ের এই দশা হয়?"

"এখন তবে কে আছে?"

"থাকিবার মধ্যে একা মা। অমন সৎব্রাহ্মণের মেয়েও আর দেখিব না।"

"উহাদের তবে চলে কেমন করে?"

"মেয়ের মামারা আছে। তাহারাই দেখে শুনে।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবু বলিলেন—"বিবাহ হইয়াছে?"

"তবে আর বলিতেছি কি.—না।"

বাবুর হৃদয়ে মায়াবিনী আশা আবার আপন প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিল। কতক্ষণ পরে বাবু বলিলেন—"আপনাকে একটি ভদ্র পরিবারের এত ভিতরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি সে জন্য মনে কিছু ভাবিবেন না।"

বৃদ্ধা বলিল—"আমি তাহা ভাবিতেছি না, আমি ভাবিতেছি আর দাঁড়াইয়া থাকিবেন কতক্ষণ?"

"দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি তো হয় না. তবে কেমন করিয়া বলিব আর দাঁড়াইয়া থাকিব কতক্ষণ? এ স্বর্ণ প্রতিমা যার গৃহ উজ্জ্বল করিবে সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।"

বৃদ্ধা একবার বাবুর দিকে চাহিল। অনেক দেখিয়া শুনিয়া সে বুড়ী হইয়াছে। মনে মনে বলিল, বাবুর মনের ভাব যদি ইহা না হয়, তবে বৃথায় আমার চুল পাকিয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। ঘরে ঘরে সন্ধ্যার কার্য্যের আয়োজন পড়িয়াছে। গ্রামের মেয়েরা কেহ গা ধুইতেছে; কেহ গা ধুইয়া আসিতেছে, কেহ জল আনিতেছে, কেহ প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছে। বসুমতীর

মাতা রকে বসিয়া পা ছড়াইয়া শলিতা পাকাইতেছেন, নিকটে বসিয়া বসুমতী এক একটি করিয়া শলিতা গুলি গুছাইতেছে ; এমন সময়ে কে ডাকিল— "কৈ গো তরফদারদের মেয়ে বাড়ী আছ ?" বসুমতীর মাতার বাপের পদবী তরফদার। মাতা বুঝিলেন, ব্রহ্ম ঠাকুরুণ আসিয়াছেন। বলিলেন—"এস মা এস, অনেক দিনের পর যে গা ?" ব্রহ্ম ঠাকুরুণ রকে উঠিলেন। মাতা বসুমতীকে বলিলেন—"যাও মা, ঘর হইতে আসন আনিয়া তোমার দিদিকে বসিতে দাও।" বসুমতী আসন আনিয়া দিল। ঠাকুরুন বসিলেন। বসুমতী বলিল—"দিদি আমাদের বাড়ী আর আস না কেন গা ?"

ব্রহ্ম ঠাকুরুণ বলিলেন "আর ভাই, একে বুড় হয়েছি, পূজা আহ্নিক, খাওয়া দাওয়া করিতেই বেলা কেটে যায়। তার উপর আজ কাল আবার আরও একটা নতুন কাজ যুটেছে।"

"নতুন কাজ কি দিদি ?"

"এই আইবুড় নাতিনীদের ঘটকালি করা।"

"কার আবার ঘটকালি হলো ?"

"যার জন্যে এসেছি।"

বসুমতীর মা বলিলেন—"মা আমার কত রঙ্গই জানেন !"

"ওলো না বৌমা, সত্যি তোমার মেয়ের জন্যে বর ঠিক্ করেছি।"

এমন সময়ে কে ডাকিল—"বসু আয় গো, গা ধুতে যাবি যদি আয়, মঙ্গলা তোকে ডাক্‌চে।"

বালিকা প্রত্যহই মঙ্গলার সঙ্গে গা ধুইতে যাইত। প্রত্যহ মঙ্গলা তাহাকে ডাকিত। মঙ্গলাদের বাড়ী তাহাদের বাড়ীর গায়ে। বালিকা বলিল—"দিদি বস, আমি গা ধুইয়া আসি।" এই বলিয়া ছুটিয়া মঙ্গলাদের বাড়ী গেল।

ব্রহ্ম ঠাকুরুণ বলিলেন—"বৌমা তোর মেয়ের বিয়ের কি কচ্চিস্ মা ?

"আমি আর কি করিব মা, তোমরাই পাঁচ জন আমার ভরসা।"

"তোমার ভাইয়েরা কি বলে ?"

"তাহারা তো চেষ্টা দেখিতেছে, বলে ভাল পাত্র পাওয়া দায়।"

"তোমার মন ভাল, ভগবান অবশ্যই তোমার ভাল করিবেন।"

"আর মা, ভগবান যদি তাই কর্ত্তেন, তবে আর এ দশা হতো না।"

"কি করবে, সব কর্ম্মের ফল। কিন্তু এই মেয়ে হতে তুমি সুখী হবে।"

"তুমিও যেমন, মুখ-চাওয়া সামগ্রী, ও আবার বাঁচবে, আমি আবার ওর হতে সুখী হব!"

"সে কি মা, তোমায় এই কথা বলবার জন্যই আজ আমি এসেছি।" এই বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরুণ সেই বাবুটীর কথা পাড়িলেন। বলা বাহুল্য, যে বৃদ্ধা প্রাতে স্নান করিতে করিতে সেই বাবুর সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তিনিই ব্রহ্মঠাকুরুণ। প্রাতঃকালে সেই সমস্ত কথাবার্ত্তার পর, বৃদ্ধা দুই প্রহরের সময় আর একবার তাঁহার কাছে গিয়াছিল। দুই জনে অনেক কথা হইয়াছিল। কিন্তু, সে সব কথা এখন বলিয়া কাজ নাই। বৃদ্ধা টিপিয়া টিপিয়া সেই বাবুর সম্বন্ধে কত কথা বলিলেন। সেই কথার মধ্যে কত অলঙ্কার দিয়াছিলেন, কে তাহা গণনা করিবে? সে বাবু কত টাকার মানুষ, জমিদারি কত বিস্তৃত, ব্রহ্ম ঠাকুরুণ সে সকল কথা বলিতেও ভুলিলেন না। পাছে কেহ শুনিতে পায়, শুনিয়া পাঁচ শত্রুতে পাঁচ রকমে ভাঙাভাঙি করে, এই জন্য এ দিক্ ওদিক্ চাহিয়া কথাটা অতি মৃদুস্বরেই চলিতেছিল। স্বর কখনও ক্ষীণ, কখন ক্ষীণতর হইতেছিল, কখন আধেক কথাটা হাসিতে চাহনিতে ও অঙ্গভঙ্গীতেই শেষ হইতেছিল। বলিতে বলিতে স্বর একটু উচ্চ গ্রামে উঠিল। অবশেষে, একটু উচ্চে বলিলেন—"আহা মাগো, বাছা দেখে একেবারে পাগল!"

শুনিতে শুনিতে মাতার হৃদয় নানারূপ চিন্তায় ভাসিয়া যাইতেছিল। আনমনে বসিয়া নিস্তব্ধভাবে সকল শুনিতেছিলেন। তিনি কোনও কথা কহিলেন না।

ব্রহ্ম ঠাকুরুণ আবার বলিতে লাগিলেন, "আহা, দুটিতে যে সাজিবে যেন মদনের পাশে রতি। তুমি মা এ সম্বন্ধে অমত করো না। তোমার ভাইদের বল, তাঁহারা গিয়ে একবার দেখে আসুন। তোমার বন্ধু যথার্থই শিবপূজা করেছিল, মা।"

মাতা কথা কহিলেন। বলিলেন—"আশীর্বাদ কর মা, বন্ধু আমার বেঁচে থাক।" নিঃশব্দে একবিন্দু অশ্রু চক্ষের অগ্রভাগে গড়াইয়া পড়িল।

'ছিঃ এমন মঙ্গল কথায় চক্ষের জল ফেলিও না, মা। ভগবান অবশ্যই তোমার ভাল করিবেন। এখনও রাতদিন হইতেছে। আজ আমি উঠি, দেখ, মা, যেন ভুলো না।"

ব্রহ্ম ঠাকুরুণ উঠিলেন। বসুমতীর মাতার মনে একেবারে পূর্ব্বের সকল কথা জাগিয়া উঠিল। কি ছিল আর কি হইয়াছে সে সকল কথা মনে পড়িল। দরদর ধারায় চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

পা ধুইয়া বালিকা বাড়ী আসিল। ডাকিল "মা"। মা কথা কহিলেন না, অঞ্চলে চক্ষুদ্বয় মার্জ্জনা করিলেন।

"হাঁ মা, কাঁদিতেছিস্ মা"—বলিকা মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মা শোক ভুলিয়া গেলেন। কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। চক্ষের জলে বালিকার কপোল ভাসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রাতে এই কথা পাড়াময় হইয়া উঠিল। ব্রহ্ম ঠাক্রুণ প্রভাতে উঠিয়া হলধর বসুর বাগানে ফুল তুলিতে গিয়াছেন, ঘাটে বসিয়া মেনকার মা বাসন মাজিতেছে, তাহাকে দেখিয়া ঠাকরুণ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন "আহা যদি এটা হয় বড় ভাল হবে।"

ব্রহ্ম ঠাক্রুণ বার বার ঐ কথা বলাতে মেনকার মা বলিল—"কি গা দিদি ?"

ব্রহ্মঠাক্রুণ বলিলেন—"না হবে বা কেন ? মেয়ে জনের মন বড় ভাল।"

মেনকার মা আবার বলিল—"কার কথা বলিতেছ ?"

"তবে কি জানি বড় মানুষ, হয় তো এ কথা ভুলে যেতে পারে।"

মেনকার মা ফাঁপরে পড়িল, বলিল—"দিদি, কি বলিতেছ, আমি তো বুঝিতে পারিতেছি না।"

ব্রহ্মঠাকরুণ বলিলেন "ওমা, সে কি ? তুই এ কথা শুনিস্ নি।"

"না, দিদি।"

ব্রহ্মঠাকরুণ একটী করবীর শাখা নোয়াইয়া ফুল তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "তা হউক বড়মানুষ, অমন মেয়ের জোড়া পাওয়া ভার।"

মেনকার মা এবার কোনও উত্তর করিল না। ঈষৎ অনুচ্চ স্বরে বলিল—" মরণ আর কি, কথাটা কি তার ঠিক নেই, মচ্চেন কেবল বকে বকে।"

ব্রহ্মঠাকরুণ দেখিলেন, মেনকার মা জবাব দেয় না। তখন করবীর ডাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'আ পোড়া কপাল, তুই কিছুই জানিস্ নে!'—এই বলিয়া প্রথম সেই বাবুর পরিচয় দিয়া, তার পর তাঁহার সহিত তাহার যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল ও বসুমতীর মাকে সে যে পরামর্শ দিয়া আসিয়াছিল, একে একে সমস্ত কথা বিবৃত করিল। কথাটা বেশির ভাগ অসত্যে পূর্ণ। কিন্তু প্রাতে উঠিয়া লোকের সঙ্গে কি বলিতে হইবে, বৃদ্ধা রাত্রে শুইয়া তাহা একটা মনে মনে ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা শুনিয়া মেনকার মা বলিল—"আহা ব্রাহ্মণীর এমন কপাল কি হবে?"

মেনকার মা জাতিতে কৈবর্ত্ত।

ব্রহ্মঠাকরুণ ফুল তুলিয়া চলিয়া গেলেন। মেনকার মা তাড়াতাড়ি বাসন গুলি রাখিয়া নিকটে পদ্মর মার বাড়ী গেল। পদ্মার মা জাতিতে ক্ষীরতাঁতি। সে তখন নেড়া মাথা আদুড় করিয়া ফোগলা গালে গুল ঠাসিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। মেনকার মা গিয়া বলিল, 'ও দিদি আর শুনেছিস?"

পদ্মর মা বলিল "কিরে, সকাল বেলা কি খবর নিয়ে এলি!"

মেনকার মা তাহার সংবাদ বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে পদ্মর মার পার কাছে গুলের কৌটা দেখিতে পাইল; বলিল—"বলিতেছি, আগে তোর গুলের কৌটা টা দে বোন্।"

পদ্মর মা গুলের কৌটা দিল। মেনকার মা গালে গুল দিয়া, দুইবার থেপ ফেলিয়া, বলিল—"বামনদের বসুর না কি বিয়ে?"

"কোথা লো?"

"কেন, ব্রহ্মঠাকরুণের মুখে শুনলুম, কে এক বাবু তাকে দেখে নাকি একেবারে পাগল হয়েছে।"

"বলিস্ কি, তা যা বল, অমন মেয়ে কিন্তু আর হবে না।"

"ঠিক্ কথা ভাই। তা তুই বোস্, বাসন গুলো জলে ফেলে এসেছি, যাই।" মেনকার মা চলিয়া গেল।

পদ্মর মা তখন তাহার মেয়েকে ডাকিল। ডাকিয়া সেই সব কথা বলিল। পদ্ম আগুন আনিতে গিয়া তাহা হালদারদের কনে বৌকে বলিয়া আসিল। কনেবৌ ঘাটে গিয়া সেই কথা ঘাটের স্ত্রীমহলে বলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে ঘাটে সে কথা লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ হইল।

নিস্তারিণী বলিল "আহা হউক, বসুমতী বেশ সুখে থাকবে।"

চাঁপা বলিল "হাঁ, আর দুখানা পাঁচখানা ভাল ভাল গহনাও পরবে।"

বসন্ত বলিল "দেখিস্ উঁহাকে সোণায় অষ্টাঙ্গ ভূষিত করে ফেল্‌বে।"

হেমাঙ্গিনী বলিল "বসুমতীর মাবও এ দশা থাক্‌বে না। হয়তঃ রাতারাতি এখানে দোতলা চকমিলন বাড়ি হবে।"

সকলেই এইরূপ বলিতেছে, এমন সময়ে দত্তদের ম্যানার মা সেইখানে আসিল। সে শুনিয়া বলিল—"তা, যাই হউক, ডাক্তার কো সেই! আ মরি, যে চেহারার চটক! যে নাক চোক! যেন একটা কালপেঁচা।"

কুসুম বলিল—"আবার সেই কোটর চোকে চাউনি দেখিচিস্।"

ম্যানার মা বলিল—"পোড়া কপাল—পোড়া কপাল! তার চেয়ে মেয়েটাকে হাত পা ধ'রে জলে ফেলে দিক্ না।"

শ্যামা অমনি বলিল "যা বল্‌লি ভাই, সাজবে না।"

চাঁপা বলিল "সোণাই পরুন দানাই পরুন, ডাক্তারের সুখ হবে না।"

এমন সময়ে বসুমতীর মাতা সেই ঘাটে জল লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে চুপ করিল। মাতা জল লইয়া উঠিয়া যাইবেন, বসন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"হাঁগা জ্যাঠাই, বসুর নাকি বিয়ে?" মাতা বলিলেন, "কে বল্লে মা?" তিনি আর দাঁড়াইলেন না, জল লইয়া গৃহে গেলেন।

তখন সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া বলিল—"তবে কি মিথ্যা!"

কনে বৌ এই খবর আনিয়াছিল, সে রাগিল। বলিল "সে কি, আমি দেখে এসেছি বের পত্র হয়েছে।"

ম্যানার মা বলিল—'দেখ্‌লি, মাগি ভাঁড়ালে।'

কনেবৌ বলিল—'অংখার—ঠ্যাকার!'

নিস্তারিণী বলিল—'ও মা, এরি মধ্যে!'

আমার কন্যাদায়।

আমার কন্যাদায়! রাত্রে নিদ্রা নাই, দিবসে বিশ্রাম নাই, অহোরাত্র সেই একই ভাবনা—একই চিন্তা—আমার কন্যাদায়! গৃহে গৃহিণীর গঞ্জনায়, পাড়ায় প্রতিবেশীর গঞ্জনায়, সমাজে আত্মীয় স্বজনের গঞ্জনায় আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তায় দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, দিন দিন দেহ ক্ষীণ হইতেছে, প্রতি নিশ্বাসে শরীরের আদসের করিয়া রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, তবু—তবুও সেই নিদারুণ চিন্তা আমায় ছাড়িল না! শয়নে, স্বপনে, আহারে, বিহারে কেবল সেই মর্ম্মভেদী ভয়ানক চিন্তা—আমার কন্যাদায়!

যে কন্যারত্নের প্রফুল্ল মুখকমল দেখিলে আমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না, আজ তাহাকে দেখিতে হইবে বলিয়া অন্তঃপুরে যাইতে আর পা উঠে না! যাহার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে আমি পূর্ব্বে আত্মহারা হইতাম, আজ তাহার সেই অমৃতময় বাক্য আমার কর্ণে যেন বিষ ঢালিয়া দেয়। যাহাকে এক মুহূর্ত্ত না দেখিলে আমি জ্ঞানশূন্য হইতাম, এখন তাহাকে দেখিতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না! শৈশবে যে আমার নয়নানন্দদায়িনী ছিল, এখন সেই নয়নপুত্তলি আমার চক্ষুশূল হইয়াছে। নিতান্ত হিংস্র পশুরাও আপনার রক্ত দিয়া তাহাদিগের সন্তানকে বুকে করিয়া পালন করে; কিন্তু আমি কেন আজ আমার প্রাণের সামগ্রী সেই স্নেহের প্রতিমার দিকে চক্ষু ফিরাইতে পর্য্যন্ত পারি না? আমি কি মানুষ!—না না—আমি হিংস্র পশু হইতেও অধম। কিন্তু,

হায়! কেন এমন হইল? আমাতে এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন কিরূপে হইল? এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? এ প্রশ্নের আর অন্য উত্তর নাই।— সেই হৃদয়বিদীর্ণকারী একই উত্তর—আমার কন্যাদায়!

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ দায়ের কি উদ্ধার নাই? এ সংসারে আসিয়া ত অনেক দায়ে পড়িয়াছি, একে একে সকল দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিলাম, আর এই দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না? অনেক সময় এ কথা মনে হইয়া হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই আশার ছলনায় ভুলিয়া কন্যার পাত্রানুসন্ধানে অনেক দেশ বিদেশ ঘুরিয়া পাত্রও মনোনীত করিয়াছিলাম; পাত্রপক্ষীয়েরাও আমার কন্যাকে দেখিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিয়াছিল। কিন্তু হায়! তথাচ শেষ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমার এ দায় হইতে উদ্ধার হওয়া হইল না। আমি দরিদ্র। আমি দরিদ্র—তাহার উপর আবার আমার কন্যাদায়!

এত আশা, এত ভরসা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম সমস্তই আমার বৃথা হইল। বরকর্ত্তার ফর্দ্দ পাইয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিলাম। তখন এক কালীন সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা আমার অনুভব হইতেছিল, আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল, আমার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও বরকর্ত্তার অর্দ্ধেক আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইতে পারে না। এইরূপে একবার নয়—সাত আটবার নিরাশ হইয়া আমার চিন্তার অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম। চিন্তা! চিন্তা! কিসের চিন্তা? মনে অন্য চিন্তা আর স্থান পায় না, কেবল সেই একই চিন্তা—একই ভাবনা—কি হবে? কি করিব? আমার যে কন্যাদায়!

আহারে আর রুচি নাই, সংসারে আর সুখ নাই, হৃদয়েও আর উৎসাহ নাই। এখন স্নেহ, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়ের উচ্চ প্রবৃত্তি সকলকে বলিদান দিয়া হৃদয়কে শ্মশান করিয়াছি আশা, ভরসা, উৎসাহ এ হৃদয়ে আর স্থান পায় না। জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম বুঝি আর রক্ষা হয় না। এখন আমার কুৎসা প্রতিবেশীর দৈনিক আলোচনার বিষয় হইয়াছে; আমাকে দেখিলে অনেকেই আর বাক্যালাপ করে না; আর যাঁহার আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও ভালবাসা আছে তিনি আমারই

সম্মুখে আমাকে নানারূপ গঞ্জনা দিয়া আত্মীয়তা করিয়া থাকেন। যে দিকে চাহি, সেই দিকেই বিভীষিকাময় দেখি। যে নিদারুণ যন্ত্রণায় দিবারাত্র দগ্ধ হইতেছি, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে লাঘব হয় বটে, কিন্তু এমন লোক পাই না, যাহাকে এ যন্ত্রণার কথা বলিয়া হৃদয়ের জ্বালার লাঘব করি। বলিব কি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কোনরূপ পরামর্শ করিবার জন্য স্বসম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের নিকট সাক্ষাৎ করিতে গেলে, আমি কন্যাদায়ে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি মনে করিয়া কেহ আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করে না। হায়! কি পাপে আমার এরূপ দণ্ড হইল! হিন্দুসমাজ! তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আমার উপর এই ভয়ানক কঠোরতম দণ্ড বিধান করিয়াছ। অপরাধ! অপরাধ!! আবার কি অপরাধ?—আমার যে কন্যাদায়!

নিষ্ঠুর বঙ্গসমাজ! তোমার হৃদয়ে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করিয়া তোমার কি ইষ্টসাধন হয়? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে সমাজ এতদূর অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয়, তাহার পতনের আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, যদি অচিরে এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার না হয়, তবে এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যে দিন এই অত্যাচারী সমাজের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। হে সমাজসংস্কারকগণ! এখনও কি তোমাদিগের চৈতন্য হইবে না? কত শত সম্ভ্রান্ত পরিবার কন্যা-দায়ে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তাহা প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখিয়াও কিরূপে তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ? হে শিক্ষিতাভিমানী স্বদেশহিতৈষী বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ! তোমাদিগের শিক্ষায় ধিক, তোমাদিগের সভ্যতায় ধিক্, তোমাদিগের স্বদেশহিতৈষিতায়ও ধিক্, আর তোমাদিগের রাজনৈতিক আন্দোলনে শত ধিক্। যাহাদিগের সমাজ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাহাদিগের এত উচ্চাভিলাষ করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না! যদি যথার্থ স্বদেশ-হিতৈষী হও, তবে অগ্রে আপনার সমাজের উন্নতি কর। কিন্তু হায়! আমার এই সকল কথা কে শুনিবে? কেই বা বুঝিবে, আমার যে কন্যা দায়!

ভাই বঙ্গবাসী! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই কুণিত প্রথায় সমা-

জের কতদূর অনিষ্ট হইতেছে। এই প্রথার বেগ এখন না থামাইলে পরিণাম কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইবে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। দেখ দেখি, এই কারণে অন্যান্যজাতিরা আমাদিগকে কতদূর ঘৃণা করিয়া থাকে। সে দিন একজন এই সহরের ইংরাজ সম্পাদক কেমন টিট্‌কারী দিয়া বলিল যে, বাঙ্গালীর বিবাহের একদিকে উৎসব আর একদিকে ভয়ানক নিরানন্দ, একদিকে marriage-ceremony অন্যদিকে ঠিক যেন funeral ceremony. ছি ছি ছি! আজ সকলে মিলিয়া যে ঘৃণিত প্রথাকে উঠাইয়া দিব মনে করিলে কাল আর সে তিলার্দ্ধ থাকিতে পারে না, তবে কেন সে প্রথাকে চিরকালের জন্য এই সমাজে বদ্ধমূল হইতে দিবে? মনে করিলেই যে কলঙ্ক মোচন করিতে পারা যায় কেন সে কলঙ্ক চিরকাল মস্তকে বহন করিবে? যে এ দায়ে ঠেকিয়াছে, সেই জানে কন্যাদায় কি ভয়ানক দায়। যদি ইহাতেও কাহারও চৈতন্য না হয়, তবে অভিসম্পাত করি, বঙ্গদেশ বঙ্গসাগরের অতল জলে নিমগ্ন হউক, ঘৃণিত "বাঙ্গালী" নাম এ পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া যাউক।

স্বহস্তে জল-সিঞ্চনের দ্বারা যে বৃক্ষকে এত দিনে কত কষ্টে বর্দ্ধিত করিলাম, সেই বৃক্ষ ফলবান হইবার সময় আমি কেমন করিয়া তাহা স্বহস্তে ছেদন করিব! যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়াও যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, আমার আর কি আছে যাহা দ্বারা এ দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারিব? তবে কি আমার কন্যার বিবাহ হইবে না! এ চিন্তা—এ ভয়ানক চিন্তা কি করিয়া হৃদয়ে স্থান দিব? হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে যে ভয়ানক চিতা জলিয়া উঠিল। হৃদয়কে ত শ্মশান করিয়াছি, তবে কি হৃদয়ের এ শ্মশান-চিতা কোনকালে নিভিবে না? মা সরলা! কেন তুমি এমন নিষ্ঠুর সমাজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? যদি জন্মগ্রহণ করিলে তবে কোন ধনবানের গৃহে জন্মিলে না কেন? এ দরিদ্র পিতার দ্বারা তোমার জীবনের সুখ, আশা, ভরসা সকলই নষ্ট হইবে। আমিই তোমার সকল সুখের কণ্টক হইলাম। আমি আর কি করিব? প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তোমায় সুখী করিতে পারিলাম না। তোমার জন্য অনেক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, অশ্রুও আর নাই মা, তোমার জন্য আমার সকল অশ্রু

ফুরাইয়া গিয়াছে। আমায় এত কষ্ট সহ্য করিতে দেখিয়া তোমাকেও গোপনে অশ্রু মোচন করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু সে দৃশ্য এ জীবনে যেন আর আমায় দেখিতে না হয়। এই হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা বরং আমার সহ্য হয়, কিন্তু তোমার সেই ম্লান মুখ, তোমার সেই অশ্রুপূর্ণ কাতর লোচন, তোমার সেই মর্ম্মস্পর্শী সুদীর্ঘ নিশ্বাস আমায় যেন পাগল করিয়া ফেলে। আমার পাগল হইবার আর বাকিই বা কি? হে ঈশ্বর! এ অভাগার অদৃষ্টে কি মৃত্যু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছ? আর এ যন্ত্রণা যে সহ্য করিতে পারি না। কোথায় আপনার উদরান্নের চেষ্টা করিব, না দিবারাত্র এই ভয়ানক চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া ছারখার হইতেছি। আমার সোণার সংসারও ছারখার হইয়া গেল। এখন আমি কি করিব? কি করিলে এ দায় হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিয়াছি। নিষ্ঠুর বঙ্গসমাজ শুন, সভ্য অসভ্য সকল ব্যক্তি শুন, সে উপায়—সে উপায় অন্য আর কিছুই নহে তাহা—আ-ত্ম-হ-ত্যা!

অনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

ছাই।

জীবনের পরপার নাই?
মানবের পরিণাম ছাই!
দেহ শুধু ভূতের ভবন
প্রাণ শুধু বায়ুর মিলন।
আশা, তৃষ্ণা, সুখ দুঃখ, ধেয়ান, ধারণা,
এ সকল ভূতের যোজনা।
এ প্রকৃতি ছাইয়ের রচনা!
নিশ্বাস ফুরালে আমি ছাই!
ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই।

তবে কেন এত আড়ম্বর,
কেন তবে প্রকৃতি সুন্দর,
কেন তবে হৃদয়ে উল্লাস।
তবে কেন আর প্রেম আশ,
কেন তবে সুখ দুঃখ তৃষা,
কেন বা মধুর ভালবাসা ?
কেন তবে অনন্তের ধ্যান
তবে কেন সঙ্গীত মস্তান,
তুমি আমি যদি শুধু ছাই,
জীবনের পরপার নাই ?
কেন তবে এতেক আকুল,
তুমি যদি ভস্মের পুতুল !
বৃথা কেন, এই পাঠাগার।
জীবনের নাই পরপার !
ঘুচে গেল যত গণ্ডগোল,
বল হরি, হরি, হরিবোল !
ধরায় সকলি যদি ছাই,
জীবনের পরপার নাই,
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
কেন তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম,
কেন বা বিহগ করে গান ?
লতিকায় কেন ফুটে ফুল,
তরু ধরে পল্লব মুকুল,
কেনই বসন্ত হেসে হেসে
ধরারে সাজায় ফুল-বেশে ?
বৃথা বহে, সিন্ধুপানে নদী
নর নারী ছাইয়ের অবধি।
বৃথা কেন ইন্দ্রজাল মেলা ?

খেল, মৃত্যু তাইয়েরই খেলা।
ডাক কেন একেক করিয়া,
একেবারে লও না ডাকিয়া?
মধু স্বরে ডাক একবার.
মোরা হই ভস্ম স্তূপাকার!
কোটী কোটী, অণু বুকে বুকে,
অচেতনে ঘুমাইব সুখে.
বায়ু বহ ছাই উড়াইয়া,
মানবের অস্তিত্ব গাইয়া।
সলিল, বহ না বুকে ছাই,'
মানবের পরিণাম ছাই।
আকাশ পূরায়ে ফেল ছাই,
জীবনের পরপার নাই!
ছাই যদি শেষেতে সকল,
কেন তবে তুই অশ্রুজল?
ছাই যদি মানব-জীবন,
তবে করি ছাই আভরণ!
যতটুকু দেহে আছে প্রাণ
বসে বসে গাই ছাই গান!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

অশ্বত্থ।

অন্য নাম—বিপ্র, অচ্যুতাবাস, অশ্বৎ, পিপর। স্বনামখ্যাত বৃহদ্বৃক্ষবিশেষ। ইহার বল্কল সুমধুর, কষায়, কফ ও পিত্তনাশক, কান্তিবর্দ্ধক, যোনি

বিশোধক, রক্তপিত্ত ও প্রদাহ নিবারক। ইহার পক্ক ফল শীতল, অতিশয় হৃদ্য। রক্তপিত্ত, বমন, শোষ, অরুচি ও বিষদোষ নাশক।

অশ্বত্থ ছাল দুগ্ধে পিশিয়া লেপ দিলে ছুলী ও মাছ্তে নিবারণ হয়। ইহা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে ছড়াইয়া দিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার শুষ্ক ছাল অগ্নিদগ্ধ করিয়া কোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নিবাইয়া সেই জল ছাকিয়া পান করিলে দুর্নিবার্য্য বমন নিবারণ হয়। অশ্বত্থ ছাল একবর্ণা গাভীর দুগ্ধসহ বাটিয়া খাইলে ও যোনিতে লেপন করিলে বন্ধ্যা নারীর গর্ভসঞ্চার হয়। অশ্বত্থের পরিপুষ্ট ছায়া-শুষ্ক ফল চূর্ণ করিয়া, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, শরীরের ধাতু পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

অশ্বগন্ধা।

অন্যনাম - কালা, কামরূপিণী, তুরগী, আসগন্ধ। সনামখ্যাত গুল্ম ভেদ। ইহার মূলের গন্ধ অশ্ব-গাত্রের গন্ধের ন্যায়। ইহা কটু, তিক্ত, উষ্ণ। কামোদ্দীপক, শুক্রবর্দ্ধক। বায়ুপ্রকোপ, শ্বাস, কাস, শ্বিত্র (ধবল) ব্রণ ও ক্ষয়রোগে উপকারক।

অশ্বগন্ধার কাথ কিছু দিন দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া পান করিলে দেহের পুষ্টি ও বলবীর্য্য বৃদ্ধি হয়। বালকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার কাথ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত শয়নকালে পান করিয়া যে নারী ঋতু স্নান দিনে পতি সহবাস করে, তাহার নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয়। অশ্বগন্ধা ও বিদ্ধড়ক মূল চূর্ণ প্রত্যেক আধতোলা মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ইন্দ্রিয়শক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

অস্থি সংহার।

অন্যনাম—হাড়যোড়া, হাড়জ, হস্তিশুণ্ডী। শৃঙ্খলবৎ লতা বিশেষ। ৬।৭ অঙ্গুলি অন্তর ইহাতে এক একটী গাঁট আছে। ইহা উষ্ণ, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু। বলকারক, কফনাশক, কণ্ডুকারি, কৃমি ও চক্ষু রোগঘ্ন। অস্থিভঙ্গে ইহার প্রলেপ বিশেষ উপকারী। ইহার চূর্ণের নস্য গ্রহণে সর্পবিষ নষ্ট হইতে পারে।

অহিফেন।

আফিং ইতি খ্যাত। শৃগালকণ্টক জাতীয় বৃক্ষের নির্য্যাসবিশেষ।

জামালপুর,* মুঙ্গের, পাটনা প্রভৃতি স্থানে পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ইহার বিস্তর চাস হয়।

ইহা মস্তিষ্ক-উত্তেজক, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনানাশক, ধারক, আক্ষেপ নিবারক। ইহার আস্বাদ তিক্ত। মাত্রা ১ রতি পর্য্যন্ত। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে। শৈশবাবস্থায় খুব সাবধানে ইহা ব্যবহার করা উচিত। জ্বর, মস্তক প্রদাহ, অতি-ঘর্ম্ম, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদায়িনী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা অহিতকারী। অনিদ্রা, অন্ত্র-প্রদাহ, অতিসার, উন্মাদ, বাত, বমন, হিক্কা, দুষ্টকাস, রক্তস্রাব, মূত্রাশয়-প্রদাহ, এবং বিবিধ অবিরাম, প্রাদাহিক ও পর্য্যায় জ্বরে ও পঞ্জর মধ্যস্থ বেদনায় ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার হয়। অধিক কাল সেবনে পুংস্ত্ব নাশ হয়।

৬ রতি আফিং ২ তোলা নিসিন্দাপাতার রসে গুলিয়া নস্য দিলে অপস্মার (মৃগী) রোগের উপশম হয়। কিঞ্চিৎ আফিং ও জায়ফল থালকুনি পাতার রসে ঘসিয়া নাড়ির চতুর্দ্দিকে লেপ দিলে দারুণ রক্তামাশায় আশু নিবৃত্ত হয়। আফিং ৬ রতি, পুরাতন গুড় ৬ রতি ও রক্তচন্দন ৪ রতি, একত্রে মাড়িয়া ৬টী বটী করিয়া ক্রমে ক্রমে খাইতে দিলে ওলাউঠা নিবারণ হয়। কিঞ্চিৎ আফিং সিমপাতার রসে গুলিয়া লেপ দিলে গলবেদনা ও কর্ণমূলের শোথ নিবারণ হয়। এক রতি আফিং ছাগদুগ্ধে গুলিয়া সেবন করিলে বহু বেগযুক্ত অতিসার অচিরে নিবারিত হয়। ধুতুরা পাতার রসে আফিং মিশাইয়া লেপ দিলে বাতবেদনা আরোগ্য হয়। আফিং ও মুসব্বর সিজপত্রের রসে মিশাইয়া অল্প গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলের স্ফীততা ও বেদনা নষ্ট হয়। নারিকেলতৈল অল্প গরম করিয়া, তাহাতে একটু আফিং মিশাইয়া কর্ণের ভিতর ঢালিয়া দিলে প্রবল কর্ণশূল (কানকামড়ান) অবিলম্বে নিবারিত হয়। আফিং ১ রতি ও কর্পূর এক আনা আন্দাজ লইয়া একত্র মিশাইয়া ৮টী বটী প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ উহার এক একটী সেবন করিলে শুক্রমেহ নিবারণ হয়। শূকরের রক্ত বা চর্ব্বিতে আফিং মিশাইয়া অর্শের বলিতে লেপ দিলে বলি পতিত হয়। কিঞ্চিৎ আফিং, ও সমুদ্রফেণা মনসাসিজের পাতার রসে মিশাইয়া লেপ দিলে স্ফীততা ও বাতের বেদনা আরাম হয়। ব্রণশোথে আফিংয়ের পটী এক রাত্রি বাঁধিয়া

রাখিলে উহা পাকিয়া আপনি কাটিয়া যায়। একটা অপক্ব বেলের মধ্যে আফিং এক আনা দিয়া, রাত্রিতে দগ্ধ করিয়া রাখিবে; প্রাতে সেই বেলের শাঁস বীজ রহিত করিয়া, উত্তমরূপে চটকাইয়া সেবন করিলে, কঠিন রক্তামাশয়, গ্রহণী প্রভৃতি পেটের পীড়া সত্বর আরোগ্য হয়।

আফিংয়ের ফলকে ঢেঁড়ি এবং তন্মধ্যস্থ বীজকে পোস্তদানা বলে। ইহা পাকে মধুর; এবং কান্তি, বীর্য্য ও বলবর্দ্ধক। ঢেঁড়ি জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সেক দিলে বাতের বেদনা নিবারণ হয়। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিরাজ।

সমালোচনা।

প্রেমপ্রতিমা বা প্রিয়ম্বদা।—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। উপন্যাসখানি একটি হিন্দুবিধবার জীবনের চিত্র। কঠোর ব্রহ্মচর্য্য যে পতিপ্রাণা হিন্দুরমণীর পক্ষে অতি কমনীয়, পরম শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম, গ্রন্থকার পরিষ্কাররূপে সেটি চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার আরও বিশেষ ক্ষমতা এই, তিনি বুঝাইয়াছেন, হিন্দুনারীর একের প্রতিই সুখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে; সেই একমাত্র স্বামীর সহিত তাহার উৎপত্তি, এবং তাঁহারই সহিত তাহার লয়। দেবার্চ্চনায় আত্মীয় স্বজনের সেবায় এবং পরোপকারে তাঁহার অপার দুঃখ, অনন্ত যন্ত্রণার কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি হয় বটে, প্রবল দাবানলে কথঞ্চিৎ বারি পতন হয় বটে, কিন্তু অভাগিনীর সুখ আর এ জগতে হইবে না। যাঁহার প্রেমে তিনি তন্ময় হইয়াছেন, পরলোকে তাঁহার সহিত না মিলিলে সুখ আর আসিবে না।

সমাজের একটি নৈমিত্তিক ঘটনা লইয়া উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। বঙ্গমহিলার বৈধব্য এবং তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন যে একটি নৈমিত্তিক ঘটনা, আমরা তাহার কথা বলিতেছি না। সে ত ইহার সর্ব্বপ্রধান কথা। আমরা আর একটি প্রাত্যহিক ঘটনার কথা বলিতেছি। সেটি দুর্ব্বল, অসহায় অনাথকে প্রতারণা—তাহার সর্ব্বস্বাপহরণ। সংসারের নিয়মই এই, প্রবলের প্রতি কেহ অত্যাচার করিতে কোন প্রকারেই সাহসী হয় না;

দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন করিয়া সকলেই আস্ফালন করে। ভ্রাতা বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে, অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র দুঃখিনী পিতৃব্য-পত্নীকে দাসীবৎ ব্যবহার করিয়া কিংবা পথের কাঙ্গালিনী করিয়া আত্মসুখসম্পাদনে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। আমরা এই উপন্যাসে পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিষয় আত্মসাতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ঐশ্বরিক নিয়ম এ প্রবঞ্চনার কিরূপ আশ্চর্য্য প্রতিফল পাইতে হইয়াছিল, পুস্তক পাঠে পাঠকগণ জানিতে পারিবেন। আমরা এই উপন্যাসের কয়েকটি প্রধান চরিত্র সমালোচনা করিব।

প্রথমে উপন্যাসের নায়িকা প্রিয়ম্বদার কথা। প্রিয়ম্বদার জীবনবৃক্ষে যে ফল ফলিবে প্রথমেই তাহার সুবীজ রোপিত হইয়াছিল। তিনি অসীম দয়ার্দ্র-হৃদয়, পরোপকারী স্বামীরত্ন পাইয়াছিলেন। এবং হিন্দু-জীবন-প্রণালী অনুসারে তাঁহার মন সেই মহান্ আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার মন এরূপ উন্নত হইয়াছিল, যে অন্যের দুঃখ তিনি কোনও প্রকারে সহ্য করিতে পারিতেন না। গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহার স্বামী উপেন্দ্রনাথ এবং তাঁহাকে পিতামাতাস্বরূপ জ্ঞান করিত।

কিন্তু এই পাপতাপপূর্ণ সংসারে এরূপ দেবতার স্থান নাই। উপেন্দ্র-নাথের জীবন ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়িল! অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে উপেন্দ্রের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার জীবনের মহাব্রত সাধনের ভার প্রিয়ম্বদার প্রতি দিয়া গেলেন। প্রিয়ম্বদা স্বামীর শেষ আজ্ঞা কয়টি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন নাই। কিরূপে তিনি স্বামীর কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আমরা তাহার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব।

বৈধব্যবেশ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রিয়ম্বদা বিধবা হইয়াই থান পরিলেন, সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন, মস্তকের কেশ কাটিয়া ফেলিলেন—প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী সাজিলেন। আজকাল অনেকে বৈধব্য বেশ চক্ষে দেখিতে মর্ম্মে ব্যথা পান, অল্প বয়সে সন্ন্যাসিনী সাজান ঘোর নিষ্ঠুরতা মনে করেন। এটি যে কি ভয়ানক ভ্রম, তাহা বলা যায় না। দুর্দ্দমনীয় রিপুর উচ্ছেদ করাই যদি বিধবার কর্ত্তব্য হয়; কায়মনোবাক্যে মৃত পতির ধ্যানই যদি জীবনের প্রধান ব্রত হয় তবে কোন্ যুক্তিবলে ভবিষ্যকারী কার্য্য সকল তাঁহারা অনুমোদন করেন? কেন তাঁহাদিগকে শান্তিপথে

অগ্রসর হইতে বাধা দেন! কেন আহার ও বেশের আংশিক পারিপাট্য করাইতে গিয়া তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতিজ্বালা শত গুণ প্রজ্জ্বলিত করেন।

প্রিয়ম্বদার প্রথম একাদশীর কথা আমরা কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। অনেক সংযমহারা, অধৈর্য্যা রমণী সে অংশ পাঠ করিয়া গভীর উপদেশ পাইবেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে বিভূষিত ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত পতিগতপ্রাণা রমণীর পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ স্বভাবসঙ্গত, আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ নহে।

চপলা। দিদি বেলা যে আর নাই, স্নানাহার করিবে আর কখন?

প্রিয়ম্বদা। 'আজ যে আমার একাদশী বোন্।' * * বালিকা চপলা কথা শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। অনেক কষ্টে পুনরায় বলিল "দিদি, পারিবে কি?"

প্রিয়। কেন পারিব না বোন্, ধর্ম্মে যদি আমার মতি থাকে আর সেই স্বর্গীয় স্বামীর চরণে যদি আমার ভক্তি থাকে, তবে কেন পারিব না বোন্?

চপলা। জেঠাইমা বলিতেছেন, আহার না কর, কিছু জল খাও।

প্রিয়। আমি যে চরণ ধ্যান করিয়াছি, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; চপলা, যখন সেই সর্ব্বগুণাধর স্বামীর চির-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিয়াছি, তখন আর সেই স্বামীর উদ্দেশে একাদশী করিতে পারিব না।

চপলা। তুমি নিজের দেহ নষ্ট করিতে বসিয়াছ, তবে খোকা আর সরোজিনী বাঁচিবে কিরূপে?

প্রিয়। এ দেহ আমার নয়, বহুদিন পূর্ব্বে এ দেহ, মন প্রাণ যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছি তিনি পৃথিবীতেই থাকুন আর স্বর্গেতেই থাকুন, এ দেহ তাঁহারই। যত দিন বাঁচিব তাঁহারই কার্য্যে এ দেহ উৎসর্গ করিব। চপলা, তোমায় আমি ছোট ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি; খোকা আর সরোজিনীকে আমি আজ হইতে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, তুমি তাহাদিগকে দেখিও; যদি ঈশ্বর বাঁচাইয়া রাখেন, তবে তাহারা তোমারই। আমার দ্বারা তাহাদের ভালরূপ লালনপালন আর হইতে পারে না। আমি তাঁহার শেষ আজ্ঞা রক্ষা করিব, সে কথা এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে।

ইচ্ছা করিয়া এ দেহ নষ্ট করিব না, কিন্তু যদি জীবনের উদ্দেশ্য পালনে এ দেহ নষ্ট হয়, যদি আমার সে শুভ দিন হয়, তাহাতে কেহ যেন বাধা না দেয়।"

লেখক যে স্থলে বিধবাবিবাহের কথা তুলিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহার চিত্র-নৈপুণ্যের কিছু ত্রুটি হইয়াছে। এক ত প্রিয়ম্বদার মত সতী বিরল, তাহাতে এখনও ছয় মাস হয় নাই তিনি বিধবা হইয়াছেন; এরূপ স্থলে ও কথার অবতারণা করিলে চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্বের হানি হইতে পারে; যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা হইতে পারে, যে অপরিণামদর্শী সংস্কারকের নিকট কালাকাল পাত্রাপাত্র বোধ সম্ভবে না। যাহা হউক, বিপত্নীক ও বিধবার প্রেম ও শিক্ষার কি প্রভেদ সকলেই তাহার পূর্ণ চিত্র এস্থলে পাইবেন।

প্রিয়ম্বদার ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম সম্যকরূপ পালন করিবার অনুকূল অবস্থাগুলি লেখক বিশেষ দক্ষতার সহিত একটীর পর একটী প্রকটিত করিয়াছেন। প্রিয়ম্বদা বাল্যকালে পরম ধার্ম্মিক, বিজ্ঞ, বহুদর্শী পরোপকারী স্নেহময় পিতা কর্ত্তৃক লালিত হইয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বামীর হস্তে পড়িয়াছিলেন, তাহা যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। তার পর, তাঁহার গুরুদেব সেই স্বামী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত; তিনি এখনকার গুরুদেবদের মত মূর্খ, কুচরিত্র, লোভী ছিলেন না। এবং সৌভাগ্য ক্রমে প্রিয়ম্বদাও বর্ত্তমান কালের রমণীদিগের মত পূজার্চ্চনায় দীক্ষিতা হইলেন না। যে মন্ত্রের মর্ম্ম তিনি বুঝিতে পারিবেন, যে পূজা, যে ব্রত তিনি কায়মনোবাক্যে সম্পন্ন করিতে পারিবেন, তাঁহার সেই প্রবীণ, পরম পণ্ডিত, পুণ্যাত্মা গুরুদেব তাঁহাকে সেই পূজায়, সেই মহান্ ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পূজার্চ্চনা সম্বন্ধে আমাদের মতের কেহ যেন বিপরীত অর্থ না করেন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের মত পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

সংসারের নিয়মই এই, যে সুখী চারিদিক হইতে তাহার সুখের উপাদান আপনা হইতে আসিয়া যুটে, এবং যাহাকে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহার দুঃখ যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না। প্রিয়ম্বদার শেষ আশ্রয়, জীবনের অবশিষ্ট অবলম্বন পিতা এই সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন! এখন ঈশ্বর তাঁহার একমাত্র আশা, একমাত্র ভরসাস্থল। উইল মতে তিনি পিতার বিপুল অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। এত ধনের

অধিকারিণী হইয়া তাঁহার "কিছুমাত্র সন্তোষ হয় নাই, বরং মনে মনে বলিয়াছিলেন"—"হে ভগবন্ এ আবার তোমার কি লীলা প্রভু, আমায় ধনের প্রলোভন কেন? প্রিয়ম্বদা কিন্তু তখনি স্থির করিলেন, দিনান্তে এক মুষ্টি হবিষ্যান্ন আর বৎসরে ২।৩ খানি গেরুয়া বসন ভিন্ন নিজের জন্য ঐ অর্থের অন্য কোন ব্যয় হইবে না।" তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। সে সব বিষয়ের পরিচয় পাঠকপাঠিকা পুস্তকপাঠে জানিতে পারিবেন। সেই সকল নিঃস্বার্থ কার্য্যের মধ্যে পদব্রজে শ্বশুরালয়ে গমন ও সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন আমাদের বিবেচনায় অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু প্রিয়ম্বদার মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া সে ত্রুটি মার্জ্জনীয় মনে করি।

উপন্যাসের মধ্যে শশিকলার চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেখানে যে অবস্থায় তাহাকে দেখিয়াছি, বরাবর সেই এক ভাব—সেই ঘোর খল, ঈর্ষাপরায়ণ, গর্ব্বিত, নিষ্ঠুর স্বভাবের কোথাও এক চুল ব্যতিক্রম হয় নাই। উপেন্দ্র যখন মৃত্যু শয্যায় পতিত, দেশ শুদ্ধ লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল; কিন্তু শশিকলা সেই বাড়ীতে থাকিয়া অমন দেবতুল্য দেবরকে একবারও দেখিতে গেল না, চক্ষুলজ্জারও খাতির রাখিল না। খলতা ও কঠোর হৃদয়ের ইহা চূড়ান্ত প্রমাণ! আমরা বাহুল্য ভয়ে অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না। এ জগতে অর্থ ব্যতীত তাহার ভালবাসার পাত্র আর কেহ ছিল না। দুঃখের বিষয় এ পাপ সংসারে এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, এবং আরও দুঃখের বিষয় এইরূপ স্ত্রীর স্বামীই একান্ত স্ত্রীপরায়ণ হইয়া থাকে। সেরূপ অধম হতভাগাগণ শশিকলার চরিত্র পাঠে অনেক শিক্ষা পাইবেন।

তারপর চপলা। ইনি নামেই চপলা, কিন্তু স্বভাবে এমন স্থির, শান্ত, ধৈর্য্যশীলা, সহিষ্ণু রমণী আর হয় না। এই সকল গুণের পূর্ণবিকাশ দেখাইবার জন্যই লেখক তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ও অত্যাচারের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু স্নেহময় স্বামীর মুখ চাহিয়া এবং প্রিয়ম্বদার সহোদরার মত ব্যবহারে তিনি এ সব কষ্ট অবিকৃতভাবে সহিতেন। ধীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রতি অত্যাচার যখন পূর্ণমাত্রায় হইল, তখন সেই স্বামীর দুঃখে মর্ম্মান্তিক ব্যথিতা হইয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, সে স্থল পাঠ করিয়া

কোন পাষাণ-হৃদয়ের হৃদয় না ভাঙ্গিয়া যাইবে! সেই আপনভোলা ভাব বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। তারপর যখন ধীরেন্দ্রনাথ স্বীয় বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া অতি হীনভাবে জীবন কাটাইতেছেন, তখন সেই চিরসঙ্গিনী কিরূপে অটল পর্ব্বতের ন্যায় সব সহিয়াছিলেন, তাহা পাঠিকা পড়িয়া দেখিবেন। কিন্তু করুণাময় ভগবান অবশেষে তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আবার ধীরেন্দ্রের অতি সমৃদ্ধ অবস্থা হইল। কিন্তু চপলার চরিত্রের কিছু পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি সেই পরিশ্রমী, শান্ত, নম্র, সকলের প্রতি স্নেহময়ী, সুখে—দুঃখে—অবিকৃত রহিলেন।

ধীর ধীরেন্দ্রনাথ বিকৃত শিক্ষামোহে অভিভূত বীরেশ্বর, ভীরু, সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, স্ত্রৈণ মহেন্দ্রনাথ, পাপিষ্ঠ গুণিরাম প্রভৃতির কোনও পরিচয় দিতে পারিলাম না। সে স্থান আমাদের নাই। প্রিয়ম্বদার ভ্রাতৃজায়া সুহাসিনীর সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা সমালোচনা শেষ করিব।

সুহাসিনী চির-আনন্দময়ী, চির-প্রফুল্ল, কাঁদিবার সময়ও তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া থাকিত। তাঁহার হৃদয়ে এত প্রেম, এত স্নেহ, এত মায়া, এত মমতা ছিল, যে তিনি যদি এত না হাসিতেন, যদি তাঁহার এরূপ বাল্যচাপল্য না থাকিত, তবে বুঝি সে বেগ ধারণ করা তাঁহার অসাধ্য হইত। সে যেন নদীর প্রবল স্রোত উথলিয়া দুকূল ভাসাইয়া চলিয়া যাইত। তিনি প্রাণ ভরিয়া স্বামীকে ভালবাসিয়াও পরিতৃপ্ত হন নাই। কিন্তু তিনি সহধর্ম্মিণী ছিলেন না। তাঁহার পতি ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি হিন্দু ছিলেন। যখন প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ছি দিদি, স্বামীর ধর্ম্মের কি নিন্দা করিতে আছে, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, স্বামী যে ধর্ম্ম বিশ্বাস করেন, স্ত্রীকেও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া সেই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে হয়।" তখন সুহাসিনী এই উত্তর দিয়াছিলেন, "প্রিয়ম্বদা, তুমি যথার্থই বলিয়াছ স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নাই, কিন্তু আমি তাহার অর্থ এই বুঝি যে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম, কিন্তু তা বলিয়া আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যে ধর্ম্ম বুঝিতে পারি না আমি কেমন করিয়া বলিব যে আমি সে ধর্ম্ম বুঝিয়াছি।" ইত্যাদি। ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বলি, যদি স্বামীর স্বভাবের কোনও দোষ থাকে, তবে স্ত্রী কখনা তাঁহাকে ঘৃণা করিবে না বটে, যাবজ্জীবন প্রাণপণে সংশোধনের চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু স্বামীর সে স্বভাবের অনুবর্ত্তন করিয়া সংসার বিষময় করিবে না। যাহা হউক সুহাসিনী অবশেষে স্বামীকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন করিয়াছিলেন। সুহাসিনী চিত্রে দু'এক স্থানে আমাদের বিষবৃক্ষের কমলমণিকে মনে পড়ে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

(সাবিত্রী লাইব্রেরী।)

শিরোমিতি বিদ্যা।

মূল-সূত্র।

শিরোমিতি বিদ্যা ((Phrenology) এক প্রকার মনোবিজ্ঞান-তন্ত্র বিশেষ। উহা মস্তিষ্কতত্ত্বের উপর স্থাপিত। আমরা দেখিতে পাই, শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে এবং শরীর-যন্ত্রের সাহায্যে মনের কার্য্য সকল বাহিরে প্রকাশ পায়। এই সত্যটির উপরেই শিরোমিতি বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যা মাত্রেরই এক একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। এই শিরোমিতি বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ কি?—না,—মস্তকের আয়তন ও গঠন দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের স্বাভাবিক ও মানসিক প্রবণতা ও শক্তি-সকল নির্ণয় করা।

ইহা প্রথমেই বলা আবশ্যক. এই বিদ্যা কি বিজ্ঞানকল্পে, কি ব্যবহারিক প্রয়োগ কল্পে, এখনও পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু শিরোমিতি বিদ্যার নিম্নলিখিত মূল সূত্রগুলির সত্যতা যে অসংখ্য প্রত্যক্ষ ব্যাপারের দ্বারা সমর্থিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১। মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র।

২। প্রত্যেক মনোবৃত্তির এক একটি বিশেষ বিশেষ পৃথক্ যন্ত্র মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

৩। মনোবৃত্তিগুলির নৈকট্য-সম্বন্ধ অনুসারে উহাদের যন্ত্রগুলিও মস্তিষ্ক অভ্যন্তরে কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি-অবস্থিত।

৪। অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে, মস্তিষ্কের আয়তনই মনের শক্তি-মাত্রার পরিমাপক।

৫। শারীরিক অবস্থার ইতর বিশেষে মানসিক শক্তি-প্রকাশের ইতর বিশেষ উপস্থিত হয়।

৬। যে কোন মনোবৃত্তি হউক না কেন, অনুশীলন দ্বারা তাহার উৎকর্ষ হইতে পারে এবং অবহেলা দ্বারা তাহার অপকর্ষ হইতে পারে।

৭। প্রত্যেক মনোবৃত্তিই স্বভাবতঃ শুভজনক, কিন্তু তাহার অপব্যবহারে অশুভজনক হইয়া পড়ে।

মস্তিষ্ক—মনের যন্ত্র।

মস্তিষ্কই যে মনের যন্ত্র, ইহা এখন প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে কয়েকটি তথ্যের দ্বারা এই সিদ্ধান্তটী সমর্থিত, তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অন্তরাত্মার অভ্যন্তরে অনুভব করিয়া দেখিলে এইরূপ প্রতীতি হইবে যে, মন মস্তকের মধ্যে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যেই অবস্থিত, অন্য স্থানে অবস্থিত নহে।

২। যেখানে মস্তিষ্কের ন্যূনতা সেইখানেই মানসিক শক্তির খর্ব্বতা দেখা যায়।

৩। যে পরিমাণে মনোবৃত্তি-সকলের বিচিত্রতা ও শক্তিমত্তা প্রকাশ পায়, সেই পরিমাণে মস্তিষ্কও বৃহৎ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়।

৪। মস্তিষ্কে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। জ্বর-রোগাক্রান্ত হইলে কিম্বা মস্তকে কঠিন আঘাত লাগিলে প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকেও একেবারে উন্মাদগ্রস্ত হইতে দেখা যায়।

৫। মস্তিষ্ক হইতে রক্ত হঠাৎ অপসারিত হইলে মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়, এবং কিছুকালের জন্য চৈতন্য স্থগিত থাকে।

৬। কোন প্রকার আঘাতে কখন কখন এরূপ ঘটনা দেখা গিয়া থাকে যে কোন ব্যক্তির মাথার খুলির কতকাংশ উঠিয়া গিয়া মস্তিষ্ক দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে। এইরূপ স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সেই মস্তিষ্কাংশকে কেবল অঙ্গুলীর দ্বারা চাপিয়া ধরায় সেই ব্যক্তির চৈতন্য স্থগিত হইয়াছে এবং চাপ সরাইয়া লইলে আবার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে।

৭। যে সকল স্থলে মস্তিষ্ক এইরূপ দৃষ্টিগোচর হয় সেই স্থলে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সময় মস্তিষ্ক স্থিরভাবে থাকে; স্বপ্ন যে পরিমাণে সুস্পষ্ট হয় সেই পরিমাণে উহাতে আন্দোলন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং জাগ্রতাবস্থায় উহাতে অধিকতর গতি উপস্থিত হয়।

মস্তিষ্ক—যন্ত্রসমূহের সমষ্টি।

সমস্ত মস্তিষ্ক যেরূপ সমস্ত মনের যন্ত্রস্বরূপ—সেইরূপ বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্কাংশ সকল বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির যন্ত্র-স্বরূপ।

ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। শরীর-তন্ত্রের আর আর সকল অংশে—এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সাধনোপযোগী এক একটি পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্র আছে। দৃষ্টির যন্ত্র চক্ষু; শ্রবণের যন্ত্র কর্ণ; পাকের যন্ত্র পাকাশয়; ইহা অপেক্ষা আরও অধিক বলা যাইতে পারে, যে স্থলে ক্রিয়া জটিল, সে স্থলে যন্ত্রও সেই অনুসারে জটিল হইয়া থাকে। যেমন মনে কর—জিহ্বা। জিহ্বাতে একটী স্নায়ু আছে যাহার কর্ম্ম উহাকে নাড়ানো—উহা থাকাতেই আমরা কথা কহিতে পারি। আর একটি স্নায়ু আছে, তাহার দ্বারা স্পর্শ বোধ হয় এবং আর একটি স্নায়ু আছে, তাহাতে আস্বাদ বোধ হয়। এক কথায়, যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মানবদেহ-যন্ত্রে এমন একটিও দৃষ্টান্তস্থল দেখা যায় না যেখানে কোন একটি স্নায়ুর দুই প্রকার ক্রিয়া আছে। এক্ষণে এই ঔপমানিক যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই অনুমানে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, যে সকল মনোবৃত্তি খুব ভিন্ন প্রকৃতির (যথা—পর্য্যবেক্ষণবৃত্তি ও তুলনাবৃত্তি) সেই সকল বৃত্তির অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্রও অবশ্য আছে।

২। ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে, যে, কোন কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ ব্যবসার কিম্বা কার্য্যের কিম্বা আলোচনার উপযোগী অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে চেষ্টা করিয়াও হয় ত আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। যদি সমগ্র মস্তিষ্কের ক্রিয়া-শক্তি একটি মাত্র হইত তাহা হইলে তদন্তর্গত প্রত্যেক বৃত্তিই সমান মাত্রায় সেই মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখা যায়।

৩। মনুষ্যের সকল মনোবৃত্তি একই সময়ে প্রকাশ হয় না। শিশু যে সময়ে ভয় ও ভালবাসায় চালিত হয়, তখন তাহার ভক্তিবৃত্তি কিম্বা ধর্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হয় না। সে বাহ্যবস্তুর গুণাগুণ উপলব্ধি করিতে অনেক পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ করে, কিন্তু একটু বয়স বেশি না হইলে

তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করিতে পারে না। ইহাতেই বোধ হয় যে, মস্তিষ্কের কোন অংশের পরিপুষ্টি দ্বারা ভালবাসার ক্ষমতা জন্মে—কোন অংশের পরিপুষ্টির দ্বারা ভক্তি করিবার ক্ষমতা জন্মে; কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা পর্য্যবেক্ষণ করি এবং কোন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বিচার করিয়া থাকি।

৪। যখন আমরা স্বপ্ন দেখি, তখন দেখা যায় আমাদের কতকগুলি মনোবৃত্তি সক্রিয় থাকে এবং কতকগুলি মনোবৃত্তি নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে; ভালবাসা, ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি কত প্রকার ভাব পরম্পরাক্রমে মনোমধ্যে উদয় হয়—কোনটারই শৃঙ্খলা থাকে না—সকলই অসম্বদ্ধ ও অব্যবস্থিত। কখনও যুক্তিযুক্ত—কখনও বা অত্যদ্ভুত। মস্তিষ্কের সজাগ অবস্থায় যেরূপ সুশৃঙ্খল ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি সমস্ত মস্তিষ্ক একটি মাত্র যন্ত্র হইত, তাহা হইলে মনোবৃত্তি সকলের এইরূপ আংশিক প্রকাশ হইত না—সকল মনোবৃত্তিই হয় এক সময়েই জাগ্রত হইত, নয় এক সময়েই নিদ্রিত থাকিত।

৫। আংশিক নির্ব্বুদ্ধিতা এবং আংশিক উন্মাদ, মস্তিষ্কের যান্ত্রিক একতা বিষয়ক মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। কোন কোন জন্ম-নির্ব্বোধ ব্যক্তি যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির নিতান্ত অভাব, তাহাদের মধ্যে কখন কখন বলবৎ নৈতিক ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়—কখন কখন বা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়। অন্যান্য বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ নির্ব্বুদ্ধি হইলেও কাহারও কাহারও কোন বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির পূর্ণ উন্মেষ দেখা যায়—যেমন গণনা-শক্তি—কিম্বা সুরজ্ঞান বা তালজ্ঞান। সমগ্র মস্তিষ্কের হীনতা যদি এইরূপ আংশিক নির্ব্বুদ্ধিতার কারণ হইত, তাহা হইলে এরূপ ব্যাপার সকল দেখা যাইত না। আংশিক উন্মাদও এই বিষয়ের সত্যতা সপ্রমাণ করে।

৬। মস্তিষ্কের আংশিক হানি হইলে, এক কিম্বা ততোধিক মনোবৃত্তির ক্রিয়া স্থগিত হয়, কিন্তু অন্যান্য মনোবৃত্তি সকলের হানি হয় না। মস্তিষ্ক যদি একটি মাত্র সমগ্র যন্ত্র হইত, তাহা হইলে এরূপ ঘটিতে পারিত না।

যন্ত্রসন্নিবেশ।

প্রত্যেক মনোবৃত্তির বিশেষ বিশেষ যন্ত্র সকল বহুল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা একে একে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত হইবার পর আলোচনা করিয়া এইরূপ দেখা যায় যে, যে সকল মনোবৃত্তির মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ আছে সেই সকল মনোবৃত্তির যন্ত্র গুলিও কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি সন্নিবেশিত। ইহাতেই প্রতীতি হয়, এই সকল যন্ত্রসন্নিবেশ স্বাভাবিক সুন্দর শৃঙ্খলা ক্রমে হইয়াছে—সুতরাং সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আয়তন—শক্তির পরিমাপক।

অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মস্তক সাধারণতঃ ক্ষুদ্র এবং নেপোলিয়ন ক্রমওএল ফ্রাংক্লিন প্রভৃতি প্রখ্যাত বড় লোকদিগের মস্তক বৃহৎ ইহা সকলেই জানেন। "অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে আয়তন শক্তির পরিমাপক" এই নিয়মটির উপর নির্ভর করিয়া কি গতি-বিজ্ঞান ও কি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—কি শরীর-তত্ত্ব বিদ্যা ইহাদের গণনা ও বিচার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। শিরোমিতি বিদ্যাও এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল নহে।

শারীরিক অবস্থা।

"আয়তন শক্তির পরিমাপক" এই সাধারণ নিয়মটি যখন আমরা উপরে বলিয়াছি তাহার সহিত এই কথাটিও যোগ করিয়া দিয়াছি যে "অন্যান্য বিষয়ে সমান হইলে।" মস্তিষ্কের সম্বন্ধে এই "অন্যান্য বিষয়গুলি" কি?—না—যথা, প্রকৃতি; রকম কিম্বা গুণ; স্বাস্থ্য; শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া; রক্ত সঞ্চালন; পরিপাকশক্তি; কার্য্য-তৎপরতা; উত্তেজনীয়তা; সামঞ্জস্য ইত্যাদি। কোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে এই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এই সকলের তারতম্যে মনোবৃত্তি সকলের শক্তি- মাত্রার তারতম্য উপস্থিত হয়।

উৎকর্ষণীয়তা।

বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ষণ করিলে সকল মনোবৃত্তিকেই পরিপুষ্ট করা যায়। যেরূপ শরীরের অঙ্গবিশেষকে চালনা দ্বারা পরিপুষ্ট করা যায় সেইরূপ প্রত্যেক মনোবৃত্তিকে চালনা দ্বারা সবল করা যায়।

সকল মনোবৃত্তিই শুভজনক।

প্রত্যেক মনোবৃত্তিই স্বতঃ শুভজনক—প্রত্যেক মানবের হিতের জন্য ও জগতের হিতের জন্য সকল মনোবৃত্তিই প্রয়োজনীয়। উহাদিগকে অপব্যবহার ও অযথা নিয়োগ করিলেই অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে এবং উহাদিগকে অযথা খর্ব্ব করিলেও শুভ ফল প্রসব করে না। সমস্ত মনোবৃত্তি যথাযথরূপে পরিপুষ্ট হইলে—সামঞ্জস্যভাবে কার্য্য করিলে, নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির অধীনে থাকিলে, মানুবজাতির পরম মঙ্গল সাধিত হয়।

হত্যা-প্রবৃত্তির যন্ত্র স্বরূপ কোন বিশেষ মস্তিকাংশ নাই। কিন্তু এমন একটি বৃত্তি আছে যাহার উদ্দেশ্য উদ্যম, কার্য্য-তৎপরতা, বল ও তেজ প্রকাশ করা—এই বৃত্তি খুব সতেজ হইলে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির দ্বারা ইহাকে যথোপযুক্ত দমনে না রাখিতে পারিলে, ইহা অবশেষে হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে পরিণত হইতে পারে। সেইরূপ মনে কর, সম্পত্তি-অর্জ্জন ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আমাদের মনে নিহিত আছে—ভবিষ্যতের জন্য সুখ স্বচ্ছন্দতার উপায় আয়োজন করিয়া রাখা এই প্রবৃত্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৃত্তির দমনে উহাকে না রাখিতে পারিলে ক্রমে উহা চৌর ও প্রবঞ্চনায় পরিণত হইতেও পারে। সকল স্থলেই মনোবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত কার্য্য গুলিই অমঙ্গলের কারণ—কোন মনোবৃত্তিরই স্বাভাবিক পরিণাম অশুভ নহে।

শিরোমিতি বিদ্যার মূলসূত্রসকলের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়া এইবার-কার মত প্রবন্ধটি শেষ করা গেল। [ক্রমশঃ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অদৃষ্টবাদ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যজগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের মধ্যে নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রভৃতি যে সকল লক্ষণ আমাদের নয়নগোচর হয়,

অন্তর্জগতের ঘটনাগুলীর মধ্যেও সেই সেই লক্ষণ আমাদের মনশ্চক্ষুর নিকটে প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে উভয় ক্ষেত্রেই এক প্রকার নিয়মের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগৎ কখনও অসম্বদ্ধভাবে কাজ করে না। দেখাইয়াছি যে, যেখানে আমরা মনে করি, আমরা ইচ্ছা করিয়া কোন বাসনা-বিশেষকে দমন করিলাম, সেখানেও বাস্তবিক অন্যতর বাসনা-বিশেষই উক্ত ইচ্ছার প্রণোদক। ইহাও দেখাইয়াছি যে, যখন লোকে স্বাধীনতার কথা বলে, তাহার অর্থ বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ ঘটনা রাজির কারণত্ব ভিন্ন আর কিছুই নয়; আর Mill যাহাকে Fatalism বলিয়াছেন, তাঁহার অর্থও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে বাহ্যজগতের কারণত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখন একটা প্রশ্ন উঠিতেছে, এই যে কার্য্যকারণ লক্ষণ সকল নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, এই গুলির দ্বারা আমরা ঘটনা সকলের কার্য্যকারণ নি[illegible] বটে, কিন্তু ইহাদের দ্বারা কার্য্যকারণ নিয়মের অবশ্যম্ভাবিতা এ[illegible]াতে এই প্রয়োগিতা সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই[illegible]তঃ একরূপ অবশ্যম্ভাবিতা (Necessity) এবং সর্ব্বস্থল-প্রয়োগিতা সম্বন্ধে [illegible] প্রত্যক্ষ কিছু বলিবার নাই। যাহা ঘটিতেছে এবং ঘটিয়াছে তাহার[illegible] প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, এবং বিজ্ঞানের ভিত্তি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের (Experience) উপর। সুতরাং যে স্থান বা সময় সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না, সে স্থান বা সময় সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে তাহা কেমন করিয়া জানিব? কাজেই, যদি কেবল বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ হইতে অবশ্যম্ভাবিতার ভাব দূর করিয়া দিতে হইবে। অদৃষ্টবাদের মূলে যে অবশ্যম্ভাবিতার ভাব রহিয়াছে তাহাও দূর করিতে হইবে। এই জন্যই Mill বলিয়াছেন,—

A volition is a moral effect which follows the corresponding moral causes as certainly and invariably as physical effects follow their physical causes; whether it *must* do so I acknowledge myself entirely ignorant, be the phenomena moral or physical, and I condemn accordingly the word Necessity as applied to either case. All I know is that it always *does*. *(Examinations of S. W. Hamilton's philosophy.)*

এখন দেখা যাউক, এ কথা কতদূর ঠিক যে কার্য্যকারণের নিয়মের

মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতার ভাব অসঙ্গত এবং অযৌক্তিক। মিল্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন, যখন অবশ্যম্ভাবিতা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তখন এ সকল বিশ্বাস কুসংস্কার এবং অভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। ইহা ভ্রমপূর্ণ। কে বলিল যে ইন্দ্রিয় ব্যতীত জ্ঞান-বৃদ্ধির আর অন্য উপায় নাই? ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা যে অবশ্যম্ভাবিতার ভাব আসিতে পারে না, তাহা Hume অকাট্য ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, এবং আজকাল সকলেই সে কথা স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা জর্ম্মাণ দার্শনিক Kantএর সহিত বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় এবং সাময়িক প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত আমাদের এক অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পথ আছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ সর্ব্বদাই এই অতীন্দ্রিয় বৃত্তির ক্রিয়া আমাদের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। বিজ্ঞান যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও বস্তুপার্থক্য আরম্ভ করে, তাহার মূল এই দুই বিভিন্ন বৃত্তির মিলন। সকরের প্রতি যদি আমরা বুদ্ধি (Intellect) সংজ্ঞা প্রদান করি, তাহা হইলে স্বচ্ছন্দতার বলিতে পারি যে প্রত্যক্ষজ্ঞান (Experience), ইন্দ্রিয় (sense) উৎকৃষ্ট বৃদ্ধি (Intellect) এই দুই বৃত্তির একীকরণ। বুদ্ধি-তত্ত্ব হইতে পরিগৃহ, বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের অধীন হইতে পারে না। Mill প্রভৃতি বলেন, যদিও আমাদের এখনকার মানসিক অবস্থায় আমরা এই দুই বৃত্তিকে বিভিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না, এমন সময় ছিল যখন এই সম্বন্ধ এত দৃঢ় ছিল না। আমরা বলি, যাহা কল্পনার অতীত তাহা লইয়া যুক্তি করা বাক্য ব্যয় করা ব্যতীত আর কিছু নয়। যদিও Mill, বিশেষতঃ Bain একেবারে বুদ্ধি অস্বীকার করেন না, তবু তাঁহারা এই বৃত্তির তত্ত্ব সকলের সংখ্যা সংক্ষেপ করিতে চান। সংযোগ (identification) এবং বিয়োগ (differentiation) এই দুই তত্ত্বেই ইঁহারা বুদ্ধির জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এইরূপ মনে করেন। আমাদের বিশ্বাস ইহার ঠিক বিপরীত। আমরা মনে করি জগতে যত প্রকার সম্বন্ধ আছে সমস্তই বুদ্ধির তত্ত্ব (principles of the intellect) * Kant-এর তত্ত্ব সংখ্যাও আমরা

* Like most English psychologists he (H. Spencer) tries to reduce the number of relations among things to a minimum, and * * says that they are limited to likeness and unlikeness, coexistence in space and sequence in time. On the contrary, there is not a conjunction or a preposition and

সম্পূর্ণ মনে করি না। বস্তুতঃ বুদ্ধির তত্ত্ব অসংখ্য। জাগতিক সম্বন্ধের সংখ্যা অনন্ত, বুদ্ধির তত্ত্বও অনন্ত। এ সকল কথার প্রমাণ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব। Kant-এর পরে দার্শনিক জগতে যাহা কিছু প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। যাহা হউক, আমরা এই বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে, কার্য্যকারণ তত্ত্ব আমরা একটি বুদ্ধিতত্ত্ব বলিয়া মনে করি। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে ইহার উৎপত্তির চেষ্টা বৃথা; কেন না, এই তত্ত্বের অন্যথা আমরা কল্পনা করিতে পারি না, এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই তত্ত্বের সত্যতা ধরিয়াই সম্ভব হয়। সুতরাং যাহা প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ফলরূপে বর্ণনা করা বাতুলতা। এই ভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং সর্ব্বস্থান-প্রযুজ্য সত্য; কেন না, ইহা একটি বুদ্ধি তত্ত্ব। এখন আবার প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি এই সম্বন্ধ কেবল বুদ্ধি-তত্ত্ব ব্যতীত আর কিছু না হয়, তাহা হইলে বস্তুতঃ জগতে এই সম্বন্ধ আছে কি না? Kant বলেন ইহা কেবল বুদ্ধিতত্ত্ব, বস্তুতঃ এরূপ কোন সম্বন্ধ জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে নাই; তবে আমাদের প্রত্যক্ষ (phenominaley real) জগতের মধ্যে ইহা নিত্য সত্য। কেন না, প্রত্যক্ষ জগৎ সততই বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায়। এইখানে আমাদের Kant-এর সহিত বিবাদ উপস্থিত। আমরা বলি, জ্ঞানের তত্ত্ব (principles of knowledge) আর অস্তিত্বতত্ত্ব (principles of existence) এক। Kant-এর পরে সমস্ত দার্শনিকগণই তাঁহার এই বিশ্বাসটি ভুল বলিয়াছেন। যাহা হউক মোটের উপর এই দাঁড়াইল,—কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বগুলিই অবশ্যম্ভাবী, সর্ব্বস্থল-প্রযুজ্য এবং বস্তুতঃ সত্য। এ কথা স্বীকার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অদৃষ্টবাদের ভিত্তি মিল্ প্রভৃতি যত কোমল এবং চঞ্চল মনে করেন বস্তুতঃ ইহা তত কোমল অথবা চঞ্চল নয়। আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা এবং অনুসন্ধিৎসা 'হতে পারে'

hardly an adverbial phrase, syntactic form or inflection of voice in human speech that does not express some shading or other of relation, which we at some moment actually feel to exist between the larger objects of our thought * * the relations are numberless * *

XXXII Mind, Proff. W. James.

'হয়ে থাকে' ইত্যাদি উত্তরে সন্তুষ্ট হয় না। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষতঃ জ্ঞানের বিষয় হইলেও অপ্রত্যক্ষ তত্ত্ব সকলের উপর স্থাপিত। বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আমাদের জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন সম্ভব (probable),—সম্ভব ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না বটে, কিন্তু আমাদের এ জ্ঞান এবং বিশ্বাস ছাড়ান অসম্ভব যে প্রকৃতপক্ষে জগতে সম্ভব (probable বলিয়া কিছু নাই। সমস্তই অবশ্যম্ভাবী—যাহা ঘটে তাহা না ঘটিয়াই পারে না। বস্তুতঃ অদৃষ্ট-বাদের ভিত্তি শিলাখণ্ড অপেক্ষা দৃঢ়তর।

এই স্থলে একটি সাধারণ আপত্তির উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে হইতেছে। যাঁহারা স্বীকার করেন যে এই নিয়ম অবশ্যম্ভাবী এবং নিত্য, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, এই নিয়মের কার্য্য বাহ্যজগতে যেরূপ, অন্তর্জগতে সেরূপ নয়। বাহ্যজগতে ঘটনার কারণ ঘটনা বটে, কিন্তু অন্তর্জগতে ঘটনার কারণ আত্মা। বাহ্যজগতের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থান এবং সময়ের সীমার মধ্যে বদ্ধ। অন্তর্জগতে অতীন্দ্রিয় কাল এবং স্থানের রাজ্যবহির্ভূত আত্মাই কারণরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং কার্য্যকারণ সূত্র ঠিক হইলেও তাহাদের প্রকাশের নিয়ম এক নয়। প্রকৃতপক্ষে, এখানে দুইটী বিভিন্নরূপ সম্বন্ধকে এক মনে করা হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কার্য্যশীল মনের যে সম্বন্ধ, প্রকৃতপক্ষে সে সম্বন্ধ, আর আমরা যাহাকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বলিয়াছি তাহা এক নহে। অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে আমাদের ক্রিয়াশীল মনের, কিম্বা স্থান ও কালের ভিত্তির উপর স্থাপিত কার্য্যকারণসূত্রের, প্রত্যক্ষভাবে কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ আমরাও বিশ্বাস করি বটে যে, অতীন্দ্রিয় আত্মা ব্যতীত এই নিয়মের কোন অর্থই থাকে না; কিন্তু তাই বলিয়া আত্মাকে কারণ নাম দেওয়া কোন মতেই সঙ্গত নয়। কার্য্যকারণসূত্র সময়সাপেক্ষ। কার্য্য-কারণের মধ্যে পরবর্ত্তিতা, পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রভৃতি সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। আত্মাকে কোন ভাবের পর বা পূর্ব্ব বলা যায় না। কার্য্যকারণসূত্র পরিমাণ এবং প্রকার-বিষয়ক। কিন্তু অতীন্দ্রিয় আত্মার পরিমাণ বা প্রকারের কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আর, আত্মার সহিত সম্বন্ধ যে কেবল অন্তর্জগতের বিশেষত্ব, তাহা মনে করাও ভুল। বহির্জগতেও কোন অতীন্দ্রিয় আত্মার

অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে কার্য্যকারণসূত্রের অর্থ থাকে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতীন্দ্রিয় আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিলেও ঘটনা সকলের অবশ্যম্ভাবিতা দূর হয় না। কার্য্যকারণসূত্র অসৎ অথবা অবস্তুর (phenomena) নিয়ম। সতের সহিত অসতের নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও সৎ হইতে অসতের, বস্তু হইতে অবস্তুর সিদ্ধি হয় না। অসৎ সৎ হয় না, সৎ অসৎ হয় না। গীতায় বলিয়াছেন,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

তবে কি স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই?—নিশ্চয়ই আছে। অনিয়মিত স্বাধীনতার কোন অর্থ নাই। যদি স্বাধীনতা থাকে, তবে সে নিয়মের মধ্যেই আছে। যেখানে নিয়মের কঠোর বাঁধুনি, সেইখানেই স্বাধীনতা। এই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়াই Kant স্বাধীনতাকে কতকটা বিশ্বাসের বিষয় বলিয়াছেন। প্রথম, কার্য্যকারণসূত্রের প্রয়োগস্থল যে অসতের (phenomena) রাজ্য, এইটী প্রমাণ করিয়া তিনি বলিলেন, অতীন্দ্রিয় সতের রাজ্যে স্বাধীনতা বিরাজ করিতে পারে; তারপর, তিনি দেখাইলেন যে, নৈতিক নিয়মের ভিত্তি—স্বাধীনতায় বিশ্বাস। Fichte Hegel প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন যে এইখানেই Kant-এর দর্শনের দুর্ব্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বাধীনতা এবং নিয়মের সামঞ্জস্য করিতে হইলে এই দুই তত্ত্বকে বিচ্ছেদ করিলে চলিবে না। কিন্তু, এক চুল নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না, অথচ স্বাধীনতা নষ্ট হইবে না, ঘোর অদৃষ্টবাদের মধ্যেও স্বাধীন আত্মা নৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে—ইহাও কি সম্ভব? আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে?—অসম্ভব নয়। এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য তখনই হয়, যখন আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাদের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অসম্ভব। 'আমি' বলিলেই বাস্তবিক 'আমি-নয়' একটা কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝায়। নিয়ম অর্থে বন্ধন, সম্বন্ধ অর্থেও বন্ধন। আমার জীবন—সম্বন্ধে; সুতরাং আমার অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা—বন্ধনে। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ না থাকিলে আমি থাকিতে পারি না, বস্তুতঃ তোমা ব্যতীত আমার অস্তিত্ব নাই; সুতরাং আমি আছি বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, তুমি আছ—আমার বন্ধন আছে—আমি নিয়মের অধীন। আমি তোমাকে 'আমি' এবং 'আমার' ভাবিতে পারি না বলিয়াই তোমাকে আমার বন্ধন

বলিয়া বোধ হয়। যখন ভাল করিয়া বুঝিব যে তুমি আমি এক, তখনই স্বাধীনতা এবং নিয়মের সামঞ্জস্য হইবে। আর একটি উদাহরণ দিয়া বুঝান যাউক। মনে করুন, আমি আর আমার সমাজ।—যতক্ষণ এই দুইটি বিভিন্ন বলিয়া ভাবিব, ততক্ষণ মনে হইবে, সমাজের অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার খর্ব্বীকরণ। কিন্তু যদি একবার বুঝিতে পারি যে, সমাজ না থাকিলে আমি থাকি না, আমার জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, প্রেম বল, ভক্তি বল সমস্তই সমাজ লইয়া; তখনি দেখিতে পাই যে, আমার নৈতিক অস্তিত্ব সমাজ ব্যতীত অসম্ভব। ইহার ভিতর রূপক কিছুই নাই—সমাজ আর আমি এক। আমার মনুষ্যত্ব ততটুকু, যতটুকু আমি এই একত্ব বুঝিয়াছি। এই ভাবটি যে একবার বুঝিয়াছে, তার কাছে কি সমাজের নিয়ম বন্ধন বলিয়া বোধ হইতে পারে?—এই ভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ঘটনা সকলকে অসম্বদ্ধ ভাবে দেখিলেই নিয়ম স্বাধীনতার বিরোধী বলিয়া বোধ হয়, নিয়মকে নিয়ম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, তাহাদের মধ্যে উদ্দেশ্য রহিয়াছে, বুদ্ধি তত্ত্বের দ্বারা তাহারা একত্রিত হইয়া রহিয়াছে, তখন দেখিতে পাই যে, ঘটনা শ্রেণীর আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর যাহা বোধ হইতেছিল তাহা রহিল না।* এতক্ষণ তাহাদের বিভিন্ন বোধ হইতেছিল, এখন দেখি তাহারা এক। একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। পৃথক্ করিলে তাহাদের কাহারই অস্তিত্ব নাই।—সংযোগেই তাহাদের অস্তিত্ব। শত্রুকে আপনার মনে করিলে সে আর শত্রু থাকে না। আপনার গলায় আপনি রজ্জু দান করিলে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। বন্ধনকে যদি আমার জীবনের অংশ বলিয়া মনে করিতে পারি, কারণের বাহ্যিক ক্রিয়ার মধ্যে যদি উদ্দেশ্যের এবং প্রেমের দৃঢ় বন্ধন দেখি, তাহা হইলে স্বাধীনতার মধ্যে নিয়ম থাকিতে পারে। আমরা পূর্ব্বে যেখানে বৈজ্ঞানিক চক্ষুতে সম্বদ্ধ ঘটনা সকলের বাহ্যিক

* The process of necessity begins with the existence of scattered circumstances which do not concern each other and appear to have no interconnection among themselves. These circumstances are an immediate actuality which collapses, and out of which a new actuality proceeds. *Hegel's Logic, translated by Wallace.*

সম্বন্ধ দেখিতেছিলাম,—দেখিয়াছি সেখানে বাস্তবিক বুদ্ধিতত্ত্ব সকল তাহাদিগকে এক করিতেছে। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব কারণের মধ্যে কার্য্য রহিয়াছে। 'ন কারণাৎ কার্য্যস্য বিভিন্নত্বং'। অন্তর্জগতের নীচ শক্তি সম্বন্ধে সহজে এ কথা বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি যে, যে আমি প্রথমে ভাব রূপে ছিলাম, পরে সেই আমিই আবার ইচ্ছারূপে প্রকাশিত হইলাম। বুঝিতে পারি, বিভিন্নতার মধ্যে আমার একত্ব নষ্ট হয় না। কিন্তু বাহিরের শক্তি সকল যখন আমার আশার ঘর বাড়ী ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন কেমন করিয়া বলি যে তাহারাও আমার পর নয়! যদি না পার, তবে তুমি স্বাধীনতার অধিকারী নও।

বাস্তবিক, আমরা ভাল করিয়া অদৃষ্টবাদী নই বলিয়াই নিয়মের কঠোরতা অনুভব করি। অদৃষ্টবাদের মূল এই যে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে অথবা ঘটিবে সমস্তই অবশ্যম্ভাবী—অর্থাৎ জগতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলে বদ্ধ।—বাস্তবিক বলিতে গেলে ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই ভাবে দেখিলে আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, সামান্য বালুকাকণার জীবনের সঙ্গে গগনব্যাপী নক্ষত্রপুঞ্জের জীবন অভেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ—উভয়ের জীবন এক। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অনন্ত আকাশ এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া একই সত্ত্বা বিরাজ করিতেছে। জগৎকে ভাগ করিয়া দেখ, তোমার আমার স্বাধীন সত্ত্বা ভাব, দেখিবে অদৃষ্টবন্ধন বড়ই কঠিন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখ,—ত্রিকালজ্ঞ সেই মহাপুরুষের জীবনে সমস্তই এক। বন্ধন বলিয়া কিছুই নাই—কেন না, তুমি ছাড়া জগতে আর কিছু নাই, বন্ধন জীবের কিছুই নয়, সে তোমারই জীবন। অবশ্যম্ভাবিতার ভাবকে কেবল উপরে উপরে দেখিলে অদৃষ্ট-বন্ধন লৌহ শৃঙ্খলাপেক্ষাও কঠোর বোধ হইবে।—তলাইয়া দেখিলে মনে হইবে সে বন্ধন স্বরচিত কুসুম-হার সদৃশ কোমল। বুঝিবে, ইহা ব্যতীত স্বাধীনতা অসম্ভব। স্বাধীনতা—প্রকৃত স্বাধীনতা নিয়মের মধ্যে। অনিয়মিত স্বাধীনতার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। চোর মনে করিতে পারে তাহার শাস্তি তাহার বন্ধন। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, সে বন্ধন তাহারই আভ্যন্তরীণ স্বভাবের বিকাশ। তাহা অবশ্যম্ভাবী—তাহা অদৃষ্টের খেলা। যদি এ কথা সে বুঝিতে পারে তবে সে স্বাধীন।

প্রকৃত স্বাধীনতা আমরা তখনই লাভ করি, যখন আমরা বুঝিতে পারি সমস্তই অদৃষ্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্যই জার্ম্মাণ দার্শনিক হিগেল (Hegel) বলিয়াছেন,—"The truth of necessity is Freedom and freedom presupposes Necessity."

যোগীশ্রেষ্ঠ শঙ্কর বলিয়াছেন,

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি
র্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥

আবার তিনিই 'সোহং' 'তত্ত্বমসি'র তাৎপর্য্য জগৎকে বুঝাইয়াছেন।

সমাপ্ত।

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

গোপাল।

(গাথা)

১

গম্ভীর যামিনী, আঁধার আকাশ,
দূরেতে ঝটিকা শ্বাসে,
দিগন্তের কোলে চমকে দামিনী,
—পথিক ছুটিছে ত্রাসে!

২

এ ধারে গর্জ্জিছে অশথের শ্রেণী,
ও ধারে তটিনী ভাঙ্গিছে পাড়।
হোথায় শ্মশানে জ্বলিতেছে চিতা,
—বড় শ্রান্ত দেহ, চলে না আর!

৩

সপ্ত বর্ষ পরে ফিরিতেছে ঘরে ;
বয়াকুল দেখিতে স্ত্রীপুত্র-মুখ !
অর্থের অভাবে ছেড়েছিল দেশ ;
পেয়েছে সে অর্থ, পাবে কি সুখ ?

৪

"খোল—খোল দ্বার !" নিস্তব্ধ কুটীর ;
পুন করাঘাতি' ডাকিল হেঁকে।
একটি নিশ্বাস, সুধু শোনা গেল !
চাল হ'তে পেঁচা পড়িল ডেকে।

৫

"খোল—খোল দ্বার !" ভেঙ্গে গেল দ্বার।
—এ কি নিস্তব্ধতা ভয়-সঞ্চারী !
হাসিল বিদ্যুৎ পিশাচীর মত,—
মৃতপুত্র-বুকে মুমূর্ষু নারী ! !

৬

তড়্‌তড়্‌ তড়্‌ বরষে জলদ,
হুহুহু ঝড়েতে উড়ে যায় চাল।—
মুমূর্ষুর মাথা কোলেতে রাখিয়া,
মৃত পুত্র-মুখ চুমিছে গোপাল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা।

(প্রস্তাবনা)

প্রায় এক শতাব্দী মাত্র অতীত হইতে চলিল, য়ুরোপীয়গণ সংস্কৃতানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সত্য বটে সিকন্দর সাহ নামক গ্রীসদেশাধিপতির

দিগ্বিজয়ের পর দুই একজন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতের সংস্কৃতাধ্যয়নের কথা শুনা যায়; কিন্তু তাহার পর মধ্যে একেবারে ও চর্চ্চা বিলুপ্ত হওয়ায় আমরা সেই সময়কে অবধি করিয়া ধরিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার কতক পরিমাণে দৃঢ় সংস্থাপিত হইবার পর হইতেই পুনর্ব্বার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। বোধ হয় সার জোন্স নাইটের সময়ই প্রথম আন্দোলনের সময়, কারণ তাহার পূর্ব্বে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃতাধ্যয়নের কথা বড় একটা শুনা যায় না।

যাহা হউক এই অল্প সময়ের মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দৃঢ় অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের সহিত এরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছেন যে চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বেদ হইতে হিতোপদেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ সকল ইউরোপীয় নানাবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এইরূপ প্রগাঢ় যত্নের সহিত সংস্কৃতাধ্যয়নের বলে ভাষাতত্ত্ব নামক একটি নূতন বিষয় সমুদিত হইয়াছে। এবং অনেক নিবিড়ান্ধকার-নিহিত তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়া পূর্ব্বপ্রচলিত অপরাপর তত্ত্বকেও সম্যক্ আলোকিত করিয়াছে। ফল, সংস্কৃতাধ্যয়নে যেমন তাঁহারা জগতের উপকারসাধন করিতেছেন বটে, সেই রূপ অন্য দিকে অনেক স্থলে স্ব স্ব কল্পনা বলে সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে নানাবিধ ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া এবং অমৌলিক এবং অযৌক্তিক রহস্য ভেদ করিয়া, জগতের পক্ষে যতই হোক, ভারতের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতেছেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের খৃষ্টধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকায় তাঁহারা ভারতীয় শাস্ত্রনিচয়কে খৃষ্টধর্ম্ম-পক্ষপাতী চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সুতরাং অনেকস্থলে বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ নিচয়ের আলোচনাস্থলে বহুল পরিমাণে প্রমাদের বশীভূত হইয়াছেন। সচরাচর তাঁহাদের মত সকল ভ্রমপূর্ণ, প্রমাণ-শূন্য ও অযৌক্তিক বলিয়া লক্ষিত হয়। কাযেই উহারা প্রতিবাদার্হ। এক্ষণে প্রতিবাদ দ্বারা ঐ সকল ভ্রমপূর্ণ মতের তন্ন তন্ন করিয়া খণ্ডন না করিলে উহা চির-কালের নিমিত্ত বদ্ধমূল হইয়া আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের গৌরব বিলুপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য প্রতিবাদ করে কে? য়ুরোপীয়দিগের মত সকল ইংরাজী ভাষায় লিখিত হয়। আমাদের দেশে যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত

তাঁহারা ইংরাজীর নাম গন্ধও জানেন না। যাঁহারা ইংরাজীতে ব্যুৎপন্ন তাঁহারাও আবার সংস্কৃতের সহিত বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। সুতরাং ইংরাজেরা আমাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের চিরসংস্কার বিরুদ্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা অযৌক্তিক ও ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ হইলেও খণ্ডিত না হওয়ায় চিরকালের নিমিত্ত বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। উহারা একবার বদ্ধমূল হইলে যে ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কার সকলের লোপ করিয়া তন্মূলক ধর্ম্মের শরীর কর্কশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করত তাহাকে একেবারে ক্ষীণ করিবে তাহা এক প্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত। বিশেষ দেখিতেছি, আজকালের নব্যসম্প্রদায়ের অবস্থা বড় ভয়ানক; তাঁহারা সংস্কৃতের ধার ধারেন না, নিজের শাস্ত্রে কি আছে না আছে তাহার তত্ত্ব লয়েন না, তাঁহাদিগের গুরু য়ুরোপীয়গণ সে সম্বন্ধে যাহা বলিল তাহাই তাঁহাদের ধারণা, তাহাই তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান, এবং তাহাতেই তাঁহারা আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্রাদির উপর, যাহা মনে আসিল, মত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। অনুবাদ মাত্র পড়িয়া, বেদের পাতা না উল্টাইয়াই, কেহ বেদ 'চাষার গান' বলিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে প্রবন্ধ লিখিলেন। বড়ই সর্ব্বনেশে কথা। এরূপ আর কিছু দিন চলিলে শীঘ্রই হিন্দু নাম লোপ পাইবার আশঙ্কা।

এইরূপ নানাবিধ অনিষ্টোদর্ক চিন্তা করিয়া আমরা "য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা" এই নাম দিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে প্রথমে কেবল য়ুরোপীয়দিগের এক একটি শাস্ত্র বিষয়ক মত প্রকাশিত হইবে, পরে তাহাদিগের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিতেও চেষ্টা করিব। কিন্তু এরূপ প্রতিবাদ একজনের সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এইজন্য আমরা পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি, তাঁহারা য়ুরোপীয় মতগুলি যদি পণ্ডিতদিগের নিকট বিদিত করিয়া সেই সেই বিষয়ে তাঁহাদিগের অভিমত সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তাহা হইলে অনেক উপকার বোধ হয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমরা যে বিষয় ধরিব সে বিষয় য়ুরোপীয় পণ্ডিত কর্তৃক যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে তাহা একবারে নিঃশেষ করিয়া না বলিয়া তদ্বিষয় প্রতিবাদ আরম্ভ করিব না। সর্ব্বত্রমান্য এবং সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া আমরা অগ্রে বেদকেই আশ্রয় করিলাম। এক্ষণে বেদের বিষয় য়ুরোপীয়

পণ্ডিতগণ যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় ক্রমশ প্রকাশিত করিয়া পরে সেই সেই মতের প্রতিবাদ আরম্ভ করিব। বেদ অতি বিস্তৃত। ইহার সম্বন্ধে বহুবিধ সমালোচ্য রহিয়াছে। তন্মধ্যে য়ুরোপীয়গণ যেরূপ যুক্তি ও বিচার দ্বারা ইহার অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাই প্রথম আলোচিত হইতেছে।

প্রথম প্রবন্ধ—প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেদের অনিত্যতা।

(থিয়োডর গোল্ডষ্টকারের মত।)

চিরকাল হইতে নানাবিধ দর্শনশাস্ত্রে বেদের নিত্যতা সিদ্ধ হইলেও একণে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ উহার বৈপরীত্য অর্থাৎ বেদের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য সেই বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া মহামান্য প্রাচীন পণ্ডিত গোল্ডষ্টকারের মতের প্রথমে উপন্যাস করিলাম। তিনি বলেন—‘বেদ’ এই কথাটি সংস্কৃত জ্ঞানার্থক ‘বিদ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহাকে লাটিন *vid* এবং গথিক *vait* এর সহিত একার্থক বলা যাইতে পারে। ‘বেদ’ এই কথাটির মৌলিক বা প্রাকৃতিক অর্থ—জ্ঞান বা বিদ্যা; কিন্তু আজ কাল ইহা দ্বারা কেবল সেই প্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়ের বোধ হয়—যাহা ব্রাহ্মণীয় ধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রমাচারের মূল-ভিত্তি-স্বরূপ এবং যাহাকে হিন্দুগণ দেবোদ্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই বেদগ্রন্থ প্রথমে তিনখানি মাত্র ছিল, ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদ। কিছু কাল পরে ঐ তিন খানির সহিত অভিনব চতুর্থ বেদের (অথর্ব্ববেদের) যোগ করা হয়। কিন্তু উহা কখনই যে পূর্ব্ববর্ত্তী বেদ ত্রয়ের সহিত সমান আদর বা অভ্যর্হিততা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেখান যাইতেছে।

(১) প্রথমতঃ ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের নবম ঋকে কেবল ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ এবং সাম বেদেরই নাম দৃষ্ট হয়, ঐ চতুর্থ বেদের নাম গন্ধও নাই।

(২) মনু-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঐ চতুর্থ-বেদের কথাই নাই বলিলে

হয়, কারণ মনু সর্ব্বত্রই ঋক্, যজু এবং সাম এই তিন বেদেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল একাদশ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদের উদ্ভবের বিষয় বলিয়াছেন, এ স্থলে, অথর্ব্বাঙ্গিরস এই শব্দ দ্বারা অথর্ব্ববেদ তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও ঠিক্ নামে নামে ঐক্য নাই।

(৩) মীমাংসকগণ যাঁহাদের সন্দিগ্ধ বৈদিক বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যান এবং বৈদিক বচনের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জনই একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিল, তাঁহারাও কেবল প্রথমোক্ত তিনখানি বেদ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন অথর্ব্ব বেদকে স্পর্শও করেন নাই।

আরও এক কথা, সকল বেদেরই পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞীয় প্রয়োজন আছে। যেমন যজ্ঞানুষ্ঠান কালে হোতা নামক পুরোহিত ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বকার্য্য পূরণ করেন, অধ্বর্য্যু, যজুর্ব্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞে অর্চ্চন বিধির অনুষ্ঠান করেন এবং উদ্গাতা, সাম বেদের মন্ত্র সকল স্বর-সংযোগে গান করেন। এইরূপ অথর্ব্ববেদের কোন বিশেষ যজ্ঞ কার্য্যে প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় না। এতদনুযায়ী কার্য্য করিতেও কোন বিশেষ পুরোহিতের কথাও বলা হয় নাই।

মধুসূদন নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়াছেন, অথর্ব্ব বেদ কোন যজ্ঞ কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না। ইহাতে কেবল গ্রহশান্তি ও অভিশাপ প্রভৃতি কতকগুলি অভিচার কার্য্যের শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ নানা কারণে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অথর্ব্ব বেদ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞকর্ম্ম-সাধক বেদত্রয়ের সহিত রচিত হয় নাই। অথর্ব্ববেদ যে পূর্ব্বোক্ত তিন বেদ অপেক্ষা অনেক পরে রচিত তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, বৈদিক কার্য্যের নিয়ামক সূত্র গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ নাই, আর যদি ইহাকে একটা প্রমাণ বলিয়া না ধর, তাহা হইলেও মন্ত্রের ভাষাই ইহার আধুনিকতার পরিচায়ক, কারণ ওরূপ ভাষা আর কোন বেদে নাই।

যাহা হউক আর একটা আশ্চর্য্য এই যে, কল্পসূত্রনিচয়ের যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যবস্থাপক নিয়মগুলি একত্র মিলাইয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট লক্ষিত হইবে যে, যজুর্ব্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্র সকল কোন না কোন যজ্ঞকর্ম্মের প্রয়োজনে আসে। কিন্তু ঋক্‌বেদের সমুদয় মন্ত্রই যে যজ্ঞের প্রয়োজনে আসে

তাহা নহে। ইহাতে এমন সকল মন্ত্র আছে যাহাতে যজ্ঞের কোনরূপ সম্পর্ক নাই বলিলে চলে। ঐ সকল মন্ত্রে উত্তম কবিত্ব এবং সামাজিক বা ঐতিহাসিক গূঢ় রহস্য দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা আমরা অনায়াসে এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে পরবর্ত্তী লোক সমুদয় বেদ-মন্ত্রের যজ্ঞনিষ্পাদকতা সিদ্ধ করিতে সাতিশয় যত্নবান হইলেও তাঁহাদের ঐ যত্ন পূর্ব্বোক্ত কাব্য-প্রসবকারী নৈসর্গিক কবিত্ব-শক্তির নিকট নিষ্ফল হইয়াছে; যেহেতু তাঁহাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ঐ সকল কবিতা যজ্ঞীয় মন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই; ঋগ্বেদের অন্তিমমণ্ডলে একটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়, উহাতে একজন দ্যূতকারের শোক পাপোদ্দীপক গর্হিত বুদ্ধির নিমিত্ত অনুতাপের বর্ণনা আছে। ঐ সকল মন্ত্র যে ভূতাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের স্তুতির বাচক ও যজ্ঞনির্ব্বাহক মন্ত্র সমূহ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। [ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

কৃষি-কথা।

আমি এইরূপ বুঝি, সংসারে থাকিতে হইলে যতকিছু বিদ্যার প্রয়োজন তাহার মধ্যে কৃষিবিদ্যা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। অন্যান্য বিদ্যার উপকারিতা আছে সত্য, কিন্তু ইহার সহিত সে সব তুলনা হইতে পারে না। টোলের পণ্ডিত যাবজ্জীবন ফেনপুঞ্জ-সজ্জিত মুখে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির সূত্র আওড়াইয়া তর্কসিদ্ধান্ত, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উপাধির হার গলায় ঝুলাইলেন, কিন্তু গৃহিণীর গহনানাভাবের জন্য তর্জ্জন গর্জ্জনের ভয় ঘুচিল না। স্মার্ত্তবাগীশ পাড়ায় পাড়ায় ব্যবস্থা দিয়া বেড়ান, কিন্তু আপনার অন্নহীনতার ব্যবস্থা আজও হইল না। শাস্ত্রবিদ্যার কথা থাউক, শস্ত্র বিদ্যার দশা তাহাপেক্ষাও হীন। শস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চা আমাদের দেশে নাই। যাহা আছে তাহার উপকারিতা অতি যৎসামান্য। সেনাপতির তর্জ্জনী মাত্র সঞ্চালনে সিপাহীরা যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য সদত প্রস্তুত,

তাহাদের মাসিক বেতন ৮ আট টাকা মাত্র। সঙ্গীত বিদ্যার শ্রেষ্ঠতা কেহ কেহ প্রতিপন্ন করিতে যত্ন পান; কিন্তু সে ভ্রান্তি মাত্র। "গানাৎ পরতরং নহি"—ভরতমুনির এ কথা যে মানে সে মানুক, আমি মানি না। সঙ্গীত বিদ্যায় পেট ভরে না, চালে খড় জুটে না। সঙ্গীতের আদর কয়জন বুঝে? পাশকরা বিদ্যার আদর আজ কাল বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহারও উপকারিতা দেখি না। এম্ এ পাশ করিয়া শেষ যাবজ্জীবন উপার্জ্জন করিলেও পাশ করিবার খরচ পোষায় না। গোলামি ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই। যিনি রসিক, তিনি হয়তঃ বিদ্যার তুলনার কথা শুনিয়া বলিবেন, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা।" কিন্তু সে সব রসের কথা হইতেছে না। এই নিরন্নতার হাহাকার মধ্যে কৃষিবিদ্যা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যার উপকারিতা তত বুঝিতে পারি না। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদৰ্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—এ কোন অর্থশাস্ত্রের কথা। কৃষি অগ্রে, বাণিজ্য তাহার পরে। আপনার অভাব পূরণ করিলে পর, যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা লইয়া অপরের দ্রব্যের সহিত বিনিময় করার নাম বাণিজ্য। যাহার নিজের অভাব পূরে না, যে পেটে খাইতে পায় না, সে কি ধন লইয়া বাণিজ্য করিবে? প্রাচীনেরা এ কথা বুঝিতেন। তাই তাঁহারা কৃষির আদর এত বাড়াইয়াছিলেন। আর্য্যদিগের কথা কি বলিব, কৃষি তো তাঁহাদের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতিরাও ইহার আদর বড় বুঝিতেন। তাই, রোমক কন্সলেরা ফোরমের রাজমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে মাঠে পড়িয়া স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। কৃষিবিদ্যার ন্যায় বিদ্যা আর নাই।

কিন্তু, কৃষির সে দিন কাল গিয়াছে। বিশেষ, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা এখন নষ্টচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশ সভ্য হইয়াছে, কাজিজ যোজার কাল পড়িয়াছে; এখন হলা মুচি হইতে বাগেশ্বর চূড়ামণি পর্য্যন্ত সকলেই চাকুরে বাবুর দল। কৃষিকর্ম্ম যে কেহ করে, সে ঘৃণার পাত্র। ঘৃণার পাত্র বলিয়া তাহা এক প্রকার নীচ জাতীয়দিগের উপরেই বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে রোগটা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে। নীচ জাতীয়েরাও দুখানা ব'য়ের পাতা উল্টাইয়া আর লাঙ্গলের মুঠি ধরিতে

চাহে না। পাঁচ টাকা মাহিনার ডাকহরকরা হইবে সেও ভাল; তবু "চাকুরে" খেতাব। ভূমি চষিতে গেলে সেইতো বোলেনের আগুন বরশান খাইতে হইবে! কিন্তু তাহা যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আর কি তাহা পারা যায় গা? এখন মুখে মুখে "বল্লিঃ ব্যাপ্য ধূমবান্" চুরটের অপূর্ব শোভা বিরাজ করিবে। পাছে পায়ে একটু ধুলা লাগে এ জন্য পায়ের উপর মোজা, তার উপর প্রিন্সআর্ভির, তার উপর চিনের বাড়ীর বুট; ইহা না হইয়া কি না এক হাঁটু কাদায় দাঁড়াইয়া বলদ ঠেঙ্গান—সে দৃশ্য মনে ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গরিব বৃদ্ধ চাষা না বুঝিয়া পেটের ক্ষুধা পেটে মারিয়া ছেলেকে 'এ বি' পড়াইয়াছিল। এখন সে ছেলে না চাকুরি করে, না লাঙ্গল চষে; কেবল তেড়ি কেটে, বাক্স ভাঙ্গে, আর পোষাক কেনে।

ইহাদিগেরই যখন এই অবস্থা তখন "ভদ্র"-আখ্যাধারীদিগের কথা কি বলিব? যে কেহ পয়সার জোরে হউক, খোসামোদের জোরে হউক, মুরুব্বি ধরিয়া ১০।১৫ টাকার একটা চাকুরি যুটাইতে পারিল, তাহারি ছেলে তরিয়া গেল, নচেৎ সে ছেলের অনন্ত অবস্থা। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের ধারণা, চাকুরি ভিন্ন তাঁহাদের জীবনের অন্য লক্ষ্য নাই; এবং চাকুরিতে তাঁহারাই একমাত্র বংশ পরম্পরাক্রমে চিরসত্ত্বে সত্ত্ববান, অন্য কেহ দাবি দাওয়া করে তাহা নামঞ্জুর। তাঁহারা যাহাদিগকে নীচজাতীয় ভাবেন, তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়ে কেহ চাকুরি পাইলে অনেকের অসহ্য হইয়া উঠে। অনেকে ভাবেন কালে কালে সব হইল, এইবার ইহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থের অন্ন মারিল। কেহ বা ঈর্ষা চাপিয়া না রাখিতে পারিয়া একটু ছল পাইলেই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"বাপু হে, যে হাতে লাঙ্গল ধরিবে সে হাতে কি কলম ধরা শোভা পায়?" কৃষিকর্ম্ম ব্রাহ্মণ-কায়স্থদিগের নিকট এতই হেয় কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরের দূরবর্ত্তী কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণেরা কৃষিকার্য্য স্বহস্তে না করিলেও লোক জন রাখিয়া আজও চাস আবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের নিন্দার পরিসীমা নাই। যে দশ টাকার চাকুরি করে, সেও তাঁহাকে 'চাষা' বলিয়া ঘৃণা করে। তাঁহার অপরাধ তিনি কোট কামিজ পরেন না, ১০।১৫ টাকার চাকুরি করেন না;

নিজে চাকর রাখিয়া চাস করেন, আর বৎসর বৎসর আপন হাতে রাশি রাশি ধান মাপিয়া গোলায় তুলেন। জনরবে শুনা যায়, শীঘ্রই সমাজে তাঁহার হুঁকা বন্ধ হইবে।

কিন্তু কেন এমন হইল তাহা বুঝা যায় না। যে আর্য্যগণের বংশাবলী বলিয়া আমরা এই অধঃপতনের দিনেও বিদেশীর নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া থাকি, সেই আর্য্যগণ তো কৃষিজীবী ছিলেন। উপনিবেশ-স্থাপনার সেই আদি দিনে নবীন সূর্য্যালোকে প্রশান্তমূর্ত্তি আর্য্যগণ পঞ্চনদ ভূমে অগ্রসর হইতেছেন—উন্নত দেহ বেড়িয়া শুভ্র যজ্ঞোপবীত লম্ববান, প্রসন্ন বদনে মধুর হাসি উছলিয়া পড়িতেছে, স্কন্ধের উপর সুদীর্ঘ হল শোভা পাইতেছে, সঙ্গে অগণন ধেনুপাল ছুটিতেছে—সে দৃশ্য কি মনোহর! সেই দৃশ্যে ভুলিয়া প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত সেই হল-মুখে আপনার লুক্কায়িত ধন-রত্ন খুলিয়া দেখাইল। আর্য্যগণ শনৈঃ শনৈঃ আপনার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেক দিন পূর্ব্বপুরুষগণ এই হলের আদর ভুলেন নাই। রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী হইলেও কেহ কেহ স্বহস্তে হল ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করিতেন। রাজর্ষি জনক স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে করিতেই সীতমুখে সীতাদেবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্রুপদরাজ স্বহস্তে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতেই দ্রৌপদী লাভ করিয়াছিলেন। আজ কাল পেন-কলম হইয়া হলের যেরূপ অনাদর হইয়াছে, পূর্ব্বে এমন ছিল না। তখন সকল যন্ত্র এবং সকল অস্ত্র অপেক্ষা হলের শ্রেষ্ঠত্ব সকলে মানিত। তাই উপাসক আপন দেবতাকে হল অস্ত্রে সাজাইল। বলরামের হলের নিকট অর্জ্জুনের গাণ্ডীব এবং কৃষ্ণের সুদর্শন পরাস্ত হইত। সেই হল আজ দুর্ব্বল কেরাণীর ষ্টিলপেনের নিকট ঘৃণার সামগ্রী!

যাহা হউক, ফল কথা, কৃষিবিদ্যার বড় অনাদর হইয়াছে। এরূপ অনাদর ভাল নয়। কৃষিবিদ্যা সকল বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে সভ্যতার বাহ্য শোভায় আজ সমগ্র দেশ অভিমানগুম্ফিত, ইহাই আদিম সভ্যতার মূল কারণ। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বকল্ বলেন—সভ্যতার প্রথম কারণ সামাজিক ধনসঞ্চয়। ধনসঞ্চয় না হইলে তাহা কখনও উন্নত হইতে পারে না। কিন্তু ধনসঞ্চয় হয় কিরূপে? মানুষ যখন প্রথম সমাজে আসিয়াছিল, তখন কিছু প্রত্যেক লোক এক একটা টেঁকশালা সঙ্গে লইয়া আসে নাই, যে ইচ্ছা করিলেই

সকলে ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে। মানুষ দুই হাত দুই পা লইয়া আসিয়াছিল, সেই হস্ত পদে পরিশ্রম করিয়া আপনার উপায় আপনি করিল। মানুষ প্রথম জন্মিয়া দেখিল, তাহার হস্ত পদ সব ঠিক্ আছে, কিন্তু উদর শূন্য, ইহা এক দিনও না পূরাইলে চলে না। তখন মানুষের প্রথম কর্ম্ম হইল, কোনও উপায়ে উদর পূরণ করা। ক্রমে উপায় স্থির হইল। মানুষ দেখিল তাহার চারি পাশে উদ্ভিদের রাশি। বাছিয়া বাছিয়া সে উদ্ভিদ্ আহার করিয়া আপনার প্রাণধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে লোক-সংখ্যা বাড়িল। সমাজের গঠন হইল। সমাজে সমাজে অনেক লোক, লোকে লোকে অনেক উদর, কিন্তু সকল উদরই শূন্য। কাজেই, উদরপূর্ত্তির উপায় আরও প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন হইল। যাহা খাইলে প্রাণধারণ হয় তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাইবার জন্য চেষ্টা বাড়িল। মানুষ কৃষিবিদ্যা শিখিল। সেই বিদ্যাবলে সমাজের প্রকাণ্ড শূন্য উদর পূরিল। সকলে চিনিল, কৃষিবিদ্যার ন্যায় গরীয়সী বিদ্যা আর নাই, সকলে সেই বিদ্যায় মন দিল। ক্রমে সকলের পরিশ্রমে অনেক সামগ্রী উৎপন্ন হইল। তখন সমাজের আহার কুলাইয়াও কিয়দংশ উদ্বৃত্ত হইল। সেই উদ্বৃত্ত সামগ্রী সমাজের ভাণ্ডারে গেল। সমাজের ধনসঞ্চয় হইল। যতক্ষণ উদর শূন্য থাকে ততক্ষণ ধনসঞ্চয় হয় না। যে পেটের জ্বালায় লালায়িত—ক্ষুধা পাইলে যাহার আপন হাতে করিয়া খাইতে হইবে, তাহার অবকাশ কখন? লোক অবকাশ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বিদ্যার চর্চ্চা বা জ্ঞানের আলোচনা না করিলে উন্নত হইতে পারে না। এই কার্য্যে সমাজে এক ভাগ সাবকাশ হওয়া আবশ্যক। সাবকাশ হইতে পারা যায়, যদি সকলকেই পেটের জ্বালায় 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে না হয়। যদি সমাজের অপর একভাগ তাহাদিগের আহারীয় খাদ্যসামগ্রী পর্য্যাপ্তপরিমাণে যোগাইয়া দেয়। আর্য্যগণের ইতিহাসে কি দেখিতে পাই? প্রথম অবস্থায় সকলেই কৃষিজীবী, সকলেই জীবন ধারণের একমাত্র উপায় খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনে ব্যস্ত। তার পর, যখন আহারীয় সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইল, লোকের আহার কুলাইয়াও উদ্বৃত্ত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সকলেই সেই এক কার্য্যে নিরত না থাকিয়া কেহ কেহ বিষয়ান্তরের আলোচনায় মন দিল। এইখানেই

বর্ণাশ্রমবিভাগের সূত্রপাত। তখন, এক এক শ্রেণীর উপর এক এক বিষয়ের ভার অর্পিত হইল। কৃষি এক সম্প্রদায়ের জীবনের অবলম্বন হইল। তাহারা সমাজের আহার যোগাইতে লাগিল। সুতরাং অন্য এক সম্প্রদায় সাবকাশ হইয়া জ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ করিল। সেই চর্চ্চায় আর্য্যগণ এক দিন উন্নতির চরম সোপানে উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের গৌরব-সূর্য্যে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। আর, তাহা না হইয়া যদি সকলকেই 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া বেড়াইতে হইত? তাহা হইলে কোথায় থাকিত সাংখ্য পাতঞ্জল, কে বা শুনিত ব্যাস বাল্মীকির নাম, কে বা গাহিত ভবভূতি কালিদাসের গুণ-গাথা! জীবন ধারণ সকলের আগে, তোমার বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য বা রাজনীতি তাহার অনেক পশ্চাতে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। 'অন্ন-চিন্তা চমৎকার।' তোমার মিল্ বেকন কোমৎ ফুয়ারবাক, কি শকুন্তলা কাদম্বরী নৈষধ কিছুতেই কিছু হয় না। তাই বলিতেছিলাম, কৃষিবিদ্যার ন্যায় বিদ্যা আর নাই। যাহাতে সকলে ইহার মর্ম্ম বুঝে, বুঝিয়া আপনার উপায় আপনি করিতে পারে, আজিকার দিনে তাহা বড়ই কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

আর কেনই বা লোকে ইহার প্রতি এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। আগে তো এমন ছিল না। এ কি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল? অনেকে দেখিয়া শুনিয়া তাই মনে করেন। বড় ভুল। পাশ্চাত্যগণ কৃষির আদর বুঝেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সমাজের অগ্রণী, দেশের মাথা, তাঁহারাও স্বহস্তে লাঙ্গল চষিতে আনন্দানুভব করেন। রোমান ডিক্টেটর সিন্সিনেটস, মহাবল ওয়াসিংটন, অগাধসত্ব গ্যারিবল্ডি—আরও কত লোকের নাম করিব?—রাজমন্ত্রী হইতে সামান্য সৈনিক পর্য্যন্ত সকলেই চাস করিতে বড়ই ভালবাসে। চাস করিতে জানে, এবং তাহা করিতে পাইলে যার পর নাই সুখী হয়। জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ায় এক সম্প্রদায় আছেন তাঁহাদিগকে Farmer princes বলে। তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি; সমাজে তাঁহাদিগের মান্যের সীমা নাই। ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর বড় লোক আছেন, তাঁহাদিগকে Gentlemen farmer বলে। House of Commons-এ তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ প্রতিপত্তি। সেই House of Commons-এর মতে দেশ

চলিতেছে। ইংরাজ কখন কৃষির অনাদর করে না। তাহাদিগের শিক্ষায় কখনও ইহা শিখাইতে পারে না। কৃষির উন্নতির জন্য ইংরাজ বড় বড় স্কুল কলেজ স্থাপনা করিতেছে। যে দুই একজন ভারতবাসী আজকাল কৃষি-বিদ্যা শিখিতেছেন, সেও ইংরাজের সেই স্কুল কলেজ হইতে। তবে, কেন আমাদের এমন মতি গতি হইল? কেন আমরা এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম? হ্যাটকোট, চেন চুরট ইংরাজের সব অনুকরণ করিলাম, কিন্তু তাহার মহৎ গুণ কেন শিখিতে পারিলাম না? সেই বাহ্য-শোভায় মজিয়া আপনার নিজের যাহা ছিল, তাহাও কেন ভুলিয়া গেলাম? হ্যাটকোটে তো পোড়া পেট বুঝে না; কথায় কথায় ইংরাজি চালে চলিলে এ বিষম ক্ষুধা তো মেটে না! গৃহে যাহার চামচিকা ও আরসুল্লার নৃত্য, ভাতের হাঁড়িতে যাহার মাকড়সার বাস, তাহার আবার এ সব কেন? হায়! কে বলিবে কেন?

তবে, দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, যেন একটু—একটু মাত্রায় স্রোত ফিরিতেছে। শিক্ষিতের মধ্যে কেহ কেহ বিলাতে গিয়া কৃষিবিদ্যা শিখিতে-ছেন; চাকুরে বাবুর মধ্যে কেহ কেহ আফিসে মনিবের তীব্র ভৎসনায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া বন্ধুর নিকট বলেন, 'আর এ ঝকমারি অপেক্ষা পাড়া-গাঁয়ে গিয়া চাস আবাদ করা ভাল।' দেখিতে পাই, বিলাতফেরত কৃষি-তত্ত্ববিদ্ দেশে আসিয়া দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে নানা কাগজে কৃষি-সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখিতেছেন। মন্দর ভাল বটে। তবে কথাটা কি. কৃষি সাহিত্য নহে; ইহা সাদা শ্রীরামপুরী কাগজের উপর বড় বড় কাল কাল অক্ষরে শোভা পাইবার সামগ্রী নয়। কাগজের উপর কলম চালান আর জমির উপর লাঙ্গল দেওয়া অনেক তফাৎ। তায়, বিলাতের কৃষিপ্রণালী ভারতের জমিতে কিরূপে খাটে, অথবা আদৌ খাটে কি না, সে সব বিষয়ে দেখিয়া শুনিয়া বড় একটা লেখা হয় না। সে আন্দাজের কথা নহে পরীক্ষার বিষয়। এখন, এ পরীক্ষা করে কে? চাষীরা লেখাপড়া জানে না এ সব প্রবন্ধ তাহারা পড়ে না। লেখকগণও কোথায় কোন্ জমির কি অবস্থা, মাঠে গিয়া তাহার কোনও তত্ত্ব লয়েন না। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বিলাত হইতে Agriculturists উপাধি লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা

আজও কেহ স্বহস্তে কোনরূপ কৃষিকার্য্যে মন দেন নাই। তবে কেহ কেহ চা-বাগান করিয়াছেন; কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। চা ভারতবাসীর খাদ্য নহে, সে তো বিলাসিতার অন্য উপকরণ মাত্র। কেহ কেহ Nursery খুলিয়াছেন; কিন্তু তাহারও তত উপকারিতা বুঝি না। অন্নের বৃক্ষে ফুল ফুটে না। এই নিরন্নতা ও পরমুখপ্রেক্ষিতার দিনে যাহাতে আপনি আপনার পেটের ভাত করিয়া খাইতে পারা যায়, ইহা সকলের পক্ষে বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। ভারত স্বর্ণ-প্রসবিনী। কিন্তু কেন তাহার আজি এমন দুর্দ্দশা! তাহার সব গিয়াছে সত্য, কিন্তু আজও তাহার সোণার মাটী আছে। ফলাইতে পারিলে, আজও সেই মাটীতে সোণা ফলে। নির্ব্বোধ অকৃতজ্ঞ সন্তানেরা ইহা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না বলিয়াই, মাতা মনের দুঃখে দিন দিন শীর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন; এবং সেই জন্যই দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় এক একবার দুর্ভিক্ষরূপ ঘোর অভিশাপে সকলকে ছারেখারে দিতেছেন!

[ক্রমশঃ

বিবিধ।

প্রকৃতি।

প্রকৃতির বিবিধ মূর্ত্তি বিবিধ ভাব। প্রকৃতি, তাহা মনুষ্যকে কবিতা-সমীরণ দ্বারা নীরবে বুঝাইয়া দেয়। প্রকৃতির কার্য্য নীরব। কিন্তু শব্দ-ক্রিয়াধারী শব্দপ্রিয় মনুষ্য, সে নীরব কেবল-স্পর্শযুক্ত প্রকৃতির কবিতা-সমীরণের প্রতি লক্ষ্য করে না—লক্ষ্য করিতে জানে না। সেইজন্য মনুষ্য প্রকৃতির কথাবার্ত্তা বুঝিতে পারে না। সেইজন্যই ত আমরা মাঝে মাঝে জগৎ-স্রোতের পিছনে পড়িয়া যাই। প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্কেতানুসারে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। প্রকৃতির রাজপথে না চলিলে আমাদের উন্নতি কোথায়? প্রকৃতির প্রত্যেক মূর্ত্তির প্রত্যেক ভাবের এক একটা অর্থ আছে। যতদিন না আমরা সে গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিব

ততদিন তাহার একটি সত্যও আবিষ্কৃত হইবে না, এবং আমাদেরও কোন কার্য্যের কোন সুফল ফলিবে না। কারণ, আমরা প্রকৃতির সহিত এক সূত্রে বাঁধা। প্রকৃতির প্রতি পদ-বিক্ষেপেই ত সত্য প্রতিভাত হইতেছে। হায়! আমরাই কেবল তাহা দেখিতে পাই না—বুঝিতে পারি না!

ভাষা।

"Words themselves are the common property of all men; yet, from words themselves, Thou, Architect of Immortalities, pilest up temples that shall outlive the Pyramids, and the the very leaf of the Papyrus becomes a Shinar, stately with towers, round which the Deluge of Ages shall roar in vain!"

ভাষা প্রাণের দর্পণ—ভাবের নীরব মূর্ত্তি—ভাবের প্রাণ—ভাবের বিকশিত যৌবন। ভাব, অদৃশ্য ভাষা-ফুল-বৃক্ষ। সাকার ভাষা তাহার প্রস্ফুটিত ফুল। ভাব, ভাষায় পরিণত হইবার প্রাণগত চেষ্টা। ভাষা তাহার ফল। ভাষা কার্য্য; ভাব কারণ। ভাষা, ভাবের উন্নত অবস্থা।

ভাষা ফুল; ভাব গন্ধ। শরীরের যেমন সৌন্দর্য্য, ফুলের যেমন সৌরভ, গ্রন্থের যেমন কল্পনা, ভাব তেমনি ভাষার। আমরা সৌন্দর্য্যকে শরীর হইতে বিভাগ করিতে পারি না। শরীরই সৌন্দর্য্য। সকল শরীরে নহে। সর্ব্বাঙ্গসমান সুডৌল শরীরে সৌন্দর্য্য। অসম্পূর্ণ এবং বিকৃত দেহে সৌন্দর্য্য কোথায়? সেই জন্য অসম্পূর্ণ ভাষার সংকীর্ণ হৃদয়ের অন্তঃপুরে, উদার ভাবের পূর্ণমূর্ত্তির বিকাশ অসম্ভব। ভাষা—অখণ্ড একত্ব—অখণ্ড মণ্ডলাকার জগৎ। প্রণয়—প্রণয়-বৃক্ষের ফুল।

ভাষা, ভাবের—জীবনের পূর্ণ প্রতিকৃতি। ভাষা সঞ্জীবনীশক্তি। মৃত—চির-বিস্মৃত পুরাতন ভাব, ভাষার জাহ্নবী-বারি পাইয়া জীবিত হইয়া উঠে। ঠিক্ ভাষা—ভাষা-ভাব আজও জন্মায় নাই। প্রাণকে ছাঁকিয়া ভাষা করিবার ক্ষমতা এ বাঙ্গালায় কাহার নাই। তাই তাহাদের ভাষার মধ্যে এত গোলমাল। কথা বা ভাব একটিমাত্র। কিন্তু তাহাকে বিবিধ প্রকারে ঘুলাইয়া বার বার বলা হয়। এইরূপ ভাষা, প্রাণ এবং ভাবের হন্তারক। ইহা ভাষা নয়। ভাষার শ্রাদ্ধ। ভাষা ভাবের পরিমাণ-রজ্জু। ভাবের চরিত্র।

ভাষা, ভাব-ফুলের মধু। মধু ফুলেরই। এবং আগে ফুল, তার পর মধু সত্য

কথা। কিন্তু ফুল এবং মধু ত এক বস্তু নয়। আমরা মধু চাই। তোমরা তাহার পরিবর্ত্তে কেবল ফুলই দিতেছ। মধুর কার্য্য ফুলের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। শরীর অভাবে আত্মা যেমন কর্ম্মশক্তিশূন্য, ভাব সেইরূপ ভাষা অভাবে। অথবা তাহাই বা বলি কেন? প্রাণের স্ফূর্ত্তিই এই শরীর। ভাষাও তাই। [ভাবই ভাষা--ভাষাই ভাব] আমরা মূর্ত্তির দ্বারা যত বুঝিতে পারি এবং দেখিতে পাই, তত নিরাকার অতীন্দ্রিয় পদার্থের দ্বারা নহে। প্রকৃতির গুণ, বৈচিত্র্য। সেই প্রকৃতি নীরবে সহস্র প্রকার নৈসর্গিক চিত্রের দ্বারা তাহার সমস্ত কথা কত সুন্দরভাবে আমাদিগকে বলিতেছে। প্রকৃতির সে নৈসর্গিক রূপক-ছবি কত উদ্দীপক! কত ভাব-প্রধান! কত পরিস্ফুট! কত কবিত্বে মধুর!

কবি প্রকৃতির কবি, ভাষার রহস্যময় প্রাসাদের প্রতিগৃহে প্রবেশ করিবার অপূর্ব্ব কৌশল-মন্ত্র জানে। প্রকৃতির চির-স্নেহের শিশু কবি, প্রকৃতি-মাতার হৃদয়ের দুর্জ্ঞেয় নীরব কথা যত বুঝিতে সক্ষম, এত আর কে? মার স্বর্গীয় চক্ষের স্নেহময় নীরব কাহিনী কেবল সন্তানই বুঝিতে পারে—ঠিক্ বুঝিতে পারে। কবি প্রকৃতির দর্পণ। সমতাল ভাষা এবং ভাবের বিবাহে কাব্য। কবি তাহার পুরোহিত। আজ পর্য্যন্ত কবিদের এ পদ একায়ত্ত। কবির ভাষা অমরবাণী। ভাষাই কবির অমরতা। প্রকৃতি অবিনশ্বর। ভাষা প্রকৃতি। সুতরাং ভাষারও মৃত্যু নাই।

ভাষা প্রথমে। সবই ভাষা। এ জগৎ ভাষার। মনুষ্যও ভাষা। ভাষার বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা মনুষ্যকে চিনিতে পারি। জগতের সমস্ত কার্য্য, ভাষার অপূর্ব্ব বিজ্ঞানযন্ত্রে এক মহান্ শক্তির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতেছে। ভাষার আদর্শ—চরমসীমা—অনন্তলীলা জগৎ-গ্রন্থে। জগৎ এক খানি সজীব কাব্য। আদর্শ। এত বড় আদর্শ আর নাই। সমগ্র জগতের আদর্শ. জগৎকারণ কবিকে কেহ ভুলিও না।

মনুষ্য-ভাষার সৃষ্টি, অবিরামপ্রসবিনী অনন্তকমনা প্রকৃতি দেখিয়া। ভাষা নৈসর্গিক নিয়মের ফল। ভাষার জীবন কত দিন, কেহ ঠিক্ বলিতে পারে না। ভাষার জীবনে কত যুগের কথা—কত শত মানুষের ইতিহাস গাঁথা। ভাষা জগতের encyclopædia। এই ভাষাকে কত লোকে কত

রকমে গড়িতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জগৎ গড়িতে কেহ পারে নাই। এক দিক কিম্বা দুই দিক গড়িয়া জগৎ গড়া হয় না। যে মহা অনন্ত অমোঘ নৈসর্গিক নিয়মের অদৃশ্য শক্তির দ্বারা জগৎ, আর কিছু না হইয়া আপনা আপনি জগৎই হইয়া ফুটিয়াছে, সে অমোঘ নৈসর্গিক নিয়ম মনুষ্য-স্বজিত জগতে নাই। জগৎ অনন্ত নৈসর্গিক নিয়মের। তোমার আমার জগৎ তোমার আমারই চিন্তাসরোবরের। ইহাদের মূলে অনৈক্য। জগৎ-শক্তি-স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়ান বৃথা। জগৎ-শক্তি বাচৌর পুষ্করিণী নহে। মনুষ্য জগৎশক্তিগত।

ভাষা-জগতের সৃষ্টি-উপাদান যদি সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টি আপনি হইবে। জগৎ-সৃষ্টি এক দিনে হয় নাই—এক জনে করে নাই। জগৎ-সৃষ্টি অনন্তশক্তির ফল। জগৎ-সৃষ্টির বিরাম নাই—শেষ নাই। কখন শেষ হইবে কি না, তাহাও কেহ জানে না।

সৃষ্টির—ভাষা-সৃষ্টির রাজমিস্ত্রি, প্রতিভা। প্রতিভা জগতের সৃষ্টিকর্তা। সর্ব্বশেষে সৃষ্টি। প্রতিভার কাজও সর্ব্বশেষে। ফুল যেমন বৃক্ষের, প্রতিভা তেমনি দেশের। বৃক্ষের প্রতিদিনের যত্নের কিরণ পাইয়া ফুল যেমন অতি অল্পে অল্পে হঠাৎ এক দিন মধুর পঞ্চমস্বরে সমস্তটা ফুটিয়া উঠে; কোন একটি বৃহৎ কাজও সেইরূপ কোন এক দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণগত যত্নের অসম্পূর্ণ ফল। সে ফল প্রতিভার জন্য অপেক্ষা করিয়া জাগিয়া থাকে। প্রতিভা ঠিক্ সময়ে এক দিন চকিতের ন্যায় আসিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া যায়। প্রতিভা, জগতের সামঞ্জস্য-মূলীভূত ঐক্য (fundamental unity)। ভাষাজননী-প্রকৃতি-পুস্তকের সূচী,—রহস্যময় জগৎ-জীবনের ইতিহাস—ভাষার প্রতিভা—উদ্যানের পদ্মফুল।

ভাষা-জগতের মালি, প্রতিভা। মালি হইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। ভাষা-জগৎ-মালার প্রতিভা-মালি-নক্ষত্র, সাহিত্যের অন্ধকারময় আকাশ উজ্জ্বল করিয়া কবে দেখা দিবে? ভাষার প্রাণ প্রতিভার অভাবে আজ ভাষা-জগৎ মানবশূন্য গ্রাম। প্রতিভার বিশ্বব্যাপিনী ভবিষ্যৎ-কল-গর্ত্তা পূর্ণ-দৃষ্টি কাহার নাই। আমার এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ভাষা-জগতে প্রতিভা-মালি কবে জন্মাবে!

বাঙ্গালাভাষা—বর্ত্তমান প্রাচীন বাঙ্গালাভাষা অপ্রকৃত। সৌন্দর্য্যের বিকৃতি। ফুলের অনুকরণ। জীবনের মৃত্যু। নিশার স্বপ্ন। প্রতিভা-গর্ভ কর্ক্কট।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের দুইটি শক্তি। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ। যোগ এবং বিয়োগ। প্রেম এবং বিরহ। জগৎ এই দুই শক্তির লীলাভূমি (manifestation)। শক্তির বিকাশ, কালভেদে। অথবা শক্তিভেদে কালা-কাল। এক সময়ে দুই শক্তির আবির্ভাব অসম্ভব। যেখানে প্রকৃতির প্রেমের চাঁদ-হাসি ফুটে, বিরহের বিজয়া-দশমী সেখানে কোথায়? ইহা জাগতিক নিয়ম। প্রকৃতির কার্য্য অদৃশ্য। সেই জন্য বিরাট প্রকৃতির প্রেমের এবং বিরহের আশ্লেষ-বিশ্লেষ-সময় কেহ নির্ণয় করিতে পারে না। অদৃশ্য প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন-তরঙ্গ-মহাসাগরে কোন্ সময়ে জোয়ার আসে এবং কোন্ সময়ে ভাঁটা আসে, কি করিয়া বলিব?

বর্ত্তমান প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নবপন, প্রকৃতির প্রেমের ক্রীড়াভূমি। দেখিতে দেখিতে প্রকৃতির আশার প্রেম-মন্দিরে বাঙ্গালাভাষার অপূর্ব্ব আন্তরিক মূর্ত্তি প্রকাশিত। আধুনিক সাহিত্য ভাষার আকর্ষণীশক্তি-সাহিত্য। সম্পূর্ণ নূতন। ভাষাময় ভাবের নূতন জগৎ। নব বাঙ্গালাভাষা, ভাষাজগতের সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর মহারাজ্য বিচিত্র জীবন-ভাব-সাগরের পূর্ণবিকশিত অসংখ্য তরঙ্গ-উপাদানে গঠিত। জীবন-ভাব-সাগরের বাছা বাছা জীবন-ভাব-রত্নে গাঁথা। সে মহারাজ্যের প্রত্যেক গৃহ অসংখ্য জীবন-ভাব-তরঙ্গের এক একটি কবাট। সে মহারাজ্য-কাহিনী কবিতা-শরতের মধুরিমাময়ী চন্দ্রকর-লেখা—বসন্তপবন—রমণীহৃদয়ের উচ্ছ্বাসময়ী ভৈরবী রাগিণীর মধুর প্রেম-সঙ্গীত—শৈলীর লজ্জাবতীলতা—কুমারসম্ভবের তৃতীয়সর্গ—আয়েষার প্রণয়।

বাঙ্গালাভাষা—বর্ত্তমানের নব বাঙ্গালা সাহিত্য—প্রকৃতির অনন্তসাহিত্যের অসম্পূর্ণ জাগতিক পুস্তকের আর এক নূতন পাতা। নূতন বাঙ্গালা সকলকার পরবর্ত্তী। বাঙ্গালা-সাহিত্য সাহিত্য-জগতের নবযুগ। ইহা বর্ত্তমান। নূতন—ইহার সবই নূতন। অতীতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল রাগিণী এক। রাগিণী অনন্ত ঐক্য। বর্ত্তমান ভাষা রাগিণী রক্ষা করিয়া যাইবে এইমাত্র। তার পর সে তাহার নূতন প্রতিভার পথে চলিবে। গোলাপ, গোলাপই ফুটে। গোলাপ কখন মল্লিকা ফুটে না। যে সময়ের যে জিনিস

তাহা সেই সময়ে হইবেই। যখন প্রকৃতির অনন্ত আবর্ত্তনী শক্তি-চক্রের অদৃশ্য প্রেমতরঙ্গ ঘুরিতে ঘুরিতে গড়িতে গড়িতে বাহ্যজগৎ-অভাব-সাগর পূর্ণ হইয়া এক নবীন দ্বীপ সৃষ্ট হয়, তখন তাহার সে তরঙ্গ-গতি কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। সমষ্টিশক্তি-বৃক্ষ-ফলকে ব্যক্তিমাধ্যাকর্ষণ কবে নাড়াইয়াছে? এক চুলও নাড়াইতে পারে না।

ভাষার আদি কে? কোথায় তিনি? ভাষা-ভাবের আদি-জননী সেই অনন্ত অদ্বিতীয় নিরাকার পুরুষকে জানিবার একমাত্র উপায়-পথ ভাষা—জগৎ—ভাষা। তিনি পূর্ণভাষা—জীবন। এই অনন্ত সৃষ্টি তাঁহারই বিকাশ। তিনি ভাব—তিনি ভাষা—তিনি পুস্তক—তিনি সাহিত্য।

বিশেষণ

ভাষার আত্মা। প্রকৃতি-শব্দ-শরীরের চৈতন্য। বিশেষ্যের—জগতের সজীব বিকশিত অবস্থা—গুণ। প্রকৃতির একমাত্র ধর্ম্ম-মন্দির-দ্বার। জগৎ জগৎপতির বিশেষণ। আজ জগৎ না থাকিলে, কে তাঁহাকে চিনিত? বিশেষণ আমাদিগকে সকল বস্তু সঠিক চিনাইয়া দেয়।

আশ্লেষণ বা জগৎ

জগতের বিশ্লেষণ জগতের মৃত্যু—প্রলয়। জগৎ আশ্লিষ্ট। ভাষাও আশ্লিষ্ট। ভাষার বিশ্লেষণ ভাষা-শরীরের ব্যবচ্ছেদ। জীবনের মৃত্যু।

সৌরভ

অদৃশ্য অখণ্ড সত্তা। জগদতীত পারাবারের পথ। অসীম-সসীমের মিলন। ফুলের ভাষা। ভাষার ভাষা। সৌরভ—অসীম, সীমারূপ জগত-অক্ষর-আকারে ব্যক্ত। সৌরভের ব্যবচ্ছেদ অসাধ্য—অসম্ভব। ভাষা, সৌরভ। সৌরভের প্রতিরূপ। তবে ভাষার ব্যবচ্ছেদ কি করিয়া হয়? এক যে; সৌরভ, ভাষা, জগৎ এক। এক—এক—এক। সব এক। ইহারা কেবল সেই মহান্ অনাদি বিভিন্ন একের বিকাশ-রূপ।

*** ***

কানন।

অনন্তলীলাময়ী প্রশান্ত প্রশস্ত নদী—সেই সৌন্দর্য্যের রঙ্গভূমি—প্রকৃতির প্রীতি-মন্দির—কল্পনাময় শান্ত কাননের অতি সূক্ষ্ম পাশ দিয়া সেই সুরে—

সেই প্রাচীন প্রেম-জীবন-গীত—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনা"র কি এক মধুর উদাসময় বিষাদ-গম্ভীর সুরের ন্যায়, স্থির মন্থর-গতিতে জগৎকে বুকে করিয়া অদৃশ্য অনন্ত পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কানন সেই নদীর পাশে চিরদিন বসিয়া চাহিয়া। নদীর উপর চিরপরিদৃশ্যমান কাননের সেই প্রগাঢ় প্রেমের কি এক অপূর্ব্ব নীরব অনন্ত-ছায়া-দৃষ্টি পড়িয়া! নদী চিরদিন সেই কেমন এক শ্রাবণের ভয়-ভয়-কি-এক বিষাদ ঘোরময় সান্ধ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। কানন—কাননের মূর্ত্তি কি বিচিত্র রাগিণীময়! কি অপূর্ব্ব রহস্যময়! কি ঘোর মায়াময়! আবার নদীগর্ভে সেই কাননের ছায়ার ছায়া! রহস্যের রহস্য! জগতের জগৎ—অতীত,—আদি,—অনন্ত! মনুষ্যের অবিনশ্বরতা! নদীর উপর কেবল ছায়া—কাননের সেই ছায়া ভিন্ন, কেহ আর কিছু কখন দেখে নাই। আর কিছু দেখা যায় না। নদীর উপর সেই ছায়া-খেলা কি মধুর! কি রহস্যময়! লোকান্তর-সমাগত বাঁশীর গানের ন্যায় কি স্বপ্নময় ভাব! কাননের হৃদয়ের কথা কেহ জানে না। তাহার ভিতর যে, কি আছে তাহা আজ পর্য্যন্ত ত কেহ বলিতে পারে নাই। নদীর উপর দাঁড়াইয়াও কাননের অন্তঃপুরের কিছুই দেখা যায় না। সেই জন্য—অথবা যে জন্যই হউক, তাহার কারণ কে জানে?—কানন আজও এত মধুর এত সমান আগ্রহের। কি বলিব সে কানন কি? কাননের সৌন্দর্য্য চিরদিন সমান, অথচ তাহা নূতন অনন্ত-বৈচিত্র্যময়। সে কাননে হয়ত কত কি ফুটিয়া আছে! কত ফুল! কত রূপ! কত গুণ! কত হাসি! কত কান্না! সে কানন দেখিয়া মনুষ্যের হৃদয়সরোবরে কত সুখের নলিনী—কত না সেই ছায়া ছায়া স্মৃতি-হিল্লোল ফুটে! কত লোকের প্রাণের কত কি হয়ত কাহারা একদিন সেই অতুল কাননের সৌন্দর্য্যের চিরস্থায়ী হৃদয়-সিংহাসনের উপর বসিয়া কত কি মধুর অপরিজ্ঞাত লীলা—জগতে অতুল—সেই প্রেমের অতৃপ্ত লীলা সাঙ্গ করিয়া গিয়াছে। সেই পুরাতন কাহিনী আজ কানন-শরীরে—বৃক্ষের পত্রে পত্রে—কুসুমের হাসির অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া পড়িতেছে। কানন আজ সে সব প্রেমের কবিতা। কানন এইরূপ। কাননের সৌন্দর্য্য-সুর, মনুষ্য-জীবনের সুখ-আশাদীপ মন্দির প্রেম-তার দিয়া চির-বাঁধা। সে কানন কি ভুলিবার? মনুষ্য কখন তাহা

ভুলিতে পারে না। নদী-যাত্রী কত লোক সে কানন দেখিয়া হাসে। আবার কত লোক ধীরে কাঁদিয়া যায়। হায়! তাহাদের হাসি-কান্না কে দেখে। কানন, মনুষ্যের—জগতের প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের—প্রত্যেক পরমাণুর আত্মা। পঞ্চভূতের জননী। কানন অদৃশ্য। কিন্তু অন্তরে তাহা সদা জাগ্রত। সে কাননের বংশীধ্বনি কানে লাগিয়াই আছে। সেই কাননই জগতের একমাত্র সু। কাননখানি আবার কি নিভৃত! যেন কাহার ধ্যানে মগ্ন। যেন কিসের প্রকাণ্ড সমাধি! যেন উত্তরাধিকারী-বিহীন কোন মহা কবির পুরাতন কাব্য! যেন বাঙ্গালির জীবন্মৃত দেবীরূপিণী, বিধবা! আর সেই কাব্য-জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর যেন চিরস্তব্ধ অনন্ত অচল প্রেম! যেন, কে তাহার হৃদয়ের একমাত্র অপার্থিব ধনকে এই অনন্ত বিশ্বের মধ্যে কোথাও রাখিবার স্থান না পাইয়া এই জীবনবসন্তের চিরসুখ-নিকেতন নিভৃত কানন-কুঞ্জে রাখিয়া কাননের কুলুপে চাবি দিয়া গিয়াছে। যেন কোন আত্ম-বিসর্জ্জী প্রেমিকের অকূল প্রেমের কি এক সেই দুঃখ-ভরা সুখের চিরজাগ্রত বিয়োগান্ত সমাপ্তি। কানন একাকী নীরবে দাঁড়াইয়া কি এক স্থির উদাস নয়নে নদীর দিকে চাহিয়া আছে। হায়! একে একে সকলেই যে চলিয়া গেল! কানন এখন কাহার জন্য চাহিয়া! কেন চাহিয়া? কত লোক গেল, কানন ত তাহাদের একজনকেও ডাকিল না! বুঝিয়াছি, তাহারা নয়। কাননরূপ দশের শূন্য পুরাইবার তাহারা কেহই নহে। কি দৃষ্টি! যেন প্রত্যেক পথিককে কাহার আগমনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছে। হায়! সে কি গো আসিবে না! তাহার জন্য কানন কতদিন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে? কে বলিতে পারে, আজ কতদিন ধরিয়া কানন এই নদীর তীরে তাহার জন্য বসিয়া? হায়! তাহার অনন্ত আগমন কি আর ফুরাইবে না! কবে ফুরাইবে রে! আজ আমি যেন তাহার সু-দূর আগমন-বার্ত্তা কাননের চারিদিক হইতে শুনিতে পাইতেছি। সে কে? কে জানে কে?

"কতদিনে চাঁদকুমুদে হবে মেলি?"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

নিশা-সংগীত।

১

মধুর—মধুর তোর রূপ
যামিনী!
হরষে হরষময়ী শশি-সোহাগিনী।
তারকা-কুসুম-বনে
খেলিছ আপন মনে
কি যেন দেখি স্বপনে মায়ার মোহিনী!

২

নীল আকাশ-তলে
স্বর্গের প্রদীপ জ্বলে,
আকাশ গঙ্গার জল
করিতেছে ঢল ঢল
কালের জটার জালে দোলে মন্দাকিনী।

৩

হাসিয়া উঠেছে কূল,
ফুটেছে মন্দার ফুল,
হরষে অমর-বালা
চারিদিকে করে খেলা
এ খেলা তোমার খেলা—তুমি মায়াবিনী।

৪

বাসবের সাড়া পেয়ে
চমকি দামিনী মেয়ে
পালাল সোণার লতা
বাঁধিয়া চ'খের পাতা
সহস্র লোচনে চান
আর না দেখিতে পান
কোথায় লুকাল হায় নীরদ-নন্দিনী!

৫

পাতালে বাসুকি ফণী
ছড়ায় মস্তক-মণি,
দু-একটী শূন্যে ছুটে
উঠেছে আলোক ফুটে,
এমন মাণিক আর কোথাও দেখি নি।

৬

মরুত বিহ্বল-প্রায়
অধীরে চলিয়া যায়,
দাঁড়াইয়া দিগঙ্গনা
কি উদার-দরশনা!
গম্ভীর প্রশান্ত-মনা কার সীমন্তিনী!

৭

নীরব বরুণা রাণী
হাসিছে আনন খানি,
বিগলিত কেশপাশে
কতই কুসুম হাসে
হাসিছে অদূরে মেয়ে গিরি-নির্ঝরিণী।

৮

সাগর লাফায়ে ওঠে
উল্লাসে উন্মত্ত ছোটে,
আকাশ ধরিতে যায়
কি জানি কি দেখে তায়,
উল্লাসে চমকে গায় চঞ্চল চাঁদিনী।

৯

হিমাদ্রি শিখরপর
হাসিছে মানস সর,
মধুর মোহিনী বালা,
মুকুরে মুরতি-খেলা!

মধুর মাধুরী যন্ত্রে
করেছে মায়ার মন্ত্রে
আকাশ পাতাল একাকার একাকিনী!

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

দ্রব্যগুণ সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অম্লবেতস।

অন্য নাম - চুক্র, গুল্মকেতু, শতবেধী, মাংসদ্রাবী। রক্তসার অম্লফল গুল্মভেদ। ইহার ফল অত্যন্ত অম্লরসযুক্ত, কষায়, উষ্ণ। বায়ু-প্রকোপ, অর্শ, গুল্ম, অরুচি, হৃদ্রোগ, হিক্কা, আনাহ (মল মূত্র রোধ) অজীর্ণ ও বমন রোগে হিতকর। ছাগ মাংস ভোজন করিয়া এই ফল অল্প পরিমাণে সেবন করিলে, উহা শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

কোন কোন দ্রব্য-গুণজ্ঞ ব্যক্তি অম্লবেতসকে "চুকাপালম্" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বস্তুত চুকা পালম, অম্লবেতস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অম্লবেতস অভাবে চুকাপালম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুকাপালম অতিশয় অম্লরসযুক্ত শাক বিশেষ। ইহার পর্য্যায় শব্দ -অম্লশাক, অম্লচুক্রিকা ইত্যাদি। ইহা বায়ুনাশক, ও প্রদাহ নিবারক, এবং অম্লবেতসের তুল্য গুণবিশিষ্ট। ইহার রস অল্প পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তাধিক্যজনিত হস্তপদাদির জ্বালা নিবারণ হয়।

আকরকরা।

অন্য নাম - আকার করভ। আরব দেশ ও বোম্বাই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ইহার মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা অঙ্গুলির ন্যায় দীর্ঘ, কুঞ্চিত, ধূসরবর্ণ, কঠিন, ভঙ্গুর ও গন্ধবিহীন। উত্তেজক, লালা-নিঃসারক, প্রদাহকারক, স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক। দন্তশূলে ইহা

চর্ব্বণ করিলে লালা নিঃসরণ হইয়া উপকার দর্শায়। অধিকক্ষণ চর্ব্বণ করিলে জিহ্বা ও তালু ঝিন্ ঝিন্ করে এবং উষ্ণ বোধ হয়। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া, সেই জলের কুল্য করিলে তালু ও তালুপার্শ্বস্থ গ্রন্থির শিথিলতা নিবারণ হয়। জিহ্বা ও গলদেশের পেশীর অবসন্নতা দূরীকরণ জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আকন্দ।

অন্য নাম—অর্ক, ক্ষীরকাণ্ডক, বসুক, মন্দার, সদাপুষ্প, আকণ্ ইতি হিন্দুস্থানে প্রসিদ্ধ। স্বনামখ্যাত ক্ষীরবান বৃক্ষ বিশেষ। শ্বেত ও রক্তবর্ণ পুষ্প ভেদে ইহা দ্বিবিধ। তন্মধ্যে শ্বেতার্কই বিশেষ উপকারী ও পবিত্র। সাধারণতঃ উভয়বিধ অর্কই স্বেদজনক, পরিবর্ত্তক, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ভেদক, কটু ও বিষমিবাজনক। বাত, শোথ, ব্রণ, অর্শ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বিষ-ব্রণ, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম উদরাময়, কফদোষ ও বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমস্ত উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে ঔষধীয় গুণে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার পত্র, পুষ্প, মূল, ছাল, দুগ্ধ, তুলা সমস্তই মানবজাতির নানাপ্রকারে কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কারক মহাত্মা হানিম্যান যেমন "একোনাইট" নামক ভৈষজ্যগুল্মের অসাধারণ ক্ষমতা ও বহুবিস্তৃত কার্য্য-ক্ষেত্র অনুসারে, উহাকে ভৈষজ্যতত্ত্বের মেরুদণ্ড স্বরূপ বলিয়া উহার অশেষবিধ গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আমাদের সুপবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রে "শ্বেতার্ককল্প" সম্বন্ধে তদপেক্ষাও অধিকতর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

অসীম-শক্তি-সম্পন্ন এই মহোপকারী বৃক্ষের তিনটী ছোট পাতার রস ২১টী গোলমরিচ সহ সেবন করিলে উন্মত্ত শৃগাল ও কুক্কুর দংশন-জনিত দোষ নিবারণ হয়। সদ্যচ্ছিন্ন ২১টী পাতা একটী নূতন হাঁড়িতে তিন প্রস্থ সাজাইয়া, তাহার উপরে, মধ্যে ও নিম্নে লবণ ⁄১ এক সের দিয়া হাঁড়ি মুদিয়া জ্বাল দিলে, সেই পত্র সকল ভস্ম হইয়া লবণ জারিত হয়। এই লবণ প্রত্যহ প্রাতে শূন্যোদরে ।॰ তোলা পরিমাণে শীতল জল সহ সেবনে দুর্দ্দমা অম্লশূল সপ্তাহ মধ্যে উপশমিত হয়। শুষ্ক পাতার ধূম প্রয়োগে ছারপোকা মারা যায়। পাকা পাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত মাখাইয়া, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, তাহার রস কর্ণে প্রবেশ করিলে কর্ণশূল ও তজ্জনিত যাতনা তৎক্ষণাৎ

নিবারিত হয়। কাঁচা পাতায় চূণ ও গুড় লেপন করিয়া, গলগণ্ড রোগে স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হয়।

ইহার মূল বাসি জল দিয়া বাটিয়া খাইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। আমানিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষ-বৃদ্ধি নিবারণ হয়। রবিবারে লাল সূতা দিয়া পায় বাঁধিলে গোদ আরোগ্য হয়। কটিদেশে ধারণ করিলে প্রমেহের উপকার হয়। অবিবাহিতা বালিকার হাতের সূতা দিয়া মস্তকে বাঁধিলে ত্রৈকাহিক জ্বর, অর্থাৎ এক দিন অন্তর যে জ্বর হয়, তাহা আরোগ্য হয়। শ্বেতার্কমূল ও শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্রে বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবনে সকল প্রকার জ্বর নিবারণ হয়। শ্বেতাকন্দমূল ও ছাগ ঘোল দ্বারা পিশিয়া লেপ দিলে গোদের উপকার হয়।

ইহার দুগ্ধ বা আটা. মাসকলাই ও তিলচূর্ণ সহ একত্র মিশাইয়া, একটী মাটীর পাত্রে করিয়া গৃহমধ্যে রাখিলে, সেই গৃহে ইন্দুর থাকিতে পারে না। ইহার আটা ও হরিদ্রা একত্রে পিশিয়া মুখে লেপ দিলে, মুখের কৃষ্ণবর্ণত্ব ও মাছ্তা তিরোহিত হয়। দন্তশূলে ইহার আটা স্থানিক প্রয়োগ করিলে, বিশেষ আরাম বোধ হয়। বৃশ্চিক-দষ্ট স্থানে আকন্দ-আটা ঘৃতসহ মিশাইয়া লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

ইহার মূলের ছাল চূর্ণ ১০।১০ রতি মাত্রায় দুই বা একবার মাত্র সেবন করিলে প্রবল রক্তামাশয় আরোগ্য হয়। শ্বেতাকন্দ-মূলের ছাল ১ তোলা ১১টী গোলমরিচ সহ বাসি জলে বাটিয়া সেবন করিলে একদিনেই নারী-দিগের প্রবল রক্তপ্রদর আরোগ্য হইয়া থাকে। ঔষধ সেবনে যদি গরম বোধ হয়, তাহা হইলে মৎস্যাদির ঝোল বা স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি কিঞ্চিৎ সেবন করিলেই, তাহা নিবারণ হইবে। শ্বেতার্কমূল-বল্কল চূর্ণ ১ রতি মাত্রায় দিবসে তিনবার করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, পারদ-অপ-ব্যবহারজনিত চর্ম্মপীড়া উপশমিত হয়।

ইহার তুলা শরীরের কোন স্থান স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইলে তথায় বাঁধিয়া রাখিলে উপকার হয়। ইহার ডাঁটার ধূম নাসারন্ধ্রে গ্রহণ করিলে নাসা আরাম হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, কবিরাজ।

পঠদ্দশায় বিবাহ হওয়া কি উচিত ?

আজ কাল প্রশ্ন উঠিয়াছে, পঠদ্দশায় বিবাহ হওয়া উচিত কি না। প্রশ্নকারীরা বলিতেছেন, হিন্দুশাস্ত্রে ইহার নিষেধ আছে। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত, অতএব এখন সে নিয়ম প্রতিপালিত হয় না কেন ? বাস্তবিক, আমরাও বলি ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমরা অতিশয় বিপদগ্রস্ত হইয়াছি। আমাদের দেহ অশেষ রোগের আবাসভূমি হইয়াছে, আমাদের আয়ু দিন দিন হ্রাস হইতেছে; আমাদের জ্ঞানের গভীরতা ক্রমেই কমিতেছে ; আমরা মনুষ্যত্ব হারাইতেছি; আমাদের নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু কথা হইতেছে, সে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম যখন এক্ষণে অবলম্বিত হয় না, তখন কোন্ বলে আমরা তাহার কোন একটী নিয়ম রক্ষা করিতে সক্ষম হইব ? তবে ইহা বিচার করা যাইতে পারে, যে কারণে, যে শিক্ষার বলে, এবং যে জীবন-প্রণালী অনুসারে প্রাচীনকালে অধিক বয়স পর্য্যন্ত সকলে অবিবাহিত থাকিতেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগী কি না। অতএব আমাদিগকে উভয়কালের শিক্ষার উদ্দেশ্য, বিষয়, প্রণালী এবং স্থান—এ সমস্তেরই আলোচনা করিতে হইবে। এরূপ গুরুতর বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা একটী প্রবন্ধে হইতে পারে না। আমরা অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলির মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমে, উদ্দেশ্যের কথা। শরীর, মন ও আত্মার উন্নতিসাধন প্রাচীন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। তন্মধ্যে আত্মার বা নৈতিক উন্নতির প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য ছিল। প্রাচীন ঋষিগণ বুঝিয়াছিলেন, নিকৃষ্ট বৃত্তি গুলিকে রীতিমত শাসনে রাখিয়া সৎবৃত্তি সমূহের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও অনুশীলন ব্যতীত মানুষ মানুষ হইতে পারে না ; ইহারই উপর জীবনের সুখ শান্তি ও আত্ম-প্রসাদ নির্ভর করে। এদিকে তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল না থাকিলে এবং জ্ঞান দ্বারা সদসৎ বৃত্তির তারতম্য করিবার এবং অনুশীলন-ক্ষমতা না জন্মাইলে নৈতিক উন্নতি কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইতে পারিবে না। সেইজন্য ব্রহ্মচারী-জীবনে এই

তিনেরই উচিত মত চর্চ্চা হইত। বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কারণ উদ্দেশ্য আমাদের নিজের নহে, পরের উদ্দেশ্য আমরা সিদ্ধ করিতেছি। তবে উদ্দেশ্য যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকর নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক উন্নতি নহে। বিজেতা বিজিতের শারীরিক উন্নতির কামনা করেন না, নিয়মও করেন নাই। নৈতিক শিক্ষা দেওয়া বিজেতার আইনে নিষিদ্ধ; নিষেধ না থাকিলেও তাঁহাদের ক্ষমতাও যথেষ্ট নাই। সুতরাং বর্ত্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল মানসিক উন্নতি। অতএব যে শরীর রক্ষার জন্য পঠদ্দশায় বিবাহ উচিত নয় বলিতেছেন, সে শরীর রক্ষার চেষ্টা আমরা বহুকাল পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি; এবং এ শরীর ধরিয়া যে বয়সে সন্তান উৎপাদন করি না কেন, সেই সন্তান দুর্ব্বল, ক্ষীণকায়, রুগ্ন হইবেই। আর যে নৈতিক শিক্ষার বলে প্রাচীনকালে অধিক বয়স পর্য্যন্ত চরিত্র রক্ষা হইত, সে নৈতিক শিক্ষা দান এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে। আমাদের হৃদয়ে সে বল নাই।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার বিষয়। তখন বিবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু বেদ বেদাঙ্গ, উপনিষদ, স্মৃতি ব্রাহ্মণমাত্রকেই প্রথমে বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিতে হইত। তারপর ইচ্ছানুসারে কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ জ্যোতিষ ইত্যাদি দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা করিতেন। ইহাই ব্রাহ্মণগণের শিক্ষার বিষয় ছিল। ক্ষত্রিয়দের বেদে অধিকার থাকিলেও তাঁহারা প্রধানতঃ রাজধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম এবং শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। বৈশ্যেরাও বেদের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। চারি পাঁচ শত বৎসর হইতে শূদ্রদের প্রতি যেরূপ আচরণ হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, কেবল নীচ দাসত্বই তাঁহাদের উপজীবিকা ছিল। তাঁহাদিগকে কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া হইত না। কিন্তু আমরা জানি, শিল্পকার্য্য শূদ্রদের জীবিকা ছিল। তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার হইত তাহার আলোচনার এস্থলে প্রয়োজন নাই। যাহা হউক কাহাকেও একথা বুঝাইতে হইবে না, ব্রাহ্মণগণ সমগ্র সমাজ চালিত করিতেন। ক্ষত্রিয়দের রাজনীতি ও সমাজনীতি, বৈশ্যদের বাণিজ্য, এবং শূদ্রদের কার্য্য সমস্তেরই শিক্ষাদাতা ও বিধানকর্ত্তা ব্রাহ্মণগণ। সে ব্রাহ্মণগণ সে সময়ে

কি ছিলেন? সংসারত্যাগী, সংযতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, একমাত্র ঈশ্বরচিন্তায় রত। সে মহাত্মাগণ যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেদিনকার রাজপুতগণও তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। পরের রাজ্য কাড়িয়া তখন রাজনীতিজ্ঞতা প্রকাশ হইত না; পরের মুখের গ্রাস লইয়া সে সময়ে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইত না! ফল কথা, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সহিত শিক্ষার পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা হইত। শাস্ত্র বা শস্ত্র, বাণিজ্য বা শিল্প সকল বিদ্যারই এখনকার শিক্ষার বিষয় কেবলমাত্র মানসিক (intellectual) উন্নতি। ইহাতে সাহিত্য, ফিলজফি, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই আছে। নাই কেবল আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিবার উপায়। বরং এ শিক্ষার বিষয়, আমাদিগকে স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণহৃদয় করা। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন আমরা বলিতেছি, পাশ্চাত্য ভাণ্ডারে মূল্যবান রত্নের অভাব আছে। উহাতে যে অনেক মহার্হ রত্ন আছে তাহা আমরা কোন ক্রমেই অস্বীকার করি না। কিন্তু, সাধারণতঃ আমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে এ সকল রত্নের কিছু পাওয়া যায় কি? আমাদের দেশের কয়জন সে সকল রত্নের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন? বিজেতার উদ্দেশ্য কি নয়, আমাদিগকে পশুত্বে পরিণত করা? অতএব যে দেশে শিক্ষার বিষয়ের এরূপ শোচনীয় অবস্থা, সে দেশের নরনারীগণকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা নিরাপদ কি না, জ্ঞানী পরিণামদর্শী মাত্রেই তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার প্রণালী। পাঠকবর্গ দেখুন, প্রাচীনকালে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা কিরূপে এক গ্রন্থে গ্রথিত ছিল, এবং সমস্ত শিক্ষা কিরূপ হাতেহেতেড়ে (practically) দেওয়া হইত। আর এখনকার শিক্ষা-প্রণালী কেমন কেবলমাত্র পুস্তকগত; কার্য্যে পরিণতি কত কম হয় মনুসংহিতায় শারীরিক শিক্ষাপ্রণালীর কতকগুলি ব্যবস্থা আছে। শ্লোকগুলি না তুলিয়া আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠকবর্গকে অবগত করাইতেছি। তখন সূর্য্যোদয়ের পরে গাত্রোত্থান করা এবং সূর্য্যাস্তের সময় শয়ন করিয়া থাকা মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইত; সেজন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। গুরুর শয়নের পরে শয়ন করিবার এবং তাঁহার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে শয্যা হইতে উঠিবার বিধান ছিল। তারপর প্রযত্নশীল হইয়া দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া

তাহা রৌদ্রে শুখাইতে হইত, এবং তদ্দ্বারা সায়ংকালে ও প্রাতে অগ্নিতে হোম করিতে হইত। জলকলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা কুশ প্রভৃতি আচার্য্যের ও তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ এবং প্রতিদিন ভৈক্ষ্যচর্য্যা করিতে হইত। যেমন তেমন শয্যায় শয়ন করিতে হইত, এবং ইচ্ছাক্রমে রেতঃস্খলন করিবার বিশেষ নিষেধ ছিল। ঐ কার্য্য করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত নষ্ট হইত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শারীরিক পরিচালনা এখন কিছুই করা হয় না। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানচর্চ্চার আধিক্যে শরীরের প্রতি কিরূপ অযত্ন প্রকাশ হয়, সংক্ষেপে বলিতেছি। ছাত্রেরা এখন আর সূর্য্যের মুখ দেখিতে পান না। প্রত্যূষের নির্ম্মল বায়ুসেবনে পূর্ব্বদিনের শারীরিক গ্লানি দূর করা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। দুই তিন প্রহর পর্য্যন্ত রাত্রি জাগরণ না করিলে পাঠাভ্যাস হইবার উপায় নাই। এখন প্রায়শ্চিত্তের ভয় নাই; নিদ্রারও সময় অসময় নাই। মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, যখন অবসর হয়, ছাত্রেরা তখনি নিদ্রা যান। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া প্রত্যূষে উঠিবার শক্তি থাকে না। ইহাতে যে অনিষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ কে করিবে? তখন যথাসময়ে শয়ন করিয়া এবং প্রত্যূষে উঠিয়া গুরু যে ছাত্রদিগের মধ্যে সেই নিয়ম বলবৎ রাখিয়াছিলেন, এখন সেরূপ কোন গুরুর অধীনে ছাত্রদিগকে থাকিতে হয় না। অভিভাবকগণের দৃষ্টান্তে বাড়ীর ছেলেরা শয়ন ও উত্থান কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রাচীনকালে শারীরিক পরিচালনার কি সুন্দর, কি সুকৌশলময় ব্যবস্থা ছিল, বোধ হয় তাহার ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। উপরের শ্লোকের মর্ম্মে সকলেই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন তখন শরীর কতদূর বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও কর্ম্মঠ হইত। বাতাতপ সহ্য করিয়া নিত্য সর্দ্দি কাশি ও জ্বরের নিষ্ঠুর হস্তে পড়িতে হইত না। ব্রহ্মচর্য্যকালে যে শরীর গঠিত হইত, যাবজ্জীবনে সে শরীর ভাঙ্গিত না। এবং সেই সকল বলবান্, সুস্থ, নীরোগ ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যে সন্তান উৎপাদন করিতেন তাঁহারাও বলিষ্ঠ ও নীরোগ হইত। শরীর যাহাতে দৃঢ়, বলিষ্ঠ, এবং কষ্টসহ হয়, এখন সে সমস্ত কার্য্য পরিত্যক্ত হইয়াছে, উৎকট মানসিক পরিশ্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে, আমাদের শরীরের মাংস ও অস্থি চিরকাল নরম ও অপক্ক থাকে। এ হাড় কোনকালে পাকে

না, এ শরীর কোনকালে বাঁধে না; শরীরে বলাধান ত দূরের কথা। এদিকে শারীরিক পরিচালনার অভাবে এবং রাত্রিজাগরণে মানসিক পরিশ্রমের আতিশয্যে রীতিমত পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কে না জানেন, ইহাই আজকালকার ছাত্রদের অজীর্ণ, উদরাময়, দৃষ্টিক্ষীণতা প্রভৃতি রোগের কারণ? কে না স্বীকার করিবেন, ছাত্রজীবনের এই সমস্ত বদ্ধমূল রোগেই আজকালের অধিকাংশ লোকই, চিররুগ্ন, ভগ্নদেহ, অন্তঃসার শূন্য, অকর্ম্মণ্য, এবং সকল কার্য্যেই নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহী? এখন জিজ্ঞাস্য, যে বয়সেই বিবাহ হউক না কেন, ইহাদের ঔরসজাত সন্তান দুর্ব্বল, রুগ্ন ক্ষীণকায় হইবে, না মহাবল, দৃঢ়কায় বীরপুরুষ হইবে? প্রাচীনকালে শারীরিক শিক্ষার সহিত মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা কিরূপে একগ্রন্থে গ্রথিত ছিল আমরা যথাস্থলে তাহার বিচার করিব। কেহ কেহ এ প্রশ্ন করিতে পারেন, আমরা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের বিষয় বলিলাম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করা হইল না। আরও এক কথা, ১০। ১৫ বৎসর হইল, বাঙ্গালীদের মধ্যে জীমন্যাষ্টিক প্রভৃতির চর্চ্চাও আরম্ভ হইয়াছে। তদুত্তরে আমরা বলি, ক্ষত্রিয়দের শরীর পরিচালনার উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, সে কথা সকলের অন্তরে অন্তরে খোদিত আছে। বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যে রত দুই শ্রেণীর শারীরিক পরিচালনার কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। আমাদের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিবাহকারী পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালীদের জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, যে সে দিনকার লোকেরাও আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক বলশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও দীর্ঘজীবী ছিলেন। এ কথাগুলিও বলিবার আবশ্যক ছিল না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ব্রাহ্মণগণ সকল বিষয়ে অন্য তিন শ্রেণীর আদর্শ ছিলেন। যাঁহারা এখনকার ব্যায়ামের তুলনা দেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দেশের কয়জন এ পর্য্যন্ত সে কার্য্যেই বা যোগ দিয়াছেন? জনকয়েক ছাড়া এখন সকলে ব্যায়াম চর্চ্চা করা সময়-অপব্যয় ও অসভ্যতা মনে করেন না কি?

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্ব্বে শিক্ষার স্থানের কথ

বলিতে হইতেছে। সকলেই জানেন, প্রাচীনকালে ছাত্রদিগকে সমস্ত অধ্যয়নকাল আচার্য্যগৃহে অবস্থিতি করিতে হইত। ইহার তাৎপর্য্য এই, সংসারের কোলাহলের মধ্যে প্রকৃত বিদ্যাচর্চ্চা হয় না; আত্মীয় পরিজনের শোক, তাপ, রোগ, ভোগ, বিবাদ, বিসম্বাদ সতত নানাপ্রকার বিঘ্নোৎপাদন করে। ২য় কারণ, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিলে মন সর্ব্বদাই সেই দিকে ধাবমান হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম সাঙ্গ করিয়া যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুকরণে মন সদাই উৎসুক হয়। ৩য় কারণ, তখনকার জীবনপ্রণালী অতি পবিত্র ছিল বটে, কিন্তু সকলের তাহা ছিল না। এত করিয়াও ঋষিগণ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারেন নাই। সে সময়েও অনেক প্রলোভন ছিল। সেগুলি ব্রহ্মচারীর ব্রতের বিষম প্রতিকূল। যে রিপুগুলি জয় করাই ব্রহ্মচারীর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য, সেই রিপুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিলে সে মহাব্রত কিরূপে সিদ্ধ হইবে? ৪র্থ কারণ, শরীর ও মন দৃঢ় করিবার জন্য যেরূপ কঠোরতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রয়োজন, গৃহে তাহার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটে। স্থানের কথায় শিক্ষকের কথা উঠিতেছে। সুশিক্ষক ব্যতীত সুস্থান বিশেষ কার্য্যকারী হইতে পারে না। তাই সংযতেন্দ্রিয়, সংসারত্যাগী, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, একমাত্র ঈশ্বরচিন্তা ও পরোপকারে রত ব্রাহ্মণ আচার্য্যপদে বরিত হইতেন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষার স্থান গৃহে। সেই গৃহ প্রাচীনকালের সংসারাশ্রম অপেক্ষা কতদূর শোচনীয়, তাহা বোধ হয় কল্পনা করা যায় না। শরীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এবং চক্ষে যাহা সকলে দেখিতেছেন, তাহাতে অধুনা শোক, তাপ, রোগ ভোগের ইয়ত্তা নাই। আর প্রাচীন প্রথাগুলি শিথিল হইয়া তাহার স্থলে অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে বিবাদ বিসম্বাদের যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রমাণ বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক নরনারী। ভোগবিলাসের মধ্যে গৃহস্থের সহিত ব্রহ্মচারী বাস করিলে যে অনিষ্ট ঘটিত, এখন তাহার পরিমাণ সকলে আলোচনা করুন। শিক্ষার প্রণালী অনুসারে গৃহস্থের মন গঠিত হইতেছে। এখন কয়জন গৃহস্থ পবিত্রভাবে, সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করেন? কয়জনের ধর্ম্মে বিশ্বাস—ঈশ্বরে মতি আছে? এখন কয়জনের জীবন আদর্শস্থানীয়? এখন উচ্চবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া নিকৃষ্টবৃত্তিগুলি কি প্রবল হইতেছে না?

এবং এ কথা কি বলিতে পারি না, এখনকার ছাত্রদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা তাঁহাদের আত্মীয় পরিজনদের দৃষ্টান্তে এবং অনবধানতায় ? তারপর, বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে কতপ্রকারের প্রলোভন দেখুন ! সংসার হইতে দূরে থাকিয়া বৃদ্ধ ধার্ম্মিক আচার্য্যের গৃহে এবং সংসহপাঠীগণের সহিত জ্ঞান-চর্চ্চার পরিবর্ত্তে এখন বারাঙ্গনালয়ে বেষ্টিত স্কুলে কদাচারী সহপাঠীগণের সহবাসে এবং প্রায় তদ্রূপ শিক্ষকের শিক্ষাধীনে সমস্ত দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়। সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের জন্য প্রলোভন ছড়ান রহিয়াছে। এখনকার ছাত্রদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও কঠোরতার বিষয়ে আর কিছু বলিতে হইবে না। এ অবস্থায় যাঁহারা পঠদ্দশায় বিবাহের বিরোধী, জানি না, তাঁহাদের নিকট পাঠের উদ্দেশ্য কি ? কোন্ মহাফল প্রাপ্তির জন্য তাঁহারা ছাত্রগণকে জ্ঞানী ও বিদ্বান্ করিতে চান বুঝিতে পারি না।

আমরা এক্ষণে বিচার করিব, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা কি প্রণালীতে দেওয়া হইত এবং শারীরিক শিক্ষার সহিত তাহা কিরূপে এক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। ব্রহ্মচারীগণ যে সকল কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতেন, সমস্তই গুরুর ও নিজেদের ধর্ম্মকার্য্যার্থ। ভবিষ্যতের এবং পরকালের মঙ্গলের জন্যই শারীরিক পরিশ্রম সমস্তই বিহিত ছিল। বাল্যাবধি তাঁহাদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল হইত, শরীর সুস্থ ও সবল না থাকিলে সংসারের কোনও কাজ তাঁহারা করিতে পারিবেন না। এই শারীরিক বলের সাহায্যেই তাঁহারা ঘোর কষ্টসাধ্য যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি করিতে পারিতেন। কি আশ্চর্য্য ! এখন যে সামান্য মাত্র ব্যায়াম চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক না থাকাতে কি বিষময় ফল ফলিতেছে ! প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় ব্যায়ামে পারদর্শী ব্যক্তি উত্তমরূপ লেখাপড়া শিখেন না। তাঁহারা কেবল মারামারি লাঠালাঠিতে রত থাকেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে প্রাচীন শিক্ষার বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সকলেই বুঝিবেন, কি সুন্দর প্রণালীতেই তখন জ্ঞানচর্চ্চা হইত ! উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত এখন কি কোনও দেশের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের তুলনা হয় ! এখনকার কোনও ধর্ম্ম গ্রন্থ সে সকলের নিকটেও পঁহুছিতে পারে না। তাঁহারা যে জ্ঞান ও নীতি

শিখিতেন, তাঁহাদের জীবনে তাহা প্রকাশ পাইত। প্রাচীন ঋষিগণের তুল্য ব্যক্তি একালে কেহ কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? এখনকার ধর্ম্ম শাস্ত্র-বিদ্ এবং প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্গণের তুলনা করিলে আকাশ পাতাল ভেদ বলিয়া বোধ হয় না কি? এখনকার কয়জন তাঁহাদের মত সমস্ত বিষয় সুখ ত্যাগী, নিঃস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয়? অনেকে বলিয়া থাকেন প্রাচীন কালে কেবল ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্মালোচনা করিতে পারিতেন; ক্ষত্রিয়াদির তাহাতে অধিকার ছিল না। আমরা তাঁহাদিগকে বলি, এখনত সকলে সকল শাস্ত্রের অধিকারী হইয়াছেন, তথাপি এখন কয়জন সেই করুণাময় সৃষ্টিকর্ত্তার প্রত্যহ আরাধনা করেন? আরাধনা দূরের কথা, কয়জনের নির্দ্দিষ্ট একটী ধর্ম্ম আছে, কয়জনের ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি আছে? আর প্রাচীন কালের ধর্ম্মশাস্ত্রে অনধিকারী ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ যে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি এবং সেদিনকার রাজপুতানার ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তখন চারিবর্ণের চারি প্রকার শিক্ষার বিষয় থাকাতে এবং সেই সুন্দর প্রণালী অনুসারে সকলেই চূড়ান্ত শিক্ষা পাইতেন এবং সকলেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। এবং এই কার্য্য বিভাগ হেতু সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার সকলকেই সকল বিষয়ে পণ্ডিত হইতে হইত না। কেহ সাহিত্য, কেহ দর্শন, কেহ গণিত, কেহ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া নিজের জ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ও সমাজের উপকার সাধন করিতেন। এইরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এক এক বিষয়ে সুদক্ষ হইতেন। ইংলণ্ডে স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। কি বিদ্যা বিষয়ে, কি যুদ্ধ বিষয়ে, কি বাণিজ্য, কি শিল্প সকল বিষয়ে নিজের প্রবণতা ও ক্ষমতা অনুসারে সকলে এক এক বিষয় গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে তাঁহারা সে নিয়ম প্রচলিত করেন নাই। এক ব্যক্তিকেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, ইতিহাস সব পড়িতে হইবে। পাঠের অধিকাংশকাল এইরূপ করিয়া শেষ তিন চারি বৎসর তিনটি, দুটি বা একটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার ফল এই হয়, অতি অল্প লোকেই কদাচিৎ কোন এক বিষয়ে সুপণ্ডিত হইতে পারেন না। কার্য্যে পরিণতি দূরের কথা, অনেকে

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর কঠোর নিয়মে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহারা নিজেদেরই কাজ করেন। এ শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য—অর্থোপার্জ্জন-ক্ষমতাদান। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী এরূপ অসম্পূর্ণ যে আজও আমাদের মধ্যে প্রকৃত মানুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এখনও আমাদের জীবনের লক্ষ্য স্থির হয় নাই; মহৎ উদ্দেশ্য জন্মে নাই। এখনও আমাদের মধ্যে অধিকাংশ নির্জ্জীব, পশুবৎ রহিয়াছেন। প্রায় সকলেরই নিকৃষ্টবৃত্তির অনুশীলনে মতি ও গতি! এরূপ বিপদের সময়, কিরূপে বিবাহকার্য্য বিলম্বে সম্পন্ন করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?

আমরা প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য ও আধুনিক পঠদ্দশার যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে জ্ঞানী ও পরিণামদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, শরীর থাকিবার অপেক্ষায় এবং বিদ্যাচর্চ্চায় মন স্থির রাখিবার প্রত্যাশায় যাঁহারা অধিক বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যতদিন আমাদের জীবন-স্রোত এইভাবে প্রবাহিত হইবে, ততদিন আমাদের শরীর কোন মতেই থাকিবে না; এবং এক কারণে আমাদের যাহা কিছু ক্ষতি হইতেছে, তৎ-পরিবর্ত্তে অন্য সহস্র কারণ আমাদের সহস্রগুণ অনিষ্ট করিবে। শরীর ও আত্মা ছাড়িয়া কেবল মনের উন্নতি করাই—কেবল বিদ্বান্ হওয়াই যদি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে যত অধিক বয়সে বিবাহ দিতে পারেন দেন, কাহারও আপত্তি নাই। (জানি না তাহাতে বিদ্বান্ হইবারও ব্যাঘাত ঘটাইবে কি না) কিন্তু যে সকল বৃত্তির অধিকারী হইয়া মনুষ্য অন্যান্য সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, সেই সমস্ত বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও সম্যক বিকাশ করাই যদি জীবনের মহান্ লক্ষ্য হয়, তবে আমাদিগকে তিনেরই—শরীর, মন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আত্মার উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। তাই আমাদের প্রার্থনা, আপনারা অনুকরণ-স্রোতের তৃণ হইবেন না; হীরকের বিনিময়ে কাচে মুগ্ধ হইবেন না; প্রকৃত সুখ ও শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবেন না।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

ঈশ্বরের রূপ-পরিগ্রহ সম্বন্ধে রামমোহন রায়।

ঈশ্বরের রূপ পরিগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রের যে সিদ্ধান্ত, রামমোহন রায়েরও সেই সিদ্ধান্ত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহার শাস্ত্র বিচারের গ্রন্থ সকল কেহ ভাল করিয়া পড়েন নাই। সে জন্য তাঁহার প্রকৃত মত কেহই জ্ঞাত নহেন। তিনি রাশি রাশি শাস্ত্র পাঠ করিয়া স্বীয় বাঙ্গালা গ্রন্থ-সমূহে আর্য্য-শাস্ত্রের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্রের জ্ঞান কিঞ্চিৎ না থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থের রস পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে পারে তাহার অধিকারী অতি বিরল। তাঁহার সময়ে তাঁহার যে সকল বিজ্ঞ বিজ্ঞ শিষ্য ছিলেন তাঁহারা অনেকে তাঁহার মত বুঝিয়াছিলেন। তখন বুঝিবার অনেকটা সুবিধাও ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি সকল ভদ্র গৃহেই তখন শাস্ত্রের কিছু কিছু চর্চ্চা ছিল। যদি বেদান্তশাস্ত্রের চর্চ্চা না থাকুক; কিন্তু ন্যায়, স্মৃতি, পুরাণ, ভারত, ভাগবত ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা ছিল। ভদ্র সন্তানেরা শাস্ত্র না পড়িয়াও সঙ্গ গুণে ঐ সকল আলোচনার ফল লাভ করিতেন। তাদৃশ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সকল পড়িয়াছেন, তাঁহারা অল্প আয়াসেই তাহার রস পাইয়াছেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত রামমোহন রায়ের বাণী সমূহের ঐক্য দেখিয়া তাঁহারা শাস্ত্র ও রামমোহন রায় উভয়কেই সম্মান দিয়াছেন।

ফলতঃ কোন একটা রব উত্থিত হইলে সাধারণ লোক সকল সে রবের কারণ জিজ্ঞাসু হন না! তাদৃশ রবের হেতু কি, মূল কি, অর্থ কি তাহা জ্ঞাত না হইয়াই অনেকে তাহাতে ভয় পান। বিধি-পরায়ণ, এবং কর্ম্ম কাণ্ডের পক্ষপাতীগণের মধ্যে একটা রব উঠিল যে, রামমোহন রায় কিছুই মানেন না। সেই অবধি বঙ্গ দেশের সকলের জানা হইল যে রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞানী। ব্রহ্মজ্ঞানীর অর্থ কি? না, নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরের রূপ, প্রতিমা, অবতার, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি মানেন না। সন্ধ্যা বন্দনা করেন না। ক্রিয়া কর্ম্ম মানেন না। স্বীয় গ্রন্থে তাহাই প্রচার করিয়াছেন। এই রূপ

রবের ফল এই হইল যে, অনেকে তাঁহার গ্রন্থ সকল স্পর্শ করিলেন না। আমরা বাল্যকালে অর্থাৎ ৩০ বৎসর পূর্ব্বে অনেক বিষয়ী ব্রাহ্মণ কায়স্থের গৃহে ফারসি কেতাবের দপ্তরের মধ্যে ঋষিদিগের অন্তরের ধন—রামমোহন রায়ের জীবনের সার্থক—উপনিষৎ সকল দেখিয়াছি। বাটীর কর্ত্তা টের না পান এমত ভাবে সুযোগ্য সন্তান ঐ সকল গ্রন্থ পড়িয়াছেন। গোপনে পরমার্থ-সুধারস পান করিয়াছেন। তখন রামমোহন রায়ের গ্রন্থ পড়িতে এতই ভয় ছিল। এখন আর সে ভয় নাই, তথাপি তাহা কেহ পড়েন না। অনেক হিন্দু সেই পূর্ব্ব রবের পক্ষপাতী হইয়া ঘৃণা পূর্ব্বক তাহা দেখিতে চান না। পক্ষান্তরে অনেক ব্রাহ্ম তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থে হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ আছে জানিয়া তাহার পাঠ ও আলোচনা ত্যাগ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা জানিয়া রাখিয়াছেন যে রামমোহন রায় তাঁহাদের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের দ্বেষী ছিলেন। কেহ কেহ পাশ্চাত্য বুদ্ধির অনুগামী হইয়া তাঁহার কৃত শাস্ত্র বিচার-সমূহের অর্থান্তর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সে চেষ্টা অবশ্যই নিষ্ফল হইবেক। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে যাঁহারা রামমোহন রায়কে হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী জানিয়া তাঁহার মতস্থ হন তাঁহাদেরও ভ্রম, আর যাঁহারা সেরূপ জানিয়া তাঁহার প্রতি দ্বেষ করেন তাঁহাদেরও ভ্রম।

আমরা রামমোহন রায়ের স্বীয় বাক্য সকল দ্বারা দর্শাইতে পারি যে, তিনি জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন, শাস্ত্রানুসারে আহার বিহারের ও সন্ধ্যাবন্দনা করার ঔচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, আশ্রমীগণের পক্ষে আশ্রম-বিহিত ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন; এবং জ্ঞানারূঢ় বিরক্তদিগের সম্বন্ধে কহিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি বশিষ্ঠ জনকাদির ন্যায় আশ্রমবিহিত ক্রিয়া কর্ম্ম করেন ভালই, না করিলে ক্ষতি নাই। কেননা শুক ভরতাদি জ্ঞানিরা আশ্রম-বিহিত বৈদিক ক্রিয়া করেন নাই। রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সকল ভাল করিয়া পড়িলে তাহার নানা স্থানে ঐ সকল উপদেশ পাওয়া যাইবে। তাঁহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া যদি দেব দেবীর উপাসকেরা তাহা পাঠ করেন তবে প্রীত হইবেন। নব্য ব্রাহ্মেরা অনেকে যে খকগোল-বর্জিত ব্রাহ্মধর্ম্ম রচনা করিয়াছেন, তাহার পক্ষপাতী না হইয়া যদি স্থির চিত্তে রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সমূহ দেখেন তবে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করি-

বেন। তদ্দ্বারা দেব দেবীর উপাসক এবং ব্রাহ্ম উভয় সম্প্রদায়ই হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে পারিবেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রতি যে মত ভেদ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্ম নষ্ট হইবে না, হিন্দুধর্ম্মও নষ্ট হইবে না। তাহাতে বরং যথাশাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মরূপে, এবং হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে পুনঃ প্রচারিত হইবেক। বস্তুতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত নিবৃত্তি-ধর্ম্মের নামান্তর মাত্র। সেই তাৎপর্য্যে তাহা প্রচারিত হইলে প্রকৃত ব্রহ্মার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়া সংসাধিত হইবেক। সমস্ত দেবারাধনায় ব্রহ্মেরই আরাধনা হইবেক। অক্ষুন্ন হৃদয়ে বিনা দ্বেষে অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে পারিবেন। এ স্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন, তবে আর প্রতিমা পূজার সহিত ব্রহ্ম-উপাসনার ভেদ রহিল কি? ইহার উত্তর দেবদেবীর পূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান নামক পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা যতদূর পারি দিয়াছি। প্রতিমা পূজার এরূপ উদ্দেশ্য নয় যে, কেবল তাহার সাজসজ্জা ও বাহ্যিক আড়ম্বরে মুগ্ধ হইবে; ইহার উদ্দেশ্য—উপাসক প্রতিমাতে ভগবদাবির্ভাব দর্শন পূর্ব্বক—সেই আবির্ভাবকে ব্রহ্মজ্ঞানে—ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিবেন। তাদৃশ সাত্বিক ব্রহ্মারাধনা, উক্ত প্রকার পৌত্তলিকতা হইতে স্বর্গ নরকের ন্যায় ভিন্ন। তাহা বিধিবদ্ধ, অনুভব বিহীন, ফল কামনা বিশিষ্ট কর্ম্মকাণ্ড হইতেও স্বতন্ত্র। যে সকল কর্ম্মীগণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদনুভব বিনা, ব্রহ্মে প্রীতি ও তৎপ্রিয় কার্য্য জ্ঞান বিনা কেবল বেদে আছে বলিয়া, বেদের দাস হইয়া, ফল পাইব বলিয়া, স্বার্থের দাস হইয়া দেব যজ্ঞাদি করেন তাঁহারা আসক্তকর্ম্মী। যদিও নিষ্কাম অর্চ্চনা ও কর্ম্মকাণ্ড অতীব কঠিন-সাধ্য, তথাপি যদি সুপারগ হন তবে যেন ব্রহ্মজ্ঞানীরা সেরূপ বেদবিধির দাস হইয়া ক্রিয়া না করেন। কেননা, তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞদিগের ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত, ব্রহ্মপ্রীতি ও ব্রহ্মার্পণবিশিষ্ট নিষ্কাম কর্ম্ম সকল অনন্ত বিস্তর ভিন্ন। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের আক্ষেপের কারণ নাই। তাঁহারা সুপারগ হইলে কথিত প্রকার পৌত্তলিক ও আসক্ত কর্ম্মীগণ হইতে সদাকালই স্বতন্ত্র থাকিতে পারিবেন, আর যদি পারগ না হন তবে, তাঁহাদের ব্রহ্মোপাসনাও বৃথা। সে যাহা হউক, ভক্তিযোগে

সকল দেবতার নামই ব্রহ্মবোধক, এবং সকল অর্চ্চনা ও সকল ক্রিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আক্ষেপ এই যে, এইরূপ সমদর্শিতা দুর্লভ। বৈদেশিক বুদ্ধি-সমুজ্জ্বলিত ব্রাহ্মদিগের তো কথাই নাই; এখনো অনেক শাক্ত ও বৈষ্ণব আছেন যাঁহারা কৃষ্ণকে ও দুর্গাকে একই পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা দেবগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মনে করেন। কিন্তু ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর মত সে প্রকার নহে, তিনি অন্বয় ব্যতিরেক বলে সকল দেবতাকে একই ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। কোন উপাসকের সহিত তাঁহার বিরোধ থাকে না। কিন্তু উক্ত প্রকার শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের দেবদেবী লইয়া পরস্পর বিস্তর বিরোধ থাকিতে পারে। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা পরস্পর রূপ নামে বদ্ধ। কিন্তু ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞ জানেন যে, ব্রহ্মের কালী কৃষ্ণাদি রূপ ধারণ কেবল মায়ার কার্য্য; সুতরাং তিনি রূপ নামে বদ্ধ থাকেন না। কেবল ব্রহ্মই তাঁহার লক্ষ্য। সেই পরম লক্ষ্য হৃদয়ে ধরিয়া তিনি সর্ব্বত্রে ভগবানকে দেখেন। তাঁহাকে জগতের জন্ম স্থিতি-ভঙ্গের কারণ বলিয়া তটস্থ লক্ষণেও তাঁহার উপাসনা করিতে পারেন। আনন্দ স্বরূপ ও রস স্বরূপ ভাবেও তাঁহার আনন্দ অনুভব পূর্ব্বক তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। বাদ্যোদ্যম পরিপূর্ণ, শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত বেদমন্ত্রপূত, দেবোৎসবেও তাঁহার আবির্ভাব দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে পারগ হয়েন। তাঁহার মন যে প্রকার ভগবদ্ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ তাহাতে কিছুই তাঁহার ব্রহ্মপূজা ও ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের বাধক হয় না। প্রত্যুত প্রতিমা-উপলক্ষিত অর্চ্চনা সমস্ত এবং এমন কি ব্রত হোমাদি কাম্য কর্ম্ম পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর ভক্তির স্মরণোদ্দীপক হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ব্যষ্টি-প্রকৃতিতে বিরাজমান। ব্রহ্মজ্ঞ সাধু তৎসর্ব্বত্রেই ভগবানকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার পবিত্র আবির্ভাবকে হৃদয়ে স্পর্শ করেন। তাহা ব্যতীত তিনি ইঁহাও জ্ঞাত আছেন যে, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অনন্ত ছটাতে পরমেশ্বর ভিন্ন ভিন্ন রুচিপরায়ণ সাধকের দৃষ্টিতে অধিক প্রতিফলিত। সুতরাং সেই সেকল বিভিন্নাধিকারীগণের সহিত যোগ দিয়া সেই সকল উপাধিতে বা সেই সকল উপাধিজ্ঞাপক প্রতিমাতে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে তাঁহার দ্বিধা বা

আলস্য হয় না। অপরঞ্চ, তিনি বেশ জানেন যে, পরমেশ্বরের বিচিত্র শক্তি। সেই শক্তি সহকারে তিনি ইন্দ্রিয়াদি এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বিশিষ্ট এই আশ্চর্য্য বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কিছুই ছিল না, তিনি সকলই করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হয় তো আবার কিছুই থাকিবে না। যাঁহার শক্তি এমন বিচিত্র তিনি নরলোকের বিশেষ কল্যাণার্থে অবশ্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইতে পারেন। যেমন প্রকৃতিতে অবতীর্ণ, জীবেতে অবতীর্ণ, সেইরূপ স্বেচ্ছা বিরচিত শরীর যোগেও অবতীর্ণ হইতে পারেন। শাস্ত্রে রামকৃষ্ণাদিকে সেই প্রকার অবতার কহে। রামকৃষ্ণাদির দেহ অদৃষ্ট ভোগের আয়তন ছিল না। তাহা ঈশ্বরের স্বেচ্ছাকৃত। প্রয়োজন বশতঃ ঈশ্বর সেই সেই উপাধিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এইরূপে অবতীর্ণ হওয়া ঈশ্বরের বিচিত্র শক্তির মধ্যগত। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের তাহাতে বিপ্রতিপত্তি নাই। যিনি বিশ্বরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রত্যেক ভূত ও প্রত্যেক পদার্থে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি বিশেষ বিশেষ কালে আত্মশক্তি বলে উন্নত শরীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতেও প্রবেশ করিতে কেন না পারিবেন? ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ তাহাতে সন্দেহ করেন না। কিন্তু তিনি তাঁহাদের দেহের অনুরাগী নহেন। তিনি জানেন সৃষ্টিসংসার সমস্তই মায়াবিরচিত। সুতরাং শরীর মিথ্যা। অদৃষ্ট-প্রেরিত জীবদিগেরও শরীর মিথ্যা, অবতারদিগেরও শরীর মিথ্যা। এই বিশ্বের রূপ ও গুণ সমস্তই মিথ্যা। কালে সেই সকল তিরোভূত হয়। অতএব ব্রহ্মই সত্য। মহাসূক্ষ্মা মায়াশক্তিকে বিস্তার ও সাম্যাবস্থায় আনয়ন করা তাঁহারই সাধ্যায়ত্ত। এতাবতা অক্ষুণ্ণ ভক্ত বা ব্রাহ্মসাধক স্বীয় মায়াময় শরীরের, মায়িক জগতের, অবতারদিগের মায়িক দেহের এবং ঈশ্বরের পরিগৃহীত কোন প্রকার রূপ গুণ বিশেষণ ও শক্তির পক্ষপাতী হইবেন না। তিনি সে সকল মায়া ভেদপূর্ব্বক ব্রহ্মের উপযাচক হইবেন। পারগ হইলে ক্রমে ক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত, আকাশ, পাতাল, দেব, অবতার, জীব প্রভৃতি মায়া-ব্যাপার ভেদ করতঃ তিনি কূটস্থ, ধ্রুব, সত্য, নিরঞ্জন ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন, আর্য্যশাস্ত্রের এই আদেশ, এই উপদেশ। ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে ঈশ্বরের রূপ-পরিগ্রহকে অস্বীকার করিতে হয়, শাস্ত্রের এমত অভিপ্রায় নহে। কিন্তু তাদৃশ রূপ সমস্ত মায়া-কল্পনা, সুতরাং মিথ্যা,

এই সিদ্ধান্ত জানিয়া রাখিতে হয়। দেহাত্মবাদী যেমন দেহকে সত্তা ও আত্মা মনে করেন, ব্রহ্মজ্ঞানী সেরূপ মনে করেন না। তিনি দেহকে জড়, অনিত্য ও মিথ্যা বলেন, এবং আত্মাকে তাহা হইতে স্বতন্ত্র জানেন। স্বল্প-বুদ্ধি লোকে মূর্ত্তিকে ঈশ্বর বোধ করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ মূর্ত্তিকে মায়া-কল্পিত বলিয়াই জানেন, এবং ঈশ্বরকে তাহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করেন।

এইরূপ দৃষ্টিতে মহাত্মা রামমোহন রায় সমস্ত অবতারবৃন্দকে ও সমস্ত দেবগণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; অথচ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিকে মায়া-কল্পনা বলিয়াছেন। তাঁহার সেইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য না বুঝিয়া সাকার-বাদীরা বিশেষতঃ গোস্বামীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তিনি অশাস্ত্র বলেন নাই। মূর্ত্তি সকল যদি মিথ্যা হইল তবে অবশিষ্ট এক ব্রহ্ম মাত্র রহিলেন। ক্ষণভঙ্গুর ঘট, মঠ, পট ভাঙ্গিয়া গেলে অবশিষ্ট একমাত্র আকাশ থাকে। সুতরাং ঘটাকাশাদির কল্পনা কেবল ঘটাদি উপাধি বশাৎ। দেবগণ ও রূপের কল্পনা কেবল মায়া বশাৎ। মায়ারূপিণী সৃষ্টিশক্তির বিচিত্র ভাব। সেই বিচিত্র ভাবের মধ্যে পরমেশ্বর নানা রূপে কল্পিত হন। যদ্রূপ জল পৃথিবী অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, তাহাকে উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারা বাষ্পাকারে পরিণত করিলে তাহার স্বরূপ আরো সূক্ষ্মতা লাভ করে, এমন কি চর্ম্ম চক্ষুতে তাহাকে দেখা কঠিন হয়; তাদৃশ অবস্থায় তাহাকে নিরাকার বলাও যাইতে পারে। তখন আকাশই তাহার আধার হয়। তদ্ভিন্ন তাহার সে অবস্থায় তাহাকে ধারণের নিমিত্ত কূপ, পুষ্করিণী, সরোবর, নদ-নদী, বা সাগর-গর্ত্ত রূপ কোন আধারের প্রয়োজন করে না। আবার ঐ সকল আধার যদি জলবিহীন হয়, তবে তাহাদের ব্যবহারিক সংজ্ঞারও সার্থক্য হয় না। কেননা সরোবর নদী সাগরাদি শব্দে লোকে জল সহিত তাহাদের সমন্বয় করে। জল সেই সকল আধারে পড়িয়া আধারানুসারে নাম রূপ গ্রহণ করে। নতুবা আধার-বিহীন জল আকাশ-বিহারী মাত্র। আকাশবৎ প্রায় সূক্ষ্ম। আকাশবৎ প্রায় নিরাকার। কিন্তু আধারে পতিত জল আধারা-কারাকারিত—সাকার। সেই জল, আধারানুসারে কূপ, পুষ্করিণী, সরোবর, নদী, সাগর ইত্যাদি নাম রূপে উক্ত হয়।* তদ্রূপ, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম-

সূক্ষ্মাদি সর্ব্বপ্রকার রূপ বিহীন। সৃষ্টির নানা ভাগে ব্যাপ্ত হওয়ায় প্রকৃতির বিচিত্রতা ও নানাস্থানুসারে নানা নামরূপে উক্ত হন। জল যেমন আধারানুসারে কোথাও সরোবর কোথাও নদী নামে কথিত হয়. কোথাও কূপ কোথাও মহাসাগরের রূপ ধারণ করে, কিন্তু নিজে একটী সূক্ষ্ম তন্মাত্রা মাত্র। পরমেশ্বর সেইরূপ স্বীয় প্রকৃতি বা মায়ারূপ আধারের বিচিত্রতা, নানাত্ব, ব্যষ্টি, সমষ্টি হেতু কোথাও দেব কোথাও দেবী। কোথাও বা একটী ব্যষ্টি প্রকৃতিতে ষষ্টি. কোথাও বা মহাসমষ্টি প্রকৃতিতে সর্ব্বেশ্বর ও জগৎ-কারণ বলিয়া কথিত হন। কিন্তু নিজে "দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যা-ভ্যন্তরহ্যজঃ"—তিনি দ্যোতনবান এবং সর্ব্বমূর্ত্তি-বিবর্জ্জিত। সকলের বাহিরে ও অন্তরে বিদ্যমান আছেন। এই সৃষ্টির বিচিত্রতারূপ উপাধি সমস্ত যদি না থাকে তবে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ মাত্র। তাঁহার সেই বিশুদ্ধ ভাবই মূল ভাব। আর তাঁহার দেব-দেবীর ভাব মায়িক মাত্র। মূল ভাবই ভূমা। মায়িক ভাব অল্প মাত্র। তাহা মহা প্রলয়কালে থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ আভ্যন্তরিক প্রলয়াবস্থায়ও তাহা থাকে না। কেবল সৃষ্টি ও মায়ার অবস্থায় সেই সকল ভাবোৎপন্ন হয়। ফলতঃ ভক্তিমান বা জ্ঞানবান সাধকের দৃষ্টিতে মায়া ভেদ হইয়া একমাত্র ভগবানই দৃষ্ট হন। সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐশিশক্তি-স্বরূপিণী মহামায়ার অচিন্ত্যভাব। তিনি তাহার দ্বারা জীবের সংসার, ধর্ম্ম, স্থিতি, বন্ধের হেতু না করিতে পারেন এমন কর্ম্মই নাই। অতএব যাঁহার বশে এমত অনির্ব্বচনীয় শক্তি তাঁহার নানারূপে প্রতিফলিত হওয়ার আশ্চর্য্য কি? যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বা ব্রাহ্ম তিনি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা অবিশ্বাস করেন নাই।

সামবেদীয় তলবকার উপনিষদে আছে যে দেবাসুর সংগ্রামে দেবগণের নিমিত্তে ব্রহ্ম জয় বিধান করাতে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতারা অভিমান প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা কহিলেন "আমাদেরই এই জয়, আমাদেরই এ মহিমা। আমরাই এ মহিমার সাক্ষাৎ কর্ত্তা।" এইরূপ মিথ্যাভিমান করিলে "ব্রহ্ম তাহাদিগকে জ্ঞান দিবার নিমিত্ত, বিস্ময়ের হেতু মায়ানির্ম্মিত অদ্ভুতরূপে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাদিগের চক্ষুর গোচর হইলেন। ইনি কে পূজ্য হয়েন তাহা দেবতারা জানিতে পারিলেন না।" প্রথমতঃ অগ্নি, পরে

বায়ু গিয়া পরীক্ষা দ্বারা জানিলেন যে, সে পূজ্যের নিকট তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় শক্তির স্বতন্ত্র গৌরব নাই। তাঁহারা এইরূপে পরাভূত হইয়া দেব-সভায় আসিয়া কহিলেন যে, এ পূজ্য কে হয়েন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। পশ্চাৎ দেবতারা তাঁহার পরিচয় লইবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র গমন করিবামাত্র সেই পূজ্য ইন্দ্র হইতে চক্ষুর নিমিষের ন্যায় অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন সেই আকাশে এক বহুশোভমানা, হেমকৃতাভরণবতী, বিদ্যারূপিণী, হিমবতো দুহিতার ন্যায় উমারূপধারিণী অনুপমা বরনারী আসিয়া অকস্মাৎ ইন্দ্রের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। তিনি ইন্দ্রকে কহিলেন যে, যে ব্রহ্মের জয়েতে তোমরা মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছ, তিনি এইমাত্র এখানে দর্শন দিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র জানিলেন সেই পূজনীয় দেবতা ব্রহ্ম।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই উপনিষৎ ভাষা তাৎপর্য্যের সহিত বঙ্গ সমাজে প্রচার করায় কেহ কেহ তাঁহার নিকট আপত্তিসূচক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা জানিতেন রামমোহন রায় ঈশ্বরের রূপ স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহারই প্রচারিত বেদের মধ্যে ব্রহ্মের রূপ পরিগ্রহের বিবরণ দেখিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিলেন যে, "যদি ব্রহ্ম বিদ্যুতের ন্যায় দেবতাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইলেন, আর বাক্য কহিলেন তবে তেঁহ এক প্রকার সাকার হইলেন।" এই আশঙ্কার সমাধান রামমোহন রায় এইরূপে করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি সংক্ষেপে কহিলেন "এরূপ আদেশ মায়িক বস্তুতঃ তাঁহার উপমা নাই।" তিনি পুনশ্চ বিস্তারিতরূপে কহিলেন যে, "যে ব্রহ্ম মায়া-কল্পনায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত নাম রূপেতে দেখাইতেছেন, তাঁহার বিদ্যুতের ন্যায় মায়া-কল্পনা করিয়া দেখান কোন্ আশ্চর্য্য? আর যেঁহ যাবৎ শব্দকে কর্ণের গোচর করিতেছেন, আর সেই শব্দ সকলের দ্বারা নানা অর্থ প্রাণি-সমূহকে বোধ করাইতেছেন, তাঁহার কি আশ্চর্য্য যে অগ্নি বায়ু ইন্দ্রের কর্ণে শব্দ দ্বারা অর্থ বোধ করান?" কিন্তু কোন কার্য্যোদ্ধার নিমিত্তে কোন রূপ ধারণ করা যদিও ব্রহ্মের পক্ষে অসম্ভব নহে, ফলে সে প্রকার রূপ যে মায়িক ও পরমার্থতঃ মিথ্যা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নতুবা ব্রহ্মের কোন কর্ম্ম-জন্য বা যথার্থ পারমার্থিক রূপ

আছে এমন কহিলে অশাস্ত্র হয়। এ কথা রামমোহন রায় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন, অথচ প্রয়োজন বশতঃ অকস্মাৎ কোন প্রকার মায়া-রচিত রূপ ধারণ করা ব্রহ্মের পক্ষে যে অসম্ভব নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

পথ্য প্রদানের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে যে, অনেকে "পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ, চৌর্য্য, পারদার্য্য ইত্যাদি যথার্থ জানিয়া অপবাদ দিতে পারেন।" এই কথার উত্তরে রামমোহন রায়ের বিরোধী পক্ষ প্রথমতঃ লিখিয়াছেন "শ্রীভগবানের জন্ম ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়?" পশ্চাৎ অনেক প্রমাণ দিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "অতএব পরমেশ্বরের জন্ম মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ লোকের ব্যবহারিক মাত্র কিন্তু বাস্তব নহে," অধিকন্তু "পরমার্থ বিবেচনায় মনুষ্যেরও জন্ম মৃত্যু কহা যায় না"। বিরোধী পক্ষের এই সকল কথার উত্তরে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন "এ প্রমাণ বটে যে কি জীবের, কি ভগবান রাম কৃষ্ণ প্রভৃতির পরমার্থ বিবেচনায় জন্ম মৃত্যু কহা যায় না." তবে কি প্রকারে ধর্ম্মসংহারক (উক্ত বিরোধীপক্ষ) লিখিলেন যে, "ভগবানের জনন ও মরণ কি প্রকারে অযথার্থ কহা যায়?"

এই কথার পরে, গীতায় "বহূনি মে ব্যতীতানি" এবং "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" এই অবতার-প্রতিপাদক বিখ্যাত শ্লোকদ্বয় উত্থাপন পূর্ব্বক মহাত্মা রামমোহন রায় শাস্ত্রীয় অবতারতত্ত্ব মানিয়া লইয়াছেন, এবং শেষোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা—(ভগবানের উক্তি) "আমি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ আপন মায়াকে স্বীকার করিয়া শুদ্ধ ও তেজস্বী সত্ত্বাত্মক মূর্ত্তি বিশিষ্ট হইয়া অবতীর্ণ হই।" এ স্থানে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন যে, "মূর্ত্তি যদ্যপিও বিশুদ্ধ, তেজস্বী, সত্ত্বগুণাত্মক হয়েন তথাপিও সে মায়ার কার্য্য।" পশ্চাৎ তিনি অন্যান্য শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, রাম, কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, মহেশ্বর ভেদে ভগবান যত প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছেন, সে সকলই মায়ার কার্য্য—যথার্থ নহে। যথার্থতঃ তাঁহার রূপ নাই।

অতঃপর ঐ সকল দেবতাদিগের উপাধি ও শরীর মায়িক জানিয়াও মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহাদিগের তত্তদবস্থাগত ঈশ্বরত্বের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। কবিতাকার নামক এক ব্যক্তি রামমোহন রায়কে

লিখিয়াছিলেন যে, "তোমরা রাম, কৃষ্ণ ও মহাদেবের দ্বেষী"। এই কথার উত্তরে রামমোহন রায় "কবিতাকারের সহিত বিচার গ্রন্থের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "হরিহরের দ্বেষ করা কিরূপে, সম্ভব হইতে পারে?" পশ্চাৎ নানা স্থানে সম্মানের সহিত যে তিনি ঐ সকল দেবতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও দর্শাইয়াছেন।

রামমোহন রায় "গোস্বামিজির সহিত বিচার" নামক গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে "আব্রহ্মস্তম্ব পর্যান্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক?"

এতাবতা রামমোহন রায়, পরমেশ্বরের রূপ-পরিগ্রহ স্বীকার করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রানুসারেই সে সমস্ত রূপকে মায়িক ও মিথ্যা কহিয়াছেন।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির উচিত যে রামকৃষ্ণ হরিহর প্রভৃতি দেবতা শব্দে ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝেন। তাঁহাদের পূজাতে ব্রহ্মপূজা জ্ঞান করেন অথচ তাঁহাদের রূপ গুণ বিশেষণকে মায়াজনা ও মিথ্যা বলিয়া জানেন। এরূপ ভাবে আচরণ-পরায়ণ হইলে ব্রাহ্মদিগের কোন দোষ হইবেক না। তবে রাম কৃষ্ণাদির "মূর্ত্তিকে" ঈশ্বর বোধ করিলে অথবা তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শরীরী এরূপ বুঝিলে অবশ্য দোষ হইবে। কেন না স্থূল শরীর যেমন আত্মা নহে, মূর্ত্তিও সেইরূপ ব্রহ্ম নহে। তাদৃশ ভাবে "মূর্ত্তির" পূজাই পৌত্তলিকতা শব্দের বাচ্য। ব্রাহ্মেরা তাহা ত্যাগ করিবেন। ভগবানের বিবিধ মায়িক সম্বন্ধ ও মায়িক রূপ পরিগ্রহানুসারে বিবিধ গুণে ও বিবিধ রূপে তাঁহার পূজা হয়। সেই সকল মায়িক রূপ গুণ উপলক্ষ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্মরণার্থে উক্ত রূপাদির অভিজ্ঞাপক প্রতিমা কল্পনা করা যায়। তাদৃশ প্রতিমা পূজায় কোটি কোটি লোক সমবেত হয়। তাহাদের হৃদয়ের আহ্বানে ভগবান অবশ্যই কর্ণপাত করেন। সে কথা মনে করিলে কোন্ ব্রহ্মবাদির হৃদয় আনন্দে প্লুত না হয়? তাদৃশ ব্রহ্মবাদী আনন্দিত হৃদয়ে সে প্রতিমা পূজায় যোগ দিলে তাঁহাতে পৌত্তলিক অপবাদ অর্শিতে পারে না। বদরিকাশ্রমে যোগাসনে উপবিষ্ট, হস্তে গ্রন্থ ও লেখনীধৃত ব্যাস দেবের যে প্রতিমূর্ত্তি, বেদান্তগ্রন্থে রহিয়াছে, উহা তাঁহার ঠিক প্রতিমূর্ত্তি নহে, উহা স্বয়ং তিনিও নহেন; তথাপি যখন ঘোষণা দেওয়া গেল যে, এটি ব্যাস দেবের

প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া স্থাপন করিলাম, তখন তাঁহার গুণ সকল, যেমন শাস্ত্রে শুনিয়াছি, স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। সেইরূপ দুর্গা কালী মহাদেব রাম কৃষ্ণাদির "প্রতিমূর্ত্তি" সকল স্বয়ং দুর্গাদিও নহেন, এবং সে সকল "প্রতিমূর্ত্তি" যে ঠিক তাঁহাদের ধৃত মায়িক দেহ সকলের অনুরূপে গঠিত হয় এমতও নহে। তথাপি যখন ঈশ্বরোপাসনার উদ্দেশে, শাস্ত্রবিহিত প্রণালীতে তাদৃশ "প্রতিমূর্ত্তি" সকল স্থাপিত হয় তখন আশ্চর্য্য ফল ফলিয়া থাকে। সে সকল "মূর্ত্তি"-অবলম্বিত অর্চ্চনায় কেবলই যে, অল্প মেধা-বিশিষ্ট, দুর্ব্বলাধিকারী ও ফলকামনাসক্ত ব্যক্তিদিগের মনস্থির ও চিত্তশুদ্ধিকর উপায়লাভ হয় এমত নহে। মহা মহা বেদান্তবিৎ ও যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম-দিগেরও তদ্দ্বারা বিস্তর ফললাভ হইয়া থাকে। বেদান্তবিৎ-ব্রাহ্মেরা জানেন পরমেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডবীজ-স্বরূপিণী মায়ার সহিত বিচিত্র-শক্তিমান। সেই বিচিত্রশক্তি হইতে জগতে অদৃষ্টযুক্ত অথবা অদৃষ্টমুক্ত বিচিত্র মায়িক ছবি প্রতিফলিত হইতে পারে। তৎসর্ব্বত্রেই সেই একই ব্রহ্ম সমষ্টি বা ব্যষ্টি-ভাবে অবতীর্ণ। অদৃষ্টযুক্ত দেহ দেহীতে তিনি যেমন অন্তরাত্মারূপে অবতীর্ণ, অদৃষ্টমুক্ত দেহেতে তিনি সেইরূপ দেহী বা আত্মারূপে অবতীর্ণ। শেষোক্ত প্রকার শুদ্ধ সত্ব তেজোময় অদৃষ্ট-মুক্ত দেহের সহিত তিনি বিবিধ গুণ কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মাদি বা কৃষ্ণাদি দেবতারূপে কথিত হন। সেই সকল দেহে তাঁহার অলৌকিকী গুণময়ী মায়ার যোগে তাঁহার বিবিধ অলৌকিকী শক্তি প্রকাশ পায়। তদুপলক্ষিত এক এক প্রকার "প্রতিমূর্ত্তি" বেদান্ত শাস্ত্রেরই এক এক প্রকরণ পাঠের ন্যায় কার্য্য করে। কোন প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে তাঁহাকে সকল জীবের মায়া সমষ্টিরূপ কারণ শরীরে উপহিত প্রলয় কারণরূপে, কোন প্রতিমূর্ত্তির উপলক্ষে তাঁহাকে তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীরে উপহিত হিরণ্যগর্ভরূপে, কোন মূর্ত্তির সহিত তাঁহাকে তদ্রূপ স্থূল শরীরে উপহিত বিরাটপুরুষরূপে দেখা যায়। কোন মূর্ত্তির অবলম্বনে তাঁহার আনন্দপ্রচুর মহাকাল বা মহাকালী স্বরূপিণী শক্তির ভাব মনেতে চিত্রিত হয়। কোন মূর্ত্তি যোগে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, কবিতা, স্মৃতি, ক্ষুৎ, পিপাসা, নিদ্রা প্রভৃতি বিজ্ঞানময়ী, মনোময়ী বা প্রাণময়ী শক্তির ভাব ও সৃষ্টি নিয়ামক হৈরণ্যগর্ভাদি দেবত্ব সমস্ত মনে মুদ্রিত হয় এবং কোন মূর্ত্তির যোগে তাঁহার ভূতার

হরণ, জগৎ-পালন পরায়ণ, যুগধর্ম্ম-সংরক্ষণ বৈরাটিক গুণ অথবা তাঁহার সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী, সর্ব্বপ্রভা, সর্ব্বশোভা-স্বরূপিনী, পত্র-পুষ্প-ফলাদি-রচনাময়ী, পুত্র-কন্যা-প্রসবিণী, বিষমে শঙ্কটে মরণে রণে দুর্গতিনাশিনী, বরাভয়দায়িনী প্রভৃতি বৈরাটিকী আভরণ-ভূষণা শক্তি বা অনির্ব্বচনীয়া দৈবী-মায়া হৃদয়ে চিত্রিত হয়। অতএব এ সকল মূর্ত্তি-উপলক্ষিত উপাসনাতে ভক্ত ও ভাবুক সাধু গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সেই ফলাফল লাভ করিয়া থাকেন, যাহা যতিগণ সন্ন্যাস যোগাবলম্বন দ্বারা, অরণ্যে ভৈক্ষচর্য্যা করতঃ বেদান্ত-বিজ্ঞানে সুনিশ্চিতার্থ হইয়া উপভোগ করেন।

পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী মহাত্মাগণ বেদান্তের উপরি উক্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল বুঝিবার প্রয়াস না পাইয়াও যদি কেবল ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় শক্তি ও সর্ব্বত্রাবতীর্ণ হইবার ক্ষমতার পরম্পর অন্বয় করেন ; তবে প্রতিমা-উপলক্ষিত পূজার প্রতি তাঁহাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা হইবেক। কারণ, জগৎ তাঁহাকে যত প্রকারে প্রতিপাদন করে, তিনি যে সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন ছটার সহিত ততরূপী তাহাতে সংশয় নাই। একদিকে গ্রন্থ সকল যেমন যুক্তি বা কাব্যরসের দ্বারা সেই সকল ভাব সাধকের মনে মুদ্রিত করিয়া দেয় ; অন্যদিকে যুক্তি ও কাব্যগ্রন্থের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে এমত "প্রতিমা" সকল সেই ভগবদৈশ্বর্য্য তাদৃশ সাধকের মনে কেননা মুদ্রিত করিবে ? কেনই বা না তাদৃশ সাধক-সম্বন্ধে জগৎগ্রন্থ ও লিপিগ্রন্থের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি-গ্রন্থ বা চিত্র-গ্রন্থ হিত-সাধিনী হইবে ? এতবতা যে জগৎকারণ মহা কবির নিয়মে এক দিকে জগৎ-ছবি, অন্য দিকে দর্শনকার ও কবির বিরচিত গ্রন্থ-ছবি, অপরদিকে প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাতা ও চিত্রকরের কৃত ঈশ্বরের গুণ ও শক্তিসমূহ বিভূষিত দেব-ছবি সমভাবে জ্ঞান দেয়, তাঁহারই স্বীয় নিয়মে যুগে যুগে প্রয়োজন কালে তিনি নটের ন্যায় স্বীয় অনির্ব্বচনীয় শক্তি যোগে কি বিবিধ রূপ ধারণ করতঃ একেবারে জগৎ ছবি, দর্শনকারের ছবি, কবির ছবি, চিত্রকরের ছবি, মূর্ত্তি-নির্ম্মাতার ছবি, অথবা সর্ব্বপ্রকার মানসিক ছবির ন্যায় ফলদান করিতে পারেন না ?

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

মরীচিকা

দিন দিন গণি দিন ; পায় পায় পায়
না জানি রে কোন্ পথে চ'লেছি কোথায় ?
হেথা ত হ'লো না সুখ, অবিরত বলি'—
জানি না কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি !

সকলেই কেঁদে যায়, তুলে এক তান,
পুরিল না সাধ বলি মুদে দু-নয়ান।
ভুলে গিয়ে কল্পনার অমৃত মধুর বোলে,
পাগলের মত যায় ছুটে কল্পনার কোলে !
—কে বলিবে সেথা গিয়ে পুরে কি প্রাণের আশ ?
অথবা আঁধারে বসি ফেলিবে দীরঘ-শ্বাস !

ওরে—ওরে মন মোর, কে আশ্বাস দিল তোরে,
আশার রতন আছে ভাবীর আঁধার ঘোরে !
নিশ্চিন্তেরে হেলা করি অনিশ্চিতে যার আশ,
লোকে বলে, তার ভাগ্যে ঘটে শুধু হা-হুতাশ।
তবে—
আকুল হইয়া হেন, যাসনে যাস নে ছুটে !
মরিবি কি অবশেষে আঁধারেতে কাঁটা ফুটে ?

হেথা—
আছে দুঃখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাতি,
নিরাশায় সুখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাতি।
নদীতে তরঙ্গ আছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস,
পরাণে সঙ্গীত আছে, স্নেহের বাতাস।
হরষের হাসি আছে, দুঃখের নিশ্বাস,
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বদেশ, প্রবাস।
আছে বিহঙ্গের গান, কুসুম বিকাশ,

রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ।
ঊষা আছে, সন্ধ্যা আছে, আছে সাধ, আশা,
স্নেহ আছে, ভক্তি আছে, আছে ভালবাসা।
সাগর, ভূধর আছে, নগর, কানন,
নিদ্রা, জাগরণ আছে, বিস্মৃতি, স্বপন।
খেলা আছে, ধুলা আছে, আছে আলোচনা,
জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে, কবিতা, সাধনা।
জনম, মরণ আছে, আছে স্বাস্থ্য, রোগ,—
নিত্য নব লীলাময় জগতের ভোগ!

তবে—

আকাশের পানে চেয়ে, সজল নয়নে,
কি অভাবে ভাবিতেছ অকাল মরণে?
ভাব—ভাব একবার
জীবনের পর-পার!
যে চির-বিস্মৃতি চাও—
সেথা যদি নাহি পাও?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয়!
কি করিবি—কি করিবি—তখন, হৃদয়?

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা।

(বেদের অনিত্যতা—সাহেবদিগের মত।)

যে যাহাই বলুক, ঋগ্বেদের সংগ্রহ যে প্রথমতঃ কোন রূপ ধর্ম্ম ক্রিয়া সম্পাদনাভিপ্রায়ে সম্পাদিত হয় নাই, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে—

যে সকল গাথা কেবল দেবতার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার নিমিত্ত রচিত হয়, তাহারা প্রায়ই এক একটি ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী মন্ত্রনিচয়ের সহিত এক স্থলে বিন্যস্ত হয়। কিন্তু অন্য দিকে আবার গাথা সকল যদি অন্তরাত্মার নৈসর্গিক কবিত্বধারা বা ভক্তিনির্ঝর হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে তাহারা কালক্রমে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যের সহিত ব্যবহৃত বা নিয়োজিত হইলেও, তাহাদের ঐরূপ একত্রোপন্যাস কখনই পূর্ব্বোক্ত কোন প্রার্থনা-বিষয়ক গাথা সমূহের মত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যজুর্ব্বেদের এবং সামবেদের সংগৃহীত মন্ত্রগুলি যেরূপ সুন্দর সঙ্গতির সহিত উপন্যস্ত হইয়াছে ঋগ্বেদের মন্ত্রোপন্যাসে তাদৃশ সঙ্গতি আদৌ নাই বলিলেই চলে।

যজুর্ব্বেদের অন্তিম অধ্যায় ব্যতীত অপর সমুদয় অধ্যায়েরই মন্ত্র সকলও যে সকল ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের সময় তাহাদের উচ্চারণ আবশ্যক হয়, সেই সেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুসারে নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। সামবেদ সংহিতায় কেবল সেই সকল মন্ত্রের সংগ্রহ করা হইয়াছে যাহা কেবল সোম যজ্ঞ স্থলেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদীয় মন্ত্রনিচয়ের উপন্যাস ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত রীতিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে অনুক্রমে কোন একটা সম্পূর্ণ যজ্ঞ উক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল কোনরূপ যজ্ঞ ক্রিয়ার অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত হয় নাই, তাহারা কোন কোন স্থানে স্ব স্ব প্রতিপাদ্য দেবতাদিগের অনুসারে এবং কোন কোন স্থানে স্ব স্ব আবিষ্কর্ত্তা ঋষিদিগের অনুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে। যেমন ইন্দ্র দেবতার স্তোত্রবিষয়ক কতকগুলি মন্ত্র একত্র বিন্যস্ত হইয়াছে অথবা মধুচ্ছন্দাঋষিদৃষ্ট কতকগুলি মন্ত্র একত্র উপন্যস্ত হইয়াছে।

বৈদিক পূজাপদ্ধতি এবং তদানীন্তন যজমানদিগের খাদ্য ও পশুরক্ষা প্রভৃতির প্রার্থনাত্মক মন্ত্রনিচয় দর্শন করিয়া অনেকেই এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ সকল মন্ত্রে যাদৃশ জীবিকাবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহা পশুপালোপজীবী ও তদর্থ নানা স্থানে ভ্রমণকারীদিগের অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফল, সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ সংহিতাকে এককালীন সংগৃহীত বলা অপেক্ষা আর অধিক ভ্রমের কার্য্য কিছুই নাই। কারণ, ইহাতে একদিকে যেমন পূর্ব্বোক্ত অব্যবস্থিত পশুপালোপজীবীদিগের অবস্থা লক্ষিত হয়, অন্য দিকে

ইহাতে এরূপ প্রমাণেরও উপলব্ধি করা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা ঋগ্বেদ-সমকালীন আর্য্যগণ গ্রাম ও নগরাদি স্থাপন করিয়া বাস করিতেন, তাঁহাদের শিল্পকার্য্যে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, তাঁহারা বস্ত্র বুনিতে, ধাতু গলাইতে, লৌহ ও সুবর্ণ প্রভৃতি গলাইয়া আভরণ নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছিলেন, এই সকল বিষয় সিদ্ধ করা যাইতে পারে। অধিক আর কি বলিব, ঋগ্বেদে তৎকালীন ব্যক্তিদিগের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে এবং বাণিজ্য কার্য্যে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম অষ্টকের ১১৬ সূক্তের কোন একটি মন্ত্রে সমুদ্র যান দ্বারা দ্বীপান্তর আক্রমণের কথাও পাওয়া যায়।

তুগ্র নামে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কোন বন্ধু ভুজ্যু নামক আপন পুত্রকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন। ঐ ভুজ্যু অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে তাঁহাদের দত্ত যানারোহণ করিয়া সমুদ্রের উপর দিয়া পুনরায় নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অশ্বিনীকুমারেরা ঐ ভুজ্যুকে তিন দিন তিন রাত্রে তিনখানি দ্রুতগামী শকট অর্পণ করেন। প্রত্যেক শকটের একশত করিয়া চক্র ছিল এবং উহা ছয়টি ঘোটক দ্বারা মহাসাগরের জলের উপর দিয়া চালিত হইয়াছিল। কেবল ইহা নয়, আমরা ঋগ্বেদসংহিতা-সংগ্রহ সমকালীন মনুষ্যদিগের সঙ্গীত শাস্ত্রীয় যন্ত্রাদিতে, বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদি ব্যবহারে এবং সময়ের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশ করণেও সম্পূর্ণ অধিকার দেখিতে পাই।

অপিচ, ঋগ্বেদ সংহিতায় এমন সকল মন্ত্রও আছে, যাহা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময় কেবল ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি কতকগুলি মোটা বিষয়ের আইন মাত্র ছিল না, কিন্তু দায়ভাগ প্রভৃতি জটিল বিষয়েরও আইন সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে, সমাজ যখন উক্তরূপ উন্নতাবস্থায় পদার্পণ করে তখন ঐ উন্নতির আনুষঙ্গিক কতকগুলি পাপ এবং দোষ আসিয়া উহাকে ভিতরে ভিতরে আক্রমণ করে; এই নিমিত্তই আমরা ঋগ্বেদ সংহিতায় এইরূপ সকল মন্ত্র দেখিতে পাই যাহাতে দ্যূতক্রীড়া, ডাকাইতি, চৌর্য্য এবং জারজোৎপত্তি প্রভৃতিরও উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদসংহিতা অতি প্রাচীন কালে যেরূপ ছিল এখন অবধি ঠিক সেই

রূপ আছে দেখিয়া হিন্দুরা বলেন বেদ নিত্য। কিন্তু আমরা গ্রন্থারম্ভে পুরাণ হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে পুরাণমতে বেদ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। পুরাণে বেদকে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিলেও পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ সে মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে বেদের নির্ম্মাতা কেহই নাই। কোন কোন পুণ্যশীল ঋষিগণ বেদের মন্ত্র সকল ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্ব স্ব হৃদয় মধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন, যিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা তাঁহার নামে সেই মন্ত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মুয়র সাহেব আপনার প্রসিদ্ধ Original Sanskrit Texts নামক গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে বিস্তর প্রমাণের সহিত ইহা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন ও মধ্য সাময়িক ভারতে কি দর্শনশাস্ত্র, কি কাব্য শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বেদের নিত্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তবে, এক্ষণে যে মধ্যে মধ্যে বেদমন্ত্রের পাঠ-ভেদাদি লক্ষিত হয়, ঐ গ্রন্থেই বড় কৌশলে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা,—প্রলয়কালে বৈদিক পুস্তক সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহার পর প্রতি মন্বন্তরার আরম্ভে নূতন করিয়া বেদের উদ্ভাব বা প্রকাশ করা হয়। ঐ সময় অর্থাংশটি সম্যক্ রূপে অপরিবর্ত্তিত থাকিলেও মন্ত্রের অবয়ব শব্দাংশে কোন কোন স্থলে পরিবর্ত্তন ঘটে, তন্নিমিত্তই পাঠ-ভেদ। হায়! আমাদের এক্ষণে সম্পূর্ণ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আচার্য্যগণ এইরূপ কোনমত প্রকারে বেদের নিত্যতা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেও আদি সৃষ্টিতে বেদ যেরূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল প্রতিমন্বন্তরাধ উহার ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে আমরা হয় ত উহার সেই আদি রূপ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছি। ইহা একটি কম শোচনীয় ব্যাপার নহে।

ঋগ্বেদের সমুদয় মন্ত্রের নিত্যতা অর্থাৎ কোন এক সময়ে একেবারে সংগৃহীত হইয়া বরাবর একভাবে থাকা এরূপ অসম্ভব যে, ইহার বিষয়ে যত কিছু যুক্তিযুক্ত মতের উপন্যাস করা যাউক না কেন, ব্রাহ্মণীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর তাহাতে কখনই সন্তোষ লাভ হইবে না। ঐ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি সমুদয় ঋগ্বেদ পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, সমুদয় ঋগ্বেদের মধ্যে কতকগুলি মন্ত্ররূপ আছে, যাহাতে মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থা স্পষ্ট চিত্রিত রহিয়াছে এবং কতকগুলিতে আবার, যেমন

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, অনেকটা উন্নত সামাজিক অবস্থার সুস্পষ্ট প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। এইরূপ কতকগুলি মন্ত্রে কেবল ধর্ম্মের মুকুলোদ্গম অবস্থা মাত্র দৃষ্ট হয়, আর কতকগুলিতে উহার যথাকাল-সুপক্কফলাবস্থা লক্ষিত হয়; সুচিরচিন্তা ও অনুশীলন ব্যতীত সেরূপ পরিণতি পাওয়াই অসম্ভব। ভিন্ন কথায় বলিতে হইলে এইরূপ বলিলেই হয় যে, ঐ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রাচীনতম পুস্তক ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে অবশ্যই বহুকাল-সাধ্য ক্রমোৎপন্ন ঐতিহাসিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যে কোন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিও ইহা কখনই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বেদের নিজ মন্ত্রগুলিই উহার নিত্যতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। ঐ নিত্যতাবাদ যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অভ্রান্তরূপে অনুমান করা যাইতে পারে পৌরহিত্য-প্রবল সময়ে, অর্থাৎ পুরোহিতগণ যে সময় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সকল বিষয়েই স্বকপোল-কল্পিত যুক্তি-পরম্পরা-সম্বলিত কার্য্যকারণ ভাবের বিন্যাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই সময়েই, এই নিত্যতাবাদ আবির্ভূত হইয়া থাকিবেক।

আমরা সচরাচর এইরূপ অনেক মন্ত্র দেখিতে পাই যাহাতে ঋষিগণ আপনাদিগকে স্বনামাঙ্কিত মন্ত্রের দর্শক মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু উহাদের নির্ম্মাতা, উৎপাদয়িতা বা রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটি মন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে "মহর্ষিগণ দেবতাদিগের সন্তোষ সাধনার্থ এই মন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন।" আর একটি মন্ত্রে লেখা আছে—"হে ইন্দ্র, গোতমেরা তোমার নিমিত্ত এই পবিত্র স্তব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সূত্রধার যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে, তাঁহারা সেইরূপ ধন প্রাপ্তির আশয়ে তোমার নিমিত্ত এই স্তব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং মনুষ্যেরা যেমন পথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ গৃৎসমদগণ পুষ্টিলাভার্থ এই মন্ত্রটী প্রস্তুত করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলের মন্ত্র সকল গৃৎসমদ নামক ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৃতীয় মণ্ডলের মন্ত্র গুলি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক, চতুর্থ মণ্ডলের বামদেব কর্ত্তৃক, পঞ্চম মণ্ডলের অত্রি কর্ত্তৃক, ষষ্ঠ মণ্ডলের ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক, সপ্তমের বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক, অষ্টমের কণ্ব কর্ত্তৃক, এবং নবমের অঙ্গিরস

কর্তৃক বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রথম ও দশম মণ্ডলের রচয়িতার ইয়ত্তা নাই।

মুরর সাহেব বলেন, ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রেও এরূপ বাক্য আছে যাহা সমকালীন এবং পূর্ব্বকালবর্ত্তী ঋষিদিগের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছে, অথবা কোন কোন মন্ত্রে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর ঋষির মধ্যে একতরের আক্ষেপ করিতেছে। এইরূপ পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতাই বেদে ঐতিহাসিক উপাদানের অন্যতর সামগ্রী হইয়াছে। যদি এইরূপ পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা কেবল কবিদিগের সম্বন্ধেই থাকিত, তাহা হইলে না হয় কোনরূপে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট যুক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগের মত অবলম্বন করিয়া বেদের নিত্যতা স্বীকার করিতাম। কিন্তু যখন বর্ণিত ঘটনা সকলেও ঐরূপ পূর্ব্বাপরীভাব লক্ষিত হয়, তখন তাহাদিগকে আর কোনরূপেই এককালীন বা অভিন্ন বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। অতএব অন্যে যেরূপ বিবেচনা করুক না কেন, আমার মতে এই এক হাজার আটাইশটি সূক্ত যাহা বর্ত্তমান ঋগ্বেদ সংহিতার পরিমাণ, উহারা কখনই এক সময়ে সংগৃহীত হয় নাই। উহাদের সম্পূর্ণরূপ সংগ্রহের নিমিত্ত অনেক যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে। যতদিন অবধি ঐ সকল সূক্ত রচনার সময় ঠিক্ ঠিক্ নিরূপণ করিতে না পারা যাইবে, ততদিন অবধি প্রাচীন ভারতের ধানা ও সামাজিক জীবনের উন্নতির বিষয় ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না। কিন্তু ঐ সকল সূক্ত রচনার সময় এখনও অবধি ঘোরান্ধকারে নিগূঢ় রহিয়াছে, কখন যে উহার প্রকাশ হইবে এরূপ আশারও কোন কারণ দেখা যায় না।

যদিও মন্ত্র সমূহে ঘটনা, সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠান বিশেষের উল্লেখ, ধর্ম্ম-ভাবের বৈশিষ্ট্য এবং ধর্ম্ম ক্রিয়ার পদ্ধতি অবলোকন করিলে কতকগুলি মন্ত্রের মধ্যে পরস্পরের সাময়িক সম্বন্ধ (পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা) লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের উপর নির্ভর করিয়া একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। যেহেতু, উহাদের অভিপ্রায় নানা জনে নানা রকমে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তবে যদি কোন মন্ত্রের এক জন ঋষি স্বয়ং স্বপূর্ব্ববর্ত্তী অপর এক জন মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ করিয়া থাকেন, অথবা আপনার পূর্ব্বঘটিত ঋগ্বেদের অপর অংশে বর্ণিত ঘটনা-বিশেষের উল্লেখ

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই সকল মন্ত্র দ্বারা তদুভয়ের ভিন্নকালতার নিঃসন্দেহরূপে স্থির করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সকল মন্ত্র যে ভিন্ন কালে রচিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আর কোন রকম 'কিন্তু' থাকে না; তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই তাহাদিগের পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা অনুমিত হয়। কিন্তু এরূপ মন্ত্র অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়। কাজেই মন্ত্র সকলের পূর্ব্বাপর-বর্ত্তিতা নির্ণয়ের প্রকৃত ভার সেই সেই মন্ত্রের ভাষার অবস্থার উপর ন্যস্ত হইতেছে। পরবর্ত্তি বেদ-বিভাগাদি পরিবর্ত্তন বেদের অনেক বিষয়ে গোলমাল উপস্থিত করিলেও ভাষার উপর একটি রেখাও টানিতে পারে নাই। ভাষা-স্তম্ভের শেখর তাহাদের হস্তস্পর্শ হইতে অনেক দূরে উঠিয়াছে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব এখনও এরূপ পরিষ্কৃত হয় নাই যে সেই তমসাচ্ছন্ন বৈদিক সময় নির্ণয়ের পথকে আলোকিত করে। আমরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে যে বৈদিক কথার অর্থ ও ইতিবৃত্ত পাইয়াছি তাহা ঠিক কি না, ইহাই লইয়া এক্ষণে মহা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের বেদের মধ্যে প্রবেশ করিবার এক মাত্র উপায় ভারতবর্ষীয়গণ কর্তৃক প্রদর্শিত পথ; তাহা লইয়াই যখন বিবাদ, তখন বৈদিক সময় নির্ণয়-বিষয়ক প্রশ্নের শীঘ্র মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

অপর দুই খানি বৈদিক সংহিতা সম্পূর্ণরূপে অথবা অধিকাংশ ঋগ্বেদ হইতেই সংগৃহীত হয়। উহাদের মধ্যেও আবার পূর্ব্বাপরভাব আছে। সামবেদ যজুর্ব্বেদ হইতে একটু পূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছে। কারণ যজুর্ব্বেদের সময় দর্শন শাস্ত্রের অনেকটা অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব ঋগ্বেদের শেষে যে কতকগুলি দর্শন মত-প্রকাশক মন্ত্র দৃষ্ট হয়, সে গুলি বোধ হয় যজুর্ব্বেদের সময় সংগৃহীত হইয়া ঋগ্বেদের শেষ ভাগে সংন্যস্ত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য যজুর্ব্বেদের ভাষ্যের প্রস্তাবনায় যজুর্ব্বেদকেই সকল বেদের শ্রেষ্ঠ এবং মূলীভূত বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঋগ্বেদ এবং সামবেদ সংহিতা চিত্রস্বরূপ, যজুর্ব্বেদ সংহিতা তাহার ভিত্তি।

আরও একটা বিচার কর, যজুর্ব্বেদের দুইটি অংশ আছে, একটি কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ আর একটি শুক্ল যজুর্ব্বেদ। এই দুই অংশ হইবার পক্ষে একটি এইরূপ ইতিহাস আছে যে প্রথমে একমাত্র কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদই ছিল। বৈশ-

-ন্দায়ন নামক কোন ঋষির শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর নিকট গর্ব্বভাব প্রকাশ করায় গুরু তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিলাম, তুমি আমার নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ তাহা বমন করিয়া দেও, এই কথা শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তৎক্ষণাৎ সমগ্র যজুর্ব্বেদ বমন করিয়া দিলেন এবং গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বেদ উদ্গীরণ করিলে ঋষির অন্যান্য শিষ্যগণ তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই উদ্গীর্ণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেলিলেন। এই জন্য কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদকে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলে। বোধ হয় উহা মলের মত বান্ত হওয়ায় কৃষ্ণ অর্থাৎ মলিন এই বিশেষণ লাভ করিয়া থাকিবে। যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় ঘোরতর তপস্যাচরণ করিয়া সূর্য্যদেবকে সন্তুষ্ট করতঃ অপর একটি বেদ লাভ করেন। ঐ বেদ শুক্ল যজুর্ব্বেদ নামে বিখ্যাত হয়। এইগল্প যে ভাবেই রচিত হউক, ইহা দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে যে, শুক্ল যজুর্ব্বেদ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ অপেক্ষা আধুনিক এবং অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। [ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

বঙ্কিমচন্দ্র। *

জগত-সাহিত্যে বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য! আশার কথা—জাতীয় জীবনের এই ত আরম্ভ। নীলদর্পণ য়ুরোপীয় বহুবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, সত্য। তাহা দীনবন্ধুর গুণে নহে, আমাদের হতভাগ্য কৃষকদিগের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে। আজ বঙ্কিমের বিষ-বৃক্ষ, কপাল-কুণ্ডলা সুদূর পশ্চিমে আলোচিত হইতেছে। অনন্ত-কালের মহা-নাটকে বাঙ্গালীর ডাক্ পড়িয়াছে।

কিন্তু, সাজ-ঘরে বড়ই গোল বাঁধিয়াছে। আমাদের হইতেছে যেন সব-ই, অথচ কিছুই হইতেছে না। দর্শকেরা নাট্যাভিনয়ে প্রহসনাভিনয় দেখিতেছে।

* বঙ্কিমচন্দ্র। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রণীত।

একজন অনুবাদক ভূমিকা কাঁদিয়াছেন,—রমেশচন্দ্র বাঙ্গালার প্রধান উপ-ন্যাসলেখক!—যাঁহারা ভারত সাহিত্য-বৃক্ষ জয় করিয়া, শতাধিক বৎসর হইতে মহোপাধ্যায় খেতাবটা, কোন ওজর আপত্তি বিনা ভোগ দখল করিতেছেন, ইনি সেই লম্ফঝম্প-গোষ্ঠিরই একজন।—বাপু হে! আমরা বাঙ্গালী। স্বভাবতঃ 'সংসার'-বিরাগী। প্রতি পদক্ষেপে বিজিত, 'বিজেতা' নহি। আমাদের 'জীবন' গাঢ় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন। হেথায় 'প্রভাত সন্ধ্যার' জোয়ার ভাটা নাই।

আর একজন অনুবাদক নহে, অনুবাদ-কর্ত্রী, অর্থাৎ কমলাকান্তের আধখানা মালা—গোড়ায় আর একজনকে দাঁড় করাইয়া, মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়াছেন।

আচ্ছা, ব্রিটনের অনুবাদক বলিয়া গর্ব্ব করিবার ত অনেকগুলি প্রকৃত গুণী আছেন। কারলাইল, মাইকেল রসেটি, গোট, জর্জ ইলিয়ট, ব্রাউনিং, লর্ড ডার্বি* প্রভৃতি ত এই ব্রিটন-সন্তান। তবে আমাদের কপালেই নিগ্রহ-ভোগটা কেন? দেখিতে পাই, ক্ষমতাশালীর হস্তে য়ুরোপীয় কোন এক ভাষা য়ুরোপীয় অন্য এক ভাষায় প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদিত হয়। কিন্তু ভারতীয় ভাষার প্রত্যেক য়ুরোপীয় অনুবাদক—উইলসনই হউন, আর মোক্ষমূলারই হউন—প্রায় এক একটী গরু সাজিয়া বসিয়া আছেন। অন্যদিকে, ভারতীয় ভাষার ভারতীয় অনুবাদক, তা যাঁহারই কেন অনুবাদ পড়ি না,—শকুন্তলাই পড়ি, আর সাংখ্য-দর্শনই পড়ি, বুঝিতে পারি।

এরূপ হয় কেন? কথাটা এই,—সমস্ত য়ুরোপ এক ছাঁচে গঠিত। সমাজ, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম অধর্ম্ম মূলতঃ এক। আমরা মূলতঃ আর এক। আমাদের সমাজ, রীতি নীতি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ভিন্ন মুখে; আমাদের রোখ্ ঝোঁক্ ভিন্ন মুখে। এক কথায় আমাদের ধাত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর উপর য়ুরোপীয়েরা প্রথম হইতেই আমাদিগকে শিখিতে না আসিয়া, যেন শিখাইতে আসেন। না উঠিয়াই কাঁদি পাড়িতে ব্যস্ত।

* As translators of Wilhelm Meister, Dante, Aristotle, Life of Jesus, Tragedy of Agamemnon and Iliad, respectively.

অনেক দিন বুঝা গিয়াছে, এ সব আপনি মোড়লে আমাদের গাঁয়ের তত ভীত হইবার কারণ নাই। তাঁহাদের জন্য—আমাদের বক্তাদের মুখবন্ধ-স্বরূপ, হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত—গালভরা, লম্বা চৌড়া, যথেষ্ট স্থান পড়িয়া আছে। তাঁহারাও জানেন, তাঁহাদের কারবার খুব ফ্যালাও।

তার পর দ্বিতীয় গোলযোগ, আমাদের একচালা-অধিবাসীদিগের। তাঁহাদের ব্যস্তবাগীশতায় বড় মাথা ঠোকাঠুকি হইতেছে। সাংঘাতিক আঘাত লাগিতেছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ত 'উদ্ধৃতের' চোটে লড়াই ফতে করিতেছেন। বসু বাবু ঘরের কোণ হইতে প্রেমিসনের ধূলা ঝাড়িয়া 'সুন্দরী' দাঁড় করাইয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিতেছেন। আবার গিরিজা-প্রসন্ন বাবু আজ জীবিত বঙ্কিমচন্দ্রকে Surgery করিতে বসিয়া গিয়াছেন। প্রথমেই, ছুরী না বসাইয়া, শলা চালাইয়াছেন।--হা বঙ্কিম!

উপস্থিত পুস্তকখানি বঙ্কিমের সমালোচনা নহে, গ্রন্থকার বলেন,—' বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা মাত্র।'' উপন্যাসের ব্যাখ্যাটা কি জিনিষ, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না। জ্যামিতির প্রথম সাতটা সংজ্ঞার মতন, শুদ্ধ অনুভব করিতে হইবে, নহিলে চলে না,—এমন কি একটা কিছু? এই ত জানি, নাটক এবং ব্যাখ্যার সংযোগেই উপন্যাস।

এর উপর আবার বিশ্লেষণ! বঙ্কিম বাবু তাঁহার কাব্যে এমন কি কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছেন, যাহার একটা বিশ্লেষণ এতদিন প্রকাশিত না হওয়ায় সমস্তটা গোল ঠেকিতেছিল? কোন কোন স্থানে এমন কিছু আছে সত্য,—যাহা নিতান্ত অসূর্য্যম্পশ্য গোছ নহে—অবগুণ্ঠনাবৃত বটে। বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই জানেন, বঙ্কিম বাবু আরো ভাল জানেন, সূক্ষ্ম আবরণের দ্বারাই সে স্থান গুলির পূর্ণ সৌন্দর্য্য, প্রকৃত কবিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর একটু মাত্র রঙ নাড়িলে বা চড়াইলে, উহার সে মাধুরী ভাঙ্গিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সে ঔদাস্য ঘুচিয়া যাইবে। কবিত্বে বিশ্লেষণ হয় না। স্পর্শ করিলেই লূতা-তন্ত ছিঁড়িয়া যায়!

সমালোচক মলাটে হেমচন্দ্র হইতে তুলিয়া দিয়াছেন, "তোমারি ভাবেতে দেখিব তোমায়।" ভূমিকারও এই ভাব। লেখকের ভাব-বিকারাবস্থার লেখা

প্রায়ই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। একটা না একটা বিশেষ দোষ থাকিয়া যায়। হয় art-এর অভাব হয়,নয় লেখা mystic হইয়া পড়ে। কিন্তু, লেখক ভাবকে তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া, তাহার চারিদিক দেখিয়া লিখিলে, তাঁহার যতটুকু ক্ষমতা থাকুক, প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, লেখক ভাবের অধীন না হইয়া, ভাবকে জয় করিয়া লিখিবেন। লিখনাবস্থায় লেখকে ও ভাবে যেন একটা স্বাতন্ত্র্য থাকে। যখন আপনার ভাবে এবং আপনাতে একটা স্বাতন্ত্র্য রাখিতে হয়, তখন আপনাতে এবং পরে, কবির সহিত সমালোচকের কতটা স্বাতন্ত্র্য রাখার প্রয়োজন! সমুদ্র বর্ণনা করিতে হইলে, আগে আপনার একটা দাঁড়াইবার স্থান চাই ই। বঙ্কিম-সমুদ্রে ডুবিয়া যাওয়া পাঠকের কাজ, বঙ্কিম-সমুদ্র বর্ণনা করা বঙ্কিমের সমালোচকের কাজ।

"সমকালীন গুণ-ভক্ত লোকের দ্বারা সমকালীন গুণীর সমালোচনা হইতে পারে।" গুণীর হইয়াই থাকে; সমকালীন অদ্বিতীয় লোকের হয় না বিজ্ঞানে যাহা চির-সত্য, সাহিত্যের ইতিহাসেও কি তাহা চির-সত্য নয়? চন্দ্রের পার্শ্বে তারকা নিষ্প্রভ; বড় প্রতিভার পার্শ্বে ক্ষুদ্র প্রতিভা নিষ্পেষিত। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্কিমের সমালোচনা করিবে কে?/উপস্থিত বাঙ্গালা সাহিত্য ত বঙ্কিমের সাহিত্য।/ বঙ্কিমেরই প্রতিভাস্রোতে তরঙ্গায়িত। এ বিষম ঘূর্ণীতে ভয়-চঞ্চল হন নাই—এ কুলু-ধ্বনিতে বিকলহৃদয় হন নাই—উপস্থিত বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন কে মহাপুরুষ আছেন?

সমালোচন খানি "শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে লিখিত হইয়াছে।" ভালই। কিন্তু, সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, সাহায্য করা "শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়দ্বয়ের" ক্ষমতাতীত। তাঁহারা বঙ্কিমের ছাত্র বা পারিপার্শ্বিক (Satelite)। বঙ্কিমের কিরণে আন্দোলিত, ওতঃপ্রোত। ভবিষ্যতে বঙ্কিমের আলোকে সকলেই লীন হইয়া যাইবেন! বঙ্কিমের পরে আর কেহ জ্বলিবেন না। একা বঙ্কিম এ যুগের।

বঙ্কিমের সমালোচনা করা সহজ নহে। বঙ্কিমের প্রকৃত সমালোচনা বিশেষ সময় ও প্রকৃত ক্ষমতা সাপেক্ষ। বঙ্কিমের সমালোচনা করিতে হইলে আর এক বঙ্কিম চাই। চাই—একজন লেসিঙ্, যাঁহার অস্থিব

বা জীবনই সমালোচনা। তাই পেইটের মতন অন্ধ ভক্তির অধীন নহেন এমন একজন artist; অথবা একজন মেথু আর্ণল্ডের মতন দোষ-গুণ-বিচার ক্ষম এবং সুইনবার্ণের মতন ভাবোন্মত্ত কবি-সমালোচক।

তবে, যদি "উপন্যাস বুঝিবার ক্ষমতা স্বত্ত্বেও উপন্যাস বুঝিয়া উঠিতে পারেন না," এমন কেহ দৃষ্টি-ক্ষীণ উপন্যাস-পাঠক থাকেন, তাঁহারাই এই "বঙ্কিমচন্দ্র"-চসমা দিয়া যেন বঙ্কিমের উপন্যাস পাঠ করেন,—সমালোচকের সহিত আমিও এ অনুরোধটী করি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বনের ছায়া।

কোথারে তরুর ছায়া,
বনের শ্যামল স্নেহ!
তট-তরু কোলে কোলে
সারাদিন কল রোলে
স্রোতস্বিনী যায় চোলে
সুদূরে সাধের গেহ;
কোথারে তরুর ছায়া
বনের শ্যামল স্নেহ!

কোথারে সুনীল দিশে
বনান্ত রয়েছে মিশে,
অনন্তের অনিমিষে
নয়ন নিমেষ-হারা!
দূর হতে বায়ু এসে
চলে যায় দূর-দেশে,
গীত গান যায় ভেসে
কোন্ দেশে যায় তারা!

হাসি, বাঁশি, পরিহাস,
বিমল সুখের শ্বাস,
মেলা-মেশা বারো মাস
নদীর শ্যামল তীরে ;
কেহ খেলে, কেহ দোলে,
ঘুমায় ছায়ার কোলে,
বেলা শুধু যায় চোলে
কুল কুল নদী নীরে।
বকুল কুড়োয় কেহ
কেহ গাঁথে মালাখানি ;
ছায়াতে ছায়ার প্রায়
বসে বসে গান গায়,
করিতেছে কে কোথায়
চুপি চুপি কানাকানি !
খুলে গেছে চুলগুলি,
বাঁধিতে গিয়েছে ভুলি,
আঙ্গুলে ধরেছে তুলি
আঁখি পাছে ঢেকে যায়,
কাঁকন খসিয়া গেছে
খুঁজিছে গাছের ছায় !
বনের মর্ম্মের মাঝে
বিজনে বাঁশরী বাজে,
তারি সুরে মাঝে মাঝে
ঘুঘু দুটি গান গায়।
ঝুরু ঝুরু কত পাতা
গাহিছে বনের গাথা,
কত না মনের কথা
তারি সাথে মিশে যায় !

লতা পাতা কত শত
খেলে কাঁপে কত মত,
ছোট ছোট আলোছায়া
ঝিকিমিকি বন ছেয়ে,
তারি সাথে তারি মত
খেলে কত ছেলে মেয়ে!
কোথায় সে গুন্ গুন্
ঝর ঝর মরমর,
কোথা সে মাথার পরে,
লতাপাতা থরথর!
কোথায় সে ছায়া আলো,
ছেলে মেয়ে, খেলাধূলি,
কোথা সে ফুলের মাঝে
এলোচুলে হাসিগুলি!
কোথারে সরল প্রাণ,
গভীর আনন্দ গান,
অসীম শান্তির মাঝে
প্রাণের সাধের গেহ,
তরুর শীতল ছায়া
বনের শ্যামল স্নেহ!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হেমচন্দ্র।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দগ্রামে রামতনু চক্রবর্ত্তীর এক দিন বড়ই নাম ডাক ছিল। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। প্রশস্ত-বক্ষঃশোভিত সুভুজ-বিশিষ্ট উন্নত শরীর; স্নিগ্ধ

মনোহর কান্তি; সুকুমার গঠন; প্রসন্ন পরিষ্কার চক্ষু; সদা-প্রফুল্ল হাসি হাসি মুখ; দেখিলেই আপনা আপনি মনে ভক্তির উদয় হইত। কি কথা! অমৃত-পূরিত, বালবৃদ্ধ সকলেই তাহাতে মুগ্ধ। ছোট বড় সবার প্রতি সমান দয়া সে দয়ায় সবাই বশীভূত। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভিন্ন অন্য লোক জানিত না। রোগে ব্যবস্থা দিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়, বিপদে সান্ত্বনা দিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়, দায়ে পরামর্শ দিতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও তাহাতেই মহা আনন্দ বোধ করিতেন। যে দিন তিনি কোনরূপে কাহারও একটু উপকার করিতে পারিতেন, সে দিন তাঁহার আহ্লাদের সীমা থাকিত না। লোকের কষ্ট দেখিলে তাঁহারা চক্ষে জল আসিত, যতক্ষণ না তাহার কষ্টের মোচন করিতে পারিতেন, ততক্ষণ আহার নিদ্রা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে যেমন মন দিয়াছিলেন তেমন ধন দেন নাই। বিধাতার এ অন্ধ-পক্ষপাতিতা সকল কালে সকল স্থলেই আছে। তা, ইহাতেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিকার ছিল না লোকের উপকার করিয়া দিনান্তে শাকভাত খাইয়াই সন্তুষ্ট। সামান্য জমি-জোরাত ছিল, তাহাতেই একরূপ চলিয়া যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ প্রকার লোক এ পৃথিবীতে অধিক দিন থাকিতে পারে না। অকস্মাৎ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এক দিন জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে জ্বর বাড়িল; বিকার ধরিল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলে দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিল। অনেকে আহার নিদ্রা ভুলিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু রোগের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে আরম্ভ হইল, সকলে মনে মনে হায় হায় করিতে লাগিল। আট দিনের দিন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল। গ্রামময় ঘরে ঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল। চক্রবর্ত্তীর দুটী পুত্র হইয়াছিল, সে দুটীই আর নাই। সে দুঃখের কথা কি বলিব? যে গোলাপ দুটী এক বৃন্তে এত শোভা ধরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ফুটিতে পাইল না। মুকুলেই শুষ্ক হইয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। কি জানি, স্বর্গে কি মাধুরীর অভাব হইয়াছিল, তাহাদের শৈশবেই বিধাতা তাহাদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। থাকিবার মধ্যে একমাত্র দুই বৎসরের কন্যা। সেই কন্যা লইয়া তাঁহার ব্রাহ্মণী বিধবা হইলেন।

কন্যার মামারা কিছু গোছাল গৃহস্থ। ভগিনীপতির মৃত্যু সংবাদ

শুনিবামাত্র ভগিনীকে লইতে আসিল। যথারীতি শ্রাদ্ধাদির পর বিধবা পিত্রালয়ে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ সকলে ভাঙিয়া আসিল। বলিল—"সে কি মা, তুমি আমাদের ফেলিয়া কোথায় যাইবে? চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী শূন্য পড়িয়া থাকিবে আমরা তাহা দেখিতে পারিব না। তবে একান্ত যাও যদি, বলিয়া যাও, আবার শীঘ্রই আসিবে। আমরা সকলে থাকিতে তোমার কিসের অভাব মা?" বিধবা সকলকে বুঝাইয়া ভ্রাতার সঙ্গে গমন করিলেন। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না। দুই মাস না যাইতেই আবার আনন্দগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

মেয়েটী ক্রমে বাড়িতে লাগিল। কি সুন্দর রূপ! কি মধুর স্বভাব! কি মিষ্ট কথা! যে দেখিত সেই আদর না করিয়া থাকিতে পারিত না। সকলেই তাহার মিষ্ট কথাগুলি শুনিতে ভাল বাসিত। ছেলেয় ছেলের খেলা করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে। কিন্তু কেহ কখন সে বালিকাকে কাহারও সহিত বিবাদ করিতে দেখে নাই; কেহ কখন তাহার মুখে একটীও উচ্চ কথা শুনে নাই। মুখ খানি সদাই প্রফুল্ল, সদাই হাসি হাসি, ঠোঁট দুখানিতে যেন হাসি মাখান রহিয়াছে। সেই হাসি মুখে বালিকা কত কথা কহিত, কত গল্প করিত, কত শ্লোক বলিত; স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া লোকে তাহা শুনিত, আর সেই ঠোঁট দুখানি কিরূপ ভাবে নাড়িত, কিরূপ ভাবে ঈষৎ হাসো বালিকার সেই কুন্দনিন্দিত দন্তগুলি সেই ঠোঁটের ভিতর দিয়া দেখা যাইত, কিরূপে মুখের উপর যে ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি উড়িয়া পড়িত বালিকা তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুখানি দিয়া সরাইয়া দিত, সেই সমস্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সকলে একমনে দেখিত। মাতার কাছে গিয়া সকলে মেয়ের সুখ্যাতি করিত। মাতা কন্যাকে বক্ষে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেন। ধীরে ধীরে চক্ষের অগ্রভাগে একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

'বৎসর যায়, না জল যায়।' দেখিতে দেখিতে বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বসুমতী একাদশ বৎসরে পড়িল। তখনও সে বালিকা সেই বালিকা। সেই স্বভাব—সেই হাসি—সেই কথা! বয়সে আরও রূপ বাড়িয়া উঠিল। যে কমল মুদিত থাকিয়া এতক্ষণ সরোবরের

শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল, তাহা যেন নবীন সূর্য্যাগে বিকাশোন্মুখ হইয়া সমস্ত প্রদেশ আলোকিত করিল। সে সুকুমার গঠনে সৌকুমার্য্য উছলিয়া উঠিল। চিত্রকর যে প্রতিমা চিত্রিত করিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর যেন 'ঘাম তেল' মাখাইয়া দিল। একে সোণার চাঁপার রঙ, তায় সেই ঢল ঢল মুখ খানির চারিপার্শ্বে নিবিড়কৃষ্ণ কুঞ্চিত অলকাশ্রেণী সর্ব্বদা বেড়িয়া থাকিত—সে মুখমণ্ডল কি অনির্ব্বচনীয় সুকুমার, কি মধুর, কি ঔদার্য্য-বিশিষ্ট। সেই সৌকুমার্য্য, বালিকা বয়সের সেই ঔদার্য্য, মুখে, চোখে, দেহে, প্রতি অবয়বে প্রতিফলিত। সে হাসি, সে চাহনি, সে কথা, সে চলন—সকলই সুন্দর, মধুর, কমনীয়, মনোমোহন;—শারদপূর্ণিমার স্নিগ্ধ চন্দ্রকর সদৃশ বসন্তসমীরসঞ্চালিত নবকুসুমিত ব্রততীর মন্দান্দোলন তুল্য। দেখিলে, দর্শন-বুভুক্ষা আরও বদ্ধিত হয়, দেখিতে দেখিতে তৎপ্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আপনা ভুলিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা যায়। অসীম রূপরাশি লইয়া বালিকা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। সে রূপের ন্যায় গুণেরও ইয়ত্তা নাই। বালিকা এখন ডাগর হইয়াছে, এখন আর তেমন খেলা করে না, পুতুলের বিয়ে দেয় না, বিড়াল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করে না। বালিকা এখন ভোর না হইতেই বিছানা হইতে উঠে; উঠিয়া যাহা পারে সে সংসারের কাজে মায়ের সাহায্য করে। মা আর ঝি, সংসারের কাজই বা কত? কিন্তু লোক না থাকিলেও সময়ে সময়ে তাহাদের সংসারে কাজ পড়িত। মাতার বার ব্রত ছিল, অতিথি কুটুম্ব ছিল, পালপার্ব্বণ ছিল। তা ছাড়া, গ্রামের যাহার রোগ হইত, যাহার অরুচি হইত, অথবা অনেকে কেবল মাতার হাতে খাইতে ভাল বাসিত বলিয়া, তাঁহার বাড়ী খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া প্রসাদ পাইবার কথা বলিয়া পাঠাইত; মাতা অতি যত্নে রন্ধনাদি করিয়া বসিয়া থাকিয়া ভোজন করাইতেন। সে সকল কাজে বালিকা যথাসাধ্য মাতার সহায়তা করিত। মাতা প্রাণান্তেও বড় কাজ মেয়েকে করিতে দিতেন না।

বাড়ীর পাশে তাহাদের একখানি বাগান ছিল। বসুমতী তাহাতে কত গাছ পুতিয়াছিল। যূঁই, মল্লিকা, গোলাপ, টগর, করবী—কত ফুল গাছ, ফুল ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া থাকিত। নূতন গাছে ফুল ধরিলে বালিকার

আহ্লাদের সীমা থাকিত না। তাহার পাশে পাশে কোথাও রাঙাশাকের ঝাড়, কোথাও লাউশাকের মাচা, কোথাও বেগুণ গাছে বেগুণ ঝুলিতেছে। বালিকা প্রত্যহ সেই সকল গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিত, বৈকালে স্বহস্তে জল সিঞ্চন করিত। বালিকা প্রত্যহ সকালে সাজি ভরিয়া ফুল তুলিত, চুপড়ি ভরিয়া শাক তরকারি তুলিত। অন্যান্য বৃক্ষে যে সময়ে যে ফল হইত তাহাও তুলিয়া লইত। সেই সকল সামগ্রী লইয়া বালিকা প্রত্যহ পাড়ায় পাড়ায় যাইত। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্যদিগকে পূজা করিবার জন্য ফুল দিয়া আসিত; যাহারা গরিব তাহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া সেই তরকারি ও ফল দিয়া আসিত। আম কি কাঁঠাল পাকিলে, পাড়ার ছেলেদিগকে ডাকিয়া আনিয়া মাকে তাহা ভাগ করিয়া সকলকে বসিয়া খাওয়াইতে বলিত। সেই বালিকার জন্য সেই গ্রামের গরিব দুঃখী সকলকে কখন শাক তরকারি কি ফল মূল কিনিয়া খাইতে হইত না।

কাহারও বাড়ী সময়ে সময়ে কর্ম্মের লোক না থাকিলে বালিকা গিয়া তাহার কাজগুলি করিয়া দিয়া আসিত। মানা করিলে শুনিত না। শূন্য কলসীটা লইয়া হুড় হুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইত, ক্ষণেক পরেই জল আনিয়া যেখানকার কলসী সেখানে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইত।

কাহারও অসুখ করিলে বসুমতীর আর আহার নিদ্রা হইত না। সমস্ত দিন তাহার শিওরের কাছে বসিয়া তাহার সুশ্রূষা করিত। কখন গায়ে হাত বুলাইত, কখন মাথা টিপিয়া দিত, কখন ঔষধ খাওয়াইত। যতদিন না সে সারিয়া উঠিত, ততদিন প্রত্যহ অধিক সময় বালিকা তাহার সুশ্রূষায় কাটাইত। রোগীও মাথার কাছে সেই বালিকার চিন্তামাখা মুখ খানি দেখিয়া অর্দ্ধেক রোগ-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত।

গ্রামের কাহারও বিপদের কথা শুনিলে বালিকা আকুল হইয়া পড়িত। তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ভাবনায় ভাঙ্গিয়া যাইত। শুইয়া শুইয়া মায়ের সঙ্গে সেই কথা বলাবলি করিত, বলিতে বলিতে বালিকা ঘুমাইয়া পড়িত। স্বপ্নে সেই কথা ভাবিয়া ঘুমন্ত বালিকা কখন বা আশঙ্কায় চমকিয়া উঠিত। প্রভাতে দুটী চক্ষুকোণে অশ্রুকণার দুটী শুষ্ক রেখা দেখা যাইত।

বাড়ীর কাছেই গঙ্গা। বালিকা নিত্য সেই গঙ্গায় স্নান করিতে যাইত।

স্নানের ঘাটের উপরেই গঙ্গাবাসীদিগের একটী ঘর। শ্মশানঘাট তাহার নিকটেই ছিল। মাঝে মাঝে সেই ঘরে মুমূর্ষুকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়া অনেকে দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া থাকিত। বালিকা প্রত্যহ স্নানের পূর্ব্বে সেই গঙ্গাবাসীদিগের নিকটে যাইত; মুমূর্ষুর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিত। কিছু খাইতে চাহিলে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। সঙ্গীরা মুমূর্ষুকে লইয়া বিব্রত থাকিত, বালিকা চাল ধুইয়া, কুটনা কুটিয়া, উনান ধরাইয়া, তাহাদের পাকশাকের যোগাড় করিয়া দিত। যে দিন মুমূর্ষুর অবস্থা বড় মন্দ দেখিত, সে দিন প্রায় সমস্ত দিন তাহাদের কাছে বসিয়া থাকিত। তাহারা বালিকার এই আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হইত; দেশে গিয়া সকলের নিকট সেই বালিকার লোকাতীত গুণের কথা পরিচয় দিত সেই গুণের সঙ্গে তাহার সেই অনিন্দিতগৌর স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময় অলোকসামান্য রূপ দেখিয়া অনেকে তাহাকে সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী বলিয়া মনে মনে ভাবিত। দেবতা ভিন্ন এত রূপ এত গুণ কি মানুষের কখন থাকে? সেই বিদেশে শ্মশানভূমে সেই বালিকাকে দেখিবামাত্র সকলের হৃদয়ে ভরসার উদয় হইত। যে কোন গঙ্গাযাত্রী সে ঘাটে আসিত, সে কখন সে বালিকার কথা ভুলিতে পারিত না।

বেলা ৫ টা বাজিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিমে একেবারে হেলিয়া পড়িয়াছে। অপরাহ্ণ-সূর্য্যের স্বর্ণ কিরণ বৃক্ষের মাথায় মাথায়, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি করিয়া খেলা করিতেছে। নীচে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রের উপর কোথাও শীতল ছায়া, কোথাও ঈষৎ রৌদ্র, কোথাও একটু বেশি ঝিকিমিকি, কোথাও বা প্রখর সূর্য্যোত্তাপ। দেখিতে দেখিতে রৌদ্র ক্রমেই পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে; যেখানে আগে বেশী রৌদ্র ছিল সেখানে কম রৌদ্র, ক্রমে পূর্ণ ছায়া। আর এক ঘণ্টা পরে সমস্ত স্থানে ছায়া পড়িয়া আসিল। একটী কলসে জল লইয়া বসুমতী ধীরে ধীরে তাহার বাগানে আসিল। ধীরে ধীরে গাছে গাছে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। গাছ শাখা দোলাইয়া পাতা নাড়িয়া সে বালিকার কাছে কতই কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লাগিল। কলসের জল ফুরাইয়া গেল, বালিকা আবার জল তুলিয়া বৃক্ষে বৃক্ষে ঢালিতে লাগিল। আবার জল ফুরাইল, আবার আনিল। সে জল তুলিতে, জল ঢালিতে কষ্ট নাই.

হাতব্যথা নাই, শ্রমবোধ নাই। মা এত বলিতেন, লোকে এত বারণ করিত, বালিকা শুনিত না; যতক্ষণ না তাহার সেই গাছ গুলিতে জল দিতে পারিত, ততক্ষণ তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিত, কিছুতেই স্বস্তি পাইত না। মাতা পিত্রালয়ে যাইতে চাহিলে, বালিকা তাহার গাছ গুলির মায়ায়—কার প্রতিই বা তাহার মায়া না ছিল?—যাইতে চাহিত না। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য ডুবিয়া আসিল। বালিকা তখনও গাছ গুলিতে জল দিতেছে। নাপিতদের মঙ্গলা গা ধুইয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিল, ডাকিল—"বসু!"

বালিকা বলিল "কে, মঙ্গলা?"

ম। হাঁ, এখনও বাগানে! গা ধুইবে না?

ব। এই আর গোটাকত গাছ আছে, তা হলেই যাব। তুমি কি গিয়াছিলে?

ম। হাঁ, আমি গা ধুইয়া আসিতেছি।

ব। ঘাটে সেই বুড়ীকে দেখিয়া আসিয়াছিলে? কেমন আছে, ভাই? আহা মার অসুখ ব'লে আজ আর একবার বৈ যাইতে পারি নাই।

ম। সে সেই দুপুরেই বুড়ীর শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে।

ব। অ্যাঁ! আহা আর একটীবার গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিলাম না। তাহার সেই ছোট ছেলেটী, আহা না জানি কতই কাঁদিয়াছে!

বালিকার চক্ষে দুই বিন্দু জল পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, মঙ্গলা তাহা দেখিতে পাইল না। বলিল—"দেখ, ভাই, দেখে এলেম, আর কারা একটী স্ত্রীলোককে সেই ঘাটে দাহ করিতে আসিয়াছে; তাদের সঙ্গে তত বেশি লোক নাই, যাহারা আছে তাহারাও বোধ হয় আপনার জন নয়; তাদের মধ্যে একটী—আহা তাহারই বোধ হয় মা মরিয়াছে—চিতা জ্বালাইয়া দিয়া তার যে কান্না! আ মরি মরি, দেখে ভাই, বুক যেন ফেটে যেতে লাগ্‌ল।"

স্থির হইয়া বালিকা শুনিল, প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল। বলিল—"তা, কেহ সান্ত্বনা করিতেছে না!"

ম। কৈ, কাহাকেও তো দেখিলাম না। তাই বোধ হলো, সঙ্গে আপনার জন কেহ নাই।

বালিকা গাছে আর জল দিতে পারিল না; হাত কাঁপিতে লাগিল; মাথা যেন কিসে ঘুরিয়া আসিল; সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে কি এক দুপ্ দুপ্ শব্দ হইতে লাগিল, দুই চক্ষু জলে পূরিয়া আসিল।

মঙ্গলা বলিল—"তা, সন্ধ্যা হইল, ঘরে যাও; আমি বাড়ি যাই।"

মঙ্গলা চলিয়া গেল। যে গাছ কটিতে জল দেওয়া বাকি ছিল, তাহা আজ আর হইল না। সন্ধ্যার সেই প্রথম অন্ধকারে দুটী চক্ষের জল মুছিয়া, বালিকা ধীরে ধীরে বাগান হইতে উঠিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়াছে। স্তরে স্তরে অন্ধকারের পর অন্ধকার নামিয়া আকাশ, নক্ষত্র, নীলিমা সমস্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণ প্রতিপদের রাত্রি,—সে অন্ধকার অতি সামান্য, ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী। দুদণ্ডের পর সে অন্ধকার কোথায় সরিয়া গেল। আকাশে চাঁদ উঠিল। চাঁদের আলো পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু, দেখ শশি, মানি বটে তোমার রূপের তুলনা নাই, তুমি অনন্ত-সুন্দরী, কবিরা তোমার রূপে চিরকাল উন্মত্ত; কিন্তু তাই বলিয়া যখন তখন সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া যার তার কাছে ও রূপের বাজরা খুলিও না। যাহার ও রূপ ভাল লাগিবে তাহারই কাছে ও রূপের আদর; নহিলে যে জঠর-জ্বালায় জ্বালাতন, কি ততোধিক নিদারুণ অস্থিভেদী শোকের জ্বালায় যে জরজর, তাহার কাছে তোমার ও রূপের কিসের আদর? সে একবার তোমার দিকে চাহিয়াও দেখিবে না। তোমার হাসিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় উন্মাদকর সুধা ঝরে জানি; কিন্তু যাহার পক্ষে সুধা, তাহার পক্ষেই সুধা; অন্যের পক্ষে তাহা বিষ! যে রোগের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে, যে পেটের জ্বালায় হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ধুঁকিতেছে, যে আসন্ন বিপদের ভীষণ-ছায়া দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শীহরিয়া উঠিতেছে, সংসার-বন্ধন জবীন-সর্ব্বস্ব

নয়ন-পুতলি হারাইয়া যে শিরে করাঘাত করিতেছে, তাহার কাছে তোমার ও হাসি বিষ নয় তো কি? কিন্তু ছিঃ তুমি আপন গরবেই মত্ত, তুমি এ সকল বুঝ না, কালকাল পাত্রাপাত্র তুমি বিবেচনা কর না,—তাই তুমি রাহুর আহার, তাই তোমার হৃদয়ে কলঙ্কের নিশানা।

অই যে ভাগীরথীতীরে শ্মশান-ঘাটের উপর কোন্ এক হতভাগিনীর চিতা ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে,—সে শ্মশানের মূর্ত্তি কি ভয়ঙ্কর, কি রোমহর্ষণ, কি ভীষণ ঔদাস্যময়! চারিদিকে যেন কিসের অস্পষ্ট ছায়া স্তূপে স্তূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন কে আসিয়া দেহের ভিতর হইতে প্রাণ ছিঁড়িয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে; কিসের ভ্রূকুটী,—কিসের হাসা,—কিসের করাল নৃত্য! এই সংসার—এই পৃথিবী—এই জগৎব্রহ্মাণ্ড সেই এতটুকু জায়গার মধ্যে যেন কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে; ভয়ানক নিস্তব্ধ, ভীষণ গম্ভীর, চারিদিকে গাছ পালা যেন কি এক বিশ্বস্তম্ভন ত্রাসে আড়ষ্ট হইয়া নিঃস্পন্দ শরীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; ক্বচিৎ চিতার পট্ পট্ শব্দ, ক্বচিৎ শিবাকুলের অশিব চীৎকার, ক্বচিৎ ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসে চলচ্চলৎ ধ্বনি,—কি সে? শব্দগুলি সব যেন একসুরে বাঁধা, একত্র মিলিয়া যেন কোথায় ডাকিতেছে; কি ভীষণ স্থান!—এই ভয়ানক বিশ্বত্রাস শ্মশানভূমে সেই জ্বলন্ত চিতার কিছু দূরে এক পার্শ্বে বসিয়া অই যে হতভাগা, যে চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য, কাঁদিয়া আকুল হইতেছে, এ সময়ে, হে সুধাংশো, তাহার সম্মুখে তোমার ঐ নারিকেল-পত্রান্তরাল মধ্যে লুকাচুরি, ঐ দিগন্তবিস্তারি নীল মেঘের উপর তর তর করিয়া ছুটাছুটি, ঐ ভাগীরথী-বক্ষে মন্দোত্থিত ঊর্ম্মিরাশির পটলে পটলে বিস্তারে বিস্তারে ঝিকিমিকি—এ সকল করিও না। তোমার ঐ রূপের বড়াই, হাসির ঠাট, রঙ্গের তুফান তুলিয়া রাখিয়া, পার যদি, মেঘের উপর হইতে তোমার সকল কিরণ, সকল সুধা একত্র করিয়া গম্ভীর ভাবে ঐ ব্যথিতের দগ্ধপ্রাণে ঢালিয়া দিয়া তাহা শীতল করিতে চেষ্টা কর। কিন্তু ছি! তুমি কলঙ্কী, তোমার হৃদয় নাই, পরের সুখ দুঃখ বুঝ না; এ কথায় হাসিয়া উঠিলে? চাঁদ হাসিয়া উঠিল। সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া নীল আকাশের গায় চাঁদ হাসিয়া লুটাপটি খাইতে লাগিল। এ সংসারে

চাঁদের ন্যায় হৃদয়হীন লোকের সংখ্যাই অধিক। সবাই আপনার সুখে উন্মত্ত, ব্যথিতের প্রতি কেহ মুখ তুলিয়া চাহে না। কিন্তু ঈশ্বর চাঁদের জন্য তাহার হৃদয়ের সার ভাগ তুলিয়া কলঙ্ক লেপিয়া দিয়াছেন; পোড়া স্বার্থপর মানুষের জন্য সেরূপ কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন?

ধীরে ধীরে ধীরে চিতার জ্বলন-কার্য্য শেষ হইয়া আসিল। অগ্নি নিভিয়া আসিতে লাগিল। হতভাগ্য মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মাতার শেষ চিহ্ন কোথায় ভস্মে মিশাইয়া গেল। সে চিতার ভস্ম, অঙ্গার ও অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড ভিন্ন কিছুই লক্ষিত হইল না। তবুও একদৃষ্টে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল। মুখে কথা নাই, চক্ষে নিমেষ নাই, শরীরে স্পন্দ নাই। যে চক্ষু এতক্ষণ জলে ভাসিতেছিল তাহা জলশূন্য। দৃষ্টি উদাস, শুষ্ক, শূন্যময়। জানুদ্বয়ের উপর মাথা রাখিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া আছে; একজন ডাকিল—"হেম!"

বলা বাহুল্য, সেই হতভাগ্য, হেমচন্দ্র। মাতার সৎকার করিতে এই ঘাটে আসিয়াছিলেন। যে ডাকিল, সে রামকৃষ্ণ।

হেম কথা কহিল না। কথা কহিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। শূন্যদৃষ্টে রামকৃষ্ণের প্রতি চাহিল। রামকৃষ্ণ বলিল—"উঠ, জল আনিয়া চিতায় ঢালিয়া দাও।"

নির্ব্বাকে হেম উঠিল। এক কলস জল আনিয়া চিতায় ঢালিয়া দিল। ভস্ম ধূম উড়াইয়া চিতা ভীষণভাবে উচ্চ রবে শোঁ-শোঁ-শব্দ করিয়া উঠিল; জাহ্নবীহৃদয়ে প্রতিহত হইয়া সে শব্দ সেই নিস্তব্ধ শ্মশানভূমে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। হেম শীহরিয়া উঠিল; তাহার হস্তের কলস কাঁপিতে লাগিল। তখন, তাহার হাত হইতে কলসী লইয়া আর আর সকলে জল ঢালিতে লাগিল; সে শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিভিয়া আসিল। জলে চিতা ধুইয়া গেল। হেম মাতার শেষ অস্থি গঙ্গায় সমর্পণ করিলেন। তাঁহার সেই মাতার আর কোন চিহ্নই এ পৃথিবীর অঙ্গে থাকিল না। হেম গঙ্গাজলের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, সে অস্থিটুকু আর দেখিতে পাইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভাগীরথী তাহা উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গরাশির স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর হেম বাষ্পবিকৃত রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল—"মা!"

রামকৃষ্ণ হেমচন্দ্রের হাত ধরিয়া গঙ্গায় নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া উপরে হেমকে কাচা পরিতে দিল। হেম তাহা পরিল। এতক্ষণে তাহার যেন সংজ্ঞা হইল; আপনার বেশের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণে যেন বুঝিল যথার্থই সে মাতৃহীন হইয়াছে; তাহার সেই আনন্দময়ী করুণার আধার জননীকে আর এ জীবনে দেখিতে পাইবে না, সেই স্নেহপরিপ্লুত আদর-মাখা ডাক আর শুনিতে পাইবে না, জন্মের মত তাহার 'মা বলা' ফুরাইয়া গেল; মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের ভিতর কত কথাই উদয় হইল; মাথা ঘুরিতে লাগিল, হেম বসিয়া পড়িয়া বালকের ন্যায় 'মা মা' শব্দে রোদন করিতে লাগিল।

আর আর সকলে স্নান করিয়া উপরে উঠিল। হেম তখন একটু শান্ত হইয়া রামকৃষ্ণকে বলিল—"যাও, তুমি ইহাদিগকে লইয়া দোকানে যাও, আহা, আমার জন্য সকলের কতই কষ্ট হইয়াছে; যিনি যাহা খাইতে চান, সকলকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াওগে, আর আপনিও একটু কিছু খাওগে।"

রামকৃষ্ণ বলিল—"আমরা যাইব, তুমি যাইবে না?"

হে। না, তোমরা এস, আমি এখানেই আছি।

রা। একা থাকিবে?

হে। তা হউক, তোমরা এস।

রামকৃষ্ণ অতসত বুঝিল না। সব বুঝিয়া কাজ করা তাহার অভ্যাস ছিল না। তায় তাহার মৌতাতের সময় বহিয়া গিয়াছে, নেশার ঝোঁক ধরিয়াছে, আহারটাও অনেকক্ষণ হয় নাই; বলিল—"তবে একাই থাকিবে—"

রামকৃষ্ণর কথা শেষ হইতে না হইতে সঙ্গীরা বলিল—"একা!—ও মা! ভয় করিবে না?"

হেম বলিল—"না।"

রামকৃষ্ণ বলিল—"তবে আর কোথাও যাইও না, আমরা শীঘ্রই আসিতেছি।"

সকলে চলিয়া গেল। হেম একা বসিয়া রহিল। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বিভীষিকাময় আতঙ্কপূর্ণ শ্মশানভূমে একা। সে শ্মশান ঘাটের নিকটবর্ত্তী

হইলেও সেখানে লোক জন বড় যাইত না, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ, মাঝে মাঝে বট অশ্বথাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ—কি গম্ভীর—লোকে দিবা দ্বিপ্রহরেও সে প্রদেশে যাইতে ভয় পাইত, সেই স্থানে রাত্রিকালে হেম একা। আকাশে তখনও চন্দ্র হাসিতেছে;—চন্দ্রালোক আকাশ হইতে বৃক্ষশিরে, লতাবিতানে, সৌধচূড়ে, সৈকতভূমে, গঙ্গাতরঙ্গে, আর সেই ভীমকান্ত শ্মশানের কালবক্ষে সর্ব্বত্রই নাচিয়া বেড়াইতেছে। শ্মশানের ভীষণ ছায়া চন্দ্রকরস্পর্শে আরও ভীষণতর দেখাইতেছে। সম্মুখে ভাগীরথী অনন্তনীরদ-খণ্ডবৎ বিশালবক্ষ বিস্তার করিয়া গম্ভীরভাবে বহিয়া যাইতেছে; সেই ভাগীরথী-বক্ষে সচন্দ্র জলদ আকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়া তরঙ্গমালার তালে তালে নৃত্য করিতেছে। মাঝে মাঝে বিরলবিন্যস্ত ঘনপত্রবিশোভি বিশাল বিটপী চাঁদের আলো মাথায় ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি হাস্যময়ী। সে শ্মশানভূমে প্রকৃতির এই হাসি আরও ভীষণ, আরও রোমহর্ষণ। ভয়ের স্থানে অন্ধকারই ভাল, নহিলে সেখানকার প্রত্যেক জিনিষটা যে আলো মাখিয়া চক্ষের উপর কি এক ভাবে চাহিয়া থাকিবে, সে ভয়ানকে আরও ভয়ানক। ভয় পাইলে মানুষ আলোক দেখিতে পারে না, তাড়াতাড়ি আগে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করে। সেই জ্যোৎস্না-বর্দ্ধিত-ভীতি প্রতিপদ-ভয়-সঞ্চারী শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়া হেমচন্দ্র একা!

মুখে কথা নাই—কোথাও দৃষ্টি নাই। নীরবে অবনতমুখে একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন, আর নয়নের অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল ভাসিয়া যাইতেছে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,—মাতার এক একটী কথা মনে পড়িতেছিল, আর বালকের ন্যায় উদ্ভ্রান্তহৃদয়ে রোদন করিতেছিলেন। সেই স্নেহ-পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, সেই স্নেহ-পরিপূর্ণ চক্ষু, সেই স্নেহ-পরিপূর্ণ কার্য্য—হায় হায়, সকলই স্বপ্ন হইয়া গেল! মরি মরি, সে হৃদয়ে কত সাধই ছিল—হেম মানুষ হইয়া উঠিতেছে, হেমের চাকুরি হইবে, হেমের বিবাহ হইবে, বধূ লইয়া কত আহ্লাদ করিবেন, তার পর হেমের ছেলে লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহাকে খেলা দিবেন—সে কত সাধ—তাহার কিছুই পূর্ণ হইল না! চিরকাল দুঃখ পাইলেন, পরের সংসারে মুখ গুঁজিয়া দিন কাটাইলেন,

একখানি কাপড়ের জন্য কতই কষ্ট—পর—একবারের বেশি দুইবার বলিতে সাহস হইত না, পরিধানের বস্ত্র ছিঁড়িলে ভয়ে ভাবনায় সারা হইতেন; একটী পয়সার জন্য কত লাঞ্ছনা—বাড়িতে খাবারওয়ালা আসিলে, অন্যান্য ছেলেরা কত খাবার কিনিয়া খাইত, তাহার দেখাদেখি হেম কি মনোরমা কিছু চাহিলে তাঁহার দুটী চক্ষু অমনি জলে ভাসিয়া যাইত; হায় হায়, সে সব কথা কি ভুলিবার? হেম চাকুরি করিবে, হয়তঃ কত টাকা উপার্জ্জন করিবে, কত কাপড় পরিবে; কিন্তু সে মা আর একদিনের জন্যও তাহা দেখিতে আসিবেন না, একদিনের জন্যও আর হেম মাতার সে মর্ম্মান্তিক দুঃখ ঘুচাইতে পারিবে না! একদিন—হেমচন্দ্রের মনে পড়িল—একদিন মনোরমা একটু দুধ খাইবার জন্য বড়ই বায়না লইল, মাতা কত বুঝাইলেন, কত সান্ত্বনা করিলেন, মনোরমা কিছুতেই শুনিল না, কাঁদিতে লাগিল, মাও কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "কেন মা কাঁদাস্! যেমন পেটে জন্মেছিলে ভাল খাবে ভাল পরিবে কোথা হইতে? আমি দুধ কোথায় পাইব, মা?" বালিকা তাহা বুঝিল না; নিকটে মহামায়ার মাতা কড়ায় করিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিলেন, তাহা মাতাকে দেখাইয়া দিল। অমনি মহামায়ার মাতা মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"মা মা মা! এমন হাবরে আদেখ্‌লে মেয়ে বাবার জন্মেও দেখিনি, তা হবে না, ও সব গর্ভের দোষ!" মাতার দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, একটীও কথা না কহিয়া বালিকাকে কোলে করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। আর এক দিন—তখন হেমের বড় ব্যাম, এক মাস হেম বিকারে অঘোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই একমাস মাতার আহার নিদ্রা ছিল না। সকল ছাড়িয়া কেবল তাহার মুখের কাছে বসিয়াছিলেন। এক মাস ধরিয়া পাকশালায় যাইতে পারেন নাই বলিয়া মহামায়া মাঝেমাঝে কটু বলিত, মাতা একটীও কথা বলিতেন না, পাছে হেমের অমঙ্গল হয় এজন্য একদিন এক ফোঁটা চক্ষের জলও ফেলিতেন না, কিসে হেম সারিয়া উঠিবে সেই চিন্তায়ই আকুল,—সেই হেম সারিয়া উঠিল, মাতা পুত্রকে কোলে করিয়া দেবতার নিকট তাহার কল্যাণে আপনার বুক চিরিয়া রক্ত দিলেন—হেমের সব প্রত্যক্ষ মনে পড়িতে লাগিল—হায় হায়, সেই মা আজ কোথায়! তাঁহার পীড়ার সময়ে হেম তাঁহার কিছু করিতে পারিল না

কেন? হেম আর ভাবিতে পারিল না; মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষু অন্ধকারময় হইয়া আসিল; বালকের ন্যায় উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল—"মা!"

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—"আর কাঁদিও না, চুপ কর।"

হেম স্তম্ভিত হইলেন, কে এ কথা বলিল তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু যে এ কথা বলিয়াছিল, সে বোধ হয় নিজেও অনেকক্ষণ কাঁদিয়াছিল, স্বর বাষ্পপীড়িত। হেমচন্দ্র মুখ ফিরিয়া দেখিলেন। এ কি দেবী? না, শ্মশানের কোন ভৌতিক মায়া? চক্ষু পরিষ্কার করিয়া হেম দেখিলেন—মানবী। সেই চন্দ্রকরমণ্ডিত প্রকৃতির প্রাসাদ মধ্যে বালিকা মূর্ত্তি! বিস্মিত হইয়া হেমচন্দ্র তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিস্মিত হইয়া হেমচন্দ্র তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বলিল—কাঁদিও না, উঠ, ছিঃ এখানে কি একা থাকিতে আছে?"

এতক্ষণে হেম কথা কহিল। বলিল—"কোথায় যাব?"

বা। কেন, আমাদের বাড়ী।

হে। তুমি কে?

বা। আমি বসুমতী; এই কাছেই আমাদের বাড়ী। এস, আমার সঙ্গে এস।

হে। তুমি বাড়ী যাও, আমি যাইব না।

বা। যাইবে না!—যাইবে না তো কি করিবে?

হে। এখানে থাকিব।

বা। একা!

হে। একাই থাকিব।

বা। আর কাঁদিবে?

বালিকার কথা শুনিয়া হেম আরও বিস্মিত হইলেন। আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। বালিকার নির্ম্মল পবিত্র সরল মূর্ত্তি ভিন্ন

কিছুই লক্ষিত হইল না। কিন্তু বালিকার এ কথায় হেম কি উত্তর দিবে? উত্তর দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। ধীরে ধীরে ধীরে চক্ষের অগ্রভাগে দুই বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িল। বালিকা তাহা দেখিল; বলিল,—"ছিঃ আবার কাঁদিতেছ! তুমি একা থাকিলেই কাঁদিবে। তুমি যদি আমাদের বাড়ী না যাও, আমিও এখান হইতে যাইব না; তোমাকে একা থাকিতে দিব না।"

হেম আবার সেই বালিকার দিকে চাহিল। প্রতিবারেই সেই মুখমণ্ডলে নূতনতর সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে লাগিল। সত্যই কি কোন দেববালা? এ মুখ, এ কথা, ক্ষুদ্র হৃদয়ে এতখানি ভাব, এ কি পৃথিবীতে সম্ভবে? আ মরি মরি, কোন্ বিধাতা এ প্রতিমা গড়িয়াছিল রে? হেম বলিল—"তুমি বাড়ী যাও, আমি একা নহি; আমার সঙ্গীরা আছেন।"

বালিকা বলিল,"আমাকে ভুলাইতেছ! সঙ্গী কেহ থাকিলে এমন জায়গায় এ অবস্থায় কি একা ফেলিয়া যায়?"

হে। তাহারা যাইতে চাহে নাই, আমিই তাহাদিগকে দোকানে পাঠাইয়া দিয়াছি। আজ তাহাদের আহার হয় নাই।

বা। তাহাদের আজ হয় নাই; কিন্তু তোমার কয় দিন হয় নাই?"

হেম নীরবে রহিলেন।

বা। তুমি কিছু খাইবে না?

হেম নীরব।

বা। না খাইলে কত দিন এ শরীর বহিবে?

হেম তখনও কথা কহিতে পারিলেন না; শূন্য দৃষ্টে একবার বালিকার দিকে চাহিলেন।

বা। কিছু না খাও, তৃষ্ণা পায় নাই কি, মুখে একবিন্দু জলও দিবে না?

প্রবল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র যে বাঁধে এতক্ষণ বদ্ধ ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা যে দারুণ উচ্ছ্বাস বহিল, তাহার বেগ সহিতে পারিল না, বাঁধ ভাঙ্গিয়া, বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া বারি রাশি উছলিয়া পড়িল। হেমের দুই চক্ষে দরদরিত ধারা বহিল।

বালিকা বলিল—"ছিঃ আবার কাঁদ কেন?"

তখনও হেমের চক্ষে অবিরল ধারা বহিতেছিল। হেম সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া বলিল—"কি বলিব, কেন কাঁদি তাহা তোমাকে কি জানাইব? এ জন্মে এ কান্না কি আর ফুরাইবে? বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—"

বালিকার বুকের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল, চক্ষুর্দ্বয় জলে ভাসিয়া গেল, প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল, হেমের কথা শেষ হইতে না হইতে কাতর কণ্ঠে বলিল—"চুপ কর চুপ কর; যাহা বলিতে এত কষ্ট তাহা তোমার বলিয়া কাজ নাই।"

হেম বলিল—"না, বলিব বৈ কি; এ হতভাগ্যের দুঃখে কেহ কখন দুঃখ করে নাই; তুমি বালিকা—না, দেবকন্যা—কি যেই হও, তুমি আমার ব্যথায় ব্যথিত, তোমাকে বলিব বৈ কি—" বলিতে বলিতে আবার হেম চন্দ্রের স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, আবার চক্ষের জলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল। হেমচন্দ্র বলিতে লাগিলেন—"মা আমার জলের জন্য কতই ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন! কত জল চাহিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে জলের জন্য কত হা করিয়াছিলেন, হায়, আমি অভাগা তখন মুখে একবিন্দু জল দিতে পারিলাম না। সে দিন একাদশী বলিয়া সকলে আমার হাত হইতে জলের ঘটি কাড়িয়া লইল। আমি কেন তাহাদের কথা শুনিলাম? কেন জল দিলাম না? মা বুঝি আমার জল জল করিয়াই মারা গেলেন; বুঝি, তখন মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারিলে এ যাত্রা তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতাম। হায়, শেষ কাহারও কথা না শুনিয়া জল দিতে গেলাম, মা আমার মনের দুঃখে কৃতঘ্ন সন্তানের জল গ্রহণ করিলেন না। দুই কস বহিয়া সে জল গড়াইয়া পড়িল। আমি তাহা দেখিলাম। সেই আমি এখনও বসিয়া রহিয়াছি; এ মুখে আবার জল দিব কোন্ প্রাণে?" আর হেম বলিতে পারিল না, "মাগো" বলিয়া বালকের ন্যায় উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল।

তখন কে কাহাকে সান্ত্বনা করিবে? হেমের কথা শুনিয়া, তাহার কান্না দেখিয়া বালিকাও অজস্রধারে কাঁদিতে লাগিল। পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখ-কথায় গলিয়া গিয়াছে, সান্ত্বনার ভাষা তখন মনে আসে না। যে পরের দুঃখ আপনার হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে না, সেই তদ্রূপ অন্য পাঁচটা দুঃখের তুলনা পাড়িয়া দুঃখের ভার কমাইতে চেষ্টা করে। যে

ব্যথিত, সে তাহা পারে না। তখন, পীড়িতও যে, সেও সে। তখন, বুঝি, দুইজনের কেহই কিছু বলে না, কেবল কাঁদে। হেমচন্দ্র কি বালিকা দুইজনের কেহই কিছু বলিতে পারিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে কে বলিল—"কে বসু—বসু দিদি?"

বালিকা চাহিয়া দেখিল; একটু শান্ত হইয়া বলিল—"হাঁ, দোকানী দাদা?"

দোকানী বিস্মিত হইয়া বলিল "রাত্রিকাল—শ্মশানভূমি—এ সময়ে তুমি এখানে!"

দোকানীর কথা শুনিয়াই হেমচন্দ্র চুপ করিয়াছিলেন। আগ্রহের সহিত দুইজনের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তাহাদিগের প্রথম সম্ভাষণেই বুঝিলেন, এ বালিকাকে তিনি যে দেববালা ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে; বালিকা মানবী। কিন্তু যেই হউক, এ বয়সে এত গুণ তিনি আর কখন মনুষ্য-শরীরে দেখেন নাই, এ বালিকার স্থান এ পৃথিবী নয়, দেবলোকই ইহার যোগ্যস্থল। এই প্রথম চিন্তার পর হেমের মনে আর এক চিন্তার উদয় হইল। হয়ত এই দোকানী বালিকার কেহ হইবে, হয়ত এ বালিকাকে কত বকিবে? মুহূর্ত্তের জন্য হেম আপনার চিন্তা ভুলিয়া গিয়া বালিকার জন্য চিন্তা করিল। মনে একটু আশঙ্কার সঞ্চার হইল। আবার ভাবিল—তাও কি হয়? নিসর্গদুর্লভ-স্বভাবা এই বালিকা কি তিরস্কারের পাত্রী? হেম একমনে তাহাদিগের উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

বালিকা বলিল—"দোকানী দাদা, তোমার দোকানে কাহারাও গিয়াছেন কি?"

দোকানী বিস্মিত হইল। বলিল—"হাঁ, একদল লোক আজ শবদাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই আমার দোকানে জলটল খাইতেছে। তা, অমন তো প্রায়ই আসে, তোমার সে কথা কেন?"

বালিকা বলিল—"সকলেই গিয়াছেন, কিন্তু ইনি যান নাই, এখানে একা বসিয়া কেবল কাঁদিতেছেন, তাই আমি ইহাকে আমাদের বাড়ী লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

বালিকা হেমচন্দ্রকে দেখাইল। দোকানী তাহা দেখিল। সে বালিকার

বর্ত্তীয জানিত, সমস্ত বুঝিল। দোকানী বৃদ্ধ, বৃদ্ধের হৃদয় গলিয়া গেল। আদরে বালিকাকে একবার কোলে লইতে ইচ্ছা হইল। বলিল ' তা, ক্রমে রাত্রি হইতেছে, এখনও এখানে কেন, দিদি ?''

বালিকা বলিল—" আমি তো তাহাই বলিতেছি, কিন্তু উনি শুনেন না, যাইতে চাহেন না, তা কি করিব ? দাদা, তুমি একবার উঁহাকে বল না ?''

দোকানী বলিল—"যাইতে চাহেন না, কি বলেন ?''

বালিকা। উনি বলেন, এখানে একা থাকিবেন। তা, হাঁ দাদা, এখানে একা থাকিতে কি আছে, দাদা ?

দোকানীর সহিত বালিকা যেরূপে কথা কহিতেছিল তাহা দেখিয়া হেম আরও আশ্চর্য্য হইতে লাগিল। আবার সেই সন্দেহ—না না, একি মানুষ! নিশ্চয় কোন দেবতার ছলনা। হেমের চক্ষে জল আসিতে-ছিল, এমন সময় দোকানী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মহাশয়, আর কেন বিলম্ব করিতেছেন, এ বালিকা আপনাকে ছাড়িবে না, আপনি ইহার সঙ্গে গমন করুন।"

হেম চক্ষের পল্লব হইতে পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দু মার্জ্জনা করিয়া বলিল—"আমি তো বলিয়াছি, আমি একা নহি, আমার সঙ্গে অনেকগুলি ভদ্রলোক আছেন, তাঁহারা একটু পরেই আসিয়া আমাকে খুঁজিবেন।"

দোকানী বলিল—"আমি তাঁহাদিগকে গিয়া সমস্ত বলিব, তাঁহারা আপনার জন্য চিন্তিত হইবেন না।"

হেম। কিন্তু এই বিদেশে রাত্রিকালে তাঁহাদিগকে নিরাশ্রয়ে রাখিয়া আমি কেমন করিয়া অন্যত্র গিয়া স্থির থাকিব ?

দোকানী বড়ই কোমলচিত্ত; বলিল—"সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আমার দোকানে তাঁহাদিগকে পরম যত্নে রাখিব। আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, ইহার সঙ্গে গমন করুন। দেখিতেছেন না, আমার দিদির চক্ষে জল।" বুড়া বালিকার সেই অশ্রুসিক্ত মুখ খানি হাত দিয়া তুলিয়া ধরিল; জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে তাহা বড় সুন্দর দেখাইল। সাদরে বুড়া বালিকার চক্ষের জল মুছাইয়া দিল।

স্থির হইয়া হেমচন্দ্র এ সমস্ত দেখিলেন। আপনার সকল দুঃখের কথা

ভুলিয়া গেলেন। আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—"তবে; চল যাই।"

তখন, সেই কৌমুদী-প্রদীপ্ত বিরল-লোক-সঞ্চার অনতিপ্রশস্ত পথভাগ দিয়া বালিকা আগে আগে যাইতে লাগিল, ধীরে ধীরে হেমচন্দ্র নীরবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। চাঁদের আলোকে যতদূর দেখা যায়, বৃদ্ধ দোকানী সেই খানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিল।

দায়িত্ব ও কর্ম্মফল।

It is not necessary to moral freedom that on the part of the person to whom it belongs, there should be an indeterminate possibility of becoming and doing anything and everything. A man's possibilities of doing and becoming at any moment of his life are as thoroughly conditioned as those of an animal or a plant.

T. H. Green.

আমরা অদৃষ্টবাদ-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষের দ্বারা যাহা কিছু কৃত হয় তাহা সমস্তই অবশ্যম্ভাবী। জড় জগতের ন্যায় অন্তর্জগতেও ঘটনা সকল নিয়মের দাস। মানবের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয়বিধ কার্য্যই, তাহার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের ফল। তাহার চরিত্র আবার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল। মানবজীবনের প্রতি এই ভাবে দৃষ্টি করিয়াও যে কেমন করিয়া তাহার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা যায়, আমাদের শেষ প্রস্তাবে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এই প্রস্তাবে আমরা দায়িত্ব এবং কর্ম্মফল সম্বন্ধে একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ লোকে মনে করে যে, যদি সমস্তই অদৃষ্টের নিয়মে সংঘটিত হইতেছে, তবে আমাকে আমার কাজের জন্য দায়ী করা অন্যায়, এবং আমি যে কর্ম্মফল ভোগ করি তাহাও অন্যায়। স্বাধীনতাবাদী (Libertarians) দার্শনিকগণও এই সূত্র ধরিয়া, যথেষ্টরূপ বাগাড়ম্বর করিতে ছাড়েন না। জগতের সাধারণ অশিক্ষিত (unsophisticated majority) লোকেরা যে তাঁহাদের পক্ষে—এই কথাটী তাঁহারা নিয়মবাদী দার্শনিকদিগের কাছে পুনঃ

পুনঃ বলিতে বড়ই ভাল বাসেন। জানি না,ইঁহারা—the majority is always in the wrong, a man is not worth a rabble—ইত্যাদি মত শুনিলে কি বলিবেন। যাহা হউক, বড় বড় পণ্ডিতের মুখে ওসব কথা শোভা পায়, ম্যাথিউ আর্ণলড্ (Mathew Arnold) অথবা (Landor) ল্যাণ্ডরের দোহাই দিয়া সাধারণের বিশ্বাস অবজ্ঞা করিয়া নিস্তার পাইবার আমাদের সম্ভাবনা নাই। আর বস্তুতঃ আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, আমাদের বিশ্বাস এই যে মানব সাধারণের সাধারণ-জ্ঞান সম্পূর্ণ না হইলেও একবারে কখন ভুল হইতে পারে না।

এই জন্য আমরা প্রথমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে, সাধারণে দায়িত্ব বলিলে কি বোঝে। তারপর দেখিব, স্বাধীনতাবাদীদিগের Libertyর সহিত বাস্তবিক তাহার কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে কি না।

কিন্তু আমরা যেরূপ সাধারণ লোক খুঁজিতেছি সেরূপ সাধারণও খুঁজিয়া পাওয়া বড় সহজ নয়। এই উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন সকলেই মত লইয়া চারিদিকে কলহে প্রবৃত্ত,—যে সময়ে সকলেই জানে বেশি, করে কম—যে কালের শিক্ষার অর্থ কোন একটা বিশেষ মতাক্রান্ত হওয়া, তখন আমাদের সাধারণ লোক পাওয়া যে বড় কঠিন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এখন সকলেই অসাধারণ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। অতএব, যদি কাহার মনে এখনও কোন তর্ক উঠে নাই (unreflecting), 'অথবা কোন বিশেষ মত রাশিদ্বারা দূষিত হয় নাই এমন লোক খুঁজিতে হয়, তবে কিছু কালের জন্য দার্শনিক জগৎ ছাড়িতে হইবে।

এইরূপ সাধারণ অশিক্ষিতকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সে দায়িত্ব বলিলে কি বোঝে ; সে নিশ্চয়ই বলিবে, সে দায়িত্ব অর্থে শাস্তি বোঝে। বোঝে এই যে, সে তাহার কাজের জন্য দায়ী, কেন না, তাহার কাজের জন্য সে কাহারও কাছে জবাব দিহি করিতে বাধ্য (Accountable)। কার কাছে জবাবদিতে হইবে সে বিভিন্ন প্রশ্ন। সে সম্বন্ধে হয়ত তাহার অনেক রকম মত থাকিতে পারে, আমরা সে মত গ্রহণ করিতে নাও পারি।--কিন্তু সে যে তাহার কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য, ধর্ম্মের আদালতে আবশ্যক হইলে তাহার জবাব দিতে হইবে, এ বিশ্বাস ছাড়াইতে পারে না।—আমরাই

কি পারি?—কিন্তু, সে কি সকল কার্য্যের জন্যই আপনাকে দায়ী মনে করে?—না। যে কাজ না কি সে করিয়াছে, সেই কাজের জন্যই,—তাহার নিজের কৃত কাজের জন্যই—সে দায়ী; যে কাজ না কি তাহাতে আরোপিত হইতে পারে তাহারই জন্য সে দায়ী। এই আরোপণ (imputabilty) জবাবদিহির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যে কাজ তাহাতে অর্শায় না—তাহাতে আরোপিত হয় না—সেজন্য তাহাকে জবাব দিতে বাধ্য করা যায় না, সেজন্য সে দায়ী নহে।

বুঝা গেল, দায়িত্বের পক্ষে আরোপণ নিতান্ত প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, এই আরোপণের পক্ষে আবার কি কি আবশ্যক।

এ সম্বন্ধে প্রথম আবশ্যক এই যে, যে কাজের জন্য আমার উপর দোষারোপ হইতেছে, সেই কাজ যে করিয়াছিল, সে আর আমি এক হওয়া দরকার। যে আমি সে কাজ করিয়াছিলাম, সে আমি যদি আর এখনকার আমি না হই, তাহা হইলে এখনকার আমি পূর্ব্বের আমির জন্য শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য নই। সুতরাং যদি আমাকে পূর্ব্বকৃত কার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমার ব্যক্তিত্ব অপরিবর্ত্তিত থাকা দরকার।

আরও একটু কিছু দরকার। কাজটি আমার হওয়া দরকার। আমার ব্যক্তিত্ব অপরিবর্ত্তিত থাকিবে এবং কাজের কর্ত্তা আমি হইব। এই খানে একটু গোলযোগ উপস্থিত। আমরা পূর্ব্বে অদৃষ্টবাদ-শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছি যে প্রত্যেক কার্য্যের কারণ, কাল এবং স্থানের (Time & Space) অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। পাঠকের কিন্তু স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা ইহাও বলিয়াছি, যে এই কাল এবং স্থানের অন্তর্গত প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ আত্মার কথা ভুলিলে এ প্রাকৃতিক জগতের কোন অর্থ থাকে না। পুরুষ প্রকৃতির জীবন। সেই পুরুষই আমি। অস্মিত্ব অর্থে আমিত্ব। এ অহঙ্কার প্রকৃতির ক্রিয়া নয়। এই আমি, সেই আমি, ঐ আমি, তুমি, আমি, তিনি এ সব প্রকৃতির বিকার—পরিবর্ত্তনশীল—জলবুদ্বুদ-বৎ ক্ষণস্থায়ী;—কিন্তু আমি 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ' এ কথায় পুরুষ-হীন প্রকৃতি বুঝিলে তাহা ভুল মনে করি। অবিনশ্বর, বিকার-

শূন্য পুরুষ। এ সাধারণ অহঙ্কারের বিনাশ নাই। সব গেলেও এ টুকু থাকিবে। এই এক আমিই সকলের মধ্যে কর্ত্তারূপে ফুটিয়া উঠিতেছে *। "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে"-অর্থে যদি এই মহা আমি বুঝা হয় তবে এ কথা আমি মানি না। কর্ত্তা বলিলে কি বুঝা যায়? কর্ত্তা বলিলে যে অনিয়মিত কার্য্য করিবার ক্ষমতা বুঝায় না, তাহা আমি পূর্ব্বের প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। কর্ত্তৃত্ব অর্থে কার্য্যের সহিত সজ্ঞান সম্বন্ধ। এইভাবে কার্য্যের প্রাকৃতিক কারণ গুলিরও কর্ত্তা আমি। আমার স্বভাব আমার, আমার কার্য্যও আমার। অথচ আমার স্বভাবও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বের প্রস্তাবে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

এ দুইটি ছাড়া আরও একটি বিষয় আবশ্যক। দায়ী ব্যক্তির পক্ষে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সে কি কাজ করিতেছে তাহার গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা তাহার যে পর্য্যন্ত, তাহার দায়িত্বও সেই পর্য্যন্ত। এইজন্য বালক অথবা উন্মাদকে আমরা দায়ী মনে করি না। পশুজাতিকে এইজন্য দায়িত্বের বহির্ভূত মনে করা হইয়া থাকে।

বোধ হয় আমাদের সাধারণ লোকের মনে এই তিনটি ভাব ব্যতীত আর কিছু নাই। সে যে চিন্তা করিয়া এরূপ একটা স্থির করিয়াছে, তাহা নহে। আমরা তাহাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিতে পাই যে, তার মনের ভাব এইরূপ। এর বেশি হয় ত কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে অবাক্ হইয়া থাকিবে। কার্য্য কাহাকে বলে? আমার কার্য্য বলিতে হইলে কি কি দার্শনিক তত্ত্বের আবশ্যক করে? কতদূর পর্য্যন্ত ধর্ম্মজ্ঞান থাকিলে দায়িত্ব-বোধ সম্ভব হয়?—এ সকল কথার পরিষ্কার উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। আর যে সকল স্থলে কেহ কোন উত্তর দিয়া থাকে, সেখানে সাধারণ লোকের মধ্যে নানাপ্রকার মতের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ হয় ত

* এক এবাহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
নিত্যঃ সর্ব্বগতোহ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥

শ্রুতিঃ।

উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও দোষীকে সম্পূর্ণ দণ্ডবিধান করিবে। কেহ বা কেবল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই শাস্তি কিম্বা পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবে। তবে, মোটের উপর বুঝিতে পারি যে যদিও সাধারণ লোকের কাছে, আট ঘাট বাঁধা, সুপরিষ্কৃত মত শ্রেণী পাওয়া সম্ভব নয়, তথাপি কতকগুলি বিষয়ে তাহার যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাহা সে কোন মতেই ছাড়িতে পারে না। তাহার বিশ্বাস যে, কোন ব্যক্তির দায়িত্বে প্রথমতঃ তাহার ব্যক্তিত্ব (Personality) অপরিবর্ত্তিত থাকা আবশ্যক, দ্বিতীয়ত কার্য্য তাহার হওয়া আবশ্যক, এবং তৃতীয়তঃ তাহার ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এ বিশ্বাস কেন হয়, ইহার মূল কি, সে বিষয়ে কোন পরিষ্কার উত্তর না দিতে পারে; কিন্তু আমাদের দর্শন কি ইহার মধ্যে কোন ভুল দেখাইতে পারেন? আমার বিশ্বাস যে, সাধারণ লোকের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিপক্ষে দার্শনিক জগতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে সমস্তই বৃথা। অবশ্যই তাহাতে নানা যুক্তির অবতারণা আছে; কিন্তু সে সকল ছেলে-ভুলান কথা। Mill প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে প্রকারে ভাবসংক্ষেপ নিয়মের (Laws of association) দ্বারা দায়িত্ব জ্ঞান বিশ্লেষণ করেন আমরা তাহা গ্রাহ্য করিতে পারি না।

Bain এই ভাবে Mill-এর মত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন;—

"Responsibility means either that we should deserve for those acts. The first alternative may be thrown out of account. The question then is whether Free-will is then involved in the justness of punishment. In this discussion Mr. Mill assumes no particular theory of morals: it is enough that difference between right and wrong be admitted and a natural preference for the right. Whoever does wrong becomes a natural object of active dislike and perhaps of punishment. The liability of the wrong-doer to be thus called to account has probably much to do with the feeling of being accountable. Oriental despots and persons of a superior caste show not the least feeling of accountability to their inferiors. More-over, if there were a race as mischievous as lions and tigers, we should treat them precisely as we treat wild-beasts though they acted necessarily. ......The real question however is, would the punishment be just? ......If an end is justifiable the sole and necessary means to that end must be justifiable. Now the Necessatarian theory proceeds

upon two ends, the benefit of the offender himself and the justification of others."*

নিয়ম সম্বন্ধে Mill-এর মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই এবং পুরুষ-বিহীন প্রাকৃতিক জগৎ যে কল্পনার ছবি ব্যতীত আর কিছুই নয়, আমরা কতক পরিমাণে তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এখানেও আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাকৃতিক শাস্তি ও ভয় হইতে দায়িত্ব-বোধের উৎপত্তি করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমি যে জবাব দিতে বাধ্য, আমার দোষের জন্য শাস্তি পাওয়া যে ন্যায়সঙ্গত, এ বিশ্বাস ভাবসংযোগ নিয়মে জন্মাইতে পারে না—অন্ততঃ তাহা প্রমাণ করা হয় নাই, করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ঠিক কি না তাহার প্রমাণ পুনর্ব্বার বিশ্লিষ্ট পদার্থগুলিকে সংশ্লিষ্টকরণ। এখানে তাহা অসম্ভব। শাস্তি যে হিতকর (expedient) ইহা হইতে কস্মিনকালে ন্যায়সঙ্গত † (just) ইহা প্রমাণ করা যায় না। শাস্তি কেবল শিক্ষার জন্য নয়, অন্ততঃ মানুষের যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দিবার অধিকার নাই—কষ্ট করিয়া তাহার যদি সহস্র শিক্ষা হইয়া থাকে তথাপি তাহার শাস্তি ভোগ করা উচিত। জর্ম্মাণ

---

* যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে চাহেন তাঁহারা Mill's Examination of Hamilton's Philosophy দেখুন।

† Judicial punishment can never be inflicted simply and solely as a means to forward a good other than itself, whether the good be the benefit of the criminal or of civil society; but it must at all times be inflicted on him for no other reason than because he has acted criminally. That is the maxim of the Pharisees, "it is expedient that one man should die for the people and that the whole nation perish not," but if justice perisheth, then it is no more worth that man should live upon the earth.

Even if a civil society were to dissolve itself by the vote of all its members (*e. g.* if a people inhabiting an island were to resolve to separate from one another and scatter themselves over the surface of the globe) nevertheless before they go the last mulerer in the prison must be executed. And this that every man may receive what is the due of his deeds, and the guilt of blood may not rest upon a people, which has failed to exact the penalty, for in that case the people, may be considered as participators in this public violation of justice.

KANT.

দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হিগেলেরও (Hegel) এই মত।

পাঠকের শিক্ষার অভাব ছিল না, তবু সে কর্ম্মফল গ্রহণ করিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল—এই যথার্থ শাস্তি। যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারিতেছি Mill-প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রথা অনুসরণ করিয়া যদি নিয়মের কথা বলিতে হয়, অদৃষ্টবাদের ভিত্তি যদি কেবল মনোবিজ্ঞানের উপর স্থাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে দায়িত্ববোধ বজায় রাখা দূরে থাক, দায়ী হইবার কেহই থাকে না। মাথা নাই তার মাথাব্যথা। ব্যক্তি নাই তার আবার দায়িত্ব। আমিই নাই, সুতরাং আমার কার্য্যও নাই; আমার অপরিবর্তিত ব্যক্তিত্বও কল্পনা মাত্র। ইহাঁদের মতকে উল্লেখ করিয়া পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন The Doctrine of Determinism * is a will *wills* nothing.

এ ভাবে দেখিলে অদৃষ্টবাদে বস্তুতই দায়িত্ব নষ্ট করে। তবে একবার দেখা যাউক যাঁহারা সাধারণ লোকের দোহাই দিয়া আকাশ পাতাল বিলোড়িত করেন, তাঁহাদের মতে দায়িত্ব কিরূপ দাঁড়ায়। আমি যেরূপ ইচ্ছা (desire) করি, সেরূপ কাজ করিবার পক্ষে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকিলে আমার দায়িত্ব নাই। যদি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তাহা হইলে এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত সাধারণের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কথা বলিয়াই কি ইহাঁরা ক্ষান্ত? না, ইহাঁরা আরও বলেন যে আমরা যে কেবল ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে স্বাধীনতা চাই তা নয়, ইচ্ছানুরূপ (as we desire) ইচ্ছা করিবারও স্বাধীনতা চাই। এ কথার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে কেবল বাসনা (desire) দ্বারা আমাদের ইচ্ছা নিয়মিত হয় না. আমি না থাকিলে কেবল বাসনা বিশেষ ইচ্ছা বিশেষের প্রণোদক হইয়া কোন কাজ করিতে পারিত না। বাসনাও আমার, ইচ্ছাও আমার। এ পর্য্যন্ত আমরাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। এবং যে অবধি না বলি যে আমরা একেবারে বাসনাশূন্য হইয়া ইচ্ছা করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব জ্ঞানের সঙ্গে কোনও বিবাদ লক্ষিত হয় না। কিন্তু এ সমস্তে স্বাধীনতাবাদীর মত যে কি নয় তাহাই বুঝিলাম। এখন দেখা যাউক তাহার মত কি। বিপরীত পক্ষের বিরুদ্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহা

* Erdmaine, as quoted by Bradley.

শুনিলাম, এখন তাঁহার নিজের মতটা কি দেখা যাউক। তাঁহার নিজের মত—আমি কর্ত্তা। আমি কর্ত্তা অর্থে প্রথমতঃ এই বুঝিতে হইবে, যে আমার বাসনা, ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত ছাড়া এক অতীন্দ্রিয় আমি এই সকলের পশ্চাতে নিত্য বিদ্যমান। কিন্তু এ ছাড়া আর একটু কথা স্বাধীনতাবাদী বলেন এবং সেইটুকুই তাঁর বিশেষত্ব। সে টুকু এই যে, আমাদের ইচ্ছা যে কেবল কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হয় না তা নয়, অধিকন্তু সে কিছুরই দ্বারা প্রণোদিত হয় না। আমি স্বয়ং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিতেছি, এবং সে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কোন সময় এবং কালান্তর্গত কেন তাহার কারণ নাই। আমি কেন ইচ্ছা করি এবং কেনইবা যে বিশেষ একটি ইচ্ছা করি তারও কোন কারণ নাই। স্বয়ং কর্ত্তা ইহার অর্থ এ ভাবে দেখিলে এই দাঁড়ায়। স্বাধীনতার অর্থ—নিয়মের অভাব—দৈবাৎ ঘটনা (Chance)—তোমার চরিত্রের সঙ্গে তোমার কার্য্যের কোনরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট নাই, তোমার চরিত্র জানিলে তোমার কাজের কথা কেহ বলিতে পারিবে না—তোমার কাজ দেখিয়া চরিত্র নির্দ্দেশ করাও বাতুলতা—এই মতে দায়িত্ব রক্ষা করিবে—স্বাধীনতাপক্ষপাতীদের এইরূপ বিশ্বাস। হায়, মতের অনুরোধে—একটা কথার অনুরোধে—মানুষ কত ভ্রমেই পতিত হয়! বাস্তবিক যথার্থই বলা হইয়াছে,

"You are accountable because you are wholly an unaccountable creature." . . . F. H. Bradley.

আমাদের বিশ্বাস, দায়িত্ব এবং কর্ম্মফল বজায় রাখা দূরে থাকুক পূর্ব্বোক্ত চিত্রটি উন্মাদের পক্ষেই শোভা পায়। যদি জানিয়া শুনিয়াই কাজ না করিলাম, যদি কি করিলাম, কেন করিলাম এ কথার উত্তর দিতে না পারি, যদি আমার কাজে আমার চরিত্রের বিকাশ না হয়, তবে সে কাজ আমার বলিতে পারি না, তাহার জন্য আমায় দায়ী করিতেও পার না, তাহার জন্য শাস্তি ও অনুতাপও অসঙ্গত। ন্যায়ান্যায় বিচার দায়িত্বের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যদি আমাদের জ্ঞান ও ভাবের সহিত ইচ্ছা শক্তির কোন সম্বন্ধ না থাকে তবে ন্যায়ান্যায় বিচারের সঙ্গেও নাই; সুতরাং সেরূপ ইচ্ছাশক্তি প্রণোদিত

কার্য্যের জন্য কেহ দায়ী নয়। ঠিকই বলা হইয়াছে এরূপ ইচ্ছাশক্তি wills *nothing* !

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, স্বাধীনতাধ্বজীরা যে বলেন সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁহাদের মত মিলে এ কথা যথার্থ নয়। অমুকের পক্ষে অমুক কাজ করা অসম্ভব, আমাকে এত জেনে শুনেও তোমার এ কথা বিশ্বাস হয়, ইত্যাদি সহস্র রূপ কথা যে প্রত্যহ আমরা শুনি ইহা কি এই মতের বিরোধী নয়?

এ কথা ও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে Mill অথবা Bain-এর মত আমি-শূন্য আমির কথা বলিলেই অশিক্ষিত লোকে কত ভয় পায়। আমরা দর্শনাদি পড়িয়াছি, সুতরাং বায়ুগ্রস্তকে আমরা আর শঙ্কা করি না, তথাপি আমরা এস্থলে Mill প্রভৃতির অনুসরণ করিতে পারিলাম না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমি থাকিলে নিয়মের কোন ব্যাঘাত না হইয়া বরং নিয়মের স্বরূপ বিশেষ বিকশিত হয়। কর্ম্ম যদিও অনন্তের সঙ্গে গ্রথিত, তবু সে আমার কর্ম্ম। আমিও অনন্ত। বস্তুতঃ অদৃষ্টবাদের প্রকৃত অর্থ কর্ম্মফল-বাদ না হইলে পরিস্ফুট হয় না। কর্ম্মফল ব্যতীত অদৃষ্টবাদের অন্য ভিত্তি বালির বাঁধের ন্যায়। আমরা যে মহাত্মার একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের শীর্ষদেশে স্থাপন করিয়াছি তাঁহারই কথায় এই প্রবন্ধ আমরা শেষ করিলাম।

The view then that action is a joint result of character and circumstances, if we know what we are about when we speak, does not render shame and remorse unaccountable and unjustifiable. * * * * On the contrary, rightly understood it alone justifies them. If a man's action did not represent his character, but an arbitrary freak of some unaccountable power of unmotived will, why should he be ashamed of it or reproach himself with it.

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

সংস্কার।

যতই উৎকৃষ্ট মূল্যবান্ উপকরণে অট্টালিকা নির্ম্মিত হউক না কেন, ইহার ভিত্তি যতই সরল, মজবুৎ ও দৃঢ়গ্রথিত হউক না কেন, প্রকৃতির শত শত অত্যাচারেও যতই অটলভাবে অবস্থিত থাকুক না কেন, ইহা যে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে, একই ভাবে থাকিবে, কোন স্থানে সংস্কারের আবশ্যক হইবে না, এ কথা কেহই বলিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে সংস্কার করিতে হইবে। কিন্তু অট্টালিকা যেরূপ তাহার সংস্কারও সেইরূপ হওয়া চাই; সামান্য মৃত্তিকা-গৃহ অথবা পর্ণ-কুটীরের উপকরণে অট্টালিকার সংস্কার হইতে পারে না। প্রথমে যে মাল মশলায় অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই মাল মশলা ব্যতীত ইহার সংস্কার অসম্ভব। হিন্দুসমাজ-অট্টালিকা যে উপকরণে গঠিত, পৃথিবীর কোনও সমাজ গঠনকারী সে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সেরূপ সুকৌশলী, সুদক্ষ, বহুদর্শী নির্ম্মাতা কোনও সমাজে জন্মেন নাই। সকল সমাজই আজ গঠিত হইতেছে, কাল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু এই হিন্দুসমাজের উপর এত যে বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গিয়াছে—কত কত জাতির প্রভাব ইহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া একাকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাতেও ইহা পর্ব্বতের ন্যায় অটল রহিয়াছে। এ অট্টালিকা ভাঙ্গিবার নয় বটে, এবং ইহারই আদর্শে পৃথিবীর যাবতীয় সমাজ-অট্টালিকার ভবিষ্যৎ গঠন-প্রণালী অবশ্যম্ভাবী হইলেও, ইহার স্থানে স্থানে যে চুণ খসিয়াছে, ময়লা ধরিয়াছে, ফাটিয়া গিয়াছে, এক আধটু টুটিয়াছে, এই সত্যটি কি কোন নিরপেক্ষ, সদ্বিবেচক পরিণামদর্শী ব্যক্তি অস্বীকার করেন? হিন্দুজাতির যে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সকল সৎবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের, কুপ্রবৃত্তির দমন ও বিনাশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, মানুষকে নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম করিবার, মনুষ্যত্ব শিখাইবার, দেবতা করিবার, প্রকৃত সুখী করিবার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী, হিন্দু সমাজ-অট্টালিকার সেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎভাগের, চুণ খসিয়াছে, ময়লা ধরিয়াছে,

স্থানে বিশেষ ফাটিয়া গিয়াছে, দু' একস্থান ভাঙ্গিয়াও গিয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক ভাগের—প্রধান ভাগের কথাই বলিলাম, অট্টালিকার সকল অংশেরই এইরূপ সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে।

আবশ্যক হইয়াছে সত্য, এবং সংস্কার করিতেও হইবে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাদা দিয়া মাটির ঘরই নির্ম্মিত বা সংস্কৃত হইতে পারে, খড় দিয়া পর্ণকুটীর ছাওয়া যায়, অট্টালিকার সংস্কার তাহাতে হয় না। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতকগুলি অসহিষ্ণু, অপক্কবুদ্ধি, অপরিণামদর্শী ব্যক্তি সেই সকল বিজাতীয় অপকৃষ্ট উপকরণে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারে এখন হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি নানা প্রকার পশুভাব প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া তাঁহারা এই সুন্দর, মহতী প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, দেশ হইতে এ প্রথা উঠিয়া যাউক, এবং তৎপরিবর্ত্তে বিলাতী স্বাতন্ত্র্য-প্রথা প্রচলিত হউক। তবেই গৃহে গৃহে সুশৃঙ্খলা, শান্তি, প্রেম ও সুখ বিরাজ করিবে। যে যে কারণে এই সকল দোষ ঘটিয়াছে, সে সকলের মূলানুসন্ধান করিতে এবং সে সব দোষ দূর করিতে তাঁহারা কোন মতেই রাজি নন। এই সুন্দর প্রথার পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ মহত্ত্ব সাধনে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইবেন না। ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব দেখিয়া অনেকে পূজা, পদ্ধতি, উপাসনা, আরাধনা, পরিত্যাগ করিয়াছেন; তৎপরিবর্ত্তে দিনান্তে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। আমাদের ঘোর আলস্য, ভীরুতা, নির্জ্জীবতার প্রকৃত কারণ বাহির করিতে চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা গুরু জনের প্রতি ভক্তি ও তাঁহাদের অধীনে থাকা, ধীরভাবে চিন্তা করিয়া কার্য্য করা, এবং সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রভৃতি মহৎগুণ গুলির অনুশীলনই এই সকল দোষের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করেন। নৈরাশ্যে, দুঃখে, যন্ত্রণায় এবং প্রধানতঃ শিক্ষার দোষে তাঁহারা সমাজের শত শত বিষয়ের সংস্কার কার্য্য এইরূপেই সাধন করিতেছেন; চিন্তা প্রণালীর গতিও এই ভাবেই ফিরাইবার চেষ্টা হইতেছে। সমাজ সংস্কারকের নামে তাঁহারা সমাজ-ধ্বংসকারীর কাজ করিতেছেন।

এই গেল এক পক্ষের কথা। আর এক পক্ষ—প্রবল পক্ষ সমাজ-ধ্বংসে প্রবৃত্ত না হইয়া সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রথম

হইতে আরম্ভ না করিয়া শেষ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অট্টালিকা সংস্কারে সুর্কির কাজ, বালির কাজ ছাড়িয়া একবারে চুণকাম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গৃহ সংস্কার ছাড়িয়া একবারে সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সামান্য কাজে তাঁহাদের মন বসে না, তাই তাঁহারা বৃহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত। সামান্যই যে বৃহতের প্রসূতি ইহা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না। তাঁহারা ভাবেন, বৃহৎ কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইলে তদ্দারাই ছোট কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইবে। এই ভ্রম বশতই আমরা লণ্ডভণ্ড হইতেছি। সেই জন্য এপর্য্যন্ত যত বৃহৎ অভাব জন্মিয়াছে, তাহার প্রায় সব গুলিই বর্ত্তমান। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে বৃহৎ বলিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহাই কি বৃহৎ এবং যাহাকে সামান্য বলিতেছেন, কার্য্যতঃ তাহাই কি সামান্য? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা সত্য নহে। সংস্কারকেরা বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আজ কাল বিধবা-বিবাহ সংস্কারকদের একটী প্রধান আন্দোলনের বিষয় হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ব্রহ্মচর্য্যই বিধবা গণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দু' এক স্থল ব্যতীত সমগ্র শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্যেরই পক্ষপাতী। ইন্দ্রিয় পরিতোষ পশুরাও করিয়া থাকে; ইহার দমনেই মানুষ হইতে পারে। হিন্দু বিধবাগণ আবহমন কাল এই জন্যই হিন্দু সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বপূজ্য পদলাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহাদিগকে এতদূর নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, পরোপকারিণী করিতে পারিয়াছে। অতএব এ উৎকৃষ্ট শিক্ষা, এ মহৎ ব্রতের পরিবর্ত্তে পুনর্ব্বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগকে দেবীপদ হইতে পশুপদে অবতরণ করান ঘোর মূর্খতা। কথা গুলি সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু সমাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া ত আর এ কঠোর ও সুন্দর ব্রত পালিত হইবে না। গৃহ তাহার ক্ষেত্র। কিন্তু সে গৃহ যে এখন শ্মশানক্ষেত্র! সে শ্মশানক্ষেত্রে এখন সকল প্রকার কদাচার, সকল প্রকার বীভৎস ব্যাপার যে অনুষ্ঠিত হইতেছে! পূর্ব্বে শিশু কাল হইতে যে শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের বলে হিন্দু-রমণীগণ উক্ত দেবধর্ম্ম পালন করিতে পারিতেন, গৃহে সে শিক্ষা, সে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার কি চেষ্টা হইতেছে? চেষ্টা করা দূরে থাকুক, বিজাতীয় শিক্ষা গুণে তাহার মধ্যে অনেকগুলি কুসংস্কার, অসার আলস্যপরায়ণতা, স্বাস্থ্যবতাবিরোধী কার্য্য বলিয়া প্রায় উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরুষেরা নিজেরা যেরূপ

ঘোর বিলাসী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইতেছেন, নারীজাতির মধ্যে তাহার প্রভাব যথেষ্ট সংক্রমিত হইতেছে। মুখে বলা হইতেছে, পুস্তকে লেখা হইতেছে, হে সংসারের দেবীগণ, তোমরা কষ্টসহিষ্ণু, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম, সংযতেন্দ্রিয়া হও। কিন্তু গৃহে সে শিক্ষা, সে দৃষ্টান্তের বিপরীতাচরণ করা হইতেছে এইরূপে যে যে বিষয়ে সংস্কারকেরা হাত দিয়াছেন, সকল বিষয়েই তাঁহারা গোড়া ছাড়িয়া আগা ধরিয়াছেন। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিবেচনা করিবেন, কোন্‌টি প্রথমে করণীয়, কোন্‌টি কারণ, কোন্‌টি তাহার ফল, অতএব কোন্‌টি গুরুতর। আরও এক কথা, গৃহের সমষ্টি যে সমাজ, গৃহের উন্নতির নামান্তর যে সমাজোন্নতি, এ কথা ত তাঁহাদের বলিয়া দিতে হইবে না।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই, সংস্কার করিতে হইলে গৃহে তাহার আরম্ভ করিতে হইবে। আগে আত্মীয়ের সহিত এক হও তবে বাহিরে পরের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে পারিবে। আগে আপনাকে আপনার করিতে শিখ, তবে পরের প্রতি মমতা হইবে। আগে গৃহকার্য্যে অনলস, সুপটু হও, তবে সমাজের জন্য কার্য্য করিতে পারিবে। আগে ঘরের অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা সংশোধন করিতে সাহসী হও পরে বাহিরের শত্রুর উৎপীড়নাদির প্রতিবিধানে সক্ষম হইবে। ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম না হইলে সমাজ সংস্কার করিবার ক্ষমতা আদৌ জন্মিতে পারে না। সে দুই মহৎভাবের বীজ গৃহে। আগে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কর, তবে বন্ধু বান্ধব এবং সমগ্র দেশের কার্য্যে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইতে পারিবে। এইরূপ ভক্তি, প্রীতি, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, প্রভৃতি মানবের যাবতীয় সংবৃত্তির—যে সকলের সম্যক অনুশীলনই মানবের ধর্ম্ম, এবং যে সকলের পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে ভবিষ্যতে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে পশুভাব ত্যাগ করিয়া দেবতা হইতে পারিবে—সেই সকলের বীজ গৃহেই অঙ্কুরিত ও বৃক্ষে পরিণত হইয়া সমাজে তাহার শুভ ফল প্রদান করিবে। ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়াই আমরা মনস্থ করিয়াছি, হিন্দু গৃহের কিরূপ সংস্কার আবশ্যক ক্রমে ক্রমে তাঁহার আলোচনা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। আজ সংক্ষেপে উপক্রমণিকা স্বরূপ দু' চারি কথা বলিলাম।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

কবি কীট্‌সের প্রতি।

দেব !

বসন্তে, বিটপীতলে,
প্রাবৃটে জাহ্নবীজলে,
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাতে বিহগ-কূজনে,
ফুটে যে সঙ্গীত সদা,
মানবের কণ্ঠে তাহা গাহিলে কেমনে ?

ওই প্রভাতের তারা
মোহমাখা, বসুন্ধরা
অরধ প্রস্ফুট ওই আলোক-আঁধারে,
তেমনি তোমার গান
ফোটে ফোটে সদা যেন বিহরে অন্তরে।

কল্পনে !—বারেক ছুটে
দেখাও কোথায় ফুটে
সে কুসুম—মুকুলে যা শুথাইল ভবে ;
পারিজাত, এ সংসারে—
মাটির সংসারে এই ফুটিয়াছে কবে ?

কোথা সে সঙ্গীত আজি,
ত্রিদিবে ভ্রমিছে বাজি,
শূন্য উতরোল করি, অনন্ত পুরিয়া,
মেঘ হ'তে ছুটে মেঘে
শান্ত করে অশনিরে চপলা চাপিয়া !

নক্ষত্রে ফুটিছে গীত
আলোকে ছুটিছে গীত,
পবনে লুটিছে তাহা সে ত্রিদিবে বাজি ;
আকুলি দেবতাকুলে
আকুল সঙ্গীত সেই তরঙ্গিত আজি।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ।

কোথায় গেল?

এই যে বসন্তের ফুলটি,—প্রকৃতির অনন্ত কাল-গৃহে কত দিনের আশা-কিরণে—কত যত্নের স্নেহ-সলিলে—কত সৌন্দর্য্যের আশ্লেষণ বিশ্লেষণে কানন—ত্রিভুবন—আলো করিয়া, আমার নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া, সৌন্দর্য্যের চরম-তীর্থ স্বর্গের অদৃশ্য-ছবি ধরিয়া হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে হৃদয়-আকাশে কত আশার বিচিত্র রামধনু ফুটাইতেছিল, সে ফুল আজ কোথায় গেল? বর্ত্তমান স্মৃতির অদৃশ্য গৃহে তাহার কেবল গন্ধটুকু রাখিয়া অতীত-পাখীর অনন্ত কাল-পাখায় আরোহণ করিয়া অনন্তের অজানা পথ দিয়া অনন্তের কোন্ গৃহে সে গেল? কি করিয়া অদৃশ্য হইল? কেন গেল? কে লইয়া গেল? কোথাকার ফুল সে? কোন্ দেশের পথিক? আকাশের কোন্ তারা? যে অনন্ত প্রকৃতিশক্তির বিরাট আকর্ষণ-প্রেমের আধ্যাত্মিক চিরপ্রবহমান স্রোতে সে ফুটিয়াছিল, সেই শক্তির গৃহ হইতে কি টান পড়িয়াছে? তাই কি একটির পর আর একটি করিয়া গুটির সমস্ত সূত্রা খুলিয়া গেল? কোন্ ভাবী জগতের অদৃশ্য যোগ-অণু? কোন্ অপ্সরার স্বপ্নের হাসি? কোথাকার আত্মা? কাহার গীত গানের লয়? এ কানন চির-অন্ধকার করিয়া কোথাকার কানন আলো করিতে গেল? আমার ইহ-জন্মের একমাত্র সাধের মণ্ডপে বিজয়া দশমীর বিষাদের উদাসময় চির-শূন্যতা রাখিয়া কাহার মণ্ডপে তাঁহার আগমনীবার্ত্তার আনন্দ-শঙ্খধ্বনি হইল? মৃত্যুর ভীষণ শ্মশানজাত বিরহের চিরবিষাদ-বৃক্ষ আমার এই মনুষ্য-উচ্ছ্বলিত কাননে রোপণ করিয়া, কোন্ কাননে হাসির চির সুখ-মিলন-পারিজাত হইয়া দেখা দিল?

কোথায় সে? তাহাকে কত স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছি।—ফুলের সেই স্মৃতি-জাগান মদিরাময় গন্ধের নীরব কবিতার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়াছি, পাই নাই ত! শারদীয় পৌর্ণমাসীর নির্ম্মল রাত্রির পাষাণ নিস্তব্ধতার রাজ্যে খুঁজিয়াছি, তাহাকে ত পাই নাই। নব পল্লবের উচ্ছলিত কচি হাসির ভাষার মধ্যেও দেখিয়াছি, কই, সেখানেও ত সে নাই! চিরকল্পনাবতী কল্লোলিনীর সেই কি এক কু-লু-লু-কু-তান-বিষাদ-তরঙ্গ-

পাপারও ত সে নাই! আমার চির-বাঞ্ছনীয় কবি-কল্পনার চরম সৌন্দর্য্যে প্রকাশিত আদর্শ বস্তুর সেই অপ্রকাশিত অদৃশ্য স্বর্গীয় ভাবের তরল হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাকে পাই নাই। ভাবুক ব্যক্তির চির-প্রিয় সেই ম্লানমুখী সন্ধ্যা-বিধবার কবিতাত্মক নীরব বিরহগানের ভিতর খুঁজিতে খুঁজিতে আত্মহারা হইয়াছি, কিন্তু সে কই? সেই কাল অমাবস্যার ভীম সমাপ্তির প্রজ্বলিত শ্মশানের চিরশান্তি-নিকেতনেও ত নাই! সেই জীবনীশক্তিবিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-পরমাণুর সার পরমাণুর সমবায়ে—আধ্যাত্মিক সমবায়ে এক—কি বলিব? জগতে অতুল সেই শরৎ-জ্যোৎস্নাস্নাত ফুলের হাসির প্রতিমা স্বরূপ—যে দেব-নির্ম্মিত তনু স্থজিত হইয়াছিল, তাহার আত্মার মধ্যেও ত সে আর নাই! নিশীথ অচেতনতার সুখ-চেতনার অদৃশ্য জগৎসঙ্গম কালেও ত তাহার দেখা পাই না! প্রেম-ভিক্ষা-পরিপূর্ণ প্রণয়ের সেই প্রথম হাস্যময়—স্বপ্নময়—আত্ম-বিস্মৃতিময় দৃষ্টির মৃদু-বিকম্পিত সুখ-কিরণের অভিনয়ের মধ্যেও তাহার সেই—সেই স্মৃতি-মাখা মুখখানি দেখিতে পাইলাম না! সেই কি এক বাতাস আসিয়া তাহার বহুদিনের কথা তাহার বিরহীর কাছে বলিয়া গেল, শুনিয়া বিরহী অতি ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিল, আমি দৌড়াইয়া তাহার মধ্যে খুঁজিতে যাইলাম—হায় হায়, সেখানে নাই! সেই জীবন-মৃত্যু,—প্রতিষ্ঠা বিসর্জ্জন,—আলোক-অন্ধকার, হাসি-কান্না এবং স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রীতিপূর্ণ মহামিলনের উজ্জ্বল সন্ধি-নক্ষত্রের মধ্যেও ত তাহার অতীত, আমার চিরশ্রুত গান শুনিতে পাইলাম না। বিনােদের বাঁশীর কত সেই সুখ-হাসি-লজ্জা-পরিপূর্ণ মধুময় কণ্ঠস্বরের মধ্যেও ত তাহার কোন চিহ্ন নাই! সেই Shelleyর সেই

The Heavens had wept upon it, but the Earth
Had crushed it on her unmaternal breast-

এর সুশীতল ছায়ার মধ্যে লুকাইয়া আছে মনে করিয়া চুরি করিতে যাইলাম। নাই! সেখানে নাই! কৌমুদী-সমুদ্র-মগ্ন অনন্ত নিশীথাকাশের মধুর সরলতা মধ্যে,—অতীত স্মৃতির চকিত আবির্ভাবের ন্যায়—আমার হারান সেই এলোথেলো সংগীতটিকে ত পাইলাম না! সর্ব্বজনহৃদি-বিরাজিত সেই যে অমর সুন্দর প্রাচীন কবিতা-গান—"সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়"—

তাহার অজানা সুখমায়াময় স্মৃতি-কাননের কত কি মায়ার অদৃশ্য ফুলরাশির অন্তঃপুরেও ত আমার তাহার কোন অস্তিত্ব নাই ! যেখানে বসন্তের বাতাস প্রাণ-গান এবং রমণীর প্রেমালসে সুখ-ঘুম-ঘোরময় নয়নের স্খলিত নীরব হাসি মিলিয়া এক হইয়া গিয়া প্রেম হইয়া ফুটিয়াছে, সেখানেওত তাহার আত্মাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না ! স্তব্ধ তরুতলের মধুময় মোহ-সাগরে ত আমার সেই মূর্ত্তিমতী বাসনা-ঊর্ম্মি-মালা আর দেখিতে পাইলাম না ! সে বাঁশীত আর শুনিতে পাই না ! আমার গৃহ-সরোবরে যাহার নয়ন-কিরণ পড়িয়া প্রতিদিন যে রামধনুক খানির সৃষ্টি করিত, এখন ত আর তাহার সৃষ্টি হয় না ! সে তবে কি নাই ? সে জ্ঞানময়ী কি একেবারে চলিয়া গিয়াছে ? এই অনন্ত বিশ্বের কোন স্থানেও কি তাহার একটিও পরমাণু নাই ! সে কি বিশ্বের কিছুর কিছুই ছিল না ! তবে কি কেবল সে একটি স্বপ্ন ! স্বপ্নজাত ভ্রম ! জন্মান্তরীণ স্মৃতি ! মায়া !—"O Heaven, whither ? Sense knows not ; Faith knows not; only that it is through Mystery to Mystery, from God and to God !

হায়, কেন গেল সে ! এখানে তাহার কিসের অভাব হইয়াছিল ! কি এখানে সে পায় নাই ! কি এমন দুঃখ হইয়াছিল ! জগৎ-পারাবারে কি তাহার স্থান ছিল না, তাই আমার সোণামুখী তরীখানি ভাসিয়া গেল ? কঠিন জগতের মাটি কি তাহার প্রতিপদক্ষেপে পায়ে বাজিত ! প্রখর সংসার-উত্তাপে কি আমার সেই ওদিনের কুসুমটি শুকাইয়া গেল ! বসন্ত সমীরণ আর বহিল না দেখিয়া কি সে তাহার অনন্ত গৃহে ফিরিয়া গেল ! অনভিজ্ঞ বাদকের হাতে পড়িয়া কি তন্ত্রীর তার ছিঁড়িয়া গেল ! না, সে নীরব সংগীত তাল রক্ষা হয় নাই ! মনে ধারণা করিতে পারি না যে, রুদ্ধ গৃহের প্রদীপ কি করিয়া—কোথাকার অননুভবনীয় বাতাস লাগিয়া—নিবিয়া গেল ! কি একটা গোলমাল হইয়াছিল। কি গোলমাল কি করিয়া বলিব ? হায় ! প্রকৃতির লীলা—রহস্য কিছু বুঝি না। প্রকৃতির চুরি কে কবে ধরিতে পারিয়াছে ? প্রকৃতির পরপারে যাহা যায়, তাহা একেবারে যায়। জন্মের মত যায়।

হায়, কতদিন ধরিয়া—কত চেষ্টা করিয়া—একটি ফুল ফুটে ! ফুল—মানুষ,

প্রকৃতির অনন্ত প্রেমের ফল। সেই মানুষ-ফুল কি বৃথা ফুটে? তাহার ফোটার কি কোন উদ্দেশ্য—কোন অর্থ নাই? যদি থাকে, তবে প্রকৃতি কেন আবার তাহাকে জগৎ-নাট্যশালার নেপথ্যে সরাইয়া ফেলে? তাহার মুখের দিকে কেন প্রকৃতি একবার চায় না? এরূপে অন্তর্হিত হওয়াই কি তাহার জীবনের পুরস্কার? জগতের কি এই নিয়ম? আমাকে এ নিয়ম কে বুঝাইয়া দিবে? কে বুঝাইয়া দিবে আমরাও কেন প্রতিদিন প্রতি পলে পলে বিন্দু বিন্দু করিয়া—কর্পূরের ন্যায় বাষ্পীভূত হইয়া—বিস্মৃতি-সাগরে মিশিয়া যাইতেছি? মৃত্যু আমাদের প্রতিদিন কেন এত আকর্ষণ করিতেছে? তাহার ভালবাসা—সহস্র প্রকারের বন্ধন—আমরা কেন এড়াইতে পারি না? আমরা কি মৃত্যুর মৃত্যু? তাই আমরা মরি?—বাঁচি? মরণের পর চির-জাগরণ।—অতৃপ্তির পর অসীম তৃপ্তি। জীবনের পর আত্মা! ইহা স্তোকবাক্য। প্রকৃতি, তুমি কি রহস্যময়ী, কি অসীম অন্ধকার! "Man begins in darkness, ends in darkness; mystery is everywhere around us and in us, under our feet, among our hands.,,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দু আচার ব্যবহার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমাজ কি, সমাজিকতা কি এবং হিন্দুসমাজের পূর্ব্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ এতক্ষণ তাহাই সাধারণতঃ বলিলাম; এক্ষণে সামাজিক আচার ব্যবহারের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

বিশদ করিবার জন্য প্রস্তাবটীকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইল।

১। স্বজাতিধর্ম্ম।

২। সামাজিকতা।

৩। সভ্যতা।

৪। শিষ্টাচার।

৫। বেশভূষা।

৬। উৎসব, ক্রিয়াকর্ম্ম ও সামাজিক দান।

৭। আমোদ অহ্লাদ।

এই সপ্ত প্রকরণের প্রত্যেকের পূর্ব্ব, মধ্য ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখা উচিত। কিন্তু যাহা সচরাচর সকলেরই জানা আছে, তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সকল মহৎ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হওয়াও অসম্ভব আর, যে সকল বিষয় সাধারণের জানা নাই, যাহা জানিবার উপায়ও অতি কঠিন, তাহা, যতদূর পারা যায়, বিশদ করিয়া লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১। স্বজাতি ধর্ম্ম।

হিন্দুজাতির স্বজাতি ধর্ম্ম বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন মত্রেই সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদের কথা আসিয়া পড়ে। চাতুর্ব্বর্ণ ও পুরুষানুক্রমিক প্রথাতে বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন কার্য্য ও ব্যবসায়, যাহা আবহমান নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কে না জানেন? তথাপি শাস্ত্রীয় উপদেশে, সংহিতার বিধানে এবং পুরাণের বিবরণে এমন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে, এখনকার মত পুরাকালে বর্ণভেদের এত দৃঢ়বন্ধনী ছিল না; গুণানুসারে ও কর্ম্মানুসারে অধম বর্ণের লোক উত্তম বর্ণে ও শ্রেষ্ঠ বর্ণের মনুষ্য নিকৃষ্ট বর্ণে প্রবিষ্ট কিম্বা গণনীয় হইত। রাজনারায়ণ বাবুর হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতায় তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান আবশ্যক। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত পুস্তকে সকলেই যখন তাহা দেখিতেছেন, তখন আর প্রস্তাব বাহুল্যের প্রয়োজন কি? মনুসংহিতা ও মহাভারতে স্পষ্ট লেখা আছে, উচ্চনীচ কর্ম্মানুসারে মানবগণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রাপ্ত হন, বংশোদ্ভব হেতুতেই নহে। বেদোল্লিখিত কবস ঋষি এবং পুরাণোক্ত বিশ্বামিত্রই তাহার প্রমাণ। এখনকার হিন্দুরা ব্রাহ্মণের মুখে ভিন্ন পুরাণ কথা শুনেন না, কিন্তু সে কালের ঋষিগণও শূদ্র লোমহর্ষণের নিকট সমুদায় পুরাণ শুনিয়াছিলেন, ইহা স্পষ্টাক্ষরে সেই সব পুরাণেই লিখিত আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম্ম তন্ন তন্ন রূপে বিচার

করিলে এই অনুমান হইতে পারে, যে, অপেক্ষাকৃত নব্যতর কালে যখন ব্রাহ্মণেরা স্বজাতীয় কঠোর ধর্ম্ম পালনে অশক্ত, অপর বর্ণের ন্যায় বিলাস-সুখাশক্ত এবং তজ্জন্য বেতনগ্রাহী ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন, তৎকাল হইতেই তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক বর্ণভেদের নিয়মটী বিশিষ্টরূপে সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। কারণ, তদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই নিকৃষ্ট বর্ণে যাইতে হইত। ঠাকুরদেব ইচ্ছা, "রামও বলিব, কাপড়ও তুলিব!" চাকরীও করিব, মান্য ও হইব! বেদের জ্ঞান ও ব্রাহ্মণের আচরণীয় শত শত অনুষ্ঠান, যাহার জন্যই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, সে সব ত্যাগ করিব, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পদটী ছাড়িব না! নীচ বর্ণের কর্ম্ম করিব, কিন্তু নীচ বর্ণে যাইব না! সুতরাং ব্রাহ্মণের পুত্র সহস্র কুকর্ম্মী হইলেও তবু তিনি ভূদেব, তবু তিনি পরমপূজ্য, তবু তিনি সেই বশিষ্ঠ জনক, এ শাস্ত্র না করিলে উল্লিখিত রূপে সর্ব্বদিক রক্ষা হয় কৈ? যাহা হউক, হিন্দু সমাজে এ বিষয়ের সহিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সংযোগ, এজন্য ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য আমরা কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। চতুর্দ্দিগে শিক্ষিত সমাজে এই পুরুষানুক্রমিক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ শ্রুত হয়, এবং প্রাচীন-পক্ষ বর্ণ ভেদের যেরূপ অবিচলিত পক্ষপাতী, তাহাতে নিরপেক্ষ লোকের কথা কওয়াই দায়! বিশেষতঃ যাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনায় বিরত, তাহাদিগের পক্ষে ভবিষ্যতের মুখ চাহিয়া প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। কেবল নিরাপদে দুই পক্ষের পক্ষে ও প্রতিপক্ষে এই দুইটী কথা বলা যাইতে পারে, যে, সভ্যতাভিমানী জাতিরা আপনাদের মধ্যে অভেদ-ভাবের যত জাঁক করেন, কার্য্যে কিন্তু তাহা সংরক্ষিত হয় না। এই প্রবন্ধের প্রথমভাগে সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, যে, সভ্যতম ইংলণ্ডীয় সমাজে ও বর্ণ-ভেদের ন্যায় অথবা কুলীন মৌলিকের ন্যায় লর্ড ও কমন্‌স্ শ্রেণী, ধনী ও দরিদ্র শ্রেণী আছে, "পিয়ারের" পুত্র সর্ব্বগুণহীন দুঃশীল হইলেও "পিয়ার" উপাধি পাইয়া থাকে। তবে যে, নিম্নশ্রেণীর যোগ্য ব্যক্তি রাজ প্রসাদে উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারে, এ প্রথাটী অনেক ভাল বটে। আমাদের দেশে সেই নিয়মের অভাবে অনেক অনিষ্ট ঘটে। ফলতঃ এ বিষয়ের পক্ষে প্রতিপক্ষে এত তর্ক উত্থিত হওয়া সম্ভব, যে, তদালোচনার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ না লিখিলে চলে না।

হিন্দুজাতির স্বজাতি ধর্ম্মের দ্বিতীয় অঙ্গ এই, যে, অপর জাতীয় লোককে অর্থাৎ ম্লেচ্ছ যবনাদিকে স্বজাতি মধ্যে গ্রহণ না করা। পূর্ব্বকালে অধম বর্ণ উত্তম হইয়াছে, কিন্তু এটী প্রায় হয় নাই।—চণ্ডাল শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে, তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিয়াছে, ব্যাধ অজানিত রূপে শিবরাত্রি করিয়া মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু যবন জাতীয় কেহ প্রায় হিন্দু হইতে পারে নাই। আধুনিক কালে হিন্দু সমাজের এক বর্ণের লোক যখন অপর বর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন ইংরাজ কি মুসলমান যে হিন্দু হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে দরাপখাঁর কাহিনী যাহা শুনা যায়, তাহার সঠিক কোনো বিশেষ সংবাদ নাই। তাহাকে হিন্দুসমাজে পরম ভক্ত বলিয়া মান্য করিত, কিন্তু আহার ব্যবহারে তাহাকে লইয়া চলিত কি না তাহা আমরা জানি না। নবদ্বীপের চৈতন্যদেব মুসলমানকে বৈষ্ণব করিয়াছেন, এমন কথা শ্রুত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত সোম-প্রকাশের অনেক পত্র প্রেরকের যে প্রকার বাদানুবাদ হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চিত হইতেছে না, চৈতন্যের সেই সব শিষ্য প্রকৃত হিন্দু কি মুসলমান? যাহা হউক, আজ্ কাল্ সেরূপে জাতি দিতে পারেন, এমন ক্ষমতাশালী মহিমান্বিত হিন্দু কেহই নাই!

২। সামাজিকতা।

হিন্দুসমাজের সামাজিকতা বলাতে লোক লৌকিকতা, আচার ব্যবহার, দলাদলি, সামাজিক অপরাধের দণ্ড, এক-ঘরিয়া ও জাত-ভ্রষ্ট প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমষ্টি বুঝিতে হইবে। ইহার প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিলে অত্যন্ত বিস্তারিত হইয়া পড়ে, এজন্য সামান্যতঃ কতিপয় প্রধান কথার উল্লেখ মাত্র করিব।

সকল জাতি মধ্যে নিয়ম, শিষ্টাচার, ভদ্র ব্যবহার প্রভৃতিকে সামাজিকতা বলে। বঙ্গীয় সমাজে ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে সামাজিক ব্যক্তিগণকে বসন, ভূষণ, অর্থাদি উপহার প্রদানকেই একণে সামাজিকতা নাম দেওয়া হয়। ইহা নম্রতা-প্রকাশক মানদায়ক সুন্দর প্রথা। বাটীতে পদার্পণ পূর্ব্বক সকলে আহার করিলেন, তজ্জন্য কর্ম্মকর্ত্তা আপনাকে ধন্য ও কৃত কৃতার্থ জ্ঞানে ভোক্তৃবর্গের গৌরবার্থে মর্য্যাদা দান করেন। নম্রতা-জ্ঞাপক না হইলে

ব্রাহ্মণের বাটীতে শূদ্র আহার করিলে মর্য্যাদা পায় না কেন? মর্য্যাদা না পাওয়া বরং ব্রাহ্মণকে প্রণামি কিছু দিয়া আসে। যে সমস্ত দেশে বর্ণভেদ ও অন্ন বিচারের আবশ্যকতা নাই, তদ্দেশে এরূপ সামাজিকতার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু অন্ন বিচারক হিন্দুসমাজে একের সহিত অন্যের ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচলিত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। এই জন্য সংস্কার আছে, যাঁহার বাটীতে দশজনে আহার করেন, তাঁহার বিশেষ উপকার করা হয়। সুতরাং এই সামাজিকতাকে এক প্রকার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন বলিলেও বলা যায়। যাঁহাদিগকে ঐ সামাজিকতা অর্পিত হয়, তাঁহারা যে মহা সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। এমতে ইহার দ্বারা উভয় পক্ষেরই তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু সামাজিকতার অপর একটী মহত্তর ব্যুৎপত্তি যে আছে, যাহাকে স্বদেশানুরাগের সহোদর ভাই বলিয়া ব্যাখ্যা করা সঙ্গত, দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় সমাজে সে সামাজিকতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

সামাজিকতার মধ্যে লিপি-সৌকার্য্যার্থ দলাদলিকেও ধরা গিয়াছে। সকল বিচার্য্য বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও পক্ষ প্রতিপক্ষ আছে। এ কথা শুনিয়া আমাদের সুশিক্ষিত উন্নতিশীল ভ্রাতারা হয়তো বলিবেন "কি আশ্চর্য্য! এ দেশে ইংরাজি চর্চ্চার বাহুল্য হওনাবধি যে বিষয় শিক্ষিত সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে; যে দলাদলিতে নিরবচ্ছিন্ন দোষ ভিন্ন কোন গুণ নাই, যদ্দ্বারা প্রতিবাসীদের মধ্যে সুহৃদ-ভঙ্গ, দ্বেষ, হিংসা, প্রতিহিংসা, বিবাদ, মনান্তর, খলতা, নিষ্ঠুরতা, ধর্ম্ম-বিরাগ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অমানুষিক ও পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহার আবার বিপক্ষ বই পক্ষ কেহ আছে?" কেহ বা বলিবেন "সহস্র শত্রুতা থাকুক, কাহারো বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে আহার করিতে না যাওয়া নিতান্ত কুটীলতা ও নীচতার কর্ম্ম।" ইহা সকলই সত্য, কিন্তু কেবল যদি আহারের বিষয় লইয়া দলাদলি হইত, দল বাঁধিবার জন্য গুরুতর কোন হেতু না থাকিত, তবে ঐ কথাগুলিন সকলই যুক্তিমূলক বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু দলাদলির আরো নিগূঢ় কারণ আছে;—দলাদলির প্রধান অঙ্গ, কোনো দোষী ব্যক্তিকে এক-ঘরিয়া করা। সমাজ মধ্যে যে সকল পাপ অত্যন্ত

গুরুতর ও ঘৃণাজনক এবং হিন্দু রাজত্বের অবসানাবধি রাজদ্বারে যে সব অপরাধের বিচার ও দণ্ড হইতে পারে না, সেই সেই দোষের প্রতিফল দেওয়া এবং আর কেহ এমন কর্ম্ম না করে, তদভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই এক-ঘরিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দু-আচার বিচার আহার ব্যবহার সকলই ধর্ম্ম-মূলক—সকলই ইহ পরকালের শুভাশুভ প্রত্যয়-মূলক। কোনো কোনো বিশেষ অহিতাচার করিয়া কোনো ব্যক্তি পতিত হইলে, লোকের বিশ্বাস আছে যে তাহার সহিত যে অন্নের ব্যবহার করিবে, সেও পতিত হইবে। সুতরাং ঐরূপ দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি বা পরিবারকে সমাজে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্যরূপে গণনীয় হয়। যখন মূল অভিপ্রায় নিন্দনীয় ও নিষ্প্রয়োজনীয় হইতেছে না, তখন দলাদলিতে আনুষঙ্গিক আর আর কাজ যাহা হওয়া থাকে, তাহার জন্য অত আইসে যায় কি? ইহাতে সচরাচর দ্বেষ হিংসা, কলহ, কুটিলতা সত্যই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন কি আছে, যাহা নিরবচ্ছিন্ন গুণবিশিষ্ট, যাহা নিতান্তই নির্দ্দোষ, যাহা অমিশ্র উত্তম, যাহা সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ? ইহাতো সামাজিক প্রথা, যে সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থা মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গ কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইতেছে, তন্মধ্যে পদে পদে দোষ রাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে! নিয়ম-পরিচালক ও নিয়ম-পালক এই উভয় পক্ষ সাবধান হইয়া না চলিলে সকল সুব্যবস্থাই কুব্যবস্থা হইতে পারে! ফলতঃ যেখানে সমাজ, সেই স্থানেই মত ভেদ। যেখানে মত-ভেদ সেইখানেই দলাদলি। এবং যেখানে সমাজ, সেইখানেই সামাজিকতা-ভঙ্গ দোষী ব্যক্তি। যে খানে এরূপ দোষী, সেইখানেই এরূপ দণ্ড হওয়া স্বাভাবিক। সেই দণ্ডের নাম এক-ঘরিয়া হউক আর দেশ ভেদে যে নামেই অভিহিত হউক, কিন্তু বস্তুতঃ বিষয়টা এক। যে ইংলণ্ডের অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা আপনাদের সকল সামাজিক বিষয়েই দোষ দর্শন করেন এবং পূর্ব্ব প্রথা সকল অবচ্ছেদাবচ্ছেদে শীঘ্র শীঘ্র উঠাইয়া দিতে চান, সেই ইংলণ্ড দেশেও কি দলাদলি নাই? সেখানে বরং ইহার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। এ দেশে শাক্ত বৈষ্ণবে যে দলাদলি, সে তো মাধুর্য্য-ভাবময়; সে দেশে রোম্যান ক্যাথেলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মানব প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা করে। তৎপরে ইংলিসচর্চ্চ ও প্রেসবিটেরিয়ানের

দলাদলি সামান্য লজ্জাস্কর নহে! রাজকীয় দলাদলিতে অদ্যাপি যেরূপ হিংসা, দ্বেষ, শঠতা, কপটতা, চাতুর্য্য, অবিচার, পক্ষপাত প্রভৃতি পাপাচারণ ইংলণ্ডের বড় বড় লোক করিয়া থাকেন, তাহার কাছে বঙ্গীয় দলাদলির দোষ সমূহ কিছুই নয়! তত্রত্য সেই সব কদর্য্য প্রথা যদি ক্ষমতার কৌষগাসে মণ্ডিত ও সভ্যতার চাক্‌চিক্যে সুরক্ষিত না থাকিত, তবে তাহার নিন্দাবাদে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত সন্দেহ নাই! অধিক কি, আমাদের মধ্যে যে শিক্ষিত যুবকগণ এই দলাদলির ধ্বংসকারী; যাঁহারা দেশের লোককে ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনার পবিত্র পথ দেখাইতেছেন; যাঁহারা ভাবিয়া ও বলিয়াও থাকেন, যে, তাঁহাদের বাক্য শুনিলে ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে লোকে সভ্য ও ধার্ম্মিক হইবে—লোকে সরল হইবে ও দলাদলির কুপ্রথা ত্যাগ করিবে; যাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ সমাজে স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া একদিনেই পোড়া বঙ্গকে সোণার বিলাত করিয়া তুলিতে উদ্যুক্ত; তাঁহারা নিজেই দলাদলির কৌটিল্যহ্রদে মগ্ন হইয়া মধ্যে কি চলাচলিই বা না করিছেন। সে সব কথা এখানে আর তুলিয়া কাজ নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেই যখন সারল্য, ধৈর্য্য ও সুবিবেচনার এত অভাব এবং দ্বেষ হিংসার এত বাড়াবাড়ি, তখন অশিক্ষিত অসভ্য বঙ্গীয় সামাজিকগণ যে তাহা হইতে মুক্তপুরুষ হইবে, এও কি আশা করা যাইতে পারে?

৩। সভ্যতা।

হিন্দু সমাজকে সভ্যতম ইউরোপীয়েরা অর্দ্ধসভ্য বলিয়া থাকেন। উভয় দেশের আধুনিক অবস্থার তুলনায় আমরাও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু এক-কালে এই ভারতবর্ষ প্রায় সর্ব্ববিষয়েই ভূমণ্ডলের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতম ছিল। কালের কুটিল চক্রে পেষিত হইয়া ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অবরোধ হইল, উন্নতি দূরে থাকুক, অবনতি ঘটিয়া উঠিল। এখনও যে ইহা অসভ্য নাম না পাইয়া অর্দ্ধসভ্যের শ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়াছে, ইহাই সৌভাগ্যের বিষয়। যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান, বাণিজ্য বিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থ-ব্যবহারিক শাস্ত্রাদির আলোচনা ও তদনুসারে কার্য্য করা; তৎফলস্বরূপ শক্তি, স্বাস্থ্য, রাজ্য, ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করা; মনুষ্যের চিন্তাশক্তি

ও লেখনীকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া; সামান্য প্রজাকেও ক্ষমতাবান্ অত্যাচারীর হস্তে রক্ষা করা; ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাজনক ব্যাপার সমূহ ধরিয়া সভ্যতার সীমা করা যায়, তবে ইউরোপের তুলনায় অস্মদ্দেশ অর্দ্ধ কেন, ষোড়শাংশের একাংশও সভ্য হইতে পারে না। কিন্তু এসমস্ত বিষয় সভ্যতার কেবল মাত্র উপকরণ নহে, ইহার মধ্যে অধিকাংশতো বাহ্য-চিহ্ন। এ সব ব্যতীত আরো বহু বিষয় আছে। তন্মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিকতা প্রধান বিচার্য্য বিষয়। যতক্ষণ না মনুষ্যের পারিবারিক ও সামাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম্মনীতি-সঙ্গত ও উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুমোদিত হয়, ততক্ষণ অন্যান্য উন্নতি সকলই বৃথা। ইউরোপে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রসাদে সেই প্রার্থনীয় উন্নতির পথও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত আছে। যদিও অত্রত্য অধিকাংশ সামাজিকগণ আশামত সে পথের পথিক নন, অল্পাংশত তাহাতে যথোচিত নিবিষ্ট বটে। এবং সমস্ত ইউরোপের যেমন প্রতাপ, তেমনি দয়া; এইজন্য তাঁহারা এক্ষণে সভ্যতম শ্রেণী হইতে পরিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ পরাধীনতা ভুগিয়া ভুগিয়া শিল্প-বিজ্ঞান-জনিত প্রায় সমুদয় বাহ্য উন্নতিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা তাঁহাদের আভ্যন্তরিক পূর্ব্বগুণাবলীর অধিকাংশকে অবলম্বন করিয়া আছেন। অনেকে বলেন, হিন্দুজাতি দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। যদিও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে, যদিও ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কিন্তু সমাজের মূলপ্রকৃতি অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে। হিন্দু সমাজের মূলপ্রকৃতি ধর্ম্মমূলক। সেই ধর্ম্মাত্মক ধাতুটী সমাজের অদ্যাপি আছে। তাহা আছে বলিয়াই এখনও অর্দ্ধসভ্য নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহার পরিবর্ত্তে ইহা যদি বাহ্যসভ্যতামূলক হইত, তবে দুর্দ্দান্ত যবন আক্রমণে কোন্‌কালে সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অসভ্যরূপে পৃথিবীর ঘৃণিত পদার্থ হইয়া পড়িত! কিরূপে কাহার দ্বারা কি কারণে আমাদের শাস্ত্রগুলি রক্ষিত হইয়াছে এবং সেই শাস্ত্রানুসারে আচার ব্যবহার চলিতেছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। যদি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার না থাকিত, তবে ভাবিয়া দেখুন, আমাদের দশা আর গারোজাতির দশায় কোনো ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইত কি না? শুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি, শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও আচার ব্যবহার রক্ষা হইয়া আসিতেছে, তাহাও নহে; সেই সঙ্গে শিল্পকর্ম্মেরও ধ্বংশাবশেষ

অদ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুভাস্করের কীর্ত্তি দেখিয়া আজো ইউরোপীয়েরাও বিস্ময়াপন্ন হয়। আজো আমাদের কাশ্মীরের শাল, জয়পুর ও কাশী অযোধ্যাদির পাষাণ-কারু; ঢাকার বস্ত্র ও ধাতুকর্ম্ম; কটকের স্থূল বস্ত্রনির্ম্মিত সূক্ষ্মরৌপ্য কারু ইত্যাদি নিপুণতা বর্ত্তমান রহিয়াছে! আজো জ্যোতিঃশাস্ত্রের ভগ্নচিহ্নস্বরূপ আশ্চর্য্য জ্যোতিশ্চক্র, আশ্চর্য্য গ্রহণ-গণনা, আশ্চর্য্য চান্দ্র সৌর দিনক্ষণ তিথি নক্ষত্রের নির্দ্দেশ প্রভৃতি কতক প্রকাশমান, কতক বা কীট-চর্ব্বিত মনুষ্যের করস্পর্শ-বর্জ্জিত তুলট ও ভূর্জ্জপত্রের পুথিমধ্যে অপ্রকাশমান আছে। আজো শারীর-বিদ্যার অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়ার ধ্বংশাবশেষ লইয়া কবিরাজগণ এমন সকল উৎকট পীড়ার উপশম করিতেছেন, যে সে সকল ব্যাধি সভ্যতম জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্য হওয়া দুরূহ! আজো হিন্দু-বিজ্ঞানের বিচিত্র পতাকার একটু ছেঁড়া ন্যাকড়া স্বরূপ এই জ্ঞানটুকু আছে, যে, বৈদ্যুতিক পদার্থের সহিত পার্থিব ধাতু-পদার্থের আকর্ষণ-সম্বন্ধ জানিতে পারিয়া মেঘ ডাকিলেই স্ত্রীলোকেরা ঘটী বাটী ঘরের মধ্যে লইয়া যায়।

কিন্তু পাশ্চাত্য আলোকে আমাদের কেমন ধাঁধা লাগিয়া যায়। পূর্ব্বের কথা আমরা সব ভুলিয়া যাই। পূর্ব্বপুরুষগণ যে অজ্ঞ ও অসভ্য ছিল এবং তাহাদিগের বংশধর হইয়া আজ আমরা সভ্যতার উচ্চশিখরে উঠিতেছি, ইহা ভাবিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করি। অনেকে এখন সেই আর্য্যদিগের নাম শুনিবা মাত্র, পত্রিকায় তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোনও প্রবন্ধ দেখিবামাত্র গুম্ফের অন্তরাল হইতে উপহাসের হাসি হাসিয়া থাকেন। আর্য্য-কথাটা অনেকের পক্ষে এতই রূঢ় ও কর্কশ ঠেকে যে সে নাম উচ্চারিত হইবামাত্র ত্রস্তে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেন। আমাদিগের সভ্যতা এখন এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের জ্ঞান অতি সংকীর্ণ, কিন্তু অভিমান বিস্তীর্ণ, শিক্ষা পল্লবগ্রাহীমাত্র, কিন্তু উপদেশের ছটায় দেশ সন্ত্রস্ত। কীর্ত্তির মধ্যে পরের অনুকরণ ও দাসাবৃত্তি। আমাদের যত কিছু বুদ্ধি ও দর্শন-ক্ষমতা "ধুতি পরি, কি পেণ্টলুন পরি" এই মহা তর্কেই এখন পর্য্যবসিত হইতেছে।

[ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন বসু।

ডারউইনের মতের সমালোচনা

অনুসন্ধিৎসা মনুষ্যজীবনের একটা প্রধান ধর্ম্ম। অতি শৈশবাবস্থা হইতে চরমকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যজীবন কেবল কার্য্যের মূলতত্ত্ব জানিবার জনাই উৎসুক হইয়া বেড়ায়। জীবের জীবতত্ত্বের যে কি এক মোহিনী-শক্তি আছে তাহা বলা যায় না। সেই জীবতত্ত্ব আশা-মরীচিকার ন্যায় দূরন্ত—বহুদূর-ব্যাপী। আজ তুমি একটা প্রশ্ন কর—শ্যাম বা রাম—তাহা-দিগের সাধ্যমত সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিবে ও বোধ হয় দিতেও সক্ষম হইবে; তাহাদিগের সেই উত্তর বা উত্তরগুলি তোমার প্রশ্নের সর্ব্ব-কার্য্য সম্পন্ন করিলেও তাহা হইতে তোমার হৃদয়ে শত সহস্র কোটি কোটি প্রশ্নশ্রেণী পর্য্যায় ক্রমে নির্গত হইতে থাকিবে. কাহার সাধ্য সে প্রশ্নের উত্তর দেয়? তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত হইলেও সেই প্রশ্ন শুনিয়া তোমাকে স্থির নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে। মনুষ্যহৃদয়ে যে প্রশ্ন স্বতঃ উৎপন্ন হয়, কয়জন তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে সক্ষম? কয়জন তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া চারিদিক বজায় রাখিয়া উত্তর দিতে পারে? মানবহৃদয়ে এই অনুসন্ধিৎসা না থাকিলে জগতে কে আজ বাল্মীকি বা ব্যাস, দান্তে বা হোমার, শঙ্করাচার্য্য বা নানক, লুথার বা চৈতন্য, কালিদাস বা সেক্সপীয়রকে পূজা করিত? কে আজ নিউটনের কথায় বিশ্বাস করিয়া মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিত? কেইবা বিশাল নদী হৃদয়ে গ্রন্থ পাঠ ও সশরীরে স্বর্গমর্ত্ত্য বিচরণ বিশ্বাস করিত? এই অনুসন্ধিৎসার জনাই মনুষ্য ইতর প্রাণী হইতে এত বিভিন্ন, এত উচ্চ। ইহাতে যে শিক্ষা লাভ হয় তাহাতে মনুষ্যকে উচ্চ কার্য্যোপ-যোগী করে, মনের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করে ও সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা উচ্চতর বুদ্ধিতে মানব প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে লইয়া যায়। এই শক্তির পরিচালনার সহিত মানব-জীবনের এতদূর নিকট সম্বন্ধ যে ইহা ব্যতিরেকে মানব জীবনের উন্নতি কদাপি সম্ভবে না। আজ যে শক্তির বলে তুমি প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় জীবন অতিবাহিত করিতেছ, আজি যাহার জন্য সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া উক্ত কার্য্যে তন্ময় হইয়াছ, সেই শক্তি তোমার শৈশবাবস্থা হইতে পরিণত হইয়া পূর্ণাবয়বে আজি তোমাতে বিরাজ করিতেছে মাত্র।

সেই অনুসন্ধিৎসার বলে একজনের গবেষণার শক্তির অন্যে পরিচয় লয়, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অনুঝকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করে—সেই গবেষণায় যে প্রমাদ দৃষ্ট হয় সেই প্রমাদ দূরীকরণের জন্য আর একজন চেষ্টা করে; হয়ত উভয়েই সেই এক ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়া সেই পূর্ব্ব প্রমাদ অধিকতর বর্দ্ধিত করে, কিম্বা সেই প্রমাদ দেখাইয়া সাধারণকে সেই ভ্রান্তপথ হইতে প্রকৃত পথে লইয়া আসিবার চেষ্টা করে। Darwin, Lord Monbodds এবং Lamarck এই তিন মহাত্মাই পর্য্যায় ক্রমে একই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, উক্ত তিন মহাত্মাই একই প্রকার প্রমাদগ্রস্ত। তাঁহাদিগের মতে "The naturo in former times, proceeded towards gradually developing one class of beings from another so as to establish a graduated chain, not of simultaneous but of successive links; and thus producod in the end human species by a metamorphosis; one raco of those, probably of that Angola Orang, from some unrecorded reason lost the habit of climbing trees, or holding by their hind as well as by their fore limbs. After thus walking on the ground for many generations, the former changed into a shape more suited to their habits and became feet and they gradually acquired the habit of walking erect."

কাল্পনিক চিন্তার বলেই পূর্ব্বোক্ত তিন মহাত্মাই মনুষ্য মর্কট বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগের দেখা আবশ্যক যে উক্ত তিন মহাত্মার এই প্রতিপাদ্য বিষয় কতদূর সঙ্গত। তাঁহাদিগের মতের সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে গুটিকতক কথা আমাদিগের বলা আবশ্যক, কেননা সেই সকল বিষয় আমাদিগের গন্তব্য পথের সম্বল হইবে। প্রথমতঃ তাঁহারা যে মতের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য মর্কট-বংশোদ্ভব বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাঁহাদিগের শিক্ষা ভিন্ন জগতে আর কিছু আছে কি না। দ্বিতীয়তঃ—তাঁহারা যে বলেন, ইতর প্রাণীগণ উন্নতিলাভ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, একটি সামান্য কীট ক্রমে ক্রমে পতঙ্গ রূপে পরিণত হইয়া অন্তত প্রাপ্ত হয়, অতঃপরে উন্নতির শেষ অবস্থায় মনুষ্যত্ব লাভ করে;—ইহাই

উন্নতির মূল, এই ইচ্ছার বলেই জীব মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়; জগৎ এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত কি না?

এক্ষণে আমাদিগের দেখা আবশ্যক, এ কথা কতদূর সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। মনে করুন, যে পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়—হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে কত দিনের সুপ্ত আশা জাগিয়া উঠে—সেই মন-ভুলান পক্ষীর মনে হইল আমি আর আকাশে উড়িব না; রাজহংসের ন্যায় নদীহৃদয়ে তরঙ্গের গায়ে গায়ে ভাসিয়া বেড়াইব—স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া প্রাণ ভরিয়া সেই কলনাদিনী বহুদূর-প্রসারিণী চঞ্চল মালার শোভা বাড়াইব। জিজ্ঞাসা করি, সেই তেমন সুন্দর পাখী বা তাহার বংশের কেহই কি সে আশা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? জিজ্ঞাসা করি—তাহার বা সেই পক্ষী জাতির মধ্যে কাহারও রাজহংসের অবয়বের ন্যায় অঙ্গের কোন প্রকার সৌসাদৃশ্য ঘটিয়াছে কি? কৈ, তাহার ত কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবান বটপত্রে শয়ন করিয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু যেমন সৃষ্টি করিয়াছিলেন শুনিয়াছি—এখনও তাহাই আছে, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই—শত শত বর্ষ পূর্ব্বে বেদব্যাস তাঁহার মহাগ্রন্থে যে পক্ষীর যে যে রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন আজিও ঠিক সেই বর্ণনানুযায়ী পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়, কাহারও কিঞ্চিৎ মাত্রও ব্যতিক্রম হয় নাই—স্বভাবে, কার্য্যে বা অবয়বে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; তবে কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে, সামান্য কীট ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্য-আকার ধারণ করিয়াছে? স্বীকার করি—বানর বা অন্যান্য জীবের সহিত মনুষ্যের কিছু সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু সে সৌসাদৃশ্য কিসের? সে সৌসাদৃশ্য অবয়ব সম্বন্ধে নহে, প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে নহে; সে সৌসাদৃশ্য হিতাহিত বিচার ও সুখ দুঃখ অনুভব সম্বন্ধে। একটি বালককে তাড়না করিলে সে যেরূপ চীৎকার করে, একটা কুকুরকে তাড়না করিলে সেও সেইরূপ চীৎকার করিবে। আবার তাহাকে সাদরে আহার দিলে ও একটু যত্ন করিলে সে যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিবে, বালকও ঠিক সেইরূপ করিবে তাহাতে কিছুমাত্রও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে না। এই ইতর প্রাণীদিগের যেরূপ স্মরণশক্তি আছে তাহা মনুষ্যের ন্যায় ও কোন কোন স্থলে মনুষ্য অপেক্ষা অধিক এরূপও

দেখা গিয়াছে। তাহারা অবমানিত হইলে তৎপ্রতিহিংসার জন্য চেষ্টা করে, অধিক কি, সে প্রতিহিংসা বৃত্তি যতদিন না চরিতার্থ হয় ততদিন তাহা কেহ তাহাদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে সক্ষম হয় না—ইহা মনুষ্যেরও ধর্ম্ম বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাহারাও মনুষ্যের ন্যায় জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা প্রতি লক্ষ্য রাখে ও কিসে আত্মসুখের বিঘ্ন না ঘটে তদ্বিষয়ে সমান যত্নবান হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল জীব ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে? এ সকল সত্ত্বেও আমরা আর এক কথা বলি, মনুষ্যের যাহা আছে তাহা ইতর প্রাণীর নাই। পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন ;—“ Man speaks, but no brute has ever uttered a word. Language is our Rubicon, and no brute will dare to cross it.*” আমরা জিজ্ঞাসা করি, পণ্ডিত মোক্ষমূলরের পূর্ব্বোক্ত বাক্য গুলি শুনিলে উক্ত মহাত্মারা কি বলিতেন? তাঁহারা কি বলিতেন যে বানরদিগের বিকৃত স্বরই ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ লক্ বলেন ;—

If it may be doubted whether beasts compound and enlarge their ideas that way to any degree, in this, I think, I may be positive that the power of abstracting is not at all in them; and that the having of general ideas is that which puts a perfect distinction betwixt man and brutes. †”

আরও একটা কথা আছে। পশু পক্ষীদিগের উন্নতি নাই, সেই প্রাচীন কাল হইতে একই রকম চলিয়া আসিতেছে। বাবুই বা টুন্‌টুনি একই প্রকার বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে—তাহাতে শিক্ষার প্রয়োজন নাই, কোন আদর্শ দেখিবার প্রয়োজন করে না, অথচ সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্বকালে একজাতীয় পক্ষী একই প্রকার কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তবে কেমন করিয়া স্বীকার করিব যে ইতর প্রাণীদিগের ক্রমে উন্নতি লাভ হইতেছে?

কিন্তু মনুষ্য প্রতিদিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, দুই বৎসর

* Maxmuller's Ninth Lecture on the Science of Language.

† Locke's Essay on Human Understanding.

পূর্ব্বে যাহা লোকের মনে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল, আজি তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে; আবার আজ যাহা আমরা অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতেছি এমন সময় আসিতে পারে যে সেই সকল অসম্ভব কার্য্য কার্য্যে পরিণত হইবে। ইতর প্রাণীদিগের সেই প্রকার সমভাব দেখিয়া কে স্বীকার করিবে যে. পশু পক্ষী—বা মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণী—ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে, বা হইয়াছে? আমাদিগের এ কথার অনেকে বলিয়া উঠিবেন যে, যদি মনুষ্য ও ইতর প্রাণী এত বিভিন্ন ভবে তাহারা যে এক শ্রেণীভুক্ত এ কথা কোথায় রহিল? স্বীকার করি, মনুষ্য ও কোন কোন ইতর প্রাণী এক শ্রেণীভুক্ত,কিন্তু সে শ্রেণীত্ব অন্য কিছুতে নহে—তাহা কেবল সাদৃশ্যে। মনুষ্য আহার বিহার, সুখ সচ্ছন্দতা অভিলাষ করে, ইতর প্রাণীরাও তাহাই করিয়া থাকে। মনুষ্য আহার করে, বৃক্ষগণও মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করিয়া দেহ পুষ্টি করে; সেই রস দেহ মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত হয়। মানবদেহও ঠিক সেইরূপ। এই উভয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, তাই বলিয়া কি মানব দেহ ও উদ্ভিদ্ এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? না, উক্ত মহাত্মাদিগের ন্যায় স্বীকার করিব যে, উদ্ভিদ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়াছে? আধুনিক বিজ্ঞানতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Proctor বলেন যে ডারউইন আপনার অন্ধ বিশ্বাসের উপর এই অদ্ভুত প্রতিপাদ্যটি স্থাপন করিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন।* প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, মহাত্মা Proctorএর কথাই সত্য। এই কথা লইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক Mivart যখন ডারউইনের মতের পোষকতা করিতে গিয়াছিলেন তখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের অন্য সম্প্রদায় তাঁহার মত খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে স্পষ্টত Darwinএর ন্যায় ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। Mivart আজও আত্মপক্ষে তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। অথচ Mivart একজন বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সে সব কথার এখানে বিস্তৃত সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা ডারউইনের কথা বলিতেছি, সেই ডারউইনের মতে ভ্রমাত্মতা কি, তাহা বারান্তরে বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* See "Knowledge" July number of 1886.

নব সম্ভাষণ।

আজ বাছা ব'লেছে রে মা,
ডেকেছে রে বাবা ব'লে—
শৈশব কি ফিরে এল,
মা পুনঃ আদর করে?

কুলু কুলু নির্ঝরিণী,
স্বপন ভাঙ্গিল আজ—
নীল আলোভরা নভঃ
নামিল প্রাণের মাঝ।

সে কি রে অমৃত ভাষা
বলেছিল তমসায়
করুণা-প্লাবিত কবি
সম্পাত ফুরালে হায়!

তা চেয়ে মধুর বাণী
ভরিল রে মোর প্রাণ।
ভেসে যেন আসে কানে
অপ্সরা-কণ্ঠের গান।

বসন্ত-প্রফুল্ল ধরা
ধরে না এমন আশা,
এমন মধুর তা'র
শ্যামল পল্লবিত ভাষা।

বলে নি ধরারে কভু
নদীর করুণ প্রাণ
এমন মধুর কথা,
এমন তরল তান।

আজ এ প্রথম শুনি
বেদের পবিত্র গাথা,
আজ মানবের বাণী
হরিল রে সব ব্যথা।

মধুর প্রশংসা হেন
আছে কি রে এ ধরায়—
শিশু যবে বলে বাবা,
আদরেতে ডাকে মায়।

আজ দেববাণী মোর
পশেছে আঁধার ঘরে,
বাছা আজ বলেছেরে মা,
ডেকেছে রে বাবা ব'লে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

আমরা কি বিদেশী?

আমরা বিদেশী। ভারতবাসী আর্য্য ভারতের সন্তান নহে, ভারত তাঁহাদের মাতৃভূমি নহে। মধ্য আসিয়ার ভ্রমণশীল অসভ্য বর্ব্বর হিন্দুকুশ শিখর হইতে অবতরণ করিয়া, পঙ্গপালের ন্যায় ভারতে আপতিত হইয়াছিল। ইহারাই আদিম আর্য্য। পরস্বাপহারক, পররাষ্ট্রলুণ্ঠনপটু তাহারা ভারতীয় কোল, ভিল সাঁওতালগণকে দেশছাড়া, রাজ্যছাড়া, এবং ভিটাছাড়া, করিয়া এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে স্বায়ত্তাধীন করিল। এই পরাজিত, প্রপীড়িত আদিম নিবাসীগণ বিজেতার দৌরাত্ম্যে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল; যাহারা পলাইতে পারে নাই তাহারা দাসত্ব স্বীকার করিয়া আর্য্যগণের সেবায় রত রহিল। ইহারাই শূদ্রগণের পূর্ব্বপুরুষ। আর ব

বিজেতা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষ। "পাশ্চাত্য' নবাবিষ্কৃত, শিশু ভাষা-শাস্ত্র হইতে আমরা আমাদের এই পরিচয় পাইলাম। কেবল আমদেরই নহে; ইংরাজ, জার্ম্মণ, পারসীকাদি সকল সুসভ্য জাতিরই এই জন্মবৃত্তান্ত। পরিচয়টি নবাগণমান্য হইলেও, আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয়, সংসারে এ পরিচয় দিতে নারাজ হইবেন! বাস্তবিক কথাটা যেন কানে ঠেকে। দেখা যাউক, এ জন্ম-কোষ্ঠী পাশ্চাত্যগণ কোথা হইতে পাইলেন।

যে দিন হইতে য়ুরোপবাসী সংস্কৃতভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন - উইলসন, কোলব্রুক, সার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি মহোদয়গণ যখন আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহারা য়ুরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতভাষায় আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিয়া চমকিত হন। মন্থন-ব্যাপার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া চলিতেছিল। শেষে গ্রিম, বপ্, গোল্ডষ্টুকর অধ্যাপকগণ এই নবীন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত করেন। আমাদের ম্যাক্সমলারও আরও কত হলাহল উদ্গিত করিয়াছেন। অধুনা এই বিজ্ঞান শাস্ত্র বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসারের ঘটক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সকল জাতিরই বংশের খবর বলিতে পারে। এই অভিনব শাস্ত্র বলেন যে :—যেহেতু পৃথিবীর অনেক গুলি ভাষার মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বৈয়াকরণ প্রথায়, বাক্য বিন্যাস প্রণালীতে, শাব্দিক আকারে এবং অর্থে অনেক সাদৃশ্য আছে; অতএব যে কয়টি ভাষার মধ্যে অধিক ঘনিষ্ঠতা তাহারা একজাতীয়। এবং যাঁহারা এই সব সদৃশ ভাষা বলিয়া থাকেন, তাহারা অবশ্য আত্মীয় এবং একজাতি। সেই জন্য তাঁহাদের জন্মভূমিও পূর্ব্বে একস্থানে ছিল, এখন ছড়াইয়া পড়িয়াছেন! এই হিসাবে মানুষ আর্য্য, তুরাণী, সেমিতি এবং হাব্‌সী জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। সকল মানুষই এই চারি জাতির মধ্যে একজাতীয়। হিন্দু, ইংরাজ, করাসিস, পারস্য দেশীয় মুসলমান, কাবুলীরা একজাতি—আর্য্য! এই আর্য্যগণ বহুপূর্ব্বে মধ্য আসিয়ায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন তথায় বাস করেন; পরে সংসারে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

কথাটা মহা মহা পণ্ডিতের উক্তি, সুতরাং তাহা কাটিতে ভয় হয়। কিন্তু, একজাতি না হইলে, একস্থানে বাস না করিলে যে এক প্রকার ব্যবহার-সাদৃশ্য ভাষা-সাদৃশ্য হয় না, এমন কিছু কথা নহে। অন্য কারণও থাকিতে

পারে। আমরা সেই সব কারণের উদ্ভাবনা এবং আলোচনায় করিবার জন্য আজ এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

দেখা গিয়াছে যে, সমভাবে এবং একাবস্থায় যদি দুইটি জীব উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রকৃতি, গতি ও স্থিতি প্রায় এক প্রকার হইয়া থাকে। কারণ, জীব উৎপন্ন কালেই একটি প্রকৃতিকে অবলম্বন করে, ঐ প্রকৃতিই উহার গতি ও স্থিতিকে নিয়মিত করে এবং সৃষ্ট জগতে উহার জাতি ও স্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। ভ্রূণ জরায়ুতে মানবী প্রকৃতি অবলম্বন করিলে পর, তাহার মনুষ্যোপযোগী শরীর সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। যদি দুইটি ভ্রূণ এক জরায়ুতে, এক প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া তদনুযায়ী পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রায় সকল বিষয়েই এক হয়। মানুষের এক প্রকৃতি, সকলেই এক ভাবে উৎপন্ন হয়; তাই মনুষ্য মৌলিকতায় এক। গতি ও স্থিতি সকল মনুষ্যেরই প্রায় এক রকমের। শব্দ গতির একটি শারীরস্ফুরণ মাত্র। ভাষা ঐ শব্দ-সমবায়ের একটি যান্ত্রিক ক্রিয়া। সুতরাং মানব মাত্রেরই এক ভাষা হওয়া উচিত। তবে কেন ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য মধ্যে ভাষার পার্থক্য দেখি?—বিচিত্রতাময়ী প্রকৃতিই (বাহ্য প্রকৃতি) এই বৈষম্যের মূলীভূত কারণ। সত্য বটে জাতীয়ত্বের নিয়মানুযায়ী সকল মনুষ্যই সকল বিষয়ে এক হওয়া উচিত; সিংহ ভারতে ও যেমন, আফ্রিকাতেও তাই। কিন্তু মনুষ্য-সৃষ্টি-কৌশলের এই টুকু বাহাদুরী, মানুষ সৃষ্ট জীব হইয়া যেন স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত। কথাটা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল, একটু সরল ভাবে বুঝা যাউক। দেশের জল বায়ু, শীতোষ্ণতা এবং স্বাভাবিক স্থিতি ও ঋতু দ্বারায় মানুষের অনেক প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে। বস্তুতঃ মানুষের (সকল জীবেরই) দুইটি প্রকৃতি আছে। প্রথম জরায়ুজ অর্থাৎ মৌলিক প্রকৃতি—মানবী ধর্ম্ম, যাহা না থাকিলে মানুষ হওয়া যায় না; দ্বিতীয় হৈতুকী প্রকৃতি—অর্থাৎ দেশোপযোগী যে আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি মানুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে যদ্দারায় হিন্দুর হিন্দুত্ব, ইংরাজের ইংরাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে, যা... না থাকিলে বৈষম্য থাকে না, বিচিত্রতার মূল, তাহাই হৈতুকী প্র...তি। ... একটা দৃষ্টান্ত দ্বারায় এ কথাটা আর একটু সহজ ভাবে বুঝা যাউক। অথবা

ও কাফ্রি দুই জনেই মানুষ। ইংরাজের মধ্যে মৌলিক মানবী প্রকৃতি যতখানি বিকসিত, কাফ্রিতেও প্রায় ততখানি। ইংরাজও যেমন আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অধীন, কাফ্রিও তদ্রূপ। কিন্তু তত্রাচ হাবসী ও ইংরাজ আকাশ পাতাল তফাৎ। শিশু জন্ম গ্রহণ করিবার সময়ে সকল শিশুই এক, কিন্তু তাহার পরেই বৈষম্য স্থাপিত হয়। মৌলিক প্রকৃতির পার্শ্বেই বৈষম্যের আকর হৈতুকী প্রকৃতি জড় হইতে থাকে—অর্থাৎ জন্মভূমির জল বায়ু, আচার ব্যবহার, শিক্ষাদির সমষ্টি ভাব মাত্র তাহাতে সঞ্চিত হয়। ইংরাজ ইংলণ্ডে জন্মিয়াছে, তাই সে ইংরাজ, হাবসি আফ্রিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাই সে মনুষ্যাধম নিগর। আফ্রিকায় জন্মিয়াছে তাই বালিকা কদর্য্য কাফ্রিনী, ইংলণ্ড জন্মভূমি তাই সে ধরাসুন্দরী মেরি ষ্টুয়ার্ট। দোষ দেশের, দোষ জলবায়ুর। মৌলিক প্রকৃতিতে ছাঁচটি ঠিক করিয়া দেয়, হৈতুকী তাহা চাঁচিয়া ছুলিয়া মনের মত করে, তাহার উপর রসান দিয়া, মনোমুগ্ধকরী করিয়া দেয়। মৌলিক প্রকৃতিতে মনুষ্যের মনুষ্যত্বকে পশুত্ব হইতে পৃথক করে, হৈতুকী তাহার আভরণ যোগায়। মৌলিক প্রকৃতি খড়, মাটি, জল ও একমেটে মূর্ত্তি; হৈতুকী তাহার দো-মেটেম, তাহার রং—পুতুলের ডাকের সাজ সজ্জা! ইংরাজীতে হৈতুকী প্রকৃতিকে কথনও accident বলিয়া থাকে। ইংরাজ ভারতে অনেক দিন থাকিলে ক্রমে তাহার রং কালো হয়, একটু একটু করিয়া আচার ব্যবহার ও বিকৃত হইয়া পড়ে—এমন কি দুই তিন বৎসরের মধ্যে তাহার ইংরাজত্ব ঘুচিয়া যায়। তখন ইংরাজের হৈতুকী প্রকৃতি ভারতীয় হইয়া পড়ে, ভাষা উল্টাইয়া যায়, ভাব বিকৃত হয়। তখন ইংরাজের জিহ্বা 'ত' 'ট' র বিভিন্নতা বুঝিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ভাষা একটি যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র। ভাষা, ছোট ছোট, সামান্য সামান্য শব্দ ক্রিয়া গুলির সমষ্টি বৃহৎ ক্রিয়া—শব্দ সমবায়ে বাক্‌যন্ত্রে ভাবের সমুদ্ভাবনা। অতএব যান্ত্রিক বিভিন্নতানুযায়ী শব্দোচ্চারণ প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া পড়ে। হিন্দুর নাদ, স্বর ও রব যতটুকু বিমাণে প্রকাশিত হইয়া, যে ভাবে ধ্বনিত হইবে, ইংরাজের ঠিক সেই ভাবে ঐ ক্রিয়া হইলেও যান্ত্রিক পার্থক্য বশতঃ সব উল্টাইয়া যাইবে। মনে করুন একজন ইংরাজ ও হিন্দু পথিক মরুপ্রান্তে ভ্রমণ করিতেছে। দুইজনেই

তৃষ্ণার্ত্ত—দুইজনই জলের জন্য কাতর; কিন্তু ইংরাজ প্রাণের জ্বালায় বলিয়া উঠিল 'ওয়াটার' (water), হিন্দু যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া বলিল 'উদক'। দুই জনেরই মনোগত ভাব এক. এক আবেগে দুইজনই শব্দোচ্চারণ করিয়াছে, তবে একজনের জিহ্বা 'ওয়াটার' শব্দিত করিল, আর একজন 'উদক' বলিল কেন ? একটি শব্দ উচ্চারণ করিতে অনেক গুলি ক্রিয়া হয়। মানসিক ইচ্ছা স্নায়ু মণ্ডলে গিয়া আঘাত করে—মস্তিষ্ককে কেমন যেন একটু উদ্রিক্ত করে—স্নায়ুপর্ব্বগুলিকে যেন একটু কাঁপাইয়া দেয়। এই কম্পনে বা উদ্রেকে একটি যত্নের (Energy) উৎপত্তি হয়—যাহাকে ভগবান্ পাণিনি আভ্যন্তর প্রযত্ন বলিয়াছেন। আভ্যন্তর প্রযত্ন যে আবেগে (Intensity) বাক্-যন্ত্রকে উদ্বেলিত করিবে, ঠিক তত খানি পরিমাণে উহার বিবৃতি (expansion) এবং সংবৃতি (contraction) হইবে। এই বিবার, সম্বার অনুযায়ী বায়ু কণ্ঠ-নালী হইয়া, তালু, মূর্দ্ধণ্য অথবা অন্য কোন উচ্চারণ স্থানে আঘাত করিবে। এই আঘাতে জিহ্বা যে ভাবে নিপীড়িত বা সঙ্কুচিত হইবে, শব্দ ঠিক সেই ভাবে উচ্চারিত হইবে। শিশুকে যখন 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে বলা যায়, তখন সে যতটুকু প্রযত্ন করিয়া কথাটি উচ্চারণ করিবার উদ্যোগ করিবে, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই প্রায় ততখানি যত্ন করিয়া থাকেন; সমান যত্ন সকলেরই ব্যয়িত হয়। তবে যান্ত্রিক সংশ্রবের ব্যাপার কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়ে। বালক 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে যে টুকু চেষ্টা করাতে তাহার ফুলটির মতন কচি বাক্‌যন্ত্রখানি মুকুলিত (সংবৃত) বা প্রস্ফুটিত (বিবৃত) হইল, হয়ত তাহার চেয়ে আর একটু সংবৃতি ও বিবৃতি অধিক না হইলে 'রাম' উচ্চারণ হয় না। তা ছাড়া রসনা দেবী যে রীতিতে বায়ুবেগাঘাত ধারণ করিবেন সেই প্রকারেই শব্দের জ্যোতি বিকশিত হইবে। অথবা জিহ্বার ক্রিয়া দোষে এক বর্ণ উচ্চারণ করিতে তাহার সবর্ণ উচ্চারিত হইবে; যেমন বালকের কাছে 'রাম' 'লাম' হইয়া গেল। এইরূপেই 'রামের' লামত্ব, 'পিতৃ' শব্দের 'ফাদারত্ব', 'দুহিতৃ'র 'ডটারত্ব' এবং ভাষার পার্থক্য ... হয়। কি নিয়ম প্রণালীতে এই বিভেদ ঘটে তাহা বাক্‌বিজ্ঞানে ... কথা। যে দেশের লোকের জিহ্বা বেশী মোটা, তালু ... ভাষা আর আমাদের ভাষা পৃথক্ হইবে তাহাতে ... অথবা

এই বৈষম্যের মধ্যে একটু ভাবের, একটু উচ্চারণ প্রণালীর সাদৃশ্য দেখা যায়। দুই জাতির মধ্যে যত খানি সাদৃশ্য তাহাদের মধ্যে শারীর, যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক ঐক্য বা আত্মীয়তা ততখানি থাকিবে। মূলে সকলেই এক হইলেও হৈতুকী প্রকৃতির জন্য এত বৈষম্য ঘটে। যেমন জলপ্রপাত হইতে জল পড়িবার সময়ে সকল জলই সমান; কিন্তু ভূমি সংস্পর্শে উহা বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা দিগেদেশে প্রধাবিত হয়, এবং ভূমি গুণে নানা ভাবে সরল, বক্র হইয়া, মধুর বা ক্ষারত্বাদযুক্ত হইয়া ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন নদী হইয়া প্রবাহিত হয়, পরে সকলই মহাসমুদ্রে একভাবে পতিত হইয়া মিশিয়া যায়, তেমনি মানুষও যখন শুক্র, কৃমি এবং রক্তাণু সংযুক্ত হইয়া মানবী প্রকৃতি অবলম্বন করে তখন সকল মানুষই এক। কিন্তু মাতৃগর্ভানুযায়ী, ঔরস গুণে সাদা, কালো বা তাম্র রঙের হইয়া, শান্ত, দুষ্ট বা উদ্ধত হইয়া, অথবা মাতৃভূমির গুণে তেজস্বী, অধ্যবসায়শীল বা সুসভ্য হইয়া, নানা জাতি হইয়া, নানা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকম লীলাখেলায় প্রবৃত্ত থাকিয়া, পরে সকলেই সেই এক মহাকালসমুদ্রে নিজের অস্তিত্ব ডুবাইয়া দেয়। জলবিম্ব জলে উঠিল, দিনকর-করঞ্জিত হইয়া, কত ভঙ্গে, কত রঙ্গে, হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া মন ভুলাইয়া শেষে সেই মহাসমুদ্রে আবার গলিয়া গেল।

আমরা একরকম করিয়া দেখাইলাম কেন ভাষার পার্থক্য হয়। এখন আর একটি কথা আলোচনা করিতে বাকি রহিল। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন যে আর্য্যগণ পূর্ব্বে মধ্য আসিয়ায় বাস করিতেন—সেইটিই তাঁহাদের আদিম জন্মভূমি। তথায় তাঁহারা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, সেই মৌলিকভাষার ছেলেপুলে আধুনিক ইংরাজী, বাঙ্গালা, ফ্রেঞ্চ, পৌরাণিক, সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক ইত্যাদি। আমরা ভাষা-পার্থক্যের যে কারণ দেখাইলাম তাহাতে মানুষকে যে একস্থানে জন্মিতে হইবে এমন কিছু বাধ্য বাধ-
ক্তো৮ নাই। ভাষা ভাবের যান্ত্রিক সমুচ্চারণ। যে দেশের লোকের বাক্‌যন্ত্রের
সমবায়ে গঠন যেমন হইবে তথাকার ভাষা তেমনি হইবে। ইংরাজ ইংলণ্ডে
শব্দোচ্চারণ তাহার ইংরাজী ভাষা। ইংরাজী ভাষায় ইংলণ্ডীয় প্রকৃতি
বিমাণে প্রকা। তবে এটা মান্য বটে যে, বৈদেশিক সংস্রবে ভাষা অনেক
এ ক্রিয়া হইলেও আমাদের বাঙ্গালা ভাষা আজকাল দাঁড়াইয়াছে। যেমন-
—— ত ইংরাজ ও হিং

কীট যেমন ভারতে অণ্ড ছিন্ন করিয়া সুন্দর প্রজাপতি হয়, চীন দেশেও তাই হইবে। যেখানকার জলবায়ু তাহার প্রকৃতির পরিপোষক, সেইখানেই মনোহর প্রজাপতিতে পরিণত হইবে। মানুষ ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মানুযায়ী; ভারতেও যেমন পশুত্ব ত্যাগ করিয়া মানবীপ্রকৃতি অবলম্বন করে, আমেরিকায়ও তাই, আফ্রেরিকায়ও তেমনি। যেখানে যেখানে তাহার জন্মগ্রহণ-উপযোগী জলবায়ু, তথায়ই তাহার বিকাশ। অধ্যাপক ডারবিন মহাশয় বেশ সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে কেমন সামান্য জড় শক্তি বিকশিত হইতে হইতে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব অবলম্বন করে. এবং পরে আত্মবিকাশ হয়। ক্রমোন্নতি প্রণালী বুঝিলে আমরা বেশ বুঝিব যে "There is no cradle-bed of human existence"—মানুষের একটি সাধারণ জন্মস্থান নাই। মানুষ প্রকৃতির দাস—একটি ফুটন্ত ফুল। যেখানে হুকুম হইবে, সেইখানেই তেমনি ভাবে ফুটিতে হইবে। শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট শুনিয়াছি যে, মনুষ্য শরীর যে ভাবে ও যে উপাদানে গঠিত তাহাতে শীত-প্রধান দেশ তাহার জন্মভূমি কখনই হইতে পারে না। শীতোষ্ণ আবর্ত্ত (Temperate zone)ই তাহার বিকাশভূমি। বাস্তবিক সাধারণ যুক্তিতে দেখিতে গেলে ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্যগণ যে কি দেখিয়া বলিলেন যে মানুষ একস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আবার সোণার সংসারের কত স্বর্গোপম স্থান গেল, মধ্য আসিয়াই (আধুনিক মতে বাল্টিক উপকূল) তাঁহাদের আদি মাতা। কথাটায় আমরা যেন একটু যাই-বেলী গন্ধ পাই। প্লেভ্‌না-বীর স্কবেলেফ যখন মধ্য আসিয়া জয় করিতে আইসেন, তখন তাঁহার সমভিব্যাহারী কতিপয় ইঞ্জিনিয়ার কাস্পিয়ান উপকূল হইতে ভাতার দেশ পর্য্যন্ত জরীপ করেন। তাঁহারা বলেন, যে মধ্য আসিয়া বড়ই আধুনিক। কিছু পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। ভূতত্ত্ব (geology) ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যেখানকার ভৌতিক প্রকৃতি এখনও পরিপুষ্ট হয় নাই, যেখানকার ভূমি এখনও লবণাক্ত; মানুষ সেখানে কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা বুঝি, মানুষ একেবারে মানুষ হইয়া পতিত হইয়া সংসারে পড়ে নাই। ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী, কুল অথবা

একটু একটু ফুটিতে ফুটিতে যেন কত সন্তর্পণে, যেন কত সাবধানে, যেন কত ভয়ে ভয়ে মানুষের অস্তিত্ব সংসারে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সমগ্র সৃষ্ট সংসার তিল তিল করিয়া, গণিয়া বাছিয়া, সকল শক্তির সকল জৈবীভাব সমষ্টি করিয়া মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব যেখানকার ভৌতিক, স্বাভাবিক, আকৃতি, প্রকৃতি পরিপুষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন তথায়ই মানুষের প্রথম আবাস স্থান। শুনিলে হাসি পায়, যে, মরুপ্রদেশ মধ্য আসিয়া অথবা তুষারাবৃত (Sweden) সুইডেন ও বাল্টিক উপকূল মানুষের প্রথম জন্মভূমি। মিষ্টার পেঙ্কা ও লেথাম এই দ্বিতীয় মতের সমর্থক। অনাবশ্যক বোধে উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সকল কথার সমালোচনা করিব না। তবে মোটা কথা এই বলিতে চাই যে, যাহা এক মন্বন্তরার (geological age) পূর্ব্বে তুষার নদীতে আবৃত ছিল, এখন যেখানে তুষার-রেখা ভূমি স্পর্শ করিতেছে, সেইটি কি মানুষের আবাসভূমি হইতে পারে? মানুষ সকল স্থানেই নিজ বুদ্ধির সাহায্যে থাকিতে পারে, তবে তাহার আদি ও প্রাকৃতিক উৎপত্তি শীতোষ্ণ প্রদেশে— স্বভাবের লীলা ভূমিতে হইয়াছে।

তাহার পর জাতি-নির্ণয়। পাশ্চাত্যগণ, মানুষকে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছে—আর্য্য, তুরাণী, সেমিতি ও হাবশি। সার্ব্বভৌম সম্রাট নেপোলিওন যেমন একদিন য়ুরোপ খণ্ডকে বিলাইয়া, ছড়াইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছেলে খেলা করিয়াছিলেন, আজকাল আমাদের শিক্ষক মহোদয়গণ বিজ্ঞানের খাতিরে, মানব মণ্ডলীকে ভাঙ্গিতেছেন গড়িতেছেন—জাতি নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গণের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যের তারতম্য দেখিয়া তাঁহারা এই চারিটি থাক্ করিয়াছেন। সমগ্র য়ুরোপবাসী (কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ভিন্ন), হিন্দু, পারসী, কাবুলী সকলেই আর্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যৌলিকতায় মানুষ এক; তবে হৈতুকী প্রকৃতির জন্য যত বৈষম্য ঘটে। অন্তর্জাতিক ব্যবহারে ও বাণিজ্যে ভিন্ন জাতিগণের মধ্যে সাদৃশ্যটা বজায় থাকে। সম্বন্ধিত আর্য্যজাতির মধ্যে এত অধিক সাদৃশ্য থাকার কারণ আছে। মাননীয় শ... ফোর্ড সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন যে "India, south of the Ganges, বিমা... peculiarly deficient in this respect; and the chief reason এ... কি the greater part of this region has been chiefly in the

' ভ. ই৹

condition of dry land from very early times." মোটামুটি কথা এই যে, আর্য্যাবর্ত্ত অন্যান্য দেশের বহুপূর্ব্বে সমুদ্র গর্ভোত্থিত হইয়া জীবের আবাসভূমি হইয়াছে। যে সব স্থল জীব নিবাসভূমি ছিল, অধুনা কালের বিচিত্র গতিতে সে সব প্রদেশ পয়োধি-গর্ভে নিহিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল প্রাচীন দেশ নিচয়ের সমসাময়িক আর্য্যাবর্ত্ত এখনও মানব নিবাসস্থল থাকিয়া কল্পকল্পান্তরিক বিদ্যাবুদ্ধির, যশ সমৃদ্ধির ভূষণ অঙ্গে রাখিয়া এখনও সংসার-শীর্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভারত সংসারকে অন্নপূর্ণার ন্যায় জ্ঞান বণ্টন করিয়াছেন—আজিও সে সদাব্রত, সে অন্নচ্ছত্রের ধূম কমে নাই। ভারতের জ্যোতিষ, ভারতের রসায়ণ, ভারতের শিল্প, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, ভারতের মণিমুক্তা হীরা চুনি সমগ্র পৃথিবীকে শোভিত, ধন্য, মান্য, গণ্য, জ্ঞানী করিয়াছে। গ্রীকগণ আমাদের খাইয়া মানুষ, রোমীয় আমাদের ধনে ঐশ্বর্য্যশালী, আবার সেই গ্রীক ও রোমের খোলায় বর্ত্তমান য়ুরোপ নির্ম্মিত। পারস্যের জেন্দাবেস্তা ভারতের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের আভাস লইয়া প্রণীত। সেই পূর্ব্বতন অগ্নিহোত্রী পারসীগণের রক্তে বর্ত্তমান পারস্য গঠিত। তাই এই সকল জাতিগণের মধ্যে এত বেশী সাদৃশ্য। আবার পুরাণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, কত ক্ষত্রিয় শবরত্ব, যবনত্ব, বা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়া কত স্থান নিবসিত করিয়াছিলেন। এততেও যদি সাম্য না থাকিবে তবে কিসে থাকিবে ?

বিচিত্র বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির রাজ্যে সব যেন চড়াইয়া পড়ে। এই বিচিত্রতা কেমনে সংসাধিত হয় পাশ্চাত্যগণ যে দিন ইহা জানিতে পারিবেন, সেই দিনই আর্য্যঋষিগণের বাক্‌বিজ্ঞানের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। বুঝিবেন, কি রকম রাসায়ণিক, কি রকম ভৌতিক ক্রিয়া হইলে সাদা চামড়া কালো হয়, কি খাইলে কি করিলে খঞ্জনগঞ্জন নয়ন কটা হয়, কতদিন কি ভাবে বিলাতে থাকিলে বাঙ্গালী পুরা সাহেব হইবে। তখন বুঝিবেন, আহার ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি কতখানি পরিবর্ত্তিত হয়। তখন বুঝিবেন, সামান্য শাক সবজী খাইলেও ধীরে ধীরে প্রকৃতির গতি কত উল্টাইয়া যায়। তখন বুঝিবেন, নবমীতে নারিকেল খাইলে অথবা

অরোদনীতে বার্ত্তাকু খাইলেও কি অনিষ্ট সংঘটিত হয়—যে সব শাস্ত্রীয় অনুশাসন বাক্য লইয়া আজকাল এই অধম বাঙ্গালীর ছোট বড় প্রায় সব রকমের লেখকগণই হিন্দুশাস্ত্রকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সামান্য কারণে, সামান্য সংস্পর্শেও একজাতির হৈতুকী প্রকৃতি বিকৃত হয়। যেমন তড়িত গতি একটু বাধা পাইলে অমনি [illegible], [illegible] ছুটিয়া চলিয়া যায়, প্রকৃতিও এমনি চপল, এমনি নরম যে ভিন্ন প্রকৃতির একটু সংস্রবে ভিন্ন দেশীয় একটু বাতাসে [illegible] টলিয়া [illegible] কিম্বা যায়—সঙ্কুচিত হইয়া যায়। তাই শাস্ত্রকারগণের এত অনুশাসন—এত সাবধানতা!

তবে কি আমরা বিদেশী নহি? ভারতবর্ষ কি সত্য সত্যই আমাদের আদি নিবাসভূমি? ভারতবর্ষ প্রকৃতির লীলাভূমি, যতপ্রকারের বিচিত্রতা থাকিতে পারে, যতবিধ বৈষম্য সম্ভবে, ভারতে তাহা সবই বর্ত্তমান। মানবী প্রকৃতি যে এখানে বহুপূর্ব্বে বিকশিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? হইতে পারে সোণার ভারত দস্যুর আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ হইয়া লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইয়াছে। বিদেশী স্বর্গোপম স্থান দেখিয়া বাস করিতে পারেন। কিন্তু ভারতের আর্য্য ভারতেরই। ভারতের ব্রাহ্মণের, ভারতের বৈশ্যের, ভারতের ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্বপুরুষ কোন বিদেশী লুঠেরা নহে। ভারতের শূদ্র রাক্ষস-বংশাবতংস নহে। আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ভারতীয় প্রকৃতি মিশিয়া মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দুর্ম্মতি হইয়াছে, তাই পাশ্চাত্য-মথিত এই হলাহল পান করিতে প্রস্তুত। পাশ্চাত্য আমাদের শাস্ত্র মথিত করিয়া বলিল, ঋষিগণ গোখাদক ছিলেন, আমরা অমনি মস্তকাবনমন করিয়া তাহাই স্বীকার করিলাম। অমনি জাতিভেদ উড়িয়া গেল, শাস্ত্র ডুবিল, মনুস্মৃতি কর্ম্মনাশায় ভাসিল। না জানি, আরও কি কপালে আছে!

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প রসায়ন।

আমাদের মত পরমুখাপেক্ষী জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই। সভ্য বলিয়া আমাদের বড়ই অভিমান। ঘর দ্বার, বাগান বাগিচা, ঘড়ি জুড়ি, রঙ তামাসা আমাদের সবই আছে। সখের অবধি নাই—সব দিকেই কেতাদুরস্ত, ফিটফাট। কিন্তু কি করিলে এই সখ প্রকৃতরূপে বজায় থাকে তাহা আমরা জানি না। আমাদের আছে সব, কিন্তু কিছুই নাই। একটি সূচ বা দিয়াশালাইয়ের জন্য সাত সমুদ্র তের নদী পারের পথে হা করিয়া থাকিতে হয়। আজকাল অনেকে এ পরপ্রেক্ষিতার লাঞ্ছনা বুঝিতেছেন, কিন্তু কিসে ইহার সম্যক্ দূরীকরণ হয়, কিসে এ অভাব পূরণ হয়, দেশের টাকা দেশে থাকে, দেশের সখ দেশে মেটে, দেশের টাকায় দেশীয় লোকের শূন্য উদর পূরণ হয়, সে বিষয়ে সকলেই সেই সমান উদাসীন, সমান নিশ্চেষ্ট, সমান নিষ্ক্রিয়। বড় বড় বিষয়ের কথা এখন থাক। যে সব সামান্য সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে বিলাত আমাদের এত কষ্টের ধন প্রতিদিন রাশি রাশি পরিমাণে লইয়া গিয়া আপনার ভাণ্ডার বোঝাই করিতেছে,—আমরা যথাসাধ্য কল্পনায় নিয়মিতরূপে সেই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের অভাব যে উপায়ে দূর করিতে পারা যায় এই প্রবন্ধে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পুস্তক কিম্বা কাগজের পার্শ্বে স্বর্ণের গিলটি করণ প্রণালী।

প্রথমে দপ্তরিদিগের প্রেসে পুস্তক কাৎ ভাবে রাখিয়া দৃঢ়রূপে প্যাচ আঁটিবে। পরে, আরমেনিয়ান বোল নামক দ্রব্য এবং মিশ্রি (মিছ্‌রি) এই উভয় দ্রব্য সমভাগে কিঞ্চিৎ জল দ্বারা পেষণ করিয়া চট্‌চটে আটার ন্যায় করিবে। তৎপরে ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শুক্লাংশ সংযোগ করতঃ তুলি অথবা ব্রুস দ্বারা পুস্তক বা দিস্তা বাঁধা কাগজের পার্শ্বে মাখাইবে। পুস্তক পার্শ্বে উক্ত মাখান দ্রব্য শুষ্কপ্রায় হইলে, রসানকাটি (রসায়নকার বা বার্ণিসকারেরা এক প্রকার প্রস্তর ব্যবহার করিয়া থাকে) দ্বারা পুস্তক পার্শ্ব

ঘর্ষণ করিয়া জমি সমান করিবে, এবং একখণ্ড স্পঞ্জ পরিষ্কৃত জলে ডুবাইয়া, নিংড়াইয়া ঐ জমিকরা স্থান ভিজাইবে। তদনন্তর স্বর্ণপত্র (তবক) মাপ করিয়া কাটিয়া ভিজান স্থানে বসাইবে এবং রগানকাটি দ্বারা সকল দিক সমান করিয়া রগান করিবে। এরূপ সাবধান হইয়া রগানি করা উচিত, যেন কোন স্থানের কাগজ কাটিয়া না যায়। একখণ্ড রেশমের বস্ত্র স্বর্ণের উপর স্থাপন করিয়া রগান করিলে কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর, সোণা বসাইবার সময় তুলা দ্বারা স্বর্ণপত্র তুলিলে ছিঁড়িবে না। কাজটি একটু সাবধানে করা আবশ্যক।

অয়েলপেন্‌টিং চিত্রপট ধূম কিম্বা ধুলা লাগিয়া মলিন হইলে পরিষ্কার করণোপায়।

প্রথমতঃ অশ্ব বা গোরুর পুরাতন মূত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ গুলিয়া তাহাতে পশমের বস্ত্র ভিজাইয়া তদ্দ্বারা চিত্রপট সকল মুছিবে। যখন দেখিবে পটগুলি পরিষ্কার হইয়াছে, তখন এক খণ্ড স্পঞ্জ নির্ম্মল জলে ভিজাইয়া উক্ত চিত্রপট ধৌত করিবে এবং শুষ্ক হইলে পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া রাখিবে।

(গ্লাস) কাচের উপর ছবি বা অক্ষরাদি অঙ্কিত করিবার উপায়।

কোন কাচ পাত্রে ছবি বা অক্ষর খোদিত করিতে হইলে প্রথমে মোম এবং আল্‌কাত্‌রা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতাপে দ্রব করিবে। তৎপরে খোদাই করিবার পাত্রে একপার্শ্বে উক্ত দ্রবিত পদার্থ মাখাইয়া শুষ্ক হইলে বুলি বা নরুন দ্বারা যেরূপ ইচ্ছা, লতা পাতা, মনুষ্য পক্ষী বা যে কোন মূর্ত্তি খোদিত করিয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢালিয়া দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে। তৎপরে তার্পিণ তৈল দ্বারা উক্ত মোম, আল্‌কাত্‌রা উঠাইয়া ফেলিবে। কাচের উপর অতি সুন্দররূপে চিত্রসকল অঙ্কিত হইবে।

জুতার কালি প্রস্তুত করণ প্রণালী।

আইভারি ব্লাক্ দেড় ছটাক, কোত্‌রা গুড় এক ছটাক, অর্দ্ধ আউন্স ভিনিগার (ছির্কা), সুইট অয়েল অর্দ্ধ ছটাক, তুঁতে অর্দ্ধছটাক এই সমস্ত

দ্রব্য পৃথক পৃথক রাখিয়া দিবে। পরে সুইট অয়েল, কোতরা গুড় ও আইভরি ব্লাক এই ৩টী দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিবে। কাইয়ের মত হইলে, তুতিয়া, ভিনিগার এবং জল ক্রমে ক্রমে তাহাতে সংযোগ করিয়া মর্দ্দন করিবে। কিয়ৎকালের মধ্যেই তাহা হইতে উৎকৃষ্ট জুতার কালি প্রস্তুত হইবে। আমরা সচরাচর যেরূপ বিলাতী জুতার কালি ব্যবহার করি, ইহা তদপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট হইবে না। উপায় সহজ, ব্যয় যৎসামান্য মাত্র।

অদৃশ্য কালি।

ডাইলিউট সলফিউরিক এসিডে নূতন কলম দ্বারা পত্র লিখিয়া অগ্নিতাপ দিলে কাল বর্ণের লেখা বাহির হয়। আজ কাল আমাদের দেশে পোষ্ট-কার্ডের চলন হইয়াছে; যাঁহারা তাহাতে বন্ধু প্রভৃতিকে, অপরের অজ্ঞাতব্য কোনও বিশেষ সংবাদ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ইহা ব্যবহার করিয়া দেখিবেন।

চিতি পড়িলে তাহা বস্ত্রাদিতে উঠাইবার প্রকরণ।

বস্ত্রের যে স্থানে চিতি পড়িয়াছে সেই স্থানে উত্তমরূপে সাবান ঘসিয়া, পরে উত্তম চা খড়ি চাঁচিয়া, ঐ গুড়া দিয়া উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিবে। তদনন্তর, ঘাসের উপর বিছাইয়া শুষ্ক করিবে এবং পুনরায় জল ভিজাইয়া দুইবার ঐরূপ করিলে, চিতির দাগ উঠিয়া যাইবে। গ্রীষ্ম ও বর্ষকালে বস্ত্রা-দিতে, বিশেষ জামা ও পিরাণে প্রায়ই এইরূপ চিতি ধরিয়া থাকে, দেখিতে অতি কদর্য্য, এমন কি সে জন্য নূতন কাপড়ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, ভদ্রলোক তাহা আর ব্যবহার করিতে পারেন না। ধোবা সে দাগ তুলিতে পারে না। অথচ ইহা নিবারণের উপায়টি অতি সহজ। সকলের ইহা জানা আবশ্যক।

[ক্রমশঃ

শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক।

সমালোচনা।

বিধবা বিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা।— সমালোচক শ্রীঃ গণ্ডূষ-জল-সঞ্চারী সফরঃ। সমালোচক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি সবিনয়ে নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার মত অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিনয়ই যোগ্য। অনন্ত, অতলস্পর্শ হিন্দুশাস্ত্র সমুদ্রে সন্তরণশীল বৃহৎ মৎস্য মধ্যে আপনাকে না ধরিয়া গণ্ডূষপ্রমাণ জলের সফর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, গণ্ডূষপ্রমাণ জলে সন্তরণকারী সফর যেমন ক্ষণকাল মধ্যে প্রাণ হারায়, তিনিও বিধবা বিবাহ-সমর্থনকারী পণ্ডিতগণের তর্কে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে অভয়দান করিতেছি। তাঁহার যুক্তিপ্রণালী আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে তিনি যে জয়ী হইয়াছেন, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। তিনি যে প্রণালীতে বিধবাবিবাহ-বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা বিধবাবিবাহ পক্ষীয়গণের বিষম চিন্তার বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

সমালোচক অনেক প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন, বিধবাবিবাহ-প্রবর্ত্তক শাস্ত্র অতি অল্প, নিষেধক শাস্ত্রই প্রায় সমস্ত। এবং যাঁহারা ঐ অল্প কয়স্থলে বিধি দিয়াছেন, তাঁহারা সহস্র স্থানে ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বর্তমান ক্রমোন্নতি যুক্তিবাদ (Evolution theory) ধরিয়া বিচার করিলে যেমন সত্যযুগের (হিন্দুসমাজের আদিম সভ্যাবস্থার) প্রথমভাগে প্রচলিত রাক্ষস পৈশাচাদি প্রভৃতি নিকৃষ্ট বিবাহ-প্রণালী, এবং কানীন, সহোঢ়, গূঢ়োৎপন্ন প্রভৃতি সন্তান ক্রমে লোপ পাইয়াছে, বিধবাবিবাহ সেইরূপে এককালে কোন কোন স্থানে প্রচলিত থাকিলেও সমাজের উন্নত অবস্থায় তাহা হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

তার পর তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে পরাশর সংহিতা বিধবাবিবাহ-সমর্থনকারীদের ব্রহ্মাস্ত্র, তাহা অন্যান্য মুনিঋষির, বিশেষতঃ মনু অর্থাৎ ভৃগুসংহিতার নানা বচন কোন স্থলে অবিকল ও কোন স্থলে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত বচনাবলী ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩য়তঃ। 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো' "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি যে বচনটীর উপর বিধবাবিবাহ পক্ষ হইতে বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক-অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পরাশরমুনি নিজোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ ধর্ম্মের তারতম্য দেখাইবার জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, কলিযুগে আচরণীয় বলিয়া উদ্ধৃত করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ এই দুইটী তাঁহার নিজের বিধান—ইহাই কলিযুগে আচরণীয় এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য গ্রন্থকার ক্রমে ক্রমে দ্বাদশটী হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহের অনুকূল বলিয়া যে সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকদ্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সমালোচন ও খণ্ডন করিয়াছেন।

৪র্থতঃ। পরাশর-মতে বিধবাবিবাহ বিধিসিদ্ধ ভাবিয়া লইয়া পরাশরের অনেক মত যেমন অপ্রচলিত রহিয়াছে, লৌকিক যুক্তি অনুসারেও ইহা প্রচলিত হওয়া উচিত নহে, এ কথাও প্রমাণ করিয়াছেন।

সমালোচকের যুক্তি প্রণালীর সম্যক বিচার করিতে গেলে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক হইয়া পড়ে; সুতরাং আমরা হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণের প্রতি সে ভার অর্পণ করিয়া অবসর লইলাম।

কিন্তু আমাদের একটী বক্তব্য আছে। সমালোচক বলেন, "মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইলে বালিকা বিধবার সংখ্যার যাহাতে হ্রাস হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও সেই জন্য বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দেওয়া উচিত।" এই বলিয়া তিনি লিখিতেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ-নিবারক প্রস্তাব সর্ব্বাংশে শাস্ত্রীয়। বহুবিবাহ এখন ঘৃণিত হইয়া পড়িয়াছে ও দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। আমাদের বিবেচনায় প্রথম কারণ—শাস্ত্রীয় যুক্তিই এ প্রথা উন্মূলনের প্রধান হেতু; সকল প্রথাই শাস্ত্রানুযায়ী পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হওয়া উচিত। তিনি যে লোকের ঘৃণার কথা বলিয়াছেন, সেই "লোক" শব্দটা বড়ই গোল বাধাইয়াছে। সমালোচককে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে এমন কয়জন লোক বর্ত্তমান, যাঁহাদের মতামত—কোন প্রথার প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ সমগ্র হিন্দুসমাজ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারে? বহুবিবাহ যে ক্রমে উঠিয়া গিয়াছে তাহা শাস্ত্রীয় বলিয়াই উঠিয়া গিয়াছে। বহুবিবাহ-প্রথা মনুষ্যত্বের যথেষ্ট হানি করিতেছিল।

হিন্দুজাতির যে একমাত্র অবশিষ্ট গৌরব—নারীজাতির সতীত্ব তাহার মূল শিথিল করিতেছিল। নিষ্ঠুরতা, দারিদ্র প্রভৃতি শত শত ভীষণ পাপ ও অত্যাচার-স্রোত ভয়ঙ্কর প্রবল করিতেছিল। সেই পশুভাব সকল আমাদিগকে এই অত্যাচার দমনে উত্তেজিত করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারদের যে মূল উদ্দেশ্য—সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের যে গূঢ় তাৎপর্য্য, মনুষ্যকে যাবতীয় পশুভাব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা, মনুষ্যকে পূর্ণ মনুষ্য করা, মনুষ্যজাতি যাঁহার অংশমাত্র, তাঁহার অংশ বলিয়া পরিচিত হইবার প্রকৃত উপযোগী করা, সেই মহান্ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই আমরা বহুবিবাহরূপ অপকৃষ্ট প্রথা ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, হিন্দুজাতির প্রাচীন জাতীয় ভাবের—যাহার মূল মন্ত্র, প্রাণ দিয়া মান রক্ষা করা, শরীরের সুখ—ক্ষণস্থায়ী সুখ, বাহ্য সুখ সম্পদ অপেক্ষা মনের প্রকৃত সুখ, স্থায়ী, অনন্ত সুখ, যাবতীয় সৎবৃত্তির সম্যক অনুশীলন দ্বারা চিত্তের প্রসাদ, মনের পূর্ণ শান্তি, হৃদয়ের পূর্ণানন্দকে সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা আজিও সেইভাবের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট আছে বলিয়া হিন্দু বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী, বিধবাবিবাহের বিরোধী, জাতিভেদের পক্ষপাতী, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী, একান্নবর্ত্তী প্রথার পক্ষপাতী ইত্যাদি প্রাচীন মতাবলম্বী হিন্দু এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিকৃতমস্তিক নব্য হিন্দুর মধ্যে প্রভেদের মূল ও গূহ্য কারণই এই। সুতরাং সমালোচক যে আক্ষেপ করিয়াছেন "অনেকে বাল্যবিবাহকে ঘৃণা করে, কিন্তু শাস্ত্রীয় জ্ঞানে এখনও অধিকাংশ লোক ঐ ঘৃণিত ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না," তাঁহার এ আক্ষেপ রহিয়া যাইবে। বাল্যবিবাহ যদি বাস্তবিকই অনিষ্টের কারণ হইত, তবে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রে ইহার সপক্ষে বিধি থাকিত না। বালবৈধব্যের কারণ বাল্যবিবাহ নহে। নিয়তিই যে ইহার প্রধান কারণ, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অবশ্য আমরা গর্ভে অবস্থানকালে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখা এবং ৪।৫ বৎসরের বালিকার বিবাহের বিরোধী। যে যে স্থানে এরূপ বিবাহ প্রচলিত, সে দেশের লোকেরা শাস্ত্রদ্রোহী। হিন্দুজাতি হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত। দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হওয়া যদি অনেক পরিমাণে শারীরিক নিয়ম সম্পূর্ণরূপে রক্ষার প্রতি নির্ভর করে, তবে অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ার দায়ী

কে? যে পুরুষ ৮ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করিয়া বালিকার ৯ বৎসর বয়সে মরিয়া গেলেন, তিনি ১৫ বৎসরের যুবতীকে বিবাহ করিলে কি শতবর্ষায়ু হই-তেন? যাহা হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিবার স্থান এ নয়। এক্ষণে পাঠকগণ দেখিবেন, সমালোচক বাল্যবিবাহের বিরোধী একটীও শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে না পারিয়া, তৎপক্ষীয় বচন হইতে নিজ মত সমর্থন করিতে গিয়া সত্যের অপলাপ চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। যিনি অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রের এতদূর পক্ষপাতী, শাস্ত্রের ভিত্তির উপরেই যিনি বিধবাবিবাহ পুস্তক গঠিত করিয়াছেন, তাঁহার মত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ নিতান্ত গর্হিত হইয়াছে। বালবৈধব্য নিবারণ পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট উপায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ, অন্তর্দর্শী ব্যক্তিগণ তদুদ্ধার, প্রচার ও পালনের চেষ্টা করিলেই ত ভাল হয়।

ভারত-কুসুম। কবিতাহার এবং ভারতকুসুম রচয়িত্রী এতদিন আত্ম নাম প্রকাশ করেন নাই। অধুনা, তিনি ভারতী এবং কল্পনায় নাম স্বাক্ষর করিয়া কবিতা লিখিতেছেন। তাঁহার আধুনিক কবিতাগুলি,—"গ্রাম্য-ছবি", "ছাই" প্রভৃতি, তাঁহার কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত পরিচয় দিতেছে। কবিতাহার এবং ভারতকুসুম, তাঁহার অল্প বয়সের লেখা, অপরিপক্কাবস্থার ফল। কিন্তু বালিকার ক্রীড়াক্লান্তাবস্থায়ও ভবিষ্য রূপ-মাধুরীর আভাস পাওয়া যায়।

সাহিত্যের দোষ গুণ বিচারকালে আমরা নারীজাতির প্রতি পক্ষ-পাতিত্বের ধার রাখি না। গিরীন্দ্রমোহিনীর সম্মুখে যশোপথ বিস্তারিত রহিয়াছে, একটুমাত্র উদ্যমের অপেক্ষা।

পারিবারিক চিকিৎসা বিধান। প্রথম ভাগ। ডাক্তার শ্রীনন্দ-লাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য একটাকা চারি আনা। আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা সফল হইয়াছে। সাধারণ রোগ সমূহের চিকিৎসা করিতে হইলে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, গ্রন্থকার অতি সরল ভাষায় তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত

করিয়াছেন। তাঁহার আর এক বিশেষ ক্ষমতা এই, তিনি যে প্রণালীতে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা সহজেই সাধারণ লোকের বোধগম্য হইবে। পরিবারের মধ্যে রোগ হইলেই যে ডাক্তার না ডাকিয়া নিজে তাহার চিকিৎসা ভার গ্রহণ করিবে, আমরা এ মতের পোষকতা করি না, কারণ, তাহাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত ফল দর্শে, তবে ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইলেও যদি গৃহস্থের চিকিৎসা বিদ্যা কিছু কিছু জানা থাকে, তবে তাহাতে অনেক সময় যে বিশেষ উপকার হয়, তাহা গৃহস্থ মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। আর এক কথা, এখন পল্লীগ্রামের অবস্থা দিন দিন যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এরূপ পুস্তকে অনেকটা উপকার হইতে পারে; কারণ, সামান্য জ্বর, সর্দ্দি, পেটের পীড়া প্রভৃতি সাধারণ রোগে প্রতিবার ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসা করাইতে সামান্য অবস্থার গৃহস্থ লোকে সক্ষম হইতে পারে না। বিলাতে এমন গৃহস্থ বিরল যাহার গৃহে সাধারণ রোগ সমূহের ঔষধ বা চিকিৎসা-পুস্তক নাই। কিন্তু আমাদের দেশে এখনও সে সময় উপস্থিত হয় নাই। এ দেশের অধিকাংশ লোকেই অশিক্ষিত। তবে, আশার কথা—আজ কাল অনেকেই লেখা পড়া শিখিতেছেন, অনেকেই এ প্রকার পুস্তকের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র যে মোটামুটি রকম সকলেরই জানা উচিত তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ, যাহাদিগকে ছেলেপুলে লইয়া ঘর করিতে হয়, তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন। আগে প্রাচীনারা গাছ গাছড়া দিয়া জ্বরজাড়ি আরাম করিতেন, তখন গৃহিণী মাত্রেই প্রায় কিছু না কিছু ঔষধ পালা জানিতেন। এখন সে দিন কাল নাই। গৃহে গৃহে ইংরাজি চিকিৎসা প্রবেশ করিয়াছে। রোগও সদাই লাগিয়া আছে। এ সময়ে সকলেরই ঘরকরা-মত কিছু কিছু চিকিৎসা জানা আবশ্যক। সেজন্য, পুস্তকও আজ কাল অনেক বাহির হইতেছে। আমরা তাহার যতগুলি দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এখানি, প্রথম শ্রেণীর স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পুস্তক পাঠে কেবল গৃহস্থ কেন অনেক পল্লীগ্রামের ডাক্তারেরও উপকার হইতে পারিবে।

কমলা দেবী। [ঐতিহাসিক উপন্যাস।] শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ প্রণীত। মূল্য দশ আনা। কমলা দেবী জগদ্বিখ্যাত

আকবর বাদসাহের হৃদয়েশ্বরী। আকবর তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া আপন হৃদয়রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কমলা ভারত সম্রাজ্যের একাধিশ্বরী হইয়াও পরিতৃপ্তা নহে. বৃদ্ধ আকবরের সহবাসে তাহার প্রণয়-পিপাসা মিটিল না। এই সময় বাদসাহের প্রধান সেনা-নায়ক প্রসিদ্ধ বীর মানসিংহ কমলার নয়ন পথের পথিক হইল, কমলা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া আপনার জীবন, যৌবন, মন, প্রাণ সমস্তই মানসিংহকে অর্পণ করিল। মানসিংহ কমলার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে মুগ্ধতা তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহার হৃদয়-দর্পণে আর এক উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত,—সে প্রতিবিম্ব হেমলতা। হেমলতা মানসিংহের পরিণীতা ভার্য্যা। বীরশ্রেষ্ঠ মানসিংহের প্রণয়ে উন্মত্তা হইয়া সে হেমলতা সর্ব্বত্যাগিনী। কিন্তু মানসিংহ কমলাকে বাহ্যিক বিশেষ ভালবাসা জানাইত, তাহার কারণ কমলা দ্বারা আপনার অভীষ্ট সাধনের সম্ভাবনা ছিল, সে অভীষ্ট অন্য কিছুই নয়—মোগল রাজ্যের ধ্বংশ করিয়া হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন। কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় সে অভিপ্রায় পুর্ণ হয় নাই।

হরিমোহন বাবু সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। কিন্তু, বলিতে কি, এ উপন্যাসখানি তাঁহার না লিখিলেই ভাল হইত। ইহাতে ঘটনার শৃঙ্খলা নাই, চরিত্র গঠনের পারিপাট্য নাই, বর্ণনার তেমন লিপিচাতুর্য্য নাই। আজ কাল দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র সকল সচরাচর যে প্রকার অপণ্য উপন্যাস উদ্গীরণ করিতেছে, ইহা ঠিক সেই শ্রেণীর না হইলেও আমরা ইহাতে প্রশংসা করিবার কিছু দেখিলাম না। লেখক ভারতবন্ধু মানসিংহের চিত্র যেরূপে আঁকিয়াছেন তাহা দেখিয়া বাস্তবিক আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তাঁহার মানসিংহকে আমরা যেখানে দেখিয়াছি সেইখানেই তাহার প্রতি আমরা, ঘৃণা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য আপনার প্রভু সম্রাটের বিপক্ষে গুপ্ত ষড়যন্ত্র, নীচজনোচিত বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং প্রভু-পত্নীর প্রতি আসক্তি—তাহাও আপনার কার্য্যোদ্ধারের জন্য—মানসিংহের ন্যায় উন্নত বীরের চরিত্রে এ সমস্ত আমরা অনুমোদন করিতে পারি না।

রাজ চিকিৎসক।—শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। বাঙ্গালায় এ ধরণের মাসিক পত্র বোধ হয় আমরা এই প্রথম দেখিলাম। মধ্যে, হোমিওপেথী মতে কয়েক খানি পত্র দেখা দিয়াছিল কিন্তু তাহার বিষয় স্বতন্ত্র, সে সকল অধিক দিন স্থায়ী হইতেও পারে নাই। কেন স্থায়ী হইতে পারে নাই, তাহার বিশেষ কারণ আমরা তত জানি না। কিন্তু স্থায়ী হওয়া উচিত ছিল। এ পত্রখানির স্থায়িত্ব আমরা অন্তরের সহিত কামনা করি। রামবাবু চিকিসা-শাস্ত্রে এক জন কৃতকর্ম্মা ও উদ্যমশীল লোক, তাঁহার "ড্রগিষ্টস্ হ্যাণ্ড বুক" ও "পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান" অনেকেরই আদরের সামগ্রী। আমরা তাঁহার নিকট অনেক আশা করি। এই জরাজীর্ণ রোগগ্রস্ত বাঙ্গালায় 'রাজ চিকিৎসকের' প্রকৃত আদর হওয়া নিতান্ত উচিত। বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত এক টাকা মাত্র। ২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, চন্দ্রকিশোর সেনের আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

নিবাধই ইয়ংমেন্স লাইব্রেরী, জয়নগর পুস্তকালয়। } আমরা এই দুই লাইব্রেরী হইতে দুই খানি রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। আজ সাত বৎসর হইল, আমরা যে উদ্দেশ্যে এই সাবিত্রী লাইব্রেরী স্থাপন করি, এত দিনে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। আজ কাল নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, সকলেই দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি করিতে যত্নপর হইতেছেন, ইহা বড়ই সুখের সংবাদ। "সাবিত্রী" আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহার ছোট ছোট ভগিনীগুলি দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া এই মহৎ ব্রত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হউন। ঈশ্বর তাঁহাদিগের উন্নতির পথে অবশ্যই সহায় হইবেন।

শিরোমিতি বিদ্যা।

শারীরিক অবস্থা

১। মস্তিষ্ক ও শরীর।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল যে মানসিক ক্রিয়া সকলের প্রকাশ ও স্ফূর্ত্তি অধিকাংশ যদিও মস্তিষ্কের আয়তনের উপর নির্ভর করে, তথাপি শারীরিক অবস্থার ইতর-বিশেষেও তাহার কতকটা তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যে সকল শিক্ষার্থী শিরোমিতি বিদ্যার নিয়মানুসারে লোকের চরিত্র নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা যেন শারীরিক অবস্থা সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

মস্তিষ্ক ও শরীরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। যে সকল অসংখ্য স্নায়ু শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত তৎসমস্ত মস্তিষ্কে গিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। শরীর দুর্ব্বল, পরিশ্রান্ত বা রোগাক্রান্ত হইলে মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সেই পরিমাণে মৃদুতর হইয়া পড়ে, এবং শরীর বলীয়ান ও উত্তেজিত হইলে মস্তিষ্ক-ক্রিয়াও দ্রুতগতি হয়। পক্ষান্তরে মনেরও প্রভাব শরীরের উপর প্রকটিত হয়। আশা ও আনন্দের প্রভাবে রক্তচালনা দ্রুত হয়, স্নায়ু সমূহ সবল হয়, এবং মাংসপেশী সকল দৃঢ় হয়। আবার, দুঃখ, নিরাশার প্রভাবে সমস্ত শরীর শিথিল হইয়া পড়ে, পরিপাক ক্রিয়া ও রসনিঃসারণ ক্রিয়া মন্দীভূত হয়।

২। শরীর প্রকৃতি।

শারীরিক প্রকৃতি চার প্রকার *। তাহাদিগের নাম—শ্লেষ্মা-প্রকৃতি; শোণিত-প্রকৃতি; পিত্ত-প্রকৃতি এবং বায়ু-প্রকৃতি।

* আমাদের শাস্ত্রে তিন প্রকার। যথা, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ু; রক্ত-প্রকৃতি আমাদের শাস্ত্রে নাই।

১। উদরের প্রাবল্যের উপর শ্লেষ্মা-প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। যাহাদের শ্লেষ্মা-প্রকৃতি, তাহাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কিঞ্চিৎ গোলাকার, তাহাদের মাংস নরম, নাড়ী ক্ষীণ এবং তাহাদের সমস্ত শরীরে কেমন এক রকম "এলিয়ে পড়া" ভাব থাকে।

২। ধমনী সমূহের প্রাবল্যের উপর শোণিত-প্রকৃতি নির্ভর করিয়া থাকে। যাহাদের শোণিত-প্রকৃতি, তাহাদের শরীর কিয়ৎ পরিমাণে স্থূল; তাহাদের মাংসপেশী কথঞ্চিৎ দৃঢ়—নাড়ি সবল; এবং মুখভাব উৎসাহোজ্জ্বল। তাহারা আগ্রহান্বিত, স্ফূর্ত্তিবিশিষ্ট, আশু ভাবগ্রহণশীল। এবং শ্লেষ্মা-প্রকৃতির লোকদিগের অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মতৎপর ও উদ্যমবিশিষ্ট।

৩। পিত্ত-প্রকৃতি যকৃতের প্রবলতার উপর নির্ভর করে। পিত্ত-প্রকৃতি লোকদিগের চুল খুব কাল—চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ—মাংসপেশী সুদৃঢ়—অস্থি বড় বড় শরীরের আকার-প্রকার কর্কশতা ব্যঞ্জক। ইহাতে অতিমাত্র কর্ম্মিষ্ঠতা, উদ্যমশীলতা ও বল প্রকাশ পায়।

৪। স্নায়ুতন্ত্রের অতিমাত্র প্রাবল্যে বায়ু-প্রকৃতির উৎপত্তি হয়। বায়ু-প্রকৃতি লোকদিগের চুল পাত্‌লা, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সরু, মাথা বড়, শরীর একটুতেই অসুস্থ হইয়া পড়ে—রোগা; তাহাদিগের মানসিক ক্রিয়া দ্রুত এবং ইন্দ্রিয়-বোধ অত্যন্ত তীব্র। তীব্রচেতনা ও মানসিক ক্রিয়াশীলতা এই প্রকৃতির বিশেষ লক্ষণ।

উপরে যে শ্রেণীবিভাগ করা হইল তাহা পুরাতন তন্ত্রানুযায়ী। আধুনিক তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

মনুষ্য শরীরে তিন প্রকার তন্ত্রের যন্ত্র সকল দেখা যায়। ঐ প্রত্যেক তন্ত্রের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া। যথা—গতি-প্রধান কিম্বা যান্ত্রিক তন্ত্র; প্রাণ প্রধান কিম্বা পুষ্টি তন্ত্র; এবং মন-প্রধান কিম্বা স্নায়বীয় তন্ত্র। এই প্রাকৃতিক ভিত্তির উপর শরীর প্রকৃতির অভিনব শ্রেণী-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত।

যথা:——

১। গতি-প্রধান প্রকৃতি।

২। প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি।

৩। মন-প্রধান প্রকৃতি।

অস্থি ও মাংসপেশী, যাহাতে শরীরের গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহারই প্রবল প্রভাবে গতি-প্রধান প্রকৃতি উৎপন্ন হয়।

প্রাণন-ক্রিয়ার যন্ত্র সমূহ যাহা বক্ষ ও উদরের মধ্যে অবস্থিত তাহারই প্রাবল্যে প্রাণ-প্রধান প্রকৃতির উৎপত্তি। এবং মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সমূহের প্রভাবে মন-প্রধান প্রকৃতির উৎপত্তি হয়।

গতি-প্রধান প্রকৃতি।

যাহার শারীরিক প্রকৃতি গতি-প্রধান, তাহার অস্থি-সকল অপেক্ষাকৃত বড়-বড়, চৌড়া অপেক্ষা লম্বায় বেশি, এবং সমস্ত আকৃতি কোণ-প্রবণ। মাংসপেশী পরিমাণে খুব বেশি নহে, কিন্তু খুব ঘন, দৃঢ়, ও বলশালী। শরীর প্রায় লম্বাকৃতি, মুখ দীর্ঘ; গণ্ড-অস্থি চৌড়া, সামনের দাঁত বড়-বড়; ঘাড় কিছু দীর্ঘ; স্কন্ধদেশ চৌড়া এবং বুক মাঝামাঝি প্রশস্ত, চুল কালো, শক্ত, এবং প্রচুর। মুখাবয়ব সকল খুব বহিঃপ্রমুখ এবং মুখভাব কঠোরতা-ব্যঞ্জক। সমস্ত শরীর-তন্ত্র শক্ত, বলশালী ও শ্রমসহ। এই প্রকৃতি যাহাদের শরীরে বলবৎ তাহাদের উদ্যম, বল ও কাজ করিবার শক্তি খুব বেশি। তাহাদের চরিত্রে খুব একটা বিশেষত্ব আছে, এবং জনসমাজে তাহারাই সর্ব্বজন-স্বীকৃত নেতা হইয়া থাকে। মন্ত্রণা-গৃহ অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্র তাহাদের উপযুক্ত বিচরণ-ভূমি। তাহারাই প্রায় রাজ্যের সৈন্য-বিভাগে ও পূর্ত্ত-বিভাগে

প্রাধান্য লাভ করে। তাহাদিগের চিন্তাশীলতা অপেক্ষা দর্শনশীলতা অধিক। তাহারা দৃঢ়, আত্ম-নির্ভরপ্রিয়, প্রেম ও বন্ধুতাতে অটল, কার্য্য-নির্ব্বাহক, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং অধ্যবসায়শীল। তাহারা প্রভুত্ব করিতে ভাল বাসে এবং এই উদ্দেশে আপনার ও অন্যের শারীরিক সুখ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হয় না। যে সকল বক্তা এই প্রকৃতির লোক তাহারা খুব জোরাল কথা প্রয়োগ করে—অনেক কথা ঝোঁক দিয়া বলে, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে না—যতটুকু

বলা আবশ্যক ততটুকু বলে। "কামারের ঠুক্‌ঠাক্‌ শ্যাক্‌রার এক ঘা" এই কথার সার্থক্য তাহারা সপ্রমাণ করে।

এই প্রকৃতি যাহাদের অতিমাত্র প্রবল তাহারা পাশব বলের অবতার বিশেষ। তাহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের উচ্চ-দেশ সঙ্কীর্ণ ও তলদেশ প্রশস্ত। ঘাড় খাটো ও স্থূল; স্কন্ধ প্রশস্ত; বুক চৌড়া, মাংসপেশী খুব স্থূল, দৃঢ়, ও পাকানো। গতি প্রকৃতির এইরূপ অতিমাত্র বিকাশ যে ব্যক্তিতে দেখা যায়, পাশব বল ছাড়া আর তাহার কিছুই থাকে না। তবে থাকিবার মধ্যে এক নির্ব্বুদ্ধিতা। মাংসপেশী থাকা মন্দ নহে, কিন্তু সমস্ত মস্তিষ্কের বিনিময়ে মাংস-পেশী অর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয় নহে।

দৃঢ়তা, যুযুৎসা, জিঘাংসা গতি-প্রকৃতি লোকদিগের প্রধান লক্ষণ। হিন্দুস্থানী ও মুসলমানদিগের মধ্যে এই প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়।

প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি।

প্রাণন-ক্রিয়ার প্রধান যন্ত্রগুলি বক্ষ ও উদরের গহ্বর অধিকার করিয়া থাকে। এই জন্য যাহাদিগের প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি তাহাদের শরীর যতটা প্রশস্ত ততটা দীর্ঘ নহে। এবং কিঞ্চিৎ বর্ত্তুলাকার। বুক ভরা ভরা; উদর-প্রদেশ বেশ পরিপুষ্ট, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল স্থূল ও ক্রম-সঙ্কীর্ণ, হস্তপদ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ঘাড় খাটো ও স্থূল, স্কন্ধ প্রশস্ত ও কোণালু নহে। মস্তক ও মুখ গোলাকার-প্রায়। মুখ-ভাব প্রীতিজনক ও হাস্যময়।

যাহাদিগের এই প্রকৃতি প্রবল তাহারা কি শারীরিক কি মানসিক উভয়-পক্ষেই ক্রিয়াশীল। তাহারা মুক্তবায়ু সেবনে ও শারীরিক পরিশ্রমে অনুরাগী; তাহারা আমোদে, কথাবার্ত্তায় ও উৎসাহজনক তর্ক বিতর্কে যোগ দিতেও তাহাদের ভাল লাগে। কিন্তু গতি-প্রকৃতির লোকদিগের ন্যায় তাহারা ততটা কঠিন পরিশ্রম করিতে কিম্বা কোন গভীর আলোচনায় মন সমাধান করিতে সমর্থ নহে। তাহারা আগ্রহান্বিত, আবেগচালিত, নানা বিষয়িণীবুদ্ধিসম্পন্ন এবং কখন কখন চপল; তাহারা শ্রমসহিষ্ণু কিন্তু কোন বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। তাহারা খুব চটক্‌ লাগাইতে পারে

কিন্তু বুদ্ধির ততটা গভীরতা নাই। তাহারা খুব রাগী, কিন্তু তাহাদের ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী নহে। যেমন অল্পেতেই তাহারা উত্তেজিত হয় তেমনি অল্পেতেই আবার শান্ত হয়। সাধারণতঃ তাঁহারা প্রফুল্ল, সৌম্য ও মিশুক। তাহারা আমুদে লোকের সঙ্গ ভাল বাসে এবং আহার বিহারে খুব অনুরাগী। মাদক দ্রব্য সেবন ও অতিভোজন দোষে লিপ্ত হইবার তাহাদিগের বিলক্ষণ প্রবণতা আছে।

যাহাদিগের প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি তাহাদিগের সাধারণতঃ পাশব বৃত্তি সকল প্রবল—বিশেষতঃ তাহাদের মিথুন-লালসা, বুভুক্ষা, এবং অর্জ্জনস্পৃহা বলবতী। দয়া, আশা, ও আমোদপ্রিয়তাও তাহাদের বেশ পরিপুষ্ট।

এই প্রাণ-প্রধান প্রকৃতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথাঃ—রক্ত-প্রধান* ও রস-প্রধান †। যাহাদের বুক খুব প্রশস্ত এবং শরীর নিতান্ত স্থূল নহে তাহারা রক্ত-প্রধান প্রকৃতির লোক। এবং যাহাদের বুক সে রূপ প্রশস্ত নহে, কিন্তু লম্বোদর ও স্থূলশরীর, তাহারা রস-প্রধান প্রকৃতির লোক।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এই রস-প্রধান প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিবার জন্য আর এক ভাবে এই প্রকৃতিগুলির শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে।

মন-প্রধান প্রকৃতি	সাত্ত্বিক প্রকৃতি।
গতি-প্রধান	রাজসিক প্রকৃতি।
রক্ত-প্রধান রস-প্রধান }	তামসিক প্রকৃতি।

মন-প্রধান প্রকৃতি।

মন-প্রধান প্রকৃতি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-তন্ত্রের আধিক্য হইতে উৎপন্ন হয়। যাহাদের এইরূপ প্রকৃতি তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত সরু এবং

* Sanguine temperament. † Sympathetic temperament.

মস্তক অপেক্ষাকৃত বৃহৎ; মুখের গঠন ডিম্বাকৃতি; উচ্চ কপাল, কপালের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত; মুখাবয়ব-সকল সুচারুরূপে খোদিত; সমস্ত মুখ ভাব-ব্যঞ্জক; সূক্ষ্ম কোমল কেশ; কোমল চর্ম্ম এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ-গ্রামস্পর্শী ও নমন-শীল। সমস্ত শরীরের গঠন সুন্দর ও পরিপাটী। কিন্তু অসাধারণ ও জমকালো নহে। সূক্ষ্মমর্ম্মিতা, মার্জ্জিত-ভাবুকতা, সুরুচি, সৌন্দর্য্যানুরাগ প্রভৃতি ভাব সকল এই প্রকৃতির মানসিক অভিব্যক্তি। চিন্তা সকল দ্রুত, ইন্দ্রিয়-বোধ তীব্র, কল্পনা স্ফূর্ত্তিময়ী এবং ধর্ম্মভাব সকল সাধারণতঃ সক্রিয় এবং প্রভাবশালী। মন-প্রধান প্রকৃতিতে, কপালের উৎকৃষ্ট অংশ সকল এবং মস্তকের চূড়া-প্রদেশ বিশিষ্ট রূপে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

হেতুদর্শিতা, তুলনা-জ্ঞান, ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা, এবং ভক্তির প্রাধান্য হয় এবং যে বৃত্তি-স্থান গুলি মস্তকের পশ্চাৎ ও তলদেশে অবস্থিত তাহারা তেমন সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না। এই প্রকৃতি অস্বাস্থ্যকর সীমায় উপনীত হইলে বায়ু-পকৃতিতে পরিণত হয়। এই প্রকৃতির আতিশয্যে, মাংশপেশীর ক্ষীণতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অনুভব-তীব্রতা এবং আশুমুগ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তিষ্কের অকালপক্কতা ও সামঞ্জস্য-হীন অভিবৃদ্ধিই এই অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থার পত্তন-ভূমি। এবং আলস্যকর অভ্যাসে, চা, কাফি, তামাক প্রভৃতির অপরিমিত ব্যবহারে, এবং অন্যান্য হানি-জনক বস্তুর

সেবনে ইহার মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠে। সাহিত্যানুশীলক পণ্ডিতগণের মধ্যে এই প্রকৃতির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃতি-সামঞ্জস্য।

উপরোক্ত কোন প্রকৃতির আতিশয্য হইলে, কি মন, কি শরীর উভয়েরই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠব নষ্ট হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শরীর ও মনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে একের পরিবর্ত্তনে অপরটিরও পরিবর্ত্তন হয় যথোপযুক্তরূপে প্রকৃতিগণের সামঞ্জস্য হইলে শারীরিক অবস্থার পূর্ণতা উৎপন্ন হয়। অতএব যাহাতে এই সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, কিম্বা কোন প্রকৃতির আতিশয্য বর্দ্ধিত না হয় তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

এই যে প্রতিকৃতিটি দেওয়া গেল, ইহাতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে প্রকৃতিত্রয়ের সামঞ্জস্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছে। পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রায় কোথাও দেখা যায় না। পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী হওয়াই প্রার্থনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে এই তিন প্রকৃতির কিছু না কিছু অংশ ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে—এই ন্যূনাধিক্যের পরিমাণ ও সংমিশ্রণ স্থির করাই সুকঠিন। বহুদর্শনে ও বহুপরীক্ষার পর এই প্রকৃতিনির্ণয়-জ্ঞান জন্মে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যাই,—যাও।

১

যাই, তবে যাই।

আকুল ঝটিকা সদা ছোটে যে সমুদ্র-মুখে,

জগত কি পারে দিতে বুকে তারে ঠাঁই?

যাই, তবে যাই।

কাটে কি তাহার বেলা ল'য়ে লতা-পাতা-খেলা,

ল'য়ে তটিনীর ঊর্ম্মি, বারীর কুন্তল?—

প্রাণে যার সদা কোলাহল!

২

যাই, তবে যাই।

ধূধূধূ সাগর-ধারে, অনন্ত বালুর পাড়ে—

ধূধূধূ মধ্যাহ্ন রৌদ্রে লুটাই—উড়াই!

যাই, তবে যাই।

শত মৃত রাজ্য-কথা, শত ভগ্ন দুর্গ-গাথা,

ওতপ্রোত করিতেছে হৃদয় যাহার;—

সদা ঢুলু ঢুলু পায়ে পড়িবে তোমার গায়ে,

এ তার অসাধ্য কর্ম্ম—আত্মহত্যা তার!

৩

যাও, ছেড়ে যাও।

কেন নিমেষের তরে মাঝখানে এসে প'ড়ে

চূর্ণ হ'য়ে যাও?

যাও, যাও, যাও।

৪

যাও, যাও, যাও।

আমি জগতের দূরে, তুমি জগতের পুরে,

তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন?

আমার অস্তিত্ব—খেলা! যা কিছু ভাঙিয়া ফেলা!—

তোমার—আমারে চেয়ে কেবল ক্রন্দন।

তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন?

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কি কি সংস্কার করিতে হইবে।

কিরূপ সংস্কার আবশ্যক তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কি কি সংস্কার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। কারণ, অগ্রে রোগ নির্ণয় না করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না। এই প্রবন্ধে আমরা যথাসাধ্য কেবল রোগগুলি নির্দ্দেশ করিব; সে সকলের কারণ এবং তদপনয়নের উপায় নির্দ্ধারণ করিব না। রোগের কারণ নির্দ্দেশ এবং ঔষধের ব্যবস্থা একত্র হওয়াই যুক্তিসঙ্গত এবং মঙ্গলকর।

"সংস্কার" প্রবন্ধে আমরা বুঝাইয়াছি, সংস্কার করিতে হইলে গৃহে তাহার আরম্ভ। গৃহ-সংস্কারের ফলই সমাজ সংস্কার, সমাজোন্নতি। এক্ষণে দেখাইতে হইবে, সেই গৃহের কি কি সংস্কার কর্ত্তব্য। গৃহ-সংস্কার বলিতে গেলে—বিশেষতঃ হিন্দুগৃহ সংস্কার বলিতে গেলে—হিন্দুপরিবার প্রথার সংস্কারের কথা প্রথমেই উঠে। কারণ, হিন্দুপরিবার লইয়াই হিন্দুগৃহ। হিন্দু-জীবন হিন্দুর গৃহেই গঠিত হয়।

হিন্দুপরিবার প্রথার দোষগুলি আলোচনা করিবার পর দেখিতে হইবে, আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাবের অভাবে আমাদের জীবন কিরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং আমাদের গৃহ কি প্রকারে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে। অপর পক্ষে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য বটে, বঙ্গমহিলাগণের প্রভাবেই বাঙ্গালীর গৃহে আজিও ধর্ম্মানুষ্ঠান পূজার্চ্চনা, ব্রত-নিয়ম, দানধ্যান, অতিথিসেবা প্রভৃতি অশেষ পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া সরলান্তঃকরণে সকলে বলুন দেখি, আজ কাল কয়জন মহিলা ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, মর্ম্ম বুঝিয়া, সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবতী হইয়া ধর্ম্মাচরণ করেন? ধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ করা দূরের কথা, তাঁহারা প্রত্যহ হরিহর প্রভৃতি ইষ্টদেবতার অর্চ্চনার্থ যে সকল মন্ত্রোচ্চারণ করেন, সেই সকল মন্ত্রের অর্থ কয়জন জানেন? তাঁহারা যে

তিথিবিশেষে পুরোহিত কর্ত্তৃক "চণ্ডী" প্রভৃতির পাঠ শ্রবণ করেন, তাহার কয় বর্ণ তাঁহারা বুঝিতে পারেন? সত্য বটে, ধর্ম্মে প্রগাঢ় আস্থা থাকিলে পাপকার্য্যে ঘৃণা এবং পুণ্যকর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে, সৎবৃত্তি সমূহের অনুশীলন হয়, এবং জীবনে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিতে থাকে। এইরূপ অন্ধ ভক্তির দ্বারা কতকদূর অগ্রসর হওয়া যায় বটে, এবং সেই কারণে বঙ্গনারীকুল পুরুষগণের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত, ধর্ম্মপরায়ণা এবং মনুষ্যত্বের অধিকারিণী বটেন; কিন্তু তাহা হইলেই হইল না। পরিণামে ইহার যে বিষময় ফল, তাহা ফলিবেই ফলিবে। (জ্ঞানের দ্বারা ভক্তির উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব জন্মে। কেবল অন্ধবিশ্বাসে পরিণামে কার্য্যের অপব্যবহার ঘটে। আমাদের নারীগণের তাহাই ঘটিয়াছে। তাঁহাদের ধর্ম্মে অপরিমিত ভাণ প্রবেশ করিয়াছে; অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান বাহ্যিক হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে প্রকৃত উদ্দেশ্য, অন্তর বিশোধিত করা, মন পবিত্র করা, সৎবৃত্তিনিচয়ের পূর্ণ স্ফূর্ত্তিসাধন করা, তাহা বড় বেশী ঘটিতেছে না। বঙ্গমহিলাগণ এক দিকে অনেক পুণ্যানুষ্ঠান করিতেছেন; অন্য দিকে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের অপরিমিত অনুশীলন করিতেছেন। তাঁহাদের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া বঙ্গগৃহ এখন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদিও ইহা হিন্দু-পরিবার প্রথার একটি অঙ্গ, আমরা যথাসময়ে স্বতন্ত্রভাবে এই বিষম সঙ্কটের উৎপত্তির কারণ এবং তন্নিবারণের উপায়োদ্ভাবন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।)

এক্ষণে হিন্দুপরিবার প্রথার কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ ঘুণ ধরিয়াছে প্রথমে তাহার আলোচনা করা যাউক। বলা বাহুল্য, সকল দোষের উল্লেখ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। চিন্তাশীল, বহুদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ বিষয়ের যত আলোচনা করিবেন, ততই নূতন নূতন দোষের আবিষ্কার হইবে। আমাদের সামান্য ক্ষমতায় যতটুকু পারিয়াছি এ প্রবন্ধে তাহাই প্রকটিত করিলাম। নিক্ষেপ অবসরে দোষগুলির বিচার যেটুকু হয় করা গেল। বিস্তারিত বিচার, কারণনির্দ্দেশ এবং তদপনয়নের উপায়-উদ্ভাবন কালে করিতে চেষ্টা করিব।

১ম। স্বার্থপরতা বা প্রকৃত স্বার্থসাধনে বিরতি। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী কথায় কেহ কেহ হাসিয়া উঠিবেন বোধ হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে তুচ্ছ বিষয়ের লোভ, ক্ষমতা লাভে আকাঙ্ক্ষা, ভোগসুখে বিষম অনুরাগকে আমরা প্রকৃত স্বার্থসাধনে বিরতি বলি। যে ধনের লোভে প্রাণসম সহোদর, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিতে হয়; যাহার জন্য দুশ্চিন্তাকীট অহরহ হৃদয় কুরিয়া খাইতে থাকে; যে অর্থ আজ আছে কাল নাই; যাহাতে ক্ষণিক আমোদ পাওয়া যায় মাত্র; সেই অর্থলোভে যে লালায়িত তাহাকেই আমরা প্রকৃত স্বার্থসাধনে বিরত বলি। এরূপ লোকেরা এক দিকে অতুল ধন সঞ্চয় করে, অপর দিকে তাহা অচিরে ধ্বংস হইয়া যায়! তাহারা লোভে পড়িয়া অর্থ, মান, সম্ভ্রম হারায়; নিজ পুত্র পৌত্রাদিকে দারুণ দুঃখে নিপতিত করে; এবং যাবজ্জীবন এক নিমেষের জন্য হৃদয়ে শান্তি, চিত্তপ্রসাদ ভোগ করিতে পায় না। তাহারা এই মোহে পড়িয়া—হীরক ফেলিয়া কাচে লোভ করিতে গিয়া—বিষম সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া বসিতেছে। বাস্তবিক তাহারা বড় নির্ব্বোধ। কিন্তু যাঁহারা ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া সমস্ত আত্মীয় পরিজনকে সমভাবে প্রতিপালন করিয়া, আপনার উচ্চপদে আপনি অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, চিত্তের পরম তৃপ্তি—জীবনে পরম সুখ লাভ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত স্বার্থ চিনেন। তাঁহারাই পরিণামদর্শী, বুদ্ধিমান্। আমরা সকলে স্বার্থপর নহি বলিয়াই পদে পদে এত দুঃখ যন্ত্রণা, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি। বর্ত্তমান একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা ইদানীং এই স্বার্থ ভুলিয়া সংসার ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া একাকার করিতেছেন। কর্ত্তার সহিত গৃহিণীর যোগ হওয়াতে তাঁহাদের দেখাদেখি ক্রমে পরিবারস্থ সকলেরই নিজ নিজ ভোগসুখে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেছেন। পরিবারপ্রথা সমূলে নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইয়াছে।

২য়। এই স্বার্থপরতাই অবিশ্বাসের প্রসূতি। এই স্বার্থপরতা বা প্রকৃত স্বার্থে বিরতি আমাদিগকে প্রতারণায় সুপটু করিয়াছে। এখন পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রে, সহোদর সহোদরে অধিক কি পিতাপুত্রে পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্বাস করেন। কেহ কাহারও নিকট নিজ সম্পত্তি রাখিয়া নিশ্চিন্ত

নহেন। প্রতিপদেই সন্দেহ, বাক্‌বিতণ্ডা, মাম্‌লা-মোকদ্দমা। সংসার এখন ঘোর অশান্তি ও বিষম যন্ত্রণার স্থল হইয়া উঠিয়াছে।

৩য়। যখন দেখা গেল, খুড়া বা জ্যেঠা ভাইপোর, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদরের, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করেন না, নিজের স্ত্রীপুত্রাদির সকল অভাব দূর করিতে মনোযোগী এবং ভবিষ্যতে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ সুখী করিবার জন্য বঞ্চনার নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তখন সেই সব আচরণ মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে বিচলিত করিয়া দেয়। ক্রমে ভালবাসার মূল শিথিল হইয়া যায়। সন্দেহ জন্মাইয়া, বিশ্বাস নষ্ট করিয়া পরস্পরের প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা. স্নেহ মমতা, প্রীতি, সহানুভূতি ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। এখন হিন্দু-পরিবারে এই মহা অনর্থ ঘটিয়াছে। আমাদের হৃদয় হইতে দিন দিন এই সকল মনোহর, সুন্দর, পবিত্র বৃত্তি শুকাইয়া যাইতেছে। সুতরাং জীবনের শান্তি, হৃদয়ের তৃপ্তি, মনের প্রকৃত সুখ ক্রমেই দূরে পলায়ন করিতেছে।

৪র্থ। এই প্রেম-সঙ্কীর্ণতার ফল—ঈর্ষা, দ্বেষ ও হিংসা। যখন একের দুঃখে অন্যের প্রাণ কাঁদিত, একের সুখে অন্যের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, তখন এ সকল পশুবৃত্তি ত্রিসীমায় আসিতে পারিত না, তখন এ সকলের অস্তিত্ব-বোধই ছিল না। কিন্তু এখন আর সে মহান্‌ ভাব নাই। এখন খুড়া, ভাইপো প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের সুখ-সমৃদ্ধি মান-সম্ভ্রমে চোখ টাটায়, সে সব বড়ই মর্ম্মান্তিক ও অসহ্য। ঈর্ষ্যায় মন পুড়িতে থাকে। নিজে তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য ও সম্মানলাভে অসমর্থ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ঘোর দ্বেষ জন্মায়। সে স্বতঃ পরতঃ তাহাদের শত্রুতা করিতে থাকে। ক্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়। বিবাদ বিসম্বাদ, মামলা মোকদ্দমা হিংসা-বৃত্তির পূর্ণাহুতি। অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঈর্ষ্যা দ্বেষ হিংসার সহিত ভস্মসাৎ হওয়াই ইহার পরিণাম!

হিন্দুপরিবারের এক দিকের চিত্র অঙ্কিত হইল। ইহার আর এক দিক্‌ আছে। সকলেই জানেন, হিন্দুপরিবার-প্রথার বর্ত্তমান অবস্থা অতি হীন হইলেও এখনও ইহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। অনেকের হৃদয়ে

ইহার মাহাত্ম্য অদ্যাপিও জাগরিত রহিয়াছে। যাঁহাদের গৃহে এখনও এই প্রথা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান, তাঁহাদের কি কি দোষ জন্মিয়াছে,—কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

১। দরিদ্রতার উৎপত্তি। এক পক্ষে এ কথা সত্য বটে, যে দশ জনের অর্থ একত্র থাকিলে সমস্ত পরিবারের সর্ব্বপ্রকারে যেমন সুবিধা হয়, সকলে যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন পৃথক্ হইলে তাহার শতাংশও লাভ করা যায় না; বরং তাহাতে এক গুণের স্থানে চারি গুণ ব্যয় হয়, এবং আরও অনেক বিষয়ে নানাপ্রকারে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এ কথা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, হিন্দুপরিবারে এক জন উপার্জ্জনক্ষম হইলে আর পাঁচ জন সব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার অর্থে নিজের এবং পুত্রকলত্রাদির ভরণ-পোষণ করেন। কোথায় তাঁহারা স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া সমস্ত পরিবারের সুখবৃদ্ধি করিবেন, এক জনের অতিরিক্ত পরিশ্রম লাঘব করিবেন, ভবিষ্যতের জন্য ধনসঞ্চয় করিবেন তাহা না হইয়া তাঁহারা "ঘোড়া দেখিয়া খোঁড়া" হইয়া বসেন। সেই এক জন যত দিন জীবিত থাকেন তত দিন একরকম করিয়া সংসার চলিয়া যায়। তার পর, তাঁহার বিয়োগে সে সংসারের কি দুর্দ্দশা হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই তাহার ভুক্তভোগী। আর যাঁহাদের পিতা বা অন্য কেহ বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বক্তব্য থাকিলেও আপাততঃ বিরত রহিলাম। কেবল রাজার শোষণে আমাদের দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে না, আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতায় আমরা গৃহে গৃহে এই দারিদ্র্য বীজ বপন করিতেছি; প্রতি বৎসরে যে দুর্ভিক্ষ হইতেছে গৃহে তাহার প্রথম উৎপত্তি। Political economy প্রভৃতির কথা তুলিতে হইলে গৃহেই তাহার আরম্ভ করা উচিত।

২। এই 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া' রোগ হইতেই আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা জন্মিয়াছে। জগৎশুদ্ধ লোক জানে, বাঙ্গালীর মত অলস, দীর্ঘসূত্রী, নিরুদ্যমী, অকর্ম্মণ্য জাতি আর নাই। পুরাকাল হইতে আমরা একের অর্থে উদর পূর্ণ করিয়া পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এমন অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি, যে আমাদের দ্বারা আর কোনও কাজ হইতে পারে

না। বহুকালের অভ্যাসে আলস্য আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। ইহা আমাদের এতদূর প্রকৃতিগত হইয়াছে, যে কোনও কাজে আমাদের আর উৎসাহ হয় না; কোনও কাজ আরম্ভ করিয়া আমরা তাহা শেষ করিতে পারি না। আলস্যের নিকট অধ্যবসায় কি এক দণ্ড তিষ্ঠিতে পারে?

৩য়। এই আলস্য ও কার্য্যাভাব হইতে আর এক বিষময় ফল যে উৎপন্ন হয়, তাহা নিতান্তই সাংঘাতিক। প্রাচীন কালের ব্রহ্মচর্য্যের লোপ হওয়া এবং আলস্য ও অন্য কর্ম্মাভাব তাহার স্থানাধিকার করা অবধি ভোগ-বিলাসে আমাদের আত্যন্তিক অনুরাগ জন্মিয়াছে। আমরা দিন দিন ঘোর বিলাসী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেছি। হিন্দু গৃহস্থাশ্রমের মূল উদ্দেশ্য বড়ই শিথিল হইয়া যাইতেছে।

৪র্থ। এই আলস্য ও ইন্দ্রিয়বশ্যতার ফলে আমাদের ধর্ম্মভাব ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। হৃদয়ে যতই তামসিক ভাব প্রবল হয়, সাত্ত্বিক ভাব ততই কমিতে থাকে। সে ভাব ধারণা করিতে হইলে বহু পরিশ্রম করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিতে হয় আলস্যের প্রভাবে তাহা ঘটিতে পারে না। সেই জন্য আমাদের ধারণাশক্তি, চিত্তের একাগ্রতা, মনের বিশুদ্ধ ভাব ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

আমরা হিন্দুগৃহের প্রধান কয়টি সংস্করণীয় বিষয়ের উল্লেখ করিলাম। প্রধান কয়টি দোষ পরিত্যাগ করিতে হইলে তদন্তর্গত অনেকগুলি দোষের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া আবশ্যক। আমরা একে একে প্রত্যেক দোষের বিস্তৃত আলোচনা করিব। দেখাইব, হিন্দুগৃহের গঠন সম্পূর্ণ হইলে হিন্দু-সমাজের পূর্ণতা সাধিত হইবে। হিন্দুগৃহ, হিন্দুসমাজ একই বস্তু। একটির উন্নতি বা অবনতিতে অপরের উন্নতি বা অবনতি বরাবর হইয়া আসিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে। রাজনৈতিক সংস্কার সমাজ সংস্কারের অন্তর্গত। তথাপি যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী তাঁহাদিগকে আমরা এই বলি যে, যে সহানুভূতি, একতা, সাহস, উদ্যম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সদ্গুণ সমূহের অভাবে তাঁহারা রাজনৈতিক জীবন গঠিত করিতে পারিতেছেন না, সভ্য জগতে বাঙ্গালী একটি জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না, গৃহে তাহা শিক্ষা

করিতে হইবে। শিশুকাল হইতে মাতা-পিতার নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার কথা। গৃহ-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক সংস্কার—সকল সংস্কারই এক গ্রন্থে গ্রথিত। তাই আমাদের সানুনয় নিবেদন, সকলে বুদ্ধি, ক্ষমতা, এবং কার্য্যের পরিসর কমাইতে থাকুন। অল্প হইতে কার্য্য আরম্ভ করুন। আগে হেলে ধরুন, তার পর কেউটে ধরিবেন। কিছুকালের জন্য ভারতভূমি, বিশ্বপ্রেম, সার্ব্বভৌমিকতা, বিশ্বজনীন উদারতা প্রভৃতি লম্বা চৌড়া দিগ্‌গজ কথাগুলা ভুলিয়া যান।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

আত্মময় কবিতা বা গীতিকবিতা।

জাগতিক সকল জিনিসেরই এক একটা সময় আছে—যুগ আছে। ফুল এক দিনে প্রস্ফুটিত হয় না। এবং কোন পদার্থের একীভাবও চির কাল থাকে না। জগৎ গতিশীল, জীবন্ত, বিচিত্র। জগতের গতি সেই পূর্ণতার অনন্তদিকে। সেই জন্য জগৎ কখন এক রকম অবস্থায় থাকিতে পারে না। ফল একবারেই হয় না। প্রথমে বীজ, ফল পরে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। দেখিতেছি, এইরূপে—ক্রমে ক্রমে—এক অবস্থার পর আর এক অবস্থায় পড়িয়া প্রকৃতি—প্রকৃতির সকল বস্তুই—অসীম পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইবার জন্য ফুটিতেছে—ঝরিতেছে—ঝরিতেছে—ফুটিতেছে। পরিবর্ত্তনই জগৎ। পরিবর্ত্তনই উন্নতি। এই অনন্ত পরিবর্ত্তনই জগৎ-শরীর আজ বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার মিশ্রিত অংশগুলির স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে। আজ আমরা জগতের প্রত্যেক উপাদান এবং তাহার প্রতি ধাতুর গুণ ও কাজ বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি, এই প্রকাণ্ড জগৎ-দলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি, কে। কাহার বিকাশ কখন।

পূর্ব্বে, একজনের বোঝাতে হাজার লোকে বুঝিত। হাজার লোক এক জনের অনুকরণ করিত; সেই একজন দলপতি ভিন্ন তাহাদের কোন কাজ

সম্পন্ন হইত না। সেই একজনের কথার প্রতিধ্বনি, হাজার লোকের প্রাণে উঠিত। সেই দলপতির কথাই, হাজার প্রাণের কথার দর্পণ। নবজাত তরুতে প্রথমে একটি ফুল ধরে। ইহা সাময়িক গুণ।

তখন কোন কথা না বুঝিয়াও বুঝিত, না বুঝিয়াও তাহাতে সম্মতি দিত। এখন না বুঝিয়া বোঝে না, না বুঝিয়া সম্মতি আর দেয় না। তখন একজন গাহিত, হাজার লোক শুনিত। এখন হাজার মনুষ্য-শাখায় গান, অদৃশ্য পরিবর্ত্তন-বারি পাইয়া, ফুটিয়া উঠিতেছে। তখন ফুটিবার সময় হয় নাই। আজ সময় পাইয়া—কাহার উপদেশের জন্য অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি ফুটিয়াছে। সময়ের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত এই হৃদয় প্রস্ফুটন—গানকেই আমি আত্মময়কবিতা বা গীতিকবিতা বলিলাম। *

জ্ঞান যত বাড়িতেছে, কবিতার ধ্যানময় রাজ্য তত বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার কবিতার দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম, অন্তর্মুখী, সর্ব্বব্যাপিনী। জীবনের অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, অতি মৃদু অজ্ঞাত হাসি, অতি মৃদু স্মৃতি-জাগান সমীরণ, কি সেই অনির্ব্বচনীয়া দৃষ্টি, অথবা প্রাণস্পর্শী অতি মধুর সেই নীরব সঙ্গীতময় চলনটি পর্য্যন্ত কবিতার চক্ষু এড়াইয়া যাইতে পারে না। এখনকার কবিতা, জীবন-লাইব্রেরীর তালিকা। জীবনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। সুখ-দুঃখের মানচিত্র।

আগে কবিতা, মনুষ্যের সাধারণ ভাব ও সাধারণ বিষয় লইয়া লেখা হইত। সাধারণ ঘটনা বা পৌরাণিক গল্প কবিতার বিষয় ছিল। তখন কবিতা, মনুষ্য-জীবনের মিশ্রপদার্থের গূঢ় রহস্য বাহির করিতে পারে নাই। কি সূত্রে হাসি কান্না—প্রেম-বিরহ—আলোক-অন্ধকার ফুটে—জীবনের বিভিন্ন পরদায় স্বতন্ত্র সুর কেন বাজে তাহার সূক্ষ্ম কারণ কেহ জানিত না। তত বুঝিবার কল্পনা শক্তি তখন কাহার ছিল না। সে সর্ব্বরহস্যভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, প্রাচীন কোন কবিতার মধ্যে দেখিতে পাই না। তখন কবিতার গতি, প্রকৃতি বহির্মুখী ছিল। এখন অন্তর্মুখী।

* The prevailing characteristic of modern literature is the predominance of individuality and scepticism. Man now stands face to face with his Creator, and sings to him his lay. Hence it is that modern literature commences with spiritual songs. Later on, as it becomes secular, the interest of self-consciousness—the feeling of personality—predominates: poetry is no longer epic; it is subjective, and lyrical and reflective.

একটা মানুষ কি সাধারণ ব্যাপার! ভাব দেখি একবার মানুষ কি! একটা জীবনে কত হাসি, কত কান্না, কত সুখ, কত দুঃখ, কত স্নেহ, কত বিরাগ, কত মায়া, কত মমতা, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত আশা, কত যন্ত্রণা, কত স্বপ্ন এবং আরও যে কত কি রহস্য আছে, একবার তাহা ভাব দেখি! মনুষ্য-জীবন রহস্যময়!—স্বপ্নময়! মনুষ্য-জীবন অনন্ত সুখ-দুঃখ-আকাজ্ক্ষার রাশি—জীবন্তমূর্ত্তি! তাহার কয়টা দুঃখ, কয়টা সুখ, কয়টা তরঙ্গের রহস্য তুমি জান? বুঝিতে পার? কেবল সময়ের প্রস্ফুটিত ফুল চির-জ্ঞানী আত্মময় কবির অসামান্য মনস্বিতা এবং সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে, সে সুখ-দুঃখ-আকাজ্ক্ষার অদৃশ্য মূল লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। মনুষ্য-জীবন-নদীতে "বহে নানা তরঙ্গ।" কিন্তু কোন্ দিক হইতে বাতাস আসিয়া যে তরঙ্গ তুলে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। বাতাস জানা বড় কঠিন। বাতাস সকলে ঠিক করিতে পারে না। কবি—আত্মময় কবিই কেবল সে বাতাস দেখিতে পায়—ঠিক করিতে পারে। আত্মময় কবির কাজ, এই রহস্যময় জীবন-নদীর সেই বাত্যান্দোলিত সহস্র সহস্র তরঙ্গগুলির সুন্দর উজ্জ্বল প্রাণস্পর্শী ছবি আঁকিয়া জগতের চোকের সম্মুখে ধরা। জীবনটা কি, এবং তাহার সমস্ত লক্ষণ কখন কিরূপ ধারণ করে—জানিবার চেষ্টা, আজকাল বড়ই পড়িয়া গিয়াছে। আত্মময় কবি তাহাই দেখাইয়া দেয়। আমার হাসি তুমি দেখিতে পাও না বলিয়া কি তাহা হাসি নহে? তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি তাহার কোন অর্থ নাই? তোমাকে দেখাইয়া এ জীবনের কোন্ কার্য্যটি হইতেছে? কই, তোমার মীমাংসা, তোমার আজ্ঞার জন্য ত আমার জীবন অপেক্ষা করিয়া থাকে না! তোমার কথায় ত সে তাহার স্বাভাবিক গতি অতিক্রম করিয়া এক সেকেণ্ডও দ্রুত চলে না? জীবন আপনার ভাবে সমান চলে। ও গুলি মনুষ্যের ভ্রম।

গীতি-কবিতা, মনুষ্য-জীবনের এক একটা ভাবের—সুখ-দুঃখের—দর্পণ। জীবনের এক একটা সত্যের প্রতিমূর্ত্তি। জীবনের সাময়িক প্রতিকৃতি। কবিতাকারে প্রকৃতি। আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের "নিশীথজগৎ" এবং অক্ষয়কুমারের "আজি নিশা জ্যোৎস্নাময়ী" নামক কবিতা দুইটি বুঝাইয়া, কথাটা আরও কিছু পরিষ্কার করিয়া দিতেছি। শুনিতে পাই, এ কবিতা

দুটি নাকি অনেকগুলি পাঠক এবং দু-এক জন বুদ্ধিমান সমালোচকেরও বুঝিতে গোল ঠেকে। গোল ত ইহাদের কোথাও দেখিতে পাই না। কবি রবি, তাঁহার সূক্ষ্ম কবিত্বময় দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, জগতের একটা দিক, জীবনের এক ভাগ, নিশীথ। সে দিকটা আমরা দেখিতে পাই না, তাহার কিছুই জানি না। বুঝি না। দেখিতে পাই না বলিয়াই তাহা নিশীথ। কিন্তু তাহা সত্য—জীবন্ত সত্য। সেই দিক্‌টা না জানার দরুণ, জগতের কত লোক নিশি দিন আত্মহারা হইয়া অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের চোখে ধূলা উড়িয়া পড়িতেছে- চরণে বাধা লাগিতেছে—পাষাণ বজ্রসম মাথায় বাজিতেছে। কত সরল শিশু, গহন জগৎ-বনের মাঝে মা'র হাত ধরে চলিতে চলিতে, অকস্মাৎ কি একটি ঘটনা-নিশীথের জালে জড়িয়া একেবারে পিছাইয়া গিয়াছে! শিশু পথ চিনে না, মাকে কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল—মা, সেই কাতর "মা মা" ধ্বনি শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে চারি দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাহাকে আর দেখিতে পাইল না! এইরূপে জীবন-গ্রাসী জগৎ-অন্ধকারের মধ্যে কত অদৃশ্য প্রাণী অহরহ কাঁদিয়া কাঁদিয়া নীরবে প্রাণত্যাগ করিতেছে! কত হিংসা, কত বিসম্বাদ, কত মিথ্যাচরণ, কত বিশৃঙ্খলা, কত অনর্থক যন্ত্রণা, কত হত্যা, কত তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস, কত সাধের খেলা, কত স্বপ্ন প্রভৃতির অবিরাম বিচিত্র অভিনয় হইতেছে! সে অন্ধকারের গর্ভে পড়িয়া কত ভক্তি, স্নেহ, প্রেম ও কত অসম্পূর্ণ সাধের খেলা, চিরদিনের মত সাঙ্গ হইয়াছে! আজ সেই স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও খেলার গৃহে নিশীথের চির-রাজত্ব। কেহ কাহাকে আর চিনে না! কাহারও কথা, কাহারও হাসি, কাহারও কান্না এবং কাহারও হৃদয়ও কেহ বুঝিতে পারে না। এইরূপে অন্ধকারে প্রতিদিন কত লোক মরিতেছে। এইরূপে অন্ধকারে পড়িয়া কত ফুল পিষ্ট হইতেছে! কত সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে! ইহাই রবীন্দ্রনাথের "নিশীথ জগৎ।" এই ভাবী-সত্যের উজ্জ্বল ছবি, কবি, জগতের পটে আঁকিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এ গীতিকবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অক্ষয়কীর্ত্তি। এটি তাঁহার chef d'aeuvre।

তার পর অক্ষয়কুমারের "আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ী।" ইহা কত সুন্দর। কি মহান্ ভাব! কবি বলিতেছেন যে, আজ আমি এই মধুর প্রাণ-উন্মাদিনী জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে ফুল-সৌরভাকুলিত ধীর সমীরণে এবং স্রোতস্বিনীর সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ ঢল ঢল নারীময় ভাবে বিভোর হইয়া যেন—কোথাকার কোন্ সুদূর হইতে অপ্সরার অলস স্বপ্নময় গান শুনিতে পাইতেছি—যেন সেই অপূর্ব্ব গান শুনিতে শুনিতে দেখিতেছি যে, সেই সুখের সুদূর নন্দনে—মন্দার-কুঞ্জে, মন্দাকিনী-তীরে আমার প্রাণের স্মৃতিময়ী অতীত অদৃষ্ট-ছায়া বসিয়া। আমার অতীতের সেই আদর্শ অনন্ত প্রেম-ছায়া, বর্ত্তমান-ভবিষ্যত পূর্ণ আলো করিয়া বিরাজিত। সে যে অভেদ-আত্মা! মরিয়াও আবার তাহাকে পাইব। সে অ-দৃষ্ট-ছায়া আমার পূর্ণতার—অনন্ত-প্রাপ্তির—আকাঙ্ক্ষা—অপ্সরা-গান। সে ছায়া অনন্ত সৌন্দর্য্য—অমর। সে ছায়ার অর্থ ব্রহ্মাণ্ড-মিলন। "আজি নিশি জ্যোৎস্নাময়ীর" অর্থ এই। ইহাই গীতিকবিতা। কবির প্রাণের একটি ভাবের ইহা দর্পণ। জীবনের কবিতা-ভগ্নাংশ। ইহা কবির জীবন-সত্য-সমবায়ের একটি সত্যের প্রতিকৃতি। আত্মময় কবির হৃদয়-অঙ্কুরের বিকাশ এইরূপ নানা কবিতা-পল্লবে, নানা কবিতা-ফুলে, নানা কবিতা-ফলে। তাহা বিচিত্র প্রকারে বিকশিত। তাহা কখন মেঘে, কখন বিদ্যুতে, কখন বৃষ্টিতে, কখন হাসিতে কখন কান্নাতে, কখন আলোতে, কখন অন্ধকারে, কখন বজ্রাঘাতে, কখন ছায়ায়, কখন মিলনে, কখন পীড়নে, কখন স্বপ্নে, কখন কটাক্ষে, কখন হাসিশূন্য গৃহে, কখন সুখের স্মৃতিতে, কখন পূর্ণিমা নিশীথে, কখন প্রেমে, কখন বিরহে, কখন বিজনে, কখন বিপিনে। সমুদয় জগৎ-বাড়ীটা একেবারে দেখান, আত্মময় কবির কাজ নয়। আত্মময় কবির কাজ, জগৎ-বাড়ীর অংশ—গৃহগুলি দেখান। সকলের এক সঙ্গে গাওয়াকে গীত বলে না। তাহা যাত্রা। হরিবোল।

জগতের শৈশব কালে অনেক কবি, অনন্ত জীবন এবং সমুদয় জগৎ-বাড়ীর ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থকে "জাতীয়" এবং "জাগতিক" প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। কিন্তু—সত্য কথা বলিতে গেলে—সে সব গ্রন্থ বা মহাকাব্য ভাল বুঝিতে পারা যায় না।

তাহা বড় অস্ফুট। তাহার ভিতরকার অনেক কথার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। সেগুলি নিতান্ত গোঁজা মিলন। অথবা কেবল কতকগুলি শব্দের যোজনা। পুস্তক নামধারী মাত্র। অসংখ্য পুস্তক পাঠের ফল। Intellect। তাহা জীবন নহে। সত্য নহে, সত্যের অস্ফুট ছায়াও নহে। যে নিয়মে ফুলের বিকাশ হয়, সে নিয়মে তাহারা জন্মায় নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দু আচার ব্যবহার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৪। শিষ্টাচার।

এইটী বড় মনস্তাপ, আমাদের নব্যতন্ত্র সুশিক্ষিত হইয়া কোথায় সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন, না, কথায় কথায় তাহার মুখ পোড়াইতে বসিয়াছেন! যদি কোন বিষয়ের অভাব থাকে তাঁহারা তাহার পরিপূরণ করুন, আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট হইব। যদি কোন দোষ দৃষ্ট হয়. তাঁহারা তাহার সংশোধন করুন. আমরা তাহাতে আনন্দিত হইব। যদি কোন অত্যাচার থাকে, (যেমন সতীদাহ, সন্তান ভাসান এবং কন্যা হত্যা পূর্ব্বে ছিল; এবং কোন কোন স্থলে শেষেরটি এখনও আছে) তাঁহারা তাহা নিবারণ করুন, আমরা কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু সে সব করিবার সময় অগ্রে আদ্যন্ত সমুদয় অবস্থা ও তাহার বৈধাবৈধতা যথারিহিতরূপে বিচারান্তে করিতে হইবে। বিশেষতঃ নবপ্রথার প্রবর্ত্তন বড় কঠিন কাজ, হয় ত ইষ্ট আশে অনিষ্ট ঘটিতে পারে, এই ভয়টী মনে রাখিয়া, অগ্র পশ্চাৎ দেখিয়া সতর্ক হইয়া তাহা করা উচিত। নতুবা সহসা অভাব বোধ, সহসা দোষ দর্শন, সহসা অত্যাচারের অভিযোগ করিয়া উন্মত্ত হওয়া বিধেয় নয়।

এই পরিচ্ছেদে আমাদের এ কথা বলিবার বিশেষ হেতু আছে। সমস্ত সভ্য বা অর্দ্ধসভ্য সমাজেই ভদ্রতা, লৌকিকতা, ও শিষ্টাচারের বিভিন্ন

বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত আছে। কোন জাতীয় লোকেই স্বজাতীয় শিষ্টাচার ত্যাগ করিয়া পরকীয় রীতি অবলম্বন করে না। কেনই বা করিবে? কোন ভদ্রলোক কি আপনার থাকিতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা করিয়া থাকে? কি গভীর আক্ষেপের বিষয়, আমাদের নবশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায় তাহাও করিতেছেন। শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন পদার্থটি হিন্দু সমাজের ভাণ্ডারে এত অশেষবিধ এবং এত অপর্য্যাপ্ত, যে, যত প্রকারের যত চাহিবে ততই প্রাপ্ত হইবে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা যখন কোন বেশী সৌজন্য, বেশী শিষ্টাচার ও বেশী স্তরের কথা উল্লেখ করেন, তখনই এই বলিয়া উপমা দিয়া থাকেন, "এ যেন পূর্ব্বাঞ্চলের সৌজন্য!" অথবা, "এ যেন পূর্ব্বাঞ্চলের আড়ম্বর!" ইউরোপীয় কোন পত্রে, কোন দরখাস্তে, কোন কাগজাদিতে পাঠাপাঠ মোটে নাই। আমাদের দেশের পত্রাদিতে কাজের কথা যদি একটি থাকে, পাঠের শব্দ দশটী পাইবে! অভ্যর্থনা, স্বাগত সম্ভাষণ, নমস্কার, প্রণাম, আলিঙ্গন, পাদ্যার্ঘ, আসনাদি প্রদান, ভক্ষ্য ভোজ্যের বিধান, এ সব পূর্ব্বকালে যাহা ছিল এবং যাহা আছে, তেমন কি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়? কাহাকে কিরূপে, কি অঙ্গভঙ্গীতে, কি বলিয়া নতি, প্রণতি, আশীর্ব্বাদ করিতে হয়—কাহাকে নমস্কার বলে, কাহাকে প্রণাম বলে, কাহাকে সম্ভাষণ বলে, কাহার প্রতি কিরূপ শিষ্টাচার বিধেয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, পথিক, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, তপস্বী, গৃহী, রাজা, প্রজা, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ইত্যাদি শত শত সম্পর্কীয় ব্যক্তির প্রতি পরস্পরের কি কর্ত্তব্য এত কথা হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোন্ দেশের ব্যবস্থা শাস্ত্রে কি ব্যবস্থাপিত আছে? ভলাভাব দিবার জন্য এ স্থলে অন্ততঃ কতিপয় মনুবচন উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

অভিবাদাৎ পরং বিপ্রো জ্যায়াংসমভিবাদয়ন্।

অসৌ নামাহমস্মীতি স্বং নাম পরিকীর্ত্তয়েৎ ॥ মনু ২য় অ। ১২২।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন বৃদ্ধকে অভিবাদন করিবে, তখন "আমি অমুককে অভিবাদন করিতেছি বলিয়া আপন নাম উচ্চারণ করিবে।

নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।

তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈবচ ॥ ঐ। ১২৩।

যাঁহাকে অভিবাদন করিবে, তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তাহা হইলে

অভিবাদ্যকে অভিবাদনানন্তর "আমি অভিবাদন করি" এই মাত্র বলিবে; এবং স্ত্রীলোকদিগকেও এইরূপ অভিবাদন করিবে।

আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
অকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ॥ ঐ। ১২৫।

অভিবাদনানন্তর অভিবাদ্য ব্যক্তি অভিবাদক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ অভিবাদককে, "হে প্রিয়দর্শন শুভশর্ম্মা তুমি দীর্ঘজীবী হও" ইহা বলিবে; ক্ষত্রিয় অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বল বর্দ্ধন্" এবং বৈশ্য অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বসুভূতে" এই কথা বলিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অভিবাদকের নামের অন্তে অথবা অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্বে যে অকারাদি স্বর তাহা প্লুতে অর্থাৎ ত্রিমাত্রে উচ্চারিত হইবে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নামের অন্ত্য স্বর অথবা অন্ত্যস্বরের পূর্ব্বস্বর বিকল্পে প্লুত হইবে। শূদ্রের এবং স্ত্রীলোকের নামে প্লুত উচ্চারণ নাই।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥ মনু ২য়। ১২৯।

পরস্ত্রী ও যে নারী পিতৃবংশীয় নহেন, তাঁহাদিগকে ভবতি বা সুভগে অথবা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে। ভগিনী প্রভৃতিকে ও পরের অনূঢ়া কন্যাকে আয়ুষ্মতি ইত্যাদি পদে সম্বোধন করিবে।

মাতৃষসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষসা।
সংপূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া॥ ঐ। ১৩১।

মাতৃ-ভগিনী, পিতৃ-ভগিনী, মাতুল-পত্নী ও শ্বশ্রূ ইঁহারা মাতার ন্যায় পূজনীয়া, যেহেতু ইঁহারা গুরুপত্নীর সমান অর্থাৎ মাতার সমান, অতএব ইঁহারা আগত হইলে পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে।

এরূপ কত বিধান আছে, তাহা অনুভবেই বুঝিয়া লইবেন। অধুনা এত সূক্ষ্ম শিষ্টাচার রহিত হইয়াছে; তথাপি অভিবাদন, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বচন, প্রিয় সম্ভাষণের কত প্রকার সুপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানেন? আপনাদের এত থাকিতে,—কোন অভাব না থাকিতেও, তবু আমাদের কেমন কুকুর-বৃত্তি অথবা পরের পদ-লেহন প্রবৃত্তির অভ্যাস হইয়াছে, যে, এ সুর অবশ্য ত্যাগ করিয়া নিতান্ত নির্লজ্জরূপে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরকীয়

শিষ্টাচার ও দেশাচারের দাস হইয়া উঠিতেছি! যে ব্যক্তি ইংরাজী স্পর্শমাত্র করিয়াছে, সে ব্যক্তিও আলাপী দেখিবা মাত্র মহা ব্যগ্রভাবে সাহেবী ধরণের মুখখানা বক্র করিয়া—

"হ্যালো! হা-ডু-ডু?"

—বলিয়া হাত খানি বাড়াইয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বসে! কিন্তু ইটী ভাবে না, যে, সাহেবদের শ্বেতাননের ভঙ্গিটী কৃষ্ণ বদনে নিতান্ত বিকৃতি দেখায়? আর যে জোরে সাহেবরা সেক্‌হ্যাণ্ড করে, কালো হাতে সে জোর নাই—সে জোর দিতে গেলেও হাত ভাঙ্গিয়া যায়! আমি স্বয়ং এক দিন এক বলবান্ বাবুর সেক্‌হ্যাণ্ডের পাল্লায় পড়িয়া বাড়ী গিয়া চুণ-হলুদ্ দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

ভাল, অনর্থক এ ধার করা কেন? ইহার আর তো কোনো তাৎপর্য্য দেখি না, কেবল জানানো আর স্পর্দ্ধা করা, যে, আমি ইংরাজী খুব জানি; যে হেয় বাঙ্গালার চেয়ে আমি বড় বিদ্যা শিখেছি; যে আমি সাহেবদের সঙ্গে সহবাস করিয়া থাকি; যে নমস্কার, প্রণাম ট্রণাম সেকেলে ঘৃণিত আচার—নিতান্ত অসভ্যের কার্য্য—ছি!

যাঁহারা এখনকার বাবুদের ধরণ ধারণ ভালরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন, যে, তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে গিয়া অথবা হঠাৎ তাঁহাদের দেখা পাইয়া যে দুর্ভাগা তাঁহাদিগকে নমস্কার কি প্রণাম করে, কিম্বা যে দুর্ভাগা ইংরাজীতে কথা না কয়, অন্ততঃ বাঙ্গালার মাঝে মাঝে বড় বড় ইংরাজী কথা না বসায়, তাহার প্রতি বাবুদের অবজ্ঞা হয়, তাহাকে সামান্য লোক ভাবেন, তাহার সহিত যৎসামান্য আলাপ করেন! তাহাকে সেইরূপ নিম্ন-শ্রেণীর জ্ঞান করেন, যেরূপ সাহেবেরা তাঁহাদিগকে জ্ঞান করিয়া থাকেন। আবার যে ব্যক্তি সেক্‌হ্যাণ্ড করিতে জানে, আঃ! ওঃ! হাঃ! হোঃ! হলো! গুড্ গড্‌লো! ইত্যাদি বলিতে জানে, মধ্যে মধ্যে টেবিলাঘাতের ন্যায় হাত ফেলিতে জানে, মধ্যে মধ্যে বিনামায় গুল্‌কাঘাতে পদতলে শব্দ করিতে পারে, তায় যদি তাহার বসন ভূষণ কিছু বিলাতি ধরণের হয়, তবে সম্মানের সীমা কি? তাহার সহিত বাবুরা মনপ্রাণ খুলিয়া আলাপ করেন, তাহাকে সভ্যনিষ্ঠ "ম্যান আব্ অনার"

বলিয়া ভাবেন, তাহার কাজে অগ্রে মনোভিনিবেশ না করিয়া থাকিতে পারেন না!

শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপ প্রথার আনুষঙ্গিক বিস্তর কথা আছে, কিন্তু যথেষ্ট হইয়াছে, একটীর আভাষেই সকলটী বোধগম্য হইবেক। এক্ষণে একবার গুরুজনের অবস্থাটা দেখা যাউক।

পুরাকালে হিন্দুসমাজে পিতা, মাতা, আচার্য্য ও গুরু-সম্পর্কীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত এবং বয়োধিকের কি প্রকার মান্য ছিল তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পূর্ব্বে যে কয়টী বচন সংগৃহীত আছে, তাহাতেও এ বিষয়ের কিয়দংশ আভাসিত আছে। আর কয়েকটী এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।

শয্যাসনেঽধ্যাচরিতে শ্রেয়সা ন সমাবিশেৎ।

শয্যাসনস্থশ্চৈবৈনং প্রত্যুত্থায়াভিবাদয়েৎ॥ মনু ২য়। অ। ১১৯।

বিদ্যা ও বয়সে অধিক গুরুতর লোক যে শয্যা বা আসন আপন নির্দ্দিষ্টরূপে অধিকার করিয়া তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করেন, বিদ্যা-হীন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনো তাহাতে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। আর ঐরূপ গুরুলোক সমাগত হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি যদি শয্যায় বা আসনে উপবিষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে।

ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।

প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥ মনু ২য় অ।১২০।

বয়োবিদ্যাদি দ্বারা জ্যেষ্ঠ আগমন করিলে অল্পবয়স্ক যুবার প্রাণ যেন দেহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করে, অতএব আগন্তুক বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রত্যুত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করিলে ঐ প্রাণ সুস্থ হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে আগত বিদ্যাবয়োজ্যেষ্ঠকে অবশ্য অভিবাদন করিবেক।

মাতুলাংশ্চ পিতৃব্যাংশ্চ শ্বশুরানৃত্বিজো গুরূন্।

অসাবহমিতি ব্রূয়াৎ প্রত্যুত্থায় যবীয়সঃ॥ ঐ ১৩০॥

মাতুল পিতৃব্য শ্বশুর পুরোহিত অথবা গুরু ইহাঁরা বয়সে কনিষ্ঠ হইলে তাঁহাদিগের আগমনে গাত্রোত্থান করিয়া আমি অমুক এই কথা বলিবেক কিন্তু পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিবেক না।

পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি।

মাতৃবদ্বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো গরীয়সী॥ ঐ ১৩৩॥

পিতা ও মাতার ভগিনীর প্রতি এবং জ্যেষ্ঠা সহোদরার প্রতি মাতার ন্যায় ব্যবহার করিবেক কিন্তু জননী তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা গুরুতরা জানিবেক, যেহেতু মাতৃ আজ্ঞায় ও মাতৃস্বসৃ আজ্ঞায় পরস্পরের বিরোধ হইলে মাতৃআজ্ঞাই প্রবল হইবেক।

য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।

স মাতা স পিতা জ্ঞেয়স্তন্ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন॥ মনু ১৪৪।

যিনি যথার্থ বেদ শব্দ দ্বারা উভয় কর্ণ পরিপূর্ণ করিয়া দেন তিনি মহোপকারক বলিয়া মাতা ও পিতৃপদে বাচ্য হয়েন, গৃহীতবেদ হইলেও কেহ তাঁহার প্রতি কখন অত্যাচার করিবেক না।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।

ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্॥ ১৫৪ ঐ॥

বয়োধিক হইলেই, কেশ শ্মশ্রু প্রভৃতি পক্ক হইলেই, বিপুল ধনশালী হইলেই, পিতৃব্যাদি সম্বন্ধ থাকিলেই যে মহৎ হয় তাহা নহে, যিনি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদের অধ্যাপক তিনিই আমাদিগের মধ্যে মহৎ শব্দের প্রতিপাদ্য।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।

ন তস্য নিষ্কৃতিং শক্যা কর্তুং বর্ষশতৈরপি॥ ঐ ২২৭॥

মাতা বালককে গর্ভে ধারণ, প্রসব বেদনা ক্লেশ, ও জন্মাবধি রক্ষণ বর্দ্ধন কষ্ট সহ্য করেন, এবং পিতা বাল্যাবধি রক্ষণ বর্দ্ধন ক্লেশ ও উপনয়নাদিপূর্ব্বক বেদাধ্যাপনাদি কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, ফলতঃ অপত্যজননে পিতা মাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত শত বৎসরে শত শত জন্মেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না।

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।

তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে॥ ঐ ২২৮।

অতএব প্রতিদিন পিতামাতার ও আচার্য্যের সর্ব্বদা হিত সাধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করিবেক, যেহেতু ইঁহারা তিনি জন সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফল পাওয়া যায়।

হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সম্বিশেৎ॥ মনু ১৯৪॥

গুরু যেরূপ অন্ন ও বসন ভূষণাদি ব্যবহার করেন, শিষ্য তাঁহার নিকট তাহা অপেক্ষা অপকৃষ্ট ভোজন ও নিকৃষ্ট বসন ভূষণ সর্ব্বদা পরিধান করিবেন, গুরু রাত্রিশেষে শয়ন হইতে উত্থিত হইবার অগ্রে তিনি উত্থিত হইবেন এবং প্রথম রাত্রিতে গুরু শয়ন করিলে পশ্চাৎ শয়ন করিবেন।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥ মনু ১৯৬।

গুরু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে কএক পদ গমন করিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে অনুমতি করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে যাইয়া, গুরু বেগে গমন করিতে করিতে অনুমতি করিলে শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ ও তাঁহাকে সম্ভাষণ করিবেন।

নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং।
নচৈবাস্যানুকুর্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতং॥ ঐ ১৯৯।

শিষ্য পরোক্ষেও উপাধ্যায় আচার্য্যাদি উপপদশূন্য করিয়া গুরুর নাম উচ্চারণ করিবেন না এবং উপহাস-বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অনুকরণ করিবেন না।

আবার জ্ঞানীর গৌরব শ্রবণ করুন,—

অধ্যাপয়ামাস পিতৄন্ শিশুরাঙ্গিরসঃ কবিঃ।
পুত্রকা ইতিহোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহ্য তান্॥ ঐ ১৫১॥

পূর্ব্বকালে অঙ্গিরার পুত্র বালক অর্থাৎ বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়াও জ্ঞানবলে অধিকবয়স্ক পিতৃব্য ও তৎপুত্রদিগকে শিষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রক বলিয়া আহ্বান করিতেন।

তে তমর্থমপৃচ্ছন্ত দেবানাগতমন্যবঃ।
দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচু র্ন্যায়্যং বঃ শিশুরুক্তবান্॥ মনু ১৫২।

পুত্রক শব্দে আহুত সেই পিতৃতুল্য পিতৃব্যাদি ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদিগের

নিকট পুত্রক শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন, দেবগণ একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, শিশু যে তোমাদিগকে পুত্রক বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, তাহা ন্যায্য হইয়াছে।

অজ্ঞো ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ।

অজ্ঞং হিঁ বালমিত্যাহুঃ পিতেত্যেব তু মন্ত্রদং ॥ ঐ ১৫৩।

অল্পবয়স্ক হইলেই যে বালক হয় এমত নহে, যে ব্যক্তি মূর্খ সে বয়োধিক হইলেও তাহাকে বালক বলা যায়। যিনি মন্ত্রের বা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করান তিনিই পিতা হয়েন, পণ্ডিতেরা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বালক ও মন্ত্রদাতাকে পিতা বলেন।

আর কত বলিব? হিন্দুর শিষ্টাচারের ভাণ্ডার অনন্ত। এ সামান্য পত্রিকায় তাহার স্থান কোথায়? হায়, কেন লোকে ইহা বুঝে না? নিজের ভাণ্ডারনিহিত—নিতান্ত-অব্যবহার-মলিন—এই সমস্ত রত্নের প্রতি কেন তাকাইয়া দেখে না? আপনার ধনে হেলা করিয়া কেন পরের ধন ভিক্ষা করিতে যায়? আমি বুড়া হিন্দু, কিছুই বুঝি না—বুঝিতে পারি না। দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হই, মর্ম্মে ব্যথা লাগে। ব্যথা লাগে বলিয়াই এ বয়সে আবার এত আবোল তাবোল বকিতে বসিয়াছি। আমার এ কথা কেহ শুনিবেন না জানি; জানি, কেহ কেহ এ প্রসঙ্গ দেখিয়াই ভ্রুকুটী করিবেন, কেহ বা কল্পনার এ পাতা কয়টা উল্টাইবেন কি না সন্দেহ; তথাপি যে এত কথা লিখিয়া মরিতেছি, কেন তাহা কি বলিব? বাস্তবিক, বুড়াগুলা সমাজের বড়ই জঞ্জাল, এ গুলার কবে গঙ্গাযাত্রা হইবে? [ক্রমশঃ

শ্রীমনোমোহন বসু।

প্রেমদাসের জীবন-নাটকের এক অঙ্ক।

আমি আমার জীবনী লিখিব। বিলাতের দিয়াশিলাই-ওয়ালা যখন আত্ম-জীবনী লেখে, তখন, আমি—এত বড় একটা Reformer, আমার

জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হইবে না! যদিও জীবন-বৃত্তান্ত লেখাপ্রথাটা বিলাতী কুষাণ্ড, তবু দেশী কুষাণ্ড ত আছে। আমার এমন একজনের সহিত আধঘণ্টা মাত্রও এপর্য্যন্ত আলাপ হয় নাই, যিনি সেই আধ-ঘণ্টার মধ্যে আপনার গুণের, কাযের, ওস্তাদীর তালিকাটা আওড়াইবার চেষ্টাটাও করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন-বৃত্তান্ত লেখাটা বিলাতী, আওড়ানটা দেশী। বিলাতী ধরণ দেশীয় ভাবে প্রচারিত না হইলে বাঙ্গালার উন্নতি কোথায়? আবার আমি আজ আপনাদিগের নিকট জীবনের এমনটুকু আওড়াইব, যাহা আমার মৃত্যুর পর অন্যের দ্বারা লিখিত হইলে, নিশ্চয়ই আর এক রকম হইয়া যাইতে পারে।

ভালবাসাটা আমাদের বাড়ীর পাশের কুলগাছ। প্রত্যেক উপন্যাস-লেখক, নাটক-লেখক, প্রবন্ধ-লেখক, সকলেই ইহাকে একবার না একবার নাড়া দিয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে আমি কিছু দুষ্ট, কাজেই কুল-তলা আমার এক-চেটে!

বলা বাহুল্য, ভালবাসাটা আমার জন্মকাল হইতেই আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ জাতি-স্মর নই, গত জন্মের কথা বলিতে পারিলাম না। ইচ্ছাটা বলি।—জন্মিবা মাত্র স্তনদুগ্ধের প্রতি আমার বিশেষ ভালবাসা জন্মিয়াছিল স্তন মুখে দিলেই ক্রন্দন থামিত, নহিলে প্রতিবাসীরা—পথের পথিকেরা পর্য্যন্ত জানিতে পারিত, একটা কাদের বাড়ীর ছেলে কাঁদিতেছে বটে!

দুই বৎসর পর্য্যন্ত ভাল খাবার, ভাল খেল্না আমার এক-চেটে ছিল কিন্তু, ইংরেজ রাজত্বে কিছুই একচেটে করিবার যো নাই। আমার একটী ভগ্নী জন্মিল। এত দিন আমি গৃহের একমাত্র রাজা ছিলাম। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটী প্রতি-নায়ক জুটিল। সুতরাং মধ্যে মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত। অর্জ্জুনের সম্মুখে কর্ণ-বেচারার রথচক্র প্রায়ই কর্দ্দমে বসিয়া যাইত। তাহার উপর বিধাতার অভিশাপ ছিল। বেচারা এ পর্য্যন্ত কখনও ওসমানের মত স্বয়ং যুদ্ধং দেহি বলে নাই!

নাপিনী বাড়ীর স্ত্রীলোকদের নখ কাটিয়া দিত, আল্তা পরাইয়া দিত, কিন্তু আমার দুঃখিনী বাদী দাসীর কেহ দিত না। দুপর বেলা, নরুণের পরিবর্ত্তে খাংরা কাটি, বাটীর পরিবর্ত্তে ইট, এবং জল বাটি প্রভৃতি

সরঞ্জাম লইয়া বামীর নথ কাটিয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। "দেহি পদপল্লব-মুদারম্" আমি দুই বৎসরের সময় বলিয়াছি।

চারি বৎসর চারি মাস চারিদিনের দিন আমার হাতে খড়ি হয়। গুরু-জীউর তৈল-মসৃণ শিখা-শোভিত মস্তক দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। প্রথম যে দিন ক-এর উপর দাগা বুলাই, সেই দিন হইতেই আমার তর্কশক্তি জন্মিয়াছিল। অদৃষ্টে এতটা আছে কি না! ক দেখিয়া প্রহ্লাদের মত আহ্লাদে কাঁদি নাই। গুরু মহাশয় এ দিক হইতে খড়ি টানিয়া পুঁটুলির কাছে শেষ করিতে বলিতেন। বাঁধাবাঁধি আমার ভাল লাগিত না। ভাবিতাম, কেন ওদিক হইতে টানিয়া এদিকে না শেষ করি। বা, আমার ইচ্ছামত ক-এর পেটটা না কাটিয়া দেই। যাহা হউক, ঘরে পড়াই ভাল পড়া, আমি বাড়ীর দেয়ালে মেজেয় সিঁড়িতে খড়ি লইয়া ইচ্ছামত ক লিখিয়া ভরিয়া দিতাম।

ছয় বৎসরের সময় বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। প্রতি ক্লাসে দুই বৎসর রহিয়া, বিদ্যার গোড়ার গাঁথনি মজবুত করিয়া, বারো বৎসর বয়সে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘরে পড়াই ভাল। সুতরাং স্কুলের কোনও বই-ই পড়িতাম না।* জলখাবারের পয়সায় পথে "আমোদিনী উপন্যাস" "ছোট বয়ের গল্প" "গোপালের পাঁচালী" ইত্যাদি কিনিতাম। বাড়ীতে—লুকায়ে, স্কুলে—পাঠ্য পুস্তকের নীচে রাখিয়া, সেইগুলি পড়িতাম। জানি না, কেন বাড়ীর সকলে এবং স্কুলের সকল মাষ্টারই আমার উপর চটিতেন। তখন হইতেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি জগতের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি।

---

* পশ্চিমে—পশ্চিমে কি কোথায় তাহা আমি মনে রাখি নাই—একবার বিদ্যাসাগর বেড়াইতে যান। একটা মুদি আসিয়া বলিয়াছিল,—"মহাশয় আপনার নিকট আমার ৸৹ আনা পাওনা আছে।" বিদ্যাসাগর বলেন, "বাপু, তোমাকে আমি কখন দেখিই নাই. তোমার আমি ধারি কিরূপে?" সে বলে—"মহাশয়. আপনার ১২ খানা "বর্ণপরিচয়" কিনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার যে ১টা অক্ষর পরিচয়ও হয় নাই!"

কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কখন কোন স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতাকে এরূপ আদালতম করি নাই।

আমি বাল্যকালেই কেমন diligent ছিলাম তাহার একটী মাত্র উদাহরণ দিব। আমার একটী সহপাঠী একদিন স্কুলে "দুর্গেশ-নন্দিনী, কপাল কুণ্ডলা ও মৃণালিনী" এই তিনখানি পুস্তক আনে। আমি তাহার নিকট বই তিন খানি পড়িতে চাই। সে বলে, আজ আমি সবে কিনিতেছি, আমার পড়া হইলে তোমায় দিব। আমি তাহাকে কাকুতি মিনতি, এবং কতকটা বল দেখাইয়া বইগুলি লইয়া আসিলাম। করার—আজ বৈকালে চারিটার সময় লইয়া যাইতেছি, কাল বেলা দশটার সময় ফিরাইয়া দিব। কথামত ঠিক দশটার সময় বই তিনখানি ফেরৎ দিই। বাড়ীর মাষ্টারকে ফাঁকি দিয়া, বাড়ীর সবাইকে ফাঁকি দিয়া, বই গুলি এত অল্প সময়ের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। অথচ রাত্রি আটটার সময় যেমন শুই, তেমনি শুইয়া-ছিলাম। তবে, সারসংগ্রহকারীর মতন—বাঙ্গালি সমালোচকের মতন—যেখানে যেখানে কথা আছে সেই সেই খানটা পড়িয়াছিলাম। লম্বা Para, যেখানে লেখকের বর্ণনা বা বকুনি, সেখানগুলা পড়ি নাই। আপনারা বুঝিলেন, বাল্যকালেও আমি পল্লব-গ্রাহী ছিলাম না। উপন্যাস ভালবাসি নাই, নাটকও ভালবাসিয়াছি।

আমাদের পাশের বাড়ীতে ৩২ বৎসর বয়স্কা মোহিনী নাম্নী একটী প্রতিবেশিনী ছিল। আমাদের সহিত তাহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি তাহাকে "মোহিনী দিদি" বলিয়া ডাকিতাম। আমি যতগুলি "গোলের পাঁচালী" প্রভৃতি কিনিতাম, সকল গুলিই মোহিনীকে পড়িতে দিতাম। আমার ১২ বৎসর বয়সের সময় দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' কিনি। তাহা হইতে "প্রিয়তমে" "প্রাণেশ্বরী" 'হৃদয়েশ্বরী" প্রভৃতি কতকগুলি হৃদয়ের স্ফূর্ত্তিকর কথা শিখি। একদিন কেমন আহ্লাদে মোহিনীর প্রতি একটা প্রয়োগ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত্তরস্বরূপ একটা প্রচণ্ড গর্জ্জন ও একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত লাভ করিয়াছিলাম।

চপেটাঘাত খাইয়া বাঙ্গালা ভাষার উপর, বাঙ্গালীর প্রেমের উপর, বাঙ্গালী রমণীর উপর মনটা কেমন চটিয়া গেল। বাঙ্গালা স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। বাড়ীতে বলিলাম বাঙ্গালা শিখিলে কিছুই হইবে না। ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হইবা মাত্র মনটা ইংরেজি রকম

হইয়া গেল। কিট ক্যাট, টেরি, পমেটম, সবই জুটিল। আপনাকে একটা knight বিবেচনা হইতে লাগিল। পাড়ায় হরি নাম্নী ২৯ বৎসরের একটী গরিব যুবতী-বালিকা থাকিত। হরিকে পাড়ার সকলে বয়স্থা বিবেচনা করিত। এমন কি সেও আপনাকে কাশীবাসী হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করিত। আমার বোধ হয় সে দুষ্টামি করিয়া, nun হইবার যোগাড়ে ছিল। যাহা হউক আমি তাহাকে বাঙ্গালীর চক্ষে না দেখিয়া, ইংরেজি বইয়ের মধ্যে দিয়া দেখিতাম। আমি তাহার bloom of youth দেখিতে পাইতাম।

তাহার চালা খানি পড়ার শেষে। চালার চারি ধারে কতগুলি গাছ ছিল, কতকটা বনের মতন দেখাইত। আমি সেইখানে একটা chivalry দেখাইবার যোগাড়ে রহিলাম। সর্ব্বদাই ভাবিতাম, হরি যখন যাইবে, তাহার পশ্চাতে একটা খেক্‌শেয়ালি তাড়া করে! সে যখন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়ে পড়ে, এমন সময়ে আমি "ভয় নাই ভয় নাই" রবে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব। সে স্খলিত-বচনে অর্দ্ধ-মুকুলিত-নেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবে, তাহাকে হাসিয়া বলিব, "সুন্দরি, আমি আমার কর্ত্তব্যই করিয়াছি।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন একটা সুযোগ শীঘ্র আসিল না। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই আমার মন উত্তপ্ত হইতে লাগিল। এত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, আমি দিন রাত্রি লাঠি বা বেত হাতে করিয়া থাকিতাম। সময়ে সময়ে লাঠিহস্তে খেক্‌শেয়ালীকে কি রকম তাড়া করিব, তাহার rehearsal-এর মত ছোট ভাইয়ের পশ্চাতে তাড়া করিতাম।

"চিরদিন সমান না যায়" এ কথাটা বড় ঠিক। একদিন দেখিলাম, হরি বাজার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পশ্চাতে পশ্চাতে একটা কুকুর আসিতেছে। আর পায় কে! ঝোপ হইতে কঞ্চি ভাঙ্গিয়া সবিক্রমে কুকুরটার পশ্চাতে তাড়া করিলাম। কুকুরটা প্রথমে আমায় দেখিয়া পলায় নাই, কিন্তু প্রথম আঘাত খাইয়া ঊর্দ্ধ-শ্বাসে হা হতোস্মি! হা দগ্ধোস্মি! রবে লাঙ্গুল উত্তোলন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। হা অদৃষ্ট! কই, হরি ত আমার প্রতি কৃতজ্ঞ নেত্রে চাহিল না!—হৃদয়ে বল বাঁধিয়া হরিকে বলিলাম, "কুকুটা তোমায় কামড়াইতে আসিয়েছিল।" হরি হাসিয়া

বলিল "কেলো!" কেলো বোধ হয় কুকুরটার নাম। জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। কি, হরি আমায় knight ভাবিল না! বাড়ীতে প্রায় রোদনোন্মুখ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরে, তাহার বাড়ী দু তিন দিন গিয়া কুকুরটার গল্প করিয়া আমার প্রশংসাটুকু তাহার মুখ হইতে বাহির করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে কুকুরের গল্পটা শুনিলেই হাসিত। পাড়ার লোকের কাছে হাসিয়া আমার বীরত্ব-কাহিনী কহিত। এমন কি শেষে আমাকে দেখিলেই হাসিত!

তার পর, অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, অর্জ্জুনের মত লক্ষভেদ করিয়া বিবাহ করা বাঙ্গালীর সম্ভবে না। এখন আর রাজকন্যা নাই। বীর্য্যের আদরও নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া সমাজসংস্কারক হইলাম। আমার প্রথম ঝোঁক পড়িল বিধবা বিবাহের উপর। আমি—মহাপুরুষ, বক্তৃতা চাই না—কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি চাই। অর্থাৎ নিজে বিধবা বিবাহ করিয়া example দেখাইতে চাই। কিন্তু পাত্রী পাই না। আমার পরিচিত যতগুলি বিধবা আছে, সকল হতভাগিনীই বিবাহের দিকে মন না দিয়া ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে মন দিয়াছিল। দুই একজনকে প্রথম প্রথম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা পুনর্ব্বার পতি পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক কি না? দেখিলাম কেহ বিরক্ত হয়, কেহ বা রহস্য করিয়া বলে "কি দাদা, তুমি তোমার ঠাকুর দাদা হইবে নাকি!" ঠেকিয়া শিখিলাম, বাল বিধবার বিবাহ হওয়াই উচিত। কিন্তু, কি করি!

আমাদের একটী প্রতিবেশিনী ছিল—নাম কুসুম। বয়স ১২।১৩, কিন্তু তাহার স্বামী বর্ত্তমান! তাহার স্বামী কলিকাতায় চাকুরি করে। কুসুমের স্বামী-কুলে কেহ অভিভাবক না থাকায়, সুতরাং মাতার নিকটই থাকিত। আবার মাতৃকুলে তাহার একমাত্র মাতা ছিল। মনে মনে ভাবিতাম, কলিকাতায় সপ্তাহে ১৫০।২০০ লোক মরে, সেই ১৫০।২০০ মধ্যে একদিনও কুসুমের স্বামীটা পড়ে না! দুর্ভিক্ষে মানুষ মরে, যুদ্ধে মানুষ মরে, কিন্তু হায় চাকুরীতে মানুষ মরে না! রোগে মনুষ মরে, শোকে মানুষ মরে, কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের জন্য কেহই মরে না! বাঙ্গালা সমাজের এই জন্য উন্নতি নাই, বাঙ্গালীর এই জন্যই অধোগতি! বাঙ্গালী স্বার্থ ত্যাগ জানে না

কুসুমের স্বামী ছয় মাস বাড়ী আসে নাই, দুই মাস সে কোন পত্রাদি পাঠায় নাই। ফন্দি করিয়া সুযোগ-ক্রমে একদিন কুসুমের সহিত দেখা করিলাম। বলিলাম, "কুসুম তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।" কুসুম আমার দিকে করুণ-নেত্রে চাহিল? আমি বলিলাম "এই একজনের মুখে শুনিলাম।" কুসুমের ভাসা ভাসা চক্ষু ক্রমে টল টল ছল ছল করিতে লাগিল! প্রথমে বিন্দু বিন্দু, ক্রমে অশ্রুর স্রোত উছলিতে লাগিল। প্রথমে দীর্ঘ-শ্বাস, ক্রমে হা-হুতাশে পাড়া সরগরম করিবার উদ্যোগ করিল। বেগতিক দেখিয়া আমি বলিলাম, "কুসুম কাঁদিও না, কাঁদিলে ত আর মরা মানুষ ফেরে না। তুমি পুনরায় বিবাহ কর।" কথাগুলা বোধ হয় তার কানেই উঠিল না। তাহার ineffeminate চিৎকারে তাহার মা-শুদ্ধ পাড়ার লোক আসিয়া উপস্থিত। আমি বেগতিক দেখিয়া সেখান হইতে আগে ভাগেই প্রস্থান করিলাম।

সেই দিনই কুসুমের মাতা, আমার পিতাকে কুসুমের স্বামীর কাছে telegraph করিতে বলিলেন। পিতা তাহাই করিলেন। কুসুমের হতভাগা জীবন্ত স্বামী উত্তর পাঠাইল "I am well"। এর আর কি! আমার উপর চারি দিক হইতে প্রশ্নবাণ বর্ষণ হইতে লাগিল। কেহ জিজ্ঞাসা করে "কার নিকট হইতে শুনিয়াছিলে?" কেহ জিজ্ঞাসা করে "কোথায় শুনিয়াছিলে?" ইত্যাদি। কেহ বা সেই নির্ণাম পুরুষকে গালি দিতে লাগিল। আমার প্রত্যুৎপন্নমতিটা নাকি খুব। আমি কাঁদ কাঁদ মুখে বলিলাম, "ক্লাসের একটা ছেলে তার দাদার মুখে শুনিয়াছে।" মা বলিলেন, "বোকা! যা তা শুনিয়া আর যা তা বলিও না।" সব দোষ মুছিয়া গেল। কিন্তু কুসুম আমায় দেখিলেই ঠোঁট ভারি করিয়া চলিয়া যাইত।

সমাজ সংস্কারকেরা বড় মন যতই বাধা পায়, ততই উছলিয়া উঠে। এখন আমি ভাবিলাম, বিধবা-বিবাহ—ক্ষুদ্র সমাজের একটী ক্ষুদ্রতম সংস্কার। ভাবিলাম, হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া যাওয়া চাই। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক করিবার একমাত্র বাঁধন দড়ি—হিন্দু-মুসলমানে বিবাহ। কিন্তু আমাদের গ্রামে একটা করণীয় গৃহস্থ মুসলমান দেখিলাম না। যা দুই চার ঘর আছে তাও পাতি—চাস বাস করে খায়। সবই বাঙ্গালীর মত। কেবল জল না বলিয়া "পানী" বলে। ভাবিলাম, যখন কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় যাইব,

সেইখানে একজন ভাল কাপুরি মুসলমানের মেয়েকে বিবাহ করিব। আর আত্মকম না হইয়া বিবাহ করা ভাল নয়,—ইত্যাদি।

যখন ভারত-একীকরণ-রূপ সুদূর আকাশে মন-রূপ বাজ পক্ষী উড়িতেছিল, পিতা-ব্যাধ ফাঁশ দিয়া বোধ হয় আমাকে ধরিয়া রাখিবার কল্পনা করিতেছিলেন। একদিন মা বলিলেন, "আসচে মাসে তোমার বিবাহ।" বিবাহ! বিবাহ কথাটা দেখিতে দেখিতে মনের মধ্যে ঘুর্ণির মত ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় তলাইয়া লইয়া গেল। বোধ হইল, যেন একটা chaos-এর ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। চুল সব খাড়া হইয়া উঠিল। আবার দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া উঠিলাম—একটা ভাব আচমকা বিদ্যুতের মত হৃদয়ের মধ্যে ছুটিয়া গেল। বিবাহ! এত একটা সংস্কার করিবার বস্তু। মাকে বলিলাম, আগে Love—পরে বিবাহ। মূর্খ মা—যে মা Cod-Liver Oil-কে কডলে বেড়াল বলে, সেই হস্তিমূর্খ মা—অপোগণ্ড বাবাকে বলিল, "ছেলে বলেছে, আগে লাভ পরে বিয়ে।" বাবা হাসিয়া বলিলেন, "লাভ না হলে কি এর মধ্যেই বিবাহ দিতেছি।"

প্রেমদাস।

কৃষি-কথা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কৃষির দুর্দ্দশার কথা যদি পাড়িতেই হইল, তবে তাহা আরও একটু ভাল করিয়া বলিতে হইতেছে। বলিতেছিলাম, দুর্ভিক্ষের কথা। সে বড় ভয়ানক—রোমহর্ষণ। সে বিভীষিকার ভৈরব নৃত্যের কথা মনে হইলে আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে; লোকে পেটের জ্বালায় গাছের পাতা চিবাইয়া খাইতেছে; হিন্দু যবনের হাতের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে; মাতা প্রাণের অধিক বুকের ধন পুত্রকে

বিক্রয় করিতেছে; পুত্র বৃদ্ধ মুমূর্ষু পিতার করুণ চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাইতেছে; ধনীর গৃহপার্শ্বে যেখানে ফেন ফেলে, ভুক্তাবশেষ নিক্ষিপ্ত করে, শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় সেই খানে ক্ষুধা-কাতর দুই একজন হতভাগী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ঘরে ঘরে রাশি রাশি লোক মরিতেছে; গৃহের দ্বারে দ্বারে শকুনি উড়িতেছে; যাহারা ধন-কুবের তাহারাও অল্প দিন মধ্যে টাকার রাশি মাথায় দিয়া ঘরের ভিতর মরিয়া পচিয়া রহিতেছে। কে দেখে? কে সে দৃশ্য ফিরাইতে চেষ্টা করে? টাকায় পেট ভরে না। দেশে আহারীয় কিছুই নাই। দূরস্থ দেশের জিনিষ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আনিতে যে সময় লাগিবে, তত দিনে দেশ শ্মশানভূমে পরিণত হইবে। ভারতভূমি স্বর্ণ-প্রসবিনী, সেই ভারতের এই দশা—ইহা ভাবিতে দুঃখ হয়, চক্ষে জল আইসে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

এ ঘোর দুর্দ্দিন নিবারণের উপায় কি? এরূপ দুর্ভিক্ষ বহুদিন হইতে আছে, ও থাকিবে। রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। কিন্তু, তখন রাজ্যের জন্য, প্রজার জন্য রাজা প্রাণপণ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতেন। এখন সে দিন নাই, সে রাজা নাই। দেশ কিসে শস্যশালী হইতে পারে, কিসে দেশের প্রজা দেশের উৎপন্ন সামগ্রী খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, সে দিকে রাজার দৃষ্টি নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেও (Mayo) নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন "It cannot be denied that Indian agriculture is in a primitive and backward condition, and the Government has not done for its improvement all it might have done." অথচ ইংরাজ কৃষির বিলক্ষণ মর্য্যাদা বুঝে; দেশের ধন-রত্ন যে তাহার জমির ভিতরই লুক্কায়িত থাকে, তাহা জানে। জানে, ভারতের ন্যায় উর্ব্বরা ভূমি আর কোথাও নাই;—তাহাতে তত পাট করিতে হয় না, অথচ যাহাই বুনা যায় তাহাই ফলে; ভারতের হৃদয় এমনই অকঠিন যে ইহার চাষীদিগের সেই সামান্য যন্ত্রাদির পরশেই তাহা খুলিয়া দিয়া আপনার সর্ব্বভাণ্ডার বিলাইয়া থাকে। ইংরাজ এ সব বুঝে—সব জানে। জানিয়া শুনিয়া, লোভ সামলাইতে না পারিয়া অমনি উড়িয়া আসিয়া

চা ও নীলের চাস আরম্ভ করিল। নিতান্ত বিদেশীয় জিনিষ হইলেও তাহাই বিনা ওজরে ফলিতে লাগিল। এত দেখিয়াও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কেন যে এই ভারতের দুর্দ্দশাপন্ন কৃষির প্রতি এত উদাসীন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, এক দিন লর্ড লিটনের গভর্ণমেণ্ট কৃষি ও রেলপথ বিস্তার দুর্ভিক্ষ-নিবারণের প্রধান উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। মনে হয়, যেন এই কথা উল্লেখ করিয়াই সে সময়ে লাইসেন্স ট্যাক্স স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সব এখন অতীতের কাহিনী হইয়া গিয়াছে! সার জন ষ্ট্রাচি ও লর্ড লিটন আপনাদের ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গরিব প্রজার সেই বুকের রক্তশোষা টাকার কি ব্যবহার করিয়াছিলেন সে সব কথা উল্লেখ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

ফলতঃ গভর্ণমেণ্ট যে ভারতকৃষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ও সঙ্কুচিত-বৃত্তি, ইহা স্থির। অথচ যাহা কিছু করের তালিকা আছে, তাহা রীতিমত বিনা ওজরে আদায় হইয়া থাকে। রাজা প্রজার উৎপন্ন সামগ্রীর "ষষ্ঠাংশ-ভাগী"—এ কথা এখন আর কেহ শুনে না। তোমার উৎপন্ন হউক ভাল, না হউক ভাল, অজন্মা নাই, দুর্ব্বৎসর নাই, রাজকর কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতে হইবে। ভারতীয় কৃষকদিগের সহিত রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সংস্রব নাই। তাহাদের দুঃখের কান্না কে শোনে? জমিদারের পাইক পিয়াদার তাড়নায় থরহরিকম্প। শেষ হতভাগ্য মহাজনের দ্বারে আছড়াইয়া পড়ে। মহাজনেরও 'বাড়ির' প্রথা আছে। তিনি দেড়ী সুদে খত লিখাইয়া লইয়া নিঃশব্দে তাহার কলিজার উপর শাণিত ছুরিকা চালাইয়া লয়েন। গরিব ছাঁ-পোষা শেষে ধনে প্রাণে মারা পড়ে। হতভাগ্য কৃষকদিগের এ দুর্দ্দিন কবে পোহাইবে? রাজাই প্রজার মা বাপ, সেই রাজাই যদি প্রজার মুখ না তাকাইল, তবে আর কে তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিবে?

গভর্ণমেণ্ট নাকি বলিয়া থাকেন, কেন, যাহা মূলধন সেই জমি আমরা প্রজাদিগকে দিই, তাহার সেই মূলধন খাটাইয়া, জমিতে ফসল করিয়া, আমাদিগকে দিবে, তাহাও যদি না পারে সে দোষ কাহার? কথাটা সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, ঠিক রাজার মত নহে। প্রজা যদি মূলধন খাটাইতেও না জানে, যদি যথারীতি চাস আবাদ করিতে না পারে, তবে সে বিষয়ে

তাহাকে শিক্ষা দেওয়া রাজার কর্তব্য। প্রজার মঙ্গলই রাজার প্রকৃতি এক জন অনভিজ্ঞ অব্যবসায়ীর হাতে মূলধন দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও বড় রাজনীতিজ্ঞের উচিত নহে। এ জন্যই বোধ হয়, লর্ড মেওর উল্লিখিত ডেস্‌প্যাচের উত্তরে তদানীন্তন Secretary of State for India বলিয়াছিলেন ' It is certain that the Government has a direct and immediate interest in the improvement of Agriculture." দুঃখের বিষয়, কথাটা কথাই রহিয়া গিয়াছে; আজও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কখনও হইবে কি না তাহাও জানি না।

অনেকে বলিবেন, দুর্ভিক্ষ লইয়া এত কথা কেন? বলিয়াছ তো, ও চিরকাল আছে ও থাকিবে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ প্রভৃতি ইতি-ভয় যাইবার নহে। কিন্তু সে তো মধ্যে মধ্যে কচিৎ দেখা দিবে মাত্র। আর, এই যে প্রতিনিয়তঃ রপ্তানি-বাণিজ্যে দেশ অন্তঃশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপায় কি? ভারতে কি শস্য জন্মায় না? কিন্তু জন্মিলে হইবে কি? দেশের জিনিষ কি দেশে থাকিতে পায়? বৎসরে যে ফসলটা ফলে, তাহার কয়টা দানা ভারতের ভাণ্ডারে থাকিতে পায়? রাজা যত পারেন, আপনি শোষেন, তারপর জাহাজ বোঝাই করিয়া তাঁহার স্বদেশীয়েরা বিলাতে লইয়া যায়—তবে দেশে আর থাকিবে কি? তুঁষ ও ভুসি খাইয়া মানুষ বাঁচে না। রপ্তানি বাণিজ্য যে দেশ ছারেখারে দিতেছে, তাহার উপায় আগে কর, দেখি। কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে। উৎপন্ন সামগ্রীতে আপনার কুলাইয়া যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে সেই উদ্বৃত্তাংশ অন্যের সহিত বিনিময় করাকেই বাণিজ্য বলে। আপনি অনাহারে থাকিয়া, স্ত্রী-পুত্রকে পেটে মারিয়া, নিজের সামগ্রী অপরকে দেওয়ার নাম বাণিজ্য নহে। যাহাতে দেশের লোকেরই কুলাইয়া উঠে না, তাহা দেশ হইতে বাহিরে যাওয়া নীতিসঙ্গত নহে। ভারতের অযথা রপ্তানি-বাণিজ্য যে তাহাকে আরও নিরন্ন করিয়া ফেলিতেছে, ইহা সত্য বটে।

কিন্তু ইহাও সত্য যে, যে ভারত সর্বপ্রসূ বলিয়া জগতে বিখ্যাত, যাহার মাটি আঁচড়াইয়া এক জায়গায় দুটা দানা ফেলিয়া দিলেই সহস্র দানা উৎপন্ন হয়, চিরকালটা সকল দেশের লোক যাহার খাইয়া পরিয়া মানু-

চা ও .. ভারত আজ ইংরাজকে দু-মুঠা চাউল দিয়া যে একেবারে অন্নের কাঙ্গাল হইয়া পড়িবে, তাহা বড় দুঃখের কথা। হউক না কেন রপ্তানি-বাণিজ্য, ভারত যদি রীতিমত শস্য জন্মাইতে পারে তবে তাহাতে তাহার লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে দৃশ্য ঠিক্ বদলাইয়া যাইতে পারে। এখন রপ্তানি-বাণিজ্যে ভারত যেরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্তরূপ শস্য জন্মাইতে পারিলে তখন সে ইহাতেই আপনার অবস্থা উন্নত করিতে পারিবে। ভারতের শস্যের বিলাতের বাজারে আদর বড় বেশী। অন্যান্য যে সব দেশ হইতে তাহা আইসে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা কখনই ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি।

মনে কর, গমের চাস। তুমি যদি তোমার ক্ষেতে এমন গম জন্মাইতেই পার, যে তাহাতে তোমার ও তোমার পরিবারেরই কুলায় না, তাহা হইলে, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যদি উপযুক্তরূপ ফলাইতে পার, আপনার রাখিয়া উদ্বৃত্তভাগ যদি চালান দিতে পার, তাহা হইলে তোমার যে তাহা হইতে বিলক্ষণ দু-পয়সা লাভ হইবেই, ইহা নিশ্চিত। ডাক্তার ওয়াটসন (Watson) বলেন, ভারতের গম আমেরিকা কি অষ্ট্রেলিয়া সকল স্থানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট,—ইহা যেমন কোমল ও পরিষ্কার, তেমনি শুভ্র এবং সুস্বাদু। British Trade Journal বলেন, ভারতের ময়দায় অনেক পরিমাণে জল খায়, ইহার রুটি বেশ ফুলিয়া উঠে, এবং ইংরাজেরা বড় পছন্দ করেন। বিলাতের অনেক কলওয়ালা মহাজন শতকরা ৫০ মণ ভারতের গম, ৪০ মণ আমেরিকার গম এবং ১০ মণ ড্যানিউবের গম ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং সকল স্থান অপেক্ষা ভারতের গমের আদর যে বেশী ইহা ঠিক্। জিনিষ ভাল, অথচ ইহা অন্যান্য দেশাপেক্ষা সস্তাও হইবার কথা। ইউনাইটেড ষ্টেটসে যত জায়গা গমের চাস করিতে ৬ টাকা, ৬।০ টাকা পড়িবে, ভারতে তাহা ৩ টাকা ৩।০ টাকায় হইবে। এরূপ কম খরচা পড়িবার কারণ আছে। ভারতের মাটি যেরূপ সহজ-উর্ব্বর, আমেরিকার মাটি সেরূপ নহে। ভারতের এক কুড়া ভূমি চষিতে যে পরিশ্রম লাগিবে, আমেরিকায় সে এক কুড়া ভূমিতে তাহার চতুর্গুণ পরিশ্রমের প্রয়োজন। তা

ছাড়া, এখানে এক টাকায় যে পরিশ্রম পাওয়া যায়, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তাঁহা ৩৸০ টাকার কমে হইয়া উঠিবে না। এ দেশে মজুরদিগের বেতন মাসে বড় জোর আট টাকা। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে তাহাদের বেতন সপ্তাহে (৫৬ ঘণ্টায়) অন্যূন ১৫ সিলিং। সুতরাং ভারতের গম যে অপেক্ষাকৃত সস্তা হইতে পারিবে, ইহা একরূপ স্থির কথা। দুই দেশের খুচরা দর দেখিলে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কানপুর, লুধিয়ানা এবং জব্বলপুরে যাহা ৭৷৷০ টাকা হইতে ১১ টাকার বেশি হয় না, আমেরিকায় তাহার দর ১৬ টাকার কম নহে। তবে, একটা কথা আছে। জাহাজ-ভাড়া। আমেরিকা হইতে মাত্র আটলাণ্টিক পার হইলেই বিলাতে আসিয়া পড়া যায়। কিন্তু ভারত হইতে তেমন সুবিধা নাই। অনেক পথ, অনেক খরচ। নিউইয়র্ক হইতে লণ্ডনে লইয়া যাইতে হইলে যাহার ভাড়া ২ টাকা কি ২৷৷০ টাকা পড়িবে, ভারতবর্ষ হইতে সে জিনিষ লইয়া যাইতে হইলে ৪ টাকার কমে কোনও মতে হইবে না। বেশ কথা। কিন্তু, মোট হিসাব ধর। প্রথম বলিয়াছি, আমেরিকায় যাহার দর ৬ টাকা ৬৷৷০ টাকা, এখানে তাহা ৩ টাকা ৩৷৷০ টাকা মাত্র; তার পর বলিয়াছি, আমেরিকায় যাহার ভাড়া ২ টাকা ২৷৷০ টাকা, এখানে তাহার ভাড়া ৪ টাকা। এখন মোট হিসাব খতাইয়া দেখ। আমেরিকায় যে গম ভাড়া সমেত ৮ টাকা কি ৯ টাকা পড়িবে, ভারতে তাহা ভাড়া সমেত ৭ টাকা কি ৭৷৷ টাকা পড়িবে। তবু ১ টাকা, ১৷৷ টাকার কম বেশি। ভারতের গম ভাল, অথচ ভারতের গম সস্তা, তবে ভারতের গমে লাভ না হইবে কেন? তবে রপ্তানি বাণিজ্যের অকারণ দোষ দিব কিসের জন্য?

তবে, আসল কথা, উপযুক্তরূপ ফসল চাই। তাহা হয় না বলিয়াই ত যত বিপত্তি। শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, ১৮৮১ অব্দে ইংলণ্ডে সর্ব্ব সমেত ৫৭০৪২৬৪৯ হাণ্ডর গম ৩১৬৬৬৮০৭০ টাকায় আমদানি হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৩৮২৬৮৫১০ টাকার গম গিয়াছিল। * হিসাব করিলে অতি যৎসামান্য মাত্র,—আট ভাগের এক ভাগ। ভূতপূর্ব্ব

* The Influence on English trade and American protection by the development of India.

রাজস্বসচিব মেজর বেয়ারিং এ সম্বন্ধে বজেটে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলেই ভারতের চাস আবাদের দুর্দ্দশার কথা বুঝিতে পারা যায়। মেজর বেয়ারিং স্থির করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতে মাত্র ২১০০০০০০ একার ভূমি গমের চাস হয়। অথচ অযোধ্যা, মধ্য-ভারত, বোম্বাই, বেরার, বেহার এবং বাঙ্গালা সকল প্রদেশেই ইহার চাস হইয়া থাকে। যে সব জমিতে চাস হয়, তাহাও রীতিমত, যেমন হওয়া উচিত সেরূপ, ফসল হয় না। ইহার অধিক আক্ষেপের কথা আর কি আছে?

শুদ্ধ গম নহে। সকল শস্যই আর ভারতে উপযুক্ত রূপ জন্মে না। সুপ্রসিদ্ধ আকবর সম্রাটের রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল তখনকার উৎপন্ন শস্যের একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। তাহা উনিশ বৎসরের বহু আয়াসে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আইন আকবরীতে সেই তালিকা আজও জাজ্জ্বল্যরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। তাহার মতে দেখিতে পাই, তখন, প্রতি একার ভূমিতে—

চাউল	১৩৩৮ পৌণ্ড।
গম	১১৫৫ ,,
তুলা	২২৩ ,,

পরিমাণে জন্মিত। আর, আজ কালি দেখিতে পাই, সেই প্রতি একার ভূমিতে,

চাউল	৮০০ হইতে ৯০০ পৌণ্ড
গম	৬৬০ ,,
তুলা	৫২ ,,

মাত্র জন্মিতেছে। এ কি এ! সে স্বর্ণপ্রসূ ভারতের উর্ব্বর-ক্ষেত্র কোথায় গেল? সে লক্ষীর প্রিয় লীলাভূমির কেন এ দশা হইল? ভারতের সারধন তাহার ভূমির সেই উর্ব্বরতা শক্তি কে হরিয়া লইল? Mr. Rivett-Carnac, আমেদাবাদের তুলার চাসের শেষ অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "Ah! I am at a loss to account for the continuous yearly decrease of this staple." দুই শত বৎসরের মধ্যে যাহার এই অবস্থা ঘটিয়াছে, আর দুই শত বৎসরের পর তাহার কি ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হইবে তাহা কে বলিবে? সে কথা মনে ভাবিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভারত স্বর্ণপ্রসবিনী, সেই ভারতের এই পরিণাম!

ভয়ে ভয়ে।

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে?
কচি কচি ঠোঁট দুটি কেন কাঁপে ধীরে?
বিষাদ-গম্ভীর মুখ,
দেখে কি কাঁপিছে বুক?
ঢল ঢল আঁখি-যুগ ছল ছল নীরে!
আসিতে সাহস নাই,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই?
ডাকিলেই 'এস ধাই,' আর কেন চেয়ে রে!
আমার স্নেহের লতা,
তুমি কি বুঝেছ ব্যথা?
কাঁপিছে অধর-পাতা, অভিমানী মেয়ে রে!
মুছেছি, মা, আঁখি-জলে;
ভয় কি, মা, আয় কোলে!
ডাক দেখি 'মা, মা,' ব'লে, আয় বুকে, রাণি রে!
—আয় বুকে অবশিষ্ট সুখ-হাসি-খানি রে!

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

যুগ-ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে অধুনা লোক সকল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া চীৎকার করিতেছেন। তন্মধ্যে ধর্ম্ম পদার্থ যে কি তাহা এ পর্য্যন্ত অনেকে স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অনেকে বলেন, যদ্বারা জগৎ রক্ষা হইতেছে তাহারি নাম

ধর্ম্ম। আর কেহ কেহ বলেন, মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে বিধিনিষেধ আছে তাহাই প্রতিপালনে ধর্ম্ম। আবার কেহ কেহ বলেন, বাইবেলোক্ত বিধিনিষেধ পালনেই ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন কোরাণোক্ত বিধিনিষেধ পালনই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর অনেক প্রকার নূতন নূতন মত আছে। বৌদ্ধ মত, জৈন মত, দিগম্বর সিদ্ধান্তী মত, কাপালিক মত, অঘোরি মত, নানকপন্থী মত, গোরক্ষী মত, মহাপ্রস্তর মত, কর্ত্তাভজা মত, ব্রাহ্ম সমাজের মত, কৃতবিদ্য নব্য বঙ্গালির মত।

এত মতামতিতেও আজি পর্য্যন্ত চঞ্চলপ্রকৃতি মানবের ধর্ম্মই স্থির হইতে পারিতেছে না। লোক সকল যতই হেতুবাদী হইতেছেন ততই পুরাতন ধর্ম্মে হীনশ্রদ্ধ হইতেছেন। বাহ্য ধর্ম্মে হেতুবাদ চলে। অপরোক্ষ ধর্ম্মে হেতুবাদ চলিতে পারে না। পরোক্ষ আর অপরোক্ষ ভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার। কৃত্রিম ধর্ম্মকে পরোক্ষ, স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অপরোক্ষ ধর্ম্ম বলা যায়। সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বজাতীয় শাস্ত্রে উক্ত উভয়বিধ ধর্ম্ম পালন ও অপালনের বিধিনিষেধ আছে। যাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করেন না, তাঁহাদিগকেই নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী বলা যায়। অপরোক্ষ ধর্ম্মকে যোগীগণ আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, আর পরোক্ষ ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তনশীল বাহ্য জগতীয় ধর্ম্ম বলেন। এ ধর্ম্ম প্রতি যুগে পরিবর্ত্তন হয়। যেমন যুগ পরিবর্ত্ত হয়, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও পরিবর্ত্ত হইতেছে। ইহারি নাম যুগ-ধর্ম্ম।

শাস্ত্র আবার দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় নানা প্রকার। ভারতবর্ষের জল বায়ু ও মৃত্তিকার আর রৌদ্রের গুণে ভারতবর্ষবাসী লোকের যেমন আকৃতি প্রকৃতি ভারতীয় সিদ্ধযোগী আর অভ্রান্ত ত্রিকালজ্ঞ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তদুপযুক্ত শাস্ত্র সকল প্রস্তুত করায় লোক সকল তদনুসারে চলিয়া সুখী হইতেছেন।

অপরাপর দেশেও এই রূপ চলিতেছে। তাহাতেই সে সকল দেশের লোক সকল সুখী। যে সকল শাস্ত্র আপ্ত বাক্যে সংরচিত সে সকল শাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তদ্ভিন্ন আর আর শাস্ত্র সকল দোষবহুল হেতু লোকের নিতান্তই অনিষ্টকর। সিদ্ধযোগী আর তপঃসিদ্ধ

তত্ত্বজ্ঞানীরাই অভ্রান্ত ত্রিকালজ্ঞ ও বাক্‌সিদ্ধ। ভারতীয় পুরাতন মুনি ঋষিরাই আপ্ত বাক্যের অধীশ্বর ছিলেন। সেই জন্যই এ প্রবন্ধে তদবলম্বন করিয়া হিন্দুর হিতার্থ যুগ-ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধ লিখিতেছি। এত দিন এরূপ প্রবন্ধ যদি কোন দেশহিতৈষী মহাত্মা লিখিয়া সকলকে জানাইতেন তাহা হইলে দেশের অনেকটা উপকার হইতে পারিত। বোধ হয় এখন সময় হইয়াছে বলিয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে। সকলই কালে হয়, আবার কালে লয় পায়। হিন্দু শাস্ত্রে পুরাতন কালের বিষয় যেমন প্রকাশ আছে, এমন আর কোন দেশায় কোন জাতির শাস্ত্রে আছে কি না তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রায় ৫০০০ হাজার বৎসর হইল কলিযুগ প্রবর্ত্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২১০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত মহারাজা যুধিষ্ঠির দেবের কিম্বা অর্জ্জুনের বংশাবলিতে ভারত শাসন কিম্বা সমগ্র পৃথিবী শাসন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এক প্রকার পুরাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। তখন হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজা ও মুনিঋষি দ্বারা পৃথিবী শাসন হইয়াছিল তাহারও প্রমাণ পুরাণ, আর তন্ত্রশাস্ত্র। যখন চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় হিন্দুরাজা দ্বারা পৃথিবী শাসিত হইয়াছিল, তখন হিন্দুধর্ম্ম বৈ আর কোন ধর্ম্ম যে পৃথিবীতে ছিল, তাহারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চীন হিন্দু ছিল, মুসলমান হিন্দু ছিল, খৃষ্টান হিন্দু ছিল (কে না হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিল ?) সকলি হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিল। সূর্য্য-বংশীয় সগর রাজা হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হয় তাহারাই বৈদিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইল, যাগযজ্ঞ সংস্কার বিহীন হইল। কিন্তু তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ায় অধিকারী হওয়ায় ঐ সকল লোক কেবল তন্ত্রমতে দৈব পৈত্র ও সংস্কার ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ইহারা বৈদিক ভাষা ও বৈদিক অক্ষর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হওয়ায় স্ব স্ব দেশোপযুক্ত ভাষা ও অক্ষর সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তৎকালে হিন্দু-ক্ষত্রিয় রাজাদিগের বলবীর্য্য অব্যাহতই ছিল বলিয়া, ঐ সকল অনার্য্যগণ হিন্দু রাজাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাঁরা এইরূপে চীন, পারস্য, মুসলমান, খৃষ্টান, মগ, পাহাড়িয়া প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ায় নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁরাও ক্রমশঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টানেরা এখন যে ধর্ম্মাবলম্বী, ১৯ শত বৎ-

সর পূর্ব্বে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এইরূপ মুসলমানেরা ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন অধুনা সে ধর্ম্ম তাঁহাদিগের নাই। চীনেরাও ২২ শত বর্ষ পুর্ব্বে যে ধর্ম্ম পালন করিতেন, এইক্ষণে সে ধর্ম্ম পরিভ্রষ্ট হইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন। এইরূপ পৃথিবীর তাবৎ জাতির পক্ষে ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে এত আর কোন জাতির হয় নাই। হিন্দুশাস্ত্রে প্রকাশ আছে যে, হিন্দুরা সত্য যুগে কেবল বেদ মতে, ত্রেতাতে কেবল শ্রুতিস্মৃতি মতে, দ্বাপরে কেবল পুরাণ মতে, কলিতে শুদ্ধ তন্ত্র মতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। ইহার প্রমাণ এই—

"যুগাদৌ বেদমার্গেন ত্রেতায়াং শ্রুতিসম্মতং
দ্বাপরেচ পুরাণেন কলাবাগমসম্মতম্॥" তন্ত্র তারাপ্রদীপ।

বিশেষতঃ কলিযুগের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা পক্ষে তন্ত্রই যে এক মাত্র শাস্ত্র তাহার কতিপয় প্রমাণ এই স্থলে দেখান যাইতেছে।

যথা—

আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ ভজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলাবান্য বিধানতঃ॥
কলৌতন্ত্রোদিতাঃ মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণ ফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ কর্ম্মসু সর্ব্বেষু জপ যজ্ঞ ক্রিয়াদিষু॥
নান্যঃ পন্থা মুক্তিহেতুরিহামুত্রসুখাপ্তয়ে।
তথা তন্ত্রোদিতো মার্গো মোক্ষায়চ সুখায়চ॥
দীক্ষাং পূজাং জপং হোমং পুরশ্চরণ তর্পণং।
ব্রতোদ্বাহৌ পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা॥
জাতকর্ম্ম তথানাম চুড়াকরণমেবচ।
মৃতক্রিয়াং পিতৃশ্রাদ্ধং কুর্য্যাদাগমসম্মতং॥
তীর্থশ্রাদ্ধং বৃষোৎসর্গং শারদোৎসবমেবচ।
যাত্রাং গৃহ প্রবেশঞ্চ নব বস্ত্রাদিধারণং॥
বাপীকূপতড়াগানাং সংস্কারং তিথিকর্ম্মচ।
গৃহারম্ভং প্রতিষ্ঠাঞ্চ দেবানাং স্থাপনং তথা॥

দিবাকৃত্যং নিশাকৃত্যং পর্ব্বকৃত্যং তথৈবচ।
ঋতুমাস বর্ষকৃত্যং নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ যৎ ॥
কর্ত্তব্যং যদকর্ত্তব্যং ত্যাজ্যং গ্রাহ্যঞ্চযদ্ভবেৎ।
মহোক্তেন বিধানেন তৎসর্ব্বং সাধয়েন্নরঃ ॥
ন কুর্য্যাৎ যদি মোহেন দুর্ম্মত্যাশ্রদ্ধয়াপি বা।
বিনষ্টঃ সর্ব্ব কর্ম্মেভ্যো বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥
যদি মন্মতমুৎসৃজ্য মহেশি প্রবলে কলৌ।
যদ্যাযৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম বিপরীতায় তদ্ভবেৎ ॥
কলিকালে প্রবৃদ্ধেতু ত্যাগ্না মচ্ছাস্ত্রমপিকে।
যোহন্যমার্গৈঃ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥
অতোঽহাহো প্রকুর্ব্বাণো যোঽন্য মার্গেণ পার্ব্বতি।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

প্রবল কলিতে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বংশে যে সকল সন্তান জন্মিবে তাহারা শুদ্ধ কাল-মাহাত্ম্যে অপবিত্রতা-হেতু সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়ারহিত হওয়ায় শূদ্রবৎ হইবে। তজ্জন্য তাহারা বেদাদি শাস্ত্রে অনধিকারী হইবে। কেবল তন্ত্রে অধিকার থাকিবে। ইহাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মূল মর্ম্ম। তন্ত্র ভিন্ন এ সময়ে অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। তন্ত্র মতে ক্রিয়া করিলে তাহাতে কৃতকার্য্য যে হইতে পারিবেন ইহারও প্রমাণ এই—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ণ শ্রৌতবর্ত্মনা ॥ তন্ত্রযামল।

এতদ্ভিন্ন এই কলি যুগের ব্রাহ্মণেরা বৈদিক সন্ধ্যা ব্যতীত আর কোনরূপ বৈদিক ক্রিয়ায় যে অনধিকারী তাহারও প্রমাণ গায়ত্রী তন্ত্রে বিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

গায়ত্রীচ তথা সন্ধ্যা বেদধ্যানং তথা মনুং।
কলিকালে মহারাজ ব্রাহ্মণেষু প্রশস্যতে ॥
অন্যংসর্ব্বং বেদমতং কলৌ বিবর্জ্জয়েদ্দ্বিজঃ।
বেদপাঠে ব্রাহ্মণস্য নাধিকারঃ কলৌযুগে ॥

হে মহারাজ, বেদমাতা গায়ত্রী, বৈদিক সন্ধ্যা, বেদের ধ্যান আর বেদ চতুষ্টয়ের মন্ত্র চতুষ্টয় এই চারিটি বৈদিক কার্য্য কলিকালে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার বৈদিক ব্যাপার পরিত্যজ্য। বিশেষতঃ কলিতে ব্রাহ্মণের বেদ পাঠে অধিকার নাই। প্রবল কলিতে বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের যেরূপ অবস্থা তাহা সপ্রমাণ লেখা যাইতেছে। মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে—

নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতিজাতীয়াঃ বিষহীনোরগাইব।
পাঞ্চলিকাঃ যথাভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ॥
সত্যাদৌসফলা আসন্ কলৌতে মৃতকাইব।
অস্মরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমং যথা।
ন তত্রফলসিদ্ধিঃস্যাচ্ছ্রম এবহিকেবলং॥

এই প্রবল কলিতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও বেদ ইঁহারা বীর্য্যহীন হইয়া রহিয়াছেন। যেমন বিষহীন সর্প তাহাঁরি মত হইয়া রহিয়াছেন। নির্বিষ প্রাণিতে দংশন করিলে প্রাণিগণের কেবল ক্ষত মাত্র হয়। তেমনি বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ মন্ত্রে ক্রিয়া করিলে কেবল অনর্থক অর্থব্যয় আর পরিশ্রম হইয়া থাকে।

অপরঞ্চ, চিত্রিত বিচিত্র পট দিয়ালে লটকাইয়া রাখিলে সেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-সম্পন্ন প্রতিমূর্ত্তি যেমন কোন কার্য্য করিতে পারে না, কেবল দেখিতে মনোহর, তেমনি বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের বাক্যগুলি একালে শুনিতে বা পড়িতে অতি সুমিষ্ট ও মনোহর হয়; কিন্তু দৈব পৈত্র্যাদি কার্য্যে কোন ফল দান করিতে পারে না। ঐ সকল শাস্ত্র সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে প্রকৃত ফল দান করিতে পারিত। একালে ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত বাক্যে কোন ফল হয় না, তাহা মৃতবাক্য হইয়াছে।

আবার—এই প্রবল কলিকালে তন্ত্রোক্ত মন্ত্র ব্যতীত অন্য বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণোক্ত মন্ত্র দ্বারা ক্রিয়া করিয়া ফলকামনা করা, আর বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান লাভ করিতে আশা করা উভয়ই সমান। সে কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

ভারতবাসী হিন্দু জাতি এই প্রবল কলিকালেও অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়াও দৈব পৈত্র্যাদি যে কিছু ক্রিয়া করিতেছেন, তাহাতে কোন ফল যে পাইতেছেন না, তাহার প্রকৃত কারণ অশাস্ত্রীয় কার্য্য করা। অশাস্ত্রীয় কার্য্য তাহাকে বলি, যে কালের জন্য যে শাস্ত্র প্রচার বা সৃষ্টি হইয়াছে, সেই শাস্ত্রানুযায়িনী ক্রিয়া না করা; কিম্বা শিবাজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার মত কার্য্য করা।

যেমন বৈদ্য আর ঔষধ সঙ্কর হইলে রোগ প্রতীকার হয় না, তেমনি বহুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দৈব পৈত্র্যাদি কার্য্য করিলে, সে কর্ম্মের ফল পাওয়া দুরাশা। তদ্দ্বারা কেবল অভিচারই ঘটিয়া থাকে।

এইক্ষণকার প্রায় তাবৎ ক্রিয়ায় বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র মিশ্রিত। কেবল শ্যামা, আর জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা শুদ্ধ তন্ত্র মতে হইতে দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার উপযুক্ত পুরোহিত বা সাধক দেখা যায় না। যেখানে তাহা মিলে সেখানকার কার্য্যের ফল হাতে হাতে লাভ হয়।

গুরুমুখী ও অতিগুপ্ত হেতু এ বিদ্যা অতি কঠিন। ইহার সচরাচর সদ্‌গুরু পাওয়া সুকঠিন। অন্যান্য শাস্ত্রের টীকা টিপ্পনী আছে। তন্ত্র শাস্ত্রের তাহা নাই। তন্ত্র শাস্ত্রকে মন্ত্রযোগ সাধনার শাস্ত্র বলে। ইহার সহিত হঠ যোগ, রাজ যোগ, লয় যোগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সহিত সে সকল কথা উপস্থিত মত লেখা যাইবে; এখন বর্ত্তমান সময়কে প্রবল কলি বলা যাইতে পারে কি না, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

এতদিন কলি প্রবল হয় নাই। প্রবল কলির প্রধান চিহ্ন এই, হিন্দু ধর্ম্মানভিজ্ঞ অত্যন্ত ধনলোভী ম্লেচ্ছজাতি ভারতের সম্রাট হইবেন। ১।

ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিয়া পরধর্ম্মাবলম্বন করিবেন। ২

গঙ্গাদেবী ছিন্ন ভিন্ন ও অন্তর্হিতা হইবেন। ৩

বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণের তেজক্ষয় হইবে। ৪।

পৃথিবীস্থ তাবদ্বস্তুর আকৃতি ধর্ম্ম ও স্বাদ অল্প হইবে। ৫।

গোব্য দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইবে। ৬।

স্ত্রীলোক সকল স্বাধীনা ও মুখরা এবং দুর্ব্বৃত্তা হইবে। ৭।

অন্ন আর সতীত্ব সর্ব্বত্র বিক্রয় হইবে। ৮।

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত থাকিবে না। ৯।

হিন্দু মাত্রেই বামাচারী হইবে। ১০

—ইত্যাদি। এ গুলি ঘটিয়াছে বলিয়া ইহাকেই সাধরণে প্রবল কলি বলে। ইহাও ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তন হইয়া শেষে ঘোর কলি হইবে। তৎপর যুগান্তর উপস্থিত হইবে! জগদ্‌গুরু শঙ্কর কলিযুগের প্রথম ভাগের মানব-নিস্তারার্থ অনেক তন্ত্র মন্ত্র প্রচার করিয়া শেষে বিবেচনা করিলেন, প্রবল আর ঘোর কলির লোক সকল এমন দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য আর সাহসহীন হইবে যে, যে সকল তন্ত্রাদি প্রকাশ করিলাম তার নিয়ম সকল প্রতিপালনে তাহারা নিতান্তই অক্ষম হইবে। তবে তাহাদিগের উপায়ের নিমিত্ত মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র প্রকাশ করা যাউক। তজ্জন্য, আর জগন্মাতা ভগবতীর অনুরোধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ তন্ত্র খানি কেবল প্রবল আর ঘোর কলির শাস্ত্র। সেই কলির রাজত্ব এখন পড়িয়াছে কি না, এবং সেই তন্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ পালন করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা কর[illegible]ন উচিত হইয়াছে কি না, তাহারই মীমাংসা করা এই প্রবন্ধে [illegible]ক্ষেপ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। এক্ষণে, যোগী আর প্রকৃত শাস্ত্রী ম[illegible]শয়দিগের নিকট এই প্রার্থনা যে, এই প্রবন্ধটির মত কার্য্য হইলে প্র[illegible] হিন্দু সমাজের উপকার হইবে কি অপকার হইবে; আর লিখিত বিষয়টি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত কি অশাস্ত্রীয়, ইহা সপ্রমাণ জানাইলে আমাদিগের সন্দেহ দূর ত হইবেই হইবে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইতে পারিবে।

[ক্রমশঃ—

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

ভারতে ইংরেজাধিকার*।

ভারতে ইংরেজাধিকার প্রবন্ধে আমি প্রধানতঃ এই কয়েকটি বিষয় বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। প্রথম, ভারতে ইংরেজাধিকার একটি অসাধারণ ঘটনার মধ্যে পরিগণিত নহে। দ্বিতীয়, ভারতে ইংরেজাধিকার কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তৃতীয়, ভারতের পূর্ব্বতন সম্রাটেরা যে নীতির বলে আপনাদের সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত রাখিয়াছিলেন,—শেষ যে নীতিতে ঔদাসীন্য দেখাইয়া সাম্রাজ্যের বলক্ষয় করিয়াছিলেন, ভারতে ইংরেজাধিকারে কিয়দংশে সেই নীতির অবমাননা হইতেছে। যে সকল ইংরেজ-লেখক বর্ত্তমান সময়ে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক সিলী প্রধান। অধ্যাপক সিলীও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতে ইংরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই; এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে ইংরেজ কোন অলৌকিক শক্তিরও পরিচয় দেন নাই। আমি উপস্থিত প্রবন্ধে এই মতের আলোচনা করিব।

অনেকে বলেন, ইংরেজ আপনাদের অনন্ত মহিমাময় ক্ষমতায় ও অপূর্ব্ব যাদুবিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক, শিবজী বা রণজিৎসিংহ যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, ইংরেজ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। চাণক্যের কূট-মন্ত্রণায় যাহা সম্পন্ন হয় নাই, ইংরেজের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। বণিক ইংরেজ বণিক্-বেশে ভারতবর্ষে আসিয়া অল্প দিনে সিন্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে আপনাদের জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন। অল্প দিনেই তাঁহাদের স্বদেশের বণিক্-সমিতির এক জন অনুগত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা, সমগ্র ভারতে সেকেন্দরশাহ বা শার্লেমানের, পিতর বা

---

* দরজীপাড়া জাতীয় পাঠক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

নেপোলিয়ানের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার স্পর্দ্ধা করিয়াছে। ইহা ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তির ফল—অগম্য, অচিন্ত্য মহিমার পরিচয়। ইংরেজ এই দেবশক্তির বলে—এই অচিন্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দূরতর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, বহুবিস্তৃত, বহু সমৃদ্ধ ও বহু জনাকীর্ণ ভূখণ্ডে অলোক-সামান্য পুরুষ ও রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

যাঁহারা অন্তস্তত্ত্বদর্শী নহেন, তাঁহারা যে, ইংরেজের সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ইতালীর সহিত ভারত-বর্ষের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এসিয়ার মানচিত্রে যেমন ভারত-ভূমি; ইউরোপের মানচিত্রে তেমনি ইতালি। উভয়েই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ; উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ হইয়াছে; উভয়ের শীর্ষদেশেই অটল অচলবর বিরাট-পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির অনুপম শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে; উভয়ের অন্তর্দ্দেশে প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতী তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে; উভয়েই প্রকৃতি রাজ্যের রমণীয় স্থান; শ্যামল তরুলতায়, শস্যপূর্ণ প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়েই চিরশোভিত, অযত্নসম্ভূত সৌন্দর্য্যের গরিমায়, অনায়াস-লভ্য ফলসম্পত্তির মহিমায় উভয়েই বিভূ-ষিত। পক্ষান্তরে, ভারতের ন্যায় ইতালীও অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। বহুশতাব্দী ধরিয়া উভয় জনপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নির্জ্জিত, নিপীড়িত ও আত্মস্বাধীনতায় বঞ্চিত। ইতালী পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল। অষ্ট্রিয়ার ন্যায় ইতালীর সৈন্যবল ছিল না, ইতালীর অধিবাসীরাও অষ্ট্রিয়ার অধিবাসীদের ন্যায় সাহসসম্পন্ন বা রণ-নিপুণ ছিল না। সীজর বা আণ্টনীর সময়ের বীরত্বকীর্ত্তি এ সময়ে ইতালী হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিল। যে অসাধারণ পরাক্রম, যে বিপুল বৈভবে জগতের লক্ষ্মী সৌন্দর্য্যশালিনী রোমনগরী তিবরের তীরে দাঁড়াইয়া আপনার গৌরবে আপনি হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম ও সে বৈভব ধীরে ধীরে অনন্ত অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে অষ্ট্রিয়া ইতালীর নিকটবর্ত্তী ছিল, সুতরাং অল্প সময়ে, অল্প আয়াসে

আক্রান্ত জনপদে আপনাদের পাশবশক্তির পরিচয় দিত। ইতালী এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়াও আপনাকে অষ্ট্রিয়ার অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। এই অধীনতাপাশ উচ্ছেদের একমাত্র কারণ—ইতালীর অপূর্ব্ব জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালী অনেকবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও আপনার জাতীয়ভাব হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ইতালীর সাহসী সৈন্যগণ পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তাহার অধিবাসিগণ বিদেশীর অত্যাচারে সুখের, সম্পদের, শান্তির আশায় অনেকবার জলাঞ্জলি দিয়াছে; ইতালীর বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুণ্ঠিত ও দেশান্তরে নীত হইয়াছে; কিন্তু ইতালী জাতীয়-জীবনের গৌরবশূন্য হয় নাই। জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ ও জাতীয়-জীবনে অনুপ্রাণিত হওয়াতে সমগ্র ইতালীতে অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়, অন্যান্য ভূখণ্ড ইতালীর সহিত সমবেদনা প্রকাশ করে, বিদেশী আক্রমণকারী অবশেষে ইতালীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরে, ভারতের দিকে—এই ঘোর দুর্দ্দশাময় পতিত ভূমির দিকে চাহিয়া দেখ। ইতালী যেমন অষ্ট্রিয়ার নিকট রহিয়াছে, ভারতভূমি তেমন ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী নহে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বহুদূরে—সাগর-ভূধর-পরিবৃত বিপুলা পৃথিবীর একভাগে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের বণিক্‌দিগকে বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া অনেক কষ্টে—অনেক দিনে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল। তখন অন্তরীক্ষের তড়িৎ ভূতলে আসিয়া ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী করে নাই; বাষ্পপ্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক অবনত করিয়া ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে সাহায্য করে নাই; মহাত্মা লেসেপসের বুদ্ধি বিস্তৃত সৈকত ভূমে জলস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অধিকতর সুগম করিয়া দেয় নাই। অধিকন্তু ইংলণ্ড যে সময়ে বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল না, ইংলণ্ডের অধিপতি সেকন্দর বা হানিবলের ন্যায় দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন না, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের আট গুণ পরিমিত ছিল, তথাপি ভারতবর্ষ সহজে ইংলণ্ডের বশীভূত হয়। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ ইতালীর ন্যায় কখনও আত্মস্বাধীনতা লাভে উন্মুখ হয় নাই, সমগ্র ভারতভূমি ইতালীর

ন্যায় জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডকে “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া কখনও আহ্বান করে নাই। অষ্ট্রীয়াকে ইতালীর জন্য যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল, ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় নাই। সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে ইংরেজ বণিকের পদানত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণে আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইহা কি বিস্ময়কর ঘটনা নহে? ইহাতে কি ইংরাজের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইংরেজের অচিন্তনীয় মহিমায় কি ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই?

ঘটনা বিচিত্র বটে, কিন্তু এই বৈচিত্রের সহিত কোনরূপ অলৌকিক শক্তির সংযোগ নাই। কোনরূপ অচিন্ত্য মহিমার সংশ্রব নাই। উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমতঃ ধরিয়া লওয়া যাইতেছে যে, ইতালীর ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল; দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের পরাক্রমে এই সার্ব্বজনীন শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ইংরেজ সমগ্র ভারতস্থ সমান আচার, সমান ধর্ম্ম ও সমান ভাষার একটি বিশাল জাতিকে আপনার ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই দুয়ের একটি কথাও প্রকৃত নহে, একটিও যথার্থ ঘটনার উপর স্থাপিত হইয়া ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তির সমর্থন করিতে পারে না। ইংরেজের পদার্পণ সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না; ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পরে ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই।

জাতীয় ভাবের উৎপত্তির প্রথম কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাষা। সমস্ত ইংলণ্ডের লোক এক ইংরেজীতেই আলাপ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সুযোগ ভারতবর্ষে নাই। সমগ্র এসিয়ার লোক এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, ইহা বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, আর সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক ভাষায় আলাপ করে, ইহা বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্যথাচরণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক জনপদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে বুঝিতে পারে না; এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর করিয়া পড়ে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীর চিন্তা, ধারণা, সম-

বেদনা প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ভাব বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? ইতালী ভারতবর্ষের ন্যায় খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও এক ভাষায় আবদ্ধ ছিল। সমগ্র ইতালীর লোক পরস্পর এক ভাষায় কথোপকথন করিয়া পরস্পরের নিকট মনোভাব জানাইতে পারিত। এই সাধারণ ভাষা হইতে একটা সাধারণ সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। স্বদেশবৎসল কবির রসময়ী কবিতায়—স্বদেশ-হিতৈষী বক্তার তেজস্বিনী বক্তৃতায় এই সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতে থাকে। কবিগুরু দান্তে এক সময়ে অপূর্ব্ব দেশ-ভক্তিতে বিভোর হইয়া যে গান গাইয়াছিলেন, রায়েঞ্জি সেই গান গাইয়াই স্বদেশীয়গণের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করেন। সমস্ত ভারতভূমিতে এ দৃশ্যের আবির্ভাব দেখা যায় নাই, সুতরাং কোন সময়ে সমস্ত ভারতভূমি একত্র জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে নাই।

একবিধ ধর্ম্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচার ব্যবহার প্রভৃতিতেও জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতবর্ষের অদৃষ্টে ইহাও ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত দুরারোহ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য, দুস্তর তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ভারত-বর্ষের জনপদ সকল পরস্পর পৃথক ভাবে অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক অন্তরায়েও কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই। জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখা যায় নাই। সুতরাং এসিয়া, ইউরোপের ন্যায় ভারত বর্ষও একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। ইহার সহিত সার্ব্বজনীন রাজ-নৈতিক ভাবের কোন সংস্রব নাই। নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তিতে ভারত-বর্ষের অঙ্গ সকল বহুকাল হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক অঙ্গ বেদনা অনুভব করে না; এক অঙ্গে তাড়িত বেগ প্রবেশিত করিলে আর এক অঙ্গের স্পন্দনক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই বিচ্ছেদে—এই অনৈক্যে ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে বলশালী হয় নাই। যখন শাহবুদ্দিন ঘোরিকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ দৃষদ্বতী-তীরে সমাগত হন, তখন জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন নাই। ভারতে মোগল রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবরশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, শেষে আফগানিস্থান তাঁহার হস্তগত হয়। বাবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন

গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাদৃশ সহায়সম্পন্ন ছিলেন না—বিশেষ রণনিপুণ যোদ্ধারাও তাঁহার সহযোগী হয় নাই, তথাপি বাবরশাহ ভারতবর্ষে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন, শেষে ইহারই বংশধরের উদ্দেশে ভারতের হিন্দুগণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে সকলকে মাতাইয়া তুলেন।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ ছিল না, ইংরেজ কোনরূপ জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষ পূর্ব্বেই বন্ধনী-বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরেজ এ বিচ্ছেদের চূড়ান্ত অবস্থায় আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন। সুতরাং ইহাতে ইংরেজের অলৌকিক দেবশক্তি বা অচিন্ত্য মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ভারতের হিন্দুগণ দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের স্বদেশীয়, স্বজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিত, এই রাজকীয় শক্তির সহিত তাঁহাদের জাতীয় বল বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে বলিতে পারা যাইত যে, ইংরেজ এই রাজশক্তির উপর আপনার প্রাজত্ব স্থাপন করিয়া জগতের সমক্ষে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন; আর যদি ভারতের সমস্ত হিন্দু আর্য্য পরস্পর সমবেদনার অধিকারী হইয়া একবিধ চিন্তায়, একবিধ ধারণায় একটি মহাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেন, তাহা হইলেও বলিতে পারা যাইত, ইংরেজ এই চিরপ্রসিদ্ধ মহাজাতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দেবশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে এই দুয়ের একটিরও চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইংরেজের পদার্পণ সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি লোকের আবাস ছিল যে, তাহাদের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, রাজনৈতিক একতা ছিল না, একের ধারণা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, একের চিন্তায় অপরে চিন্তাশীল হইত না, একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিশিয়া যাইত না, একের অভাবে অপরের অভাব বোধ হইত না। ইংরেজ পরের সাহায্যে এই বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত লোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন; ভারতে ইংরেজ রাজত্ব লোকাতীত দেবশক্তির বলে স্থাপিত হয় নাই। ইতিহাসের চক্ষে ইহা অসাধারণ বিস্ময়কর ঘটনাও নহে।

আবার, অনেকের বিশ্বাস ইংরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কেবল ইংরাজের পরাক্রমে, ইংরাজের ক্ষমতায়, ইংরাজের বুদ্ধি-কৌশলে ভারতবাসী পরাজিত,* পদানতও পরাধীনতার দুঃসহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। ইংরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত। ইংরেজ আধিপত্য স্থাপনকর্তা, ভারতবাসী আধিপত্য স্থাপনে পরাজিত। নানা দৃশ্য-সমাকীর্ণ নানা রত্ন-শোভিত প্রকৃতির এই রমণীয় বাস্তু দিগ্বিজয়ী ইংরেজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি। পলাশীর আম্র কাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে, সর্ব্বত্রই ইংরেজের বাহুবলে ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অনেক ইংরেজ ইতিহাসলেখক অম্লানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। লর্ড মেকলে 'লর্ড ক্লাইব' শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক স্থলে "কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে, অর্থাৎ ক্লাইব ও তাঁহার ইংলণ্ডবাসীদিগকে, প্রতিরোধ করিতে পারে নাই" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের" ক্ষমতাবলেই যেন ভারত সাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। ক্লাইব তাঁহার ইংলণ্ডবাসীদিগের পরাক্রমেই যেন পলাশির যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত করিয়া তুলিয়াছেন।

যাঁহারা প্রকৃত ঘটনা বিপর্য্যস্ত করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, আমি তাঁহাদিগকে শতহস্ত দূর হইতে অভিবাদন করি। ভারতবর্ষ এখন ইংরেজের পদানত হইয়াছে, ইংরেজ এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইংরেজের বীরত্বে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ভারতের দেশের পর দেশ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরাজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। হিমগিরির অভ্রভেদী শিখর হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ইংরাজের প্রতাপ ছাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইংরাজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি নহে। অদূরদর্শী ইংরেজ যতই গর্ব্বিত হউন না কেন, জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব বিস্তার করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত বিজেতা

বলিয়া সম্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারতবর্ষের প্রকৃত বিজেতা নহেন, কেবল ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই, বিজয়-লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতে ইংরেজের কোন অধিকার নাই। ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতবাসী আপনারাই আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়া তুলিয়াছে।

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশান্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিলেই উহাকে সাধারণতঃ দেশজয় বলা গিয়া থাকে। দুই রাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেই রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের অধিপতিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত রাজ্যাধিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকট প্রকারান্তরে আপনার অধীনতা স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হওয়াতে তাঁহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। ইহাই প্রকৃত দেশজয়। যখন মাসিদনের মহাবীর সেকন্দরসাহ পারস্যস্থান জয় করেন, তখন মাসিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যগণ সেকেন্দার সাহের সৈন্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। পারস্যে মাসিদনের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। যখন পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফ্গানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে শেষে আফ্গানদিগের পরাজয় হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নরপতি আফ্গানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন। যখন নির্দ্দেশ করা যায় যে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন, তখন সহজেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যেও এইরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ইংলণ্ডের অধিপতি দিল্লির মোগল সম্রাট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের রাজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইংলণ্ডের সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত

হয় নাই, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই। ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কেবল ইংলণ্ডের কয়েক জন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিয়া, মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় ভারতবর্ষে অরাজকতা দেখিতে পান। এই অরাজকতা তাঁহাদিগকে আধিপত্য স্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। তাঁহারা ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছলে বলে ও কৌশলে ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইহা প্রকৃত দেশজয় নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত।

এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময় যদি ইংলণ্ডের বণিকগণ কেবল তাঁহাদের "সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের" বাহুবলে ভারতের জনপদ সকল অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বলিতে পারা যাইত যে, ইংলণ্ডের পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে এইরূপ চিত্র ত পাঠকের নেত্র পথবর্ত্তী হয় না। ভারতবর্ষের দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৬৫০০০ হাজার মাত্র ইংরেজ। এইরূপ সংখ্যা কেবল সিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। সিপাহি যুদ্ধের সময় ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২৩৫ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। ১৮০৮ অব্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাতভাগের এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন্য ছিল। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অন্ধকূপ-হত্যার পর লর্ডক্লাইব যখন কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মান্দ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে ১৫০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও ৯০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশির যুদ্ধে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িস্যা বৃটিশ কোম্পানীর পদানত হয়, তাহাতে ২৮৮০ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে ইংরাজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান

যুদ্ধে তাঁহাদের বিজয়-গৌরব বিকাশ পাইয়াছে। তৎসমুদায়েই একপঞ্চমাংশ মাত্র ইংরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারি ভাগের সমস্তই ভারতবর্ষীয় সৈন্য। সুতরাং ইংরেজ জাতি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির পরাক্রমে ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশী কর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই; সমগ্র ভারতবর্ষে কখন বিজাতি ও বিদেশীর পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। ভারতবর্ষ আপনাকে আপনিই জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ভারতবাসী পূর্ব্বতন গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আর ইংরাজেরাও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন। [ক্রমশঃ

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শিরোমিতি বিদ্যা।

মস্তিষ্ক উপাদানের উৎকৃষ্টতা।

"মস্তিষ্কের আয়তনই মনের শক্তি-মাত্রার পরিমাপক" ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে সকল কারণে এই নিয়মের তারতম্য ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে শারীরিক প্রকৃতির ইতর-বিশেষ একটি প্রধান কারণ। শারীরিক প্রকৃতির বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণনা করা গিয়াছে, এক্ষণে অপর কারণগুলির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা :—

মস্তিষ্ক উপাদানের উৎকৃষ্টতা।

এক খণ্ড পেটাই লোহা আয়তনে-সমান এক খণ্ড ঢালাই লোহা অপেক্ষা

বেশি শক্ত।—ঘনতার আধিক্য হেতু বেশি ভারি ও দৃঢ়। পাঁওরুটীর ন্যায় ছিদ্রালু ও বিরল-পরমাণু দ্রব্য-সকল লঘু ও ভঙ্গুর হইয়া থাকে। সিংহ বলবান্ কেননা উহার মাংসপেশী, মাংসবন্ধনী এবং অস্থিসকল অত্যন্ত ঘন ও শক্ত। কি মনুষ্যে, কি পশুতে, কি মস্তিষ্কে, কি মাংস-পেশীতে এই একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত মহত্ত্ব কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়, না যেখানে গুরুভার ও দৃঢ় মস্তিষ্ক, সুদৃঢ় স্নায়ু সমন্বিত বলবান শরীরের সহিত সম্মিলিত হয়। যাহাদিগের মাথা ছোট, তাহারা খুব চটক্দার, তীক্ষ্মবুদ্ধি, চতুর এবং কোন কোন বিষয়ে বলবান্ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনই চৌকোষ, গভীরবুদ্ধি কিম্বা নেতৃ-গুণাক্রান্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যাহাদিগের মাথা বড়, অথচ যাহাদিগের মস্তিষ্কের আভ্যন্তরিক উপাদান তেমন উৎকৃষ্ট নহে, কিম্বা রোগাক্রান্ত, তাহারা বৃহৎমস্তক হইয়াও স্থূলবুদ্ধি কিম্বা নির্বুদ্ধি হইতে পারে। কি শরীর কি মন উভয়েরই উচ্চতম শক্তি প্রকাশের জন্য দুইটি বিষয় সমান প্রয়োজনীয়। প্রথম, উপাদানের উৎকৃষ্টতা—দ্বিতীয়, আয়তনের বৃহত্ত্ব। এই উপাদান-ঘটিত উৎকৃষ্টতা অনেক সময়ে চর্ম্ম, কেশ ও মুখাবয়ব প্রভৃতির স্থূলসূক্ষ্মতা দেখিয়া নির্ণীত হয়।

স্বাস্থ্য।

কোন ব্যক্তির চরিত্র নির্ণয় করিতে হইলে তাহার স্বাস্থ্যের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কারণ, অস্বস্থ হইলে কি মন কি শরীর উভয়ই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। "সুস্থ শরীরে সুস্থ মন" ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া শারীরিক তত্ত্বের একটি প্রধান ব্যাপার। নিঃশ্বাস আর জীবন প্রায় একই কথা।

*বুকের আয়তন ও ফুস্ফুসের অবস্থার উপর শ্বাসপ্রশ্বাসের শক্তি নির্ভর করে। বুকের আয়তন মাপিয়া দেখিলেই নির্ণয় হইতে পারে।

শ্বাসপ্রশ্বাস শক্তি উত্তম হইলে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় যথা :—

* সৈনিক বিভাগের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক সৈনিকের বুকের বেড় তাহার শরীরের দীর্ঘতা মাপের অর্দ্ধেক হওয়া চাই।

মুখ বেশ লাল, হাত পা গরম, এবং সমস্ত শরীরের ক্রিয়া সবল। যাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের তেমন বল নাই, তাহার মুখ সাধারণতঃ পাণ্ডুবর্ণ—হাত পা ঠাণ্ডা, নীল শিরার আধিক্য এবং অল্পেতেই তাহাদের সর্দ্দি কাশি হয়।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া যাহার যত সবল তাহার সেই পরিমাণে জীবনী-শক্তি, অতএব বুককে প্রশস্ত করা এবং শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়াকে বলবতী রাখা সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণায়াম ইহার একটি প্রধান সাধন। এই জন্য প্রাণায়াম সাধন করিলে আয়ু বৃদ্ধি হয়।

রক্ত চালনা।

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া এই উভয়ের মধ্যে একটি অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জীবনী শক্তি উৎপাদনে উভয়েরই সহযোগিতা আছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে বুক যে ওঠে নাবে এবং নাড়ীতে যে স্পন্দন হয় এই উভয়ের মধ্যেই একটা যোগ আছে।

বিশুদ্ধ খাদ্য যথোপযুক্ত রূপে শরীরাভ্যন্তরে সমীকৃত হইলে এবং বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অন্তর্নীত হইয়া ঐ খাদ্যকে অক্সিজেন-শোধিত করিলে যে রক্ত উৎপন্ন হয় উহা বিশুদ্ধ রক্ত। সমস্ত শরীর-তন্ত্রে এই রক্ত প্রধাবিত করাই হৃৎপিণ্ডের কার্য্য। এবং এই রক্ত হইতেই মাংস-পেশী, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক উৎপন্ন হয়। রক্ত বিশুদ্ধ হইলেই এই সকল পদার্থ সবল ও সুস্থ ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে।

ভাল রক্ত চালনের লক্ষণ —মুখের সুস্থ বর্ণ—হাত পা গরম এবং নাড়ী ধীর, সবল ও সমবেগসম্পন্ন।

পরিপাক ক্রিয়া।

পাকাশয়ের অবস্থার উপর পরিপাক শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করে। কিন্তু রক্ত চালনা ও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার মাত্রা-ভেদেও উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি রক্তচালনা-শক্তি কম হয়, তাহা হইলে পরিপাকের সময় হয়তো যথাপরিমাণ রক্ত পাকস্থলীতে নীত হয় না। আর যদি শ্বাস-প্রশ্বাস শক্তি কম হয়, তাহা হইলে যে রক্ত পাকাশয়ে নীত হইয়াছে তাহার বল ও তেজ যথোপযুক্তরূপে থাকে না। বেশি পরিমাণে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া হইলে পরিপাকের সাহায্য হয় এবং পরিপাক-যন্ত্র ও ফুসফুস

সবল হয়। দৃঢ় নিরেট মাংস, সুস্থ বর্ণ, ইহা সুস্থ পরিপাক যন্ত্রের ও উত্তম পরিপাক শক্তির লক্ষণ। ক্ষীণতা, পাণ্ডুবর্ণ-ব্রণময় চর্ম্ম—নৈরাশ্য-যুক্ত খিট্‌খিটে মনের অবস্থা,—এই সকল অসম্পূর্ণ পরিপাক ক্রিয়ার নিদর্শন।

ক্রিয়াশীলতা।

ক্রিয়াশীলতা প্রধানতঃ শরীর-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যে স্থলে গতি-প্রধান প্রকৃতি এবং মন-প্রধান প্রকৃতি উভয়েই সমানরূপে বলবতী সেই স্থলে এই ক্রিয়াশীলতার বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমস্ত শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দীর্ঘতা ও মাংসপেশীর অনতিপরিপুষ্টি ইহার লক্ষণ। হরিণ, গ্রে হৌণ্ড কুক্কুর এবং ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া এই জন্য এত দ্রুতগামী। দীর্ঘতা, অস্থূলতা ও সুকুমার গঠনের সহিত সহজসাধ্য গতি কেমন সংলগ্ন তাহা উপরোক্ত পশুদের দৃষ্টান্তে সপ্রমাণ হয়।

উত্তেজনীয়তা।

ইহাও শরীর প্রকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে। যেস্থলে প্রাণ-প্রধান প্রকৃতি ও মন-প্রধান প্রকৃতি উভয়ই অত্যন্ত বলবতী, সেই স্থলে এই উত্তেজনীয়তার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। অতিমাত্র মদ্য, তামাক, চা, কাফি প্রভৃতি সেবনে যাঁহাদের স্নায়ুতন্ত্র বিকলিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উত্তেজনীয়তা স্বাস্থ্যবহির্ভূত অস্বাভাবিক মাত্রায় প্রকাশ পায়।* রস-প্রধান প্রকৃতির লোকেতে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। সকল বিষয়েতেই তাহাদের ঔদাস্য ও অনুৎসাহ—কি বর্ত্তমান কি অতীত কোন ঘটনাতেই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে না।

অবস্থা সমূহের সামঞ্জস্য।

চরিত্রের পূর্ণবিকাশের জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক, যে শরীর ও মস্তিষ্ক এবং তদুভয়ের শারীরতাত্ত্বিক অবস্থা সমূহের মধ্যে বিলক্ষণ সামঞ্জস্য

---

* পূর্ব্ব প্রবন্ধে মুদ্রাযন্ত্রীদিগের প্রমাদ বশতঃ রস-প্রধান প্রকৃতির ইংরাজী Sympathetic temperament লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে হইবে Lymphatic temperament.

থাকে--কোথাও কিছু অতিরিক্ত না হয়, ন্যূনতাও না থাকে। স্থলবিশেষে মনের উপর শরীরের কতটা প্রভাব প্রকটিত তাহা যদি আমাদের নির্ণয় করিতে হয় তাহা হইলে শুধু যে শরীর ও মনের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তির ও অবস্থার বিকাশ দেখিতে হইবে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের আপেক্ষিক ক্রিয়াশীলতা ও শক্তিমাত্রাও নির্ণয় করিতে হইবে। যে স্থলে সকলে মিলিয়া জুলিয়া কাজ করে, সেই স্থলে প্রত্যেকের কার্য্যকারিতা ও বল বৃদ্ধি পায়; পক্ষান্তরে এইরূপ সামঞ্জস্য ও সম্মিলনের অভাব হইলে, সকলেরই কার্য্যে ব্যাঘাত হয়। [ক্রমশঃ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

য়ূরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা।
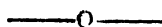
(বেদের অনিত্যতা—সাহেবদিগের মত)।

পূর্ব্বোক্ত ইতিবৃত্তদ্বারা এরূপ কল্পনা করাও অযৌক্তিক নয় যে, কোন একখানি প্রচলিত প্রসিদ্ধ পুস্তকের উক্তরূপ বিভাগ-ঘটনা তাহার প্রচারকদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ ব্যতীত কখনই সঙ্ঘটিত হয় নাই। অবশ্যই উহার মধ্যে এক দলেরা প্রাচীনপ্রিয়তা বশতঃ প্রচলিত পুস্তককে যথাবস্থ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অপর দলেরা যথোচিত পরিবর্ত্তন করাকে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছিল। এইমাত্র কারণ বশতঃ প্রথমে কত বাক্‌বিতণ্ডা, কত গালাগাল মন্দ, পরে কত হাতাহাতি, এমন কি, কত রক্তারক্তির পর এক যজুর্ব্বেদ দুই স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। নূতন ভাগ বা শুক্লযজুর্ব্বেদের উৎপত্তির স্বরূপ ভালরূপে জানিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন বা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের বিষয় সম্যক্‌রূপে জানা আবশ্যক।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বেদ সকল দুই ভাগে বিভক্ত (১) মন্ত্র বা সংহিতা ভাগ, (২ ব্রাহ্মণ ভাগ। সংহিতাভাগে বিশেষ করিয়া বৈদিক মন্ত্র ও তদুক্ত বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণভাগে যে যে বৈদিক কৃত্যের অনুষ্ঠানে যে যে মন্ত্রের প্রয়োগ হয় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ এবং সামবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিভাগ অতি শুদ্ধতার সহিত কৃত হইয়াছে। ইহাদিগের মন্ত্রভাগ এবং ব্রাহ্মণ ভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবেই রহিয়াছে। পরস্পরের সহিত কোনরূপ সংস্রব নাই। প্রত্যেকই আপন আপন আলোচ্য বিষয় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের কিছুমাত্র শৃঙ্খলা নাই, অর্থাৎ উহাতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ পরস্পর জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতায় মন্ত্র ও তৎপ্রয়োগার্হ কৃত্য সকলের উল্লেখ এক স্থানেই করা হইয়াছে। বাস্তবিক বলিতে হইলে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ সংহিতাকে অধ্বর্য্যু নামক পুরোহিতের স্বকার্য্যপদ্ধতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; যেহেতু, হোতা এবং উদ্গাতাদিগের অধ্যেতব্য দুখানি স্বতন্ত্র বিশেষ পুস্তক আছে।

কেহ কেহ কল্পনা করেন প্রাচীন যজুর্ব্বেদ সংহিতার মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের পার্থক্য না থাকায়, অর্থাৎ উভয়ের সংমিশ্রণভাবে অবস্থিতি করায় ইহার নাম কৃষ্ণ বা অন্ধকারময় হইয়া থাকিবে। তবে ইহার তৈত্তিরীয় সংহিতা নামের প্রতি এইরূপ কারণ হইতে পারে যে, ইহার অনুগামীগণ তিত্তীর পক্ষীর মত লড়াই করিয়া অপরের পরিত্যক্ত অংশ গ্রহণ করিয়াছিল. এই নিমিত্ত উহার নাম তৈত্তিরীয় হইয়া থাকিবে। বোধ হয় শুক্ল-যজুর্ব্বেদে ঐরূপ মিশ্রনভাব দূরীকৃত হইয়াছে। ইহার সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ পরিষ্কার হওয়ায়ই ইহার নাম শুক্ল হইয়া থাকিবে।

যজুর্ব্বেদের পূর্ব্বোক্ত খণ্ডদ্বয়ে একই বিষয়ের উল্লেখ আছে। তবে ঐ সকল বিষয় প্রত্যেকে বিভিন্ন রীতিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং একই বিষয় হয়ত এক স্থানে সংক্ষেপে এবং অপর স্থানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও এক কারণে বেদ সকলের ভিন্নকালিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদে অশ্বমেধ-যজ্ঞ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এমন কি,

দু চার কথায় শেষ করা হইয়াছে বলিলে হয়। কিন্তু যজুর্ব্বেদে অশ্বমেধ অনুষ্ঠানের যেরূপ বিস্তার ও দুরূহ পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে ঋক্ এবং যজুর্ব্বেদ কখনই এক সময়ে রচিত হয় নাই।

রচনায় যাগযজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে অনেক ঘোঁট-মঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কেবল তাহা নয়, যজুর্ব্বেদে এরূপ যজ্ঞের উল্লেখ আছে—অন্য কোন বেদে যাহার আদৌ উল্লেখই নাই, অন্য বেদের সময় উহাদের নাম অবধি কেহ জানিত না বলিলেই চলে। যেমন, পুরুষমেধ-যজ্ঞ। এই যজ্ঞে, পরস্পর ভিন্নব্যবসায়, ভিন্নস্বভাব ও ভিন্নজাতীয় এক শত পঁচাশী জন মনুষ্যকে একাদশটী যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া নানাবিধ দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত। এইরূপ সর্ব্বমেধ এবং পিতৃমেধ প্রভৃতি আরও কয়েকটী অসাধারণ যজ্ঞের বিধান দৃষ্ট হয়। ইহাও এস্থলে অবশ্য কথনীয় যে, ঋগ্বেদ সংহিতার সময় চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগের কোন রূপ স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হয় না, কিন্তু যজুর্ব্বেদে উহা স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এবঞ্চ যজুর্ব্বেদে এরূপ অনেক কথার ব্যবহার দৃষ্ট হয় যাহা পৌরাণিক সময়ে শিবের পর্য্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

সামবেদ এবং যজুর্ব্বেদের মত অথর্ব্ববেদ সংহিতাকে যজ্ঞার্থ সংগৃহীত পুস্তক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। অথর্ব্ব বেদের প্রায় ষষ্ঠাংশ ছন্দোবদ্ধ নয়। উহা বড় এবং ছোট ছোট গদ্যময় বাক্যে পরিপূর্ণ, ঐ ভাগের ভাষা ও লেখনরীতির ব্রাহ্মণের ভাষা ও লেখনরীতির সহিত অনেকাংশে ঐক্য দৃষ্ট হয়। অবশিষ্ট বা পদ্য ভাগের ষষ্ঠাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মন্ত্রভাগ হইতে সংগৃহীত; তাহার মধ্যেও আবার দশম মণ্ডলের মন্ত্রই অধিক, অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি অথর্ব্ববেদের নিজস্ব। অথর্ব্ববেদের নিজস্ব মন্ত্রগুলির রচয়িতা যে কে তদ্বিষয়ে কোন প্রামাণিক ইতিবৃত্ত বা উপন্যাস লক্ষিত হয় না। তাহাদের অধিকাংশই কল্পিত ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অধ্যাপক হুইট্‌নি সাহেব বলেন, অথর্ব্ববেদের প্রথম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় অবধি ঠিক এক নিয়মে রচিত হইয়াছে। ঐ সকল অধ্যায়ের মন্ত্র-সংখ্যা সমান, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মন্ত্রযুক্ত অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় বড় মন্ত্রযুক্ত অধ্যায় সকল সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদ সংহিতার মন্ত্রনিচয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া এই-রূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের মত উহারাও বৈদিক সময়ের অনেক পরে রচিত এবং পূর্ব্ববর্ত্তন বৈদিক মন্ত্র-সমূহ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাব-প্রকাশক। আদিম বৈদিক মন্ত্রনিচয়ে যদিও দেবতাদিগের উপর কিঞ্চিৎ ভীতি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সে ভয় আন্তরীণ শ্রদ্ধা ও সমাদর-সম্মিষ্ট। পিতা মাতা গুরুজনকে যেরূপ ভয় করা যায়, উহাও সেই জাতীয় ভয়। বাঙ্গালা ভাষায় সম্ভ্রম যে অর্থে ব্যবহৃত হয় উহার ও ঠিক সেই অর্থ। দেবতাদিগের উপর স্বতঃসিদ্ধ ভক্তি অচল ভাবে অবস্থিত। এবং দেবতা-গণ ও যজমানের মঙ্গল সাধনে ও অভ্যুদয় করিতে একান্ত তৎপর। তৎ-কালের দৈত্য বা ক্রুরাত্মাদিগের সাধারণ নাম রাক্ষস। সর্ব্বত্র ইহাদের এই এক মাত্র নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহারা অতি ভীষণ হইলেও দেবতাদিগের বধ্য ও বিজেয়; সুতরাং তাহাদের উপাসনা অনাবশ্যক। অন্য দিকে অথর্ব্ববেদের মন্ত্রনিচয়ে দেবতাদিগের প্রতি যে ভয় দর্শিত হই-য়াছে সে ভয় অন্যবিধ, সে হৃদয়কম্পনকারী ভয়। লোকে জমীদার, দারগা বা পুলিশের পদাতিককে যেরূপ ভয় করে উহা সেইরূপ ভয়। সে ভয়ের সঙ্গে ভক্তি বা শ্রদ্ধার ভাগ অতি অল্প। দেবতারাও সেরূপ যজমানের হিত-সাধনে স্বতঃ যত্নবান নন। তাঁহাদিগকে সাধ্য সাধনা করিয়া ঐন্দ্রজাল মন্ত্রের মত স্তব পাঠে মুগ্ধ করিয়া যজমানের স্বকার্য্য সাধন করিতে হয়। এবং কোন স্থলে কপটাচার, কোন স্থলে কৌশল আর স্থল-বিশেষে বল প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগের নিকট হইতে মঙ্গল গ্রহণ করিতে হয়। অথর্ব্ববেদ সংহিতায় সকল প্রকার ভূত, প্রেত আদি সকল প্রকার দুষ্টাত্মারই নাম, শ্রেণী এবং উচ্চ নীচ পদবী অবধি উক্ত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে, উহারা পূজার পাত্র হইয়াছে। প্রত্যেকের উপাসনার পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের নিকট বিঘ্ন না করিতে প্রার্থনা করিয়া বলি প্রদান করিবার বিধি বলা হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্র অসংখ্যবিধ অভিলষিত বস্তুলাভের নিমিত্ত প্রয়োজিত হয়, প্রার্থিত বস্তু সমূহের মধ্যে প্রায়ই দীর্ঘ জীবন, এবং উৎকট উৎকট পীড়া হইতে আরোগ্যলাভেরই আধিক্য দেখা যায়। ঐ সকল প্রার্থনা শুনিয়া স্তূয়মান দেব কখন কখন এক খানি রক্ষা-

কবচ দান করেন, এবং অনেক স্থলেই অত্যদ্ভুত গুণশালী উদ্ভিদ্-বিশে-ষের আদেশ করেন যাহা শরীরের উপর ধারণ করিয়া সমুদয় ক্লেশ দূরী-ভূত হইয়া আনন্দলাভ হয়। সম্পদ এবং বীর্য্যও যাচিত হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন শত্রুর ক্ষয়, প্রণয় বা ক্রীড়ায় জয়লাভ, সামান্য ইতি বা উপদ্রবের অপনয়ন ইত্যাদি, এমন কি, টাকে চুল হবার অবধি প্রার্থনা আছে। কেবল অলৌকিক ঘটনাকারী মন্ত্রেরও অভাব নাই। কিন্তু প্রথম বৈদিক সময়ের উত্তরকালীন হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ পরিণাম ঘটিয়াছিল তদনুসারে বিবেচনা করিতে গেলে, অথর্ব্ববেদ সংহিতায় অলৌকিক ঘটনা বিষয়ক মন্ত্রের সংখ্যা অল্প বলিতে হইবে। ফলতঃ এইরূপ একটা মোটামুটি বোধ হই-তেছে যে, অথর্ব্ববেদ কেবল এক মাত্র পুরোহিতদিগের প্রযত্নে সৃষ্ট হয় নাই; তৎকালীন মনুষ্য জাতির অবস্থা বিশেষও কতক পরিমাণে উহাকে উৎপন্ন করিয়াছে। বৈদিক সময় হইতে আধুনিক সময়ে অবতরণার্থ অথর্ব্ব একটি মধ্যবর্ত্তী সোপান। ইহা ব্রাহ্মণদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই মতের যত না বীজ বপন করুক, কিন্তু মূর্খ লোকদিগের কুসংস্কার ও পৌত্ত-লিকতার যে সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়ই আমাদের নিকট বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সুতরাং মন্ত্রভাগের সহিত ডাক্তার থিয়োডর গোল্ড ষ্টকার সাহেবের ব্রাহ্মণ বিষয়ক মতগুলির উপন্যাস করা কোনরূপ অপ্রামাণিক হইবে না, বরং আমাদের প্রস্তাবের সম্পূর্ণতার সাধন হইবে। তিনি এইরূপে ব্রাহ্মণভাগের আরম্ভ করিয়াছেন—

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বেদের ব্রাহ্মণভাগের মোটামুটি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এক্ষণে কেবল তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধানদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও এক আধটু অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলেই আমরা বৈদিক মন্ত্র সকলের সংগ্রহ ও অবশিষ্ট বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের কোথায় স্থান হইতে পারে, ইহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইব।

ঋগ্বেদের পুরোহিতগণ বহ্বৃচদিগের ব্রাহ্মণকে দুই প্রকারে রক্ষা করিয়া-ছেন। উহাদের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের আট পঞ্চাশিকা, চল্লিশ অধ্যায় এবং দুইশত পঁচাশীখণ্ডে বিভক্ত। সাংখ্যায়ন বা কৌশীতকী ব্রাহ্মণ

ত্রিংশং অধ্যায় সম্পন্ন এবং প্রত্যেক অধ্যায় পূর্ব্বের মত খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় ব্রাহ্মণের মোটের উপর একই বিষয়। কিন্তু বিষয়-বিনি-বেশ ও ব্যবস্থার রীতি দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম ত্রিশ অধ্যায় সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের ঐ ভাগ অপেক্ষা পুরাতন। আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ দশ অধ্যায় সাংখ্যায়নের শেষ দশ অধ্যায় অপেক্ষা অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এই সকল উভয় ব্রাহ্মণেই ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্রের ক্রম রক্ষিত হয় নাই, কেবল সোমনিমিত্ত যজ্ঞ সমূহে হোতৃনামক পুরোহিতের ব্যবহার্য্য মন্ত্র সকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে। যে সকল কৃত্য বা যজ্ঞ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত এই ব্রাহ্মণদ্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছে উহা-দের মধ্যে অভিষেক নামক কৃত্য একটী বিশেষ জ্ঞাতব্য।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের যে সকল বাক্য ঐন্দ্রজালিক জাতীয় বা আভিসারিক কৃত্য প্রবর্ত্তক উহারা ইহার শেষ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়; ঐ অধ্যায়ে অভিঘাত বা রাজা-দিগের শত্রুধ্বংস বিষয়ক একটী যজ্ঞের উল্লেখ আছে। তাহাতে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এই যজ্ঞের বিষয় অবগত হয়, তাহাদিগের সকল প্রকার শত্রু নিপা-তিত হয়। যাহা আকাশে গমন করে তাহার নাম বায়ু। এই বায়ুর সান্নিধ্যে বিদ্যুৎ, বর্ষা, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি এই পাঁচটী দেবতা বিনষ্ট হয়। বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়াই বৃষ্টির পূর্ব্বে অন্তর্হিত হয়; ইহা অন্তর্ধান হয় কিন্তু কোথায় যায় তাহা কেহই বলিতে পারে না। যখন মনুষ্য পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় তখন সে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় এই মাত্র, কিন্তু আত্মা যে কোথায় গমন করে তাহা কেহই জানে না। অতএব যখন বিদ্যুৎ অন্তর্হিত হইবে, তখন এই মন্ত্র পাঠ করিবে "আমার শত্রু বিনষ্ট হৌক, সে লোকের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হৌক এবং তাহার গতি যেন কাহারও বিদিত না হয়।" নিশ্চয়ই অতি শীঘ্র তাহার যে কি গতি হইবে তাহা কেহই জানিবে না।

[ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

হেমচন্দ্র।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সেই রাত্রে হেমচন্দ্র বসুমতীর সঙ্গে তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বসুমতীর মাতা এতক্ষণ মেয়ের জন্য বড়ই ভাবিতেছিলেন। পাগল মেয়ে—বলিলে শুনে না, নিষেধ করিলে মানে না; কে জানে কোথায় গেল? বৃদ্ধার সে দিন একটু অসুখ হইয়াছিল, সে অসুখ ভুলিয়া গিয়া ঘর বাহির করিতে লাগিল। যাহাকে দেখিল, জিজ্ঞাসা করিল। কেহ ঠিক্ বলিতে পারিল না। কিন্তু সকলেই বলিতে লাগিল "ভয় নাই, ভাবিও না, বোধ হয় কার বড় অসুখ হইয়াছে, তাই সেখানে বসিয়া আছেন, তা মা, আপনি ঘরে যান, আমরা খুঁজিয়া দেখিতেছি।" বৃদ্ধা চলিয়া গেল। আরও এক ঘণ্টা অতীত হইল। মার কাছে সে এক ঘণ্টা এক যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধা গৃহে তিষ্ঠিতে পারিল না। বাহিরে আসিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে হেমচন্দ্রকে লইয়া বসুমতী আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতার দেহে প্রাণ আসিল। বলিলেন—"জ্যালা মেয়ে যা হউক—"মাতা আরও বলিতে যাইতেছিলেন। বালিকা হেমকে দেখাইল, দেখাইয়া সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। মাতা ভৎর্সনা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষে দুই বিন্দু জল আসিল; হেমচন্দ্রকে বলিলেন—"এস বাবা এস।"

হেম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল; ভাবিল, এমন মা না হইলে কি এমন মেয়ে হয়? ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

তখন, মুখ হাত ধোয়ার পর, জলযোগের আয়োজন হইল। হেম খাইতে চাহে না। মাতা বিস্তর বলিতে লাগিল। শেষ, হেম কিছু খাইল। মাতার কথামত ইতিপূর্ব্বে বসুমতী শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, জলযোগান্তে হেম গিয়া শয়ন করিল। সে কি শয্যা?—মেজের উপর এক খানি

মাত্র কম্বল। হেম তাহার উপর শয়ন করিলেন। কয়েক দিনের পরিশ্রমে, অনাহারে, চিন্তা ও ক্লেশে শরীর বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইল, অল্পক্ষণ মধ্যে হেম অচেতনে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে হেম এক স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, সেই নিশীথ—জ্যোৎস্নাস্নাত, নীরব, শব্দশূন্য—গম্ভীরতাপূর্ণ। আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল, নীল—নীল আকাশমণ্ডলে সেই যে চন্দ্র—তাহার ভাস্বর দীপ্তি স্ফুরিত করিয়া শোভা পাইতেছে—তাহাও গম্ভীরতাপূর্ণ। আর সেই সচন্দ্র-জলদ আকাশের কর্পূরকুন্দধবল প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরিয়া সেই যে বীচিবিক্ষোভশালিনী পূর্ণতোয়া ভাগীরথী মৃদুনাদে ধীরবিক্ষেপে উছলিয়া উছলিয়া চলিয়াছে তাহাও গম্ভীরতাপূর্ণ। রজনীর গম্ভীরতা, চন্দ্রালোকের গম্ভীরতা, ভাগীরথীর গম্ভীরতা—সর্ব্বত্রই গম্ভীরতাপূর্ণ। সেই সকল গম্ভীরতার উপর আরও গম্ভীর সেই শ্মশানের প্রাণউদাসী করাল দৃশ্য। হেম দেখিলেন, সেই শ্মশান মধ্যে তিনি তেমনি বসিয়া—নির্জ্জন, নির্ম্মানব, একেলা। দূরে সেই চিতা তেমনি ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে। চিতাধূম মণ্ডলাকারে আকাশপথে উত্থিত হইতেছে। হেম বাষ্পপরিপূর্ণ নয়নে তাহা চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা প্রবল ঝটিকাকারে ভীষণ ধূম উত্থিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশ, চন্দ্র, ভাগীরথী, শ্মশান, চিতা সমস্ত ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া পড়িল—প্রকৃতি অনন্ত ধূমময়ে মিশাইয়া গেল—হেমচন্দ্র আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সহসা পশ্চাতে কে যেন খল খল শব্দে হাসিয়া উঠিল। ভয়ে, আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। হেম আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না; জোরে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল। আবার সেই রব—সেই খল খল বিকট হাসি। ভয়ানক ভয়ানক! হেমের দুই চক্ষু মুদ্রিত, তথাপি সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটা স্ত্রীলোক তাহার প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া এই বিকট হাসি হাসিতেছে। ক্রমে সেই মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর—আরো স্পষ্টতর হইতে লাগিল। এ কি এ! নিশাচরী নয়, প্রেতিনী নয়,—হেমের বোধ হইল, হেম স্পষ্ট দেখিল, সে মহামায়া! হেম আরও শিহরিল, বক্ষবেপন আরও পরিবর্দ্ধিত হইল, জিহ্বা শুখাইয়া আসিল। সেই মূর্ত্তি সেইরূপ হাসিতে

হাসিতে ক্রমে তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইল। কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিল। তার পর, আপনার বস্ত্রমধ্য হইতে একগাছি রজ্জু বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাহার হস্তপদ দৃঢ় বদ্ধ করিল। বদ্ধ হইয়া হেম তথায় পড়িয়া রহিল। তখন, সে আবার সেই উৎকট খল খল হাসি হাসিয়া এক তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। বন্ধনে হেমের বড়ই যাতনা বোধ হইতে লাগিল। তালু শুষ্ক হইয়া গেল, প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল, উপায় না দেখিয়া হেম কেবল কাঁদিতে লাগিল। তখন, বোধ হইল, কে যেন, ধীরে ধীরে মৃদুপদসঞ্চারে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে স্পর্শে তাহার অসাড় দেহে যেন চেতনা ফিরিয়া আসিল। যে আসিল, সে যেন তখন ধীরে ধীরে একটী একটী করিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কত ভয়—একবার পশ্চাতে চাহে, আর একবার বাঁধন খুলিতে চেষ্টা করে। একটী একটী করিয়া অনেকগুলি বাঁধন খুলিল। হেমচন্দ্র সেই ভীষণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তখন, সেই মুক্তিকারিণীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য মুখ উত্তোলন করিয়া দেখিলেন। হেম বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, বালিকা; সে বালিকা বিরাজ। কিন্তু হেম চাহিয়া দেখিবামাত্র বিরাজ যেন কোথায় উড়িয়া গেল। সকল বাঁধন খোলা হইল না—কে জানে কোথা দিয়া, কেমন করিয়া—পলায়ন করিল। কোথায় গেল? তখনও হেমের দুই চক্ষু দৃঢ় মুদ্রিত ছিল; ভয়ে, বিস্ময়ে হেম চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই লক্ষিত হইল না। সেই ধূম,—ছিদ্রশূন্য—রন্ধ্রশূন্য ধূমপটলে দিগন্ত বেষ্টিয়া রহিয়াছে—আর কিছুই নাই। হেমের বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। হেম স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন, সেই ধূমস্তর কতক্ষণ পরে যেন চারিদিক্ হইতে একটু একটু করিয়া সরিয়া আসিয়া এক স্থানে জমাট বাঁধিতে লাগিল। দেখিতে পাইলেন, সেই সূচিভেদ্য বিশ্বগ্রাসী তিমিরান্ধতামর বিরাট ধূমরাশি, মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃহৎ স্তম্ভাকার ধারণ করিল। তাহার শিখর-দেশ আকাশের প্রান্তে গিয়া সংলগ্ন হইল। সেই অন্তরীক্ষ প্রদেশে ধূমময় স্তম্ভ-শিখরে হেম দেখিলেন, মণিমরকতাদিমণ্ডিত বিবিধ কারুখচিত এক সিংহাসন উজ্জ্বল চন্দ্রকরসংস্পর্শে হীরকখণ্ড, এবং ঝক্ ঝক্ করিয়া উদ্ভাসিত হই-

তেছে। হেমের হৃদয়ে এতক্ষণ নীরবে যে ভয় ক্রীড়া করিতেছিল তাহা ঘুচিল, হেম বিস্মিত হইল। বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কি অপূর্ব্ব শোভা! অনন্ত-নক্ষত্রখচিতবৎ সেই সিংহাসনোপরি কীরিট কুণ্ডল-শোভমানা নানারত্নালঙ্কার-ভূষণা এক জ্যোতির্ম্ময়ী রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি। মুখমণ্ডলে করুণা উছলিয়া পড়িতেছে, নয়নে স্নেহের হাসি স্ফুরিত হইতেছে। হেম সবিস্ময়ে, সানন্দে, ভীতহৃদয়ে চিনিল, তাহার সেই অচিরমৃতা দুঃখিনী জননী এই আলোকময়ীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। হেম ডাকিতে গেল—মা, কিন্তু কথা ফুটিল না। হেম শতবার চেষ্টা করিল, কথা ফুটিল না। হেম বড়ই কাতর হইল। সেই করুণাময়ী মার দেখা পাইয়া হেম একবার প্রাণ ভরিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতে পারিল না—তাহার কান্না আসিল। দুটী চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। সেই অশ্রুপ্লুত কাতর মুখ তুলিয়া হেম মাতার প্রতি চাহিয়া রহিল। তখন সেই নৈশ গম্ভীরতা বিদীর্ণ করিয়া অপ্সরাকণ্ঠগীতিবৎ সহস্রবীণাঝঙ্কার-নিন্দিত কি এক অপার্থিব স্বরে সেই কিরণমালিনী কারুণ্যপ্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন, "বাছা! কেন কাঁদিতেছ? কাঁদিয়া কি ফল? সকলই নিয়তির কর্ম্ম। নিয়তির আদেশ কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিয়তি ফুরাইয়াছে, তাই আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি। সে জন্য কেন কাঁদ, যাদু?" এতক্ষণে হেমের কথা ফুটিল। বলিল "কাঁদিব না? আমি আপনার সন্তান হইয়া আপনার কোন্ কাজটা করিলাম? আমা-দের জন্য কতই দুঃখ সহিলেন, কিন্তু আমরা আপনার একটা দুঃখও ঘুচাইতে পারিলাম না—এ কষ্ট কি ভুলিবার?" মাতা আবার বলিতে লাগিলেন, "বাছা, কেন আবার আপনা বিস্মৃত হও। সুখ দুঃখ এ সব বিধিলিপি, মনুষ্যের সাধ্য কি একজনের দুঃখ আর একজনে খণ্ডন করে? সে জন্য কষ্ট পাইও না। আর, দেখিতেছ না, আমার এখন আর কোন দুঃখ নাই, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। তোমায় বড় ব্যথিত দেখিয়াই, একবার তোমাকে আমার এই অবস্থা দেখাইতে আসিয়াছি।" হেম কাতরে বলিল "যদি দেখা দিয়াছ, তবে আর ফেলিয়া যাইও না, আমাকেও ঐ স্থানে তুলিয়া লও।" মাতা ঈষৎ হাস্যে বলিলেন "তাও কি হয়? তাহা হইবে না। এখন এ স্থান তোমার নয়—তোমার সম্মুখে সংসারের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ,

তাহাই তোমার অবলম্বনীয়। কিন্তু সাবধান, সে অতি কঠিন স্থান,—আধি ব্যাধি, বাধা বিঘ্ন পদে পদে। ইতিপূর্ব্বে যে এক ভীষণ দৃশ্য স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করিয়াছ তাহা আমিই দেখাইয়াছি, সাবধান—বুঝিয়া চলিও। আর থাকিব না, আমি চলিলাম।” এই বলিয়া সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইল। কাতরে হেম বলিতে লাগিল— “যাইও না—যাইও না, সংসার যদি এত ভয়ানক, এখানে একা ফেলিয়া যাইও না—একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।” তখন সেই মূর্ত্তি পুনরায় একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, “কি করিব, এ স্থান এখন তোমার নয়। আমি শত চেষ্টা করিলেও তুমি এখন এখানে আসিতে পারিবে না।” হেম বলিল ‘পারিব না—কেন পারিব না?’ মাতা তখন জ্যোতিঃপুঞ্জ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা বলিলেন—“কেমন করিয়া পারিবে, বাছা? ঐ দেখ, তোমার পশ্চাতে কে তোমায় ধরিয়া টানিতেছে।” হেম বিস্মিতলোচনে পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, মনোরমা। মনোরমা কাতরে তাহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে —“দাদা, কোথা যাও—কোথা যাও—এ দুঃখিনী অবলাকে একা রাখিয়া কোথায় যাও।” সেই কাতরোক্তি শুনিয়া হেমের চক্ষে জল আসিল। হেম আবার একবার উর্দ্ধমুখে সেই দৈবী মূর্ত্তির প্রতি চাহিল। তিনি বলিলেন “কেমন বাছা, বলিয়াছিতো পারিবে না। আমি চলিলাম।” হেম দেখিল, তখন, সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল, সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ধূমপটলে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। প্রখর সূর্য্যমণ্ডল যেমন মেঘস্তর মধ্যে ধীরে ধীরে আবৃত হইতে থাকে, সেইরূপ ধীরে ধীরে অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছিল। হেম আবার কাতর হইয়া বলিল “একটু অপেক্ষা কর—মনোরমাকে শান্ত করিতেছি, তাহার স্বামীর হস্তে তাহাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যাইতেছি।” কিন্তু সে মূর্ত্তি আর পূর্ণপ্রকাশিত হইল না। সেই অবস্থায় থাকিয়াই. তখন ঈষৎ হাস্যে বলিল—“পারিবে না—বাছা, পারিবে না—ঐ দেখ আবার কে তোমার পদতলে।” তখন সেই প্রস্থানোন্মুখী জ্যোতির্ম্ময়ী অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা কি দেখাইয়া দিলেন। হেম তৎসঙ্কেতানুসারে আপনার পদপ্রান্তে চাহিয়া দেখিল। এ কি প্রহেলিকা! অসামান্যরূপসী নন্দনপারিজাতসমপুষ্পময়ী এক নিসর্গসুন্দরী বালিকা

পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া রোদন করিতেছে।—মুখে কথা নাই, অথচ যে কাতরতায়, সে রোদনে, সে চক্ষের জলে কত কথা প্রকাশ করিতেছে। কে এ বালিকা? সে বালিকাকে হেম কয়েক দণ্ডের জন্য মাত্র দেখিয়াছিল, এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিলেও তাহাকে ভুলা যায় না—হেম চিনিল—বসুমতী। "বসুমতী!—" আর হেমের কথা বাহির হইল না, হতবাকের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল। শূন্যময়—ধূমময়—অন্ধকারময়। কোথায় সে স্তম্ভ, কোথায় সে সিংহাসন, কোথায় সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। কেবল শূন্য—অনন্ত শূন্য মণ্ডলে মণ্ডলে ব্যাপিয়া রহিয়াছে—দিগন্তসঞ্চারী ধূম পটলে পটলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অন্ধকারের পর অন্ধকার স্তরে স্তরে বিচরণ করিতেছে। আর সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বনি—মহামায়ার সেই ভীষণ ভ্রকুটী—সেই বিকট হাসি! ভয়ানক—ভয়ানক! হেম সভয়ে ডাকিয়া উঠিল—"মা!"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তখন, প্রভাত হইয়াছিল। দোয়েল, কাক, শালিক, বুলবুল সকল পাখীই একে একে গান ধরিয়াছিল। গাছে গাছে, শাখায় শাখায় নানা পাখী—নানা-বুলি বলিতেছিল। গৃহকপোত ঘরের চালে উড়িয়া বসিয়া গা খুঁটিতেছিল, পাখা ঝাড়িতেছিল, রব করিতেছিল। সেই পক্ষীকূজনশব্দ অতিক্রম করিয়া দূরে অস্পষ্ট লোকধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। সে শব্দ নানা রকমের, কেহ হাসিতেছিল, কেহ কাঁসিতেছিল, কেহ ডাকিতেছিল, কেহ বকিতেছিল, কেহ ইষ্টদেবের নাম করিতেছিল, কেহ বা মৃদুমন্দ গান ধরিয়াছিল। কোথাও টানোত্থিত হুকার ভুড়ভুড়বুড়বুড় শব্দ, কোথাও নিমজ্জমান গাড়ুর বক বক শব্দ, কোথাও মার্জ্জননিরতা বধূর তাবিজলবঙ্গকুলে ও বাসনে মৃদু মন্দ ঠন্ ঠন্ শব্দ। কোথাও বাছুর ডাকিতেছে, কোথাও গোরু হাঁকিতেছে, কোথাও রাখাল গাহিতেছে। সেই সব বিবিধ শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া অনন্ত শব্দের সমুদ্র সৃষ্ট হইতেছে। সেই শব্দসমুদ্র মধ্যে ঝাঁপ দিয়া প্রভাতে নরনারী আপন আপন কাজে ব্যস্ত হইতেছে। রোদ উঠিয়াছে। গাছের

ভাল, ঘরের চাল হইতে ঝিকিমিকি করিতে করিতে রোদ আসিয়া উঠানে পড়িয়াছে। হেমচন্দ্র যেখানে শুইয়াছিলেন তাহার পশ্চাৎ দিকে একটী জানালা খোলা ছিল। উন্মুক্ত গবাক্ষপথপ্রবিষ্ট হইয়া সূর্য্যালোক মেঝের উপর, মেঝে হইতে বিছানার উপর, বিছানা হইতে হেমচন্দ্রের মুখের উপরি পড়িয়া খেলা করিতেছিল। নিদ্রাভঙ্গে হেমচন্দ্র সেই আলোকপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তখনও তাঁহার বুকের ভিতর দুপ দুপ করিতেছিল; তখনও ললাটে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতেছিল। হেমচন্দ্র আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিলেন না। কোথায় তিনি, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রভাত হইয়াছে, রোদ উঠিয়াছে, লোক জাগিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দুই হাতে চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিলেন। পরিষ্কার দৃষ্টিতে আর এক বার চারি দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। গৃহ আলোকময়—এত যথার্থই প্রভাত, আর তিনি সেই কম্বলশয্যায় শুইয়া। তাহা ত সত্য, কিন্তু সেই দৃশ্য—সেই কথা—সেত ভুলিবার নহে, তাহা তো এখনো স্পষ্ট বোধ হইতেছে। বড়ই গোল ঠেকিল। হেম ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শিয়রে কাহার নিশ্বাস অনুভূত হইল। সচকিতে হেম মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শিয়রে দাঁড়াইয়া সেই বালিকা বসুমতী।

বসুমতী বলিল—"ঘুম ভাঙ্গিয়াছে?"

হেম সে কথার উত্তর দিতে পারিল না। বালিকাকে দেখিবামাত্র স্বপ্নদৃষ্ট সেই দৃশ্য আরও স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। হেমের বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। অবাক্ হইয়া বালিকার প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিল। বালিকার সেই সরল, নির্দোষ, পবিত্র মুখমণ্ডল প্রভাতসূর্য্যের মৃদু করস্পর্শে উজলিতেছিল। বিমূঢ়ের ন্যায় হতবুদ্ধি হইয়া শূন্যদৃষ্টে হেম সেই মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কথার উত্তর দিতে পারিল না।

বালিকা বলিল—"অমন করিতেছ কেন?"

হেম কথা কহে না।

বালিকা বলিল—"অসুখ হইয়াছে কি?"

তবু হেম কথা কহে না।

বালিকা তখন বড়ই কাতর হইল। কাতরে জিজ্ঞাসা করিল—"বল না, কেন অমন করিতেছ? কি হইয়াছে?"

হেম কথা কহিল। বলিল—"আমার কিছু হয় নাই। তুমি কে?"

বালিকা বলিল—"চিনিতে পারিতেছ না! আমি বসুমতী।"

"বসুমতী—" হেম আর কিছু বলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে ধীরে বসুমতীর নাম উচ্চারণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বালিকা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। ছুটিয়া গিয়া মাতাকে ডাকিয়া আনিল। মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইয়াছে, বাবা?"

কি হইয়াছে, তাহার কি উত্তর দিবে? হেমের চমক ভাঙ্গিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"কিছু নয়, একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

মাতা বলিলেন—"কোন অসুখ হয় নাই ত?"

হেম। না।

মাতা। ঘুম হইয়াছিল?

হেম। হাঁ।

মাতা। বেলা হইয়াছে, উঠ, হাত মুখ ধোও গিয়া।

হেম। একেবারে গঙ্গায় যাই, সেখানে দোকানে আর আর সকলে আছেন, সকলে একত্রে হাত মুখ ধুইয়া, রওনা হইব। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বেলা হইয়া গিয়াছে। আর বিলম্ব করিব না।

মাতা। সে কি, বাবা, তাও কি হয়? সে কত পথ, পেটে কিছু নাই, হাঁটিবে কেমন করিয়া? সকাল সকাল যোগাড় করিতেছি, এখানে হবিষ্য করিয়া পরে বৈকালে যাইও।

হেম। আমি একা নহি। আমরা অনেকগুলি। রাত্রি হইতে তাঁহাদের ছাড়িয়া রহিয়াছি, একবার তাঁহাদিগের সঙ্গে দেখা করা উচিত হইতেছে।

মাতা। সেতো ভালই, আমি তাঁহাদের জন্য লোক পাঠাইতেছি। সকলে মিলিয়া চারিটী আহার করিয়া তার পর যাইবেন।

হেমের যে কোনও অসুখ করে নাই, ইহা জানিতে পারিয়া বসুমতীর

সেই ভগ্নপ্রায় হৃদয়টুকু অনেক আশ্বস্ত হইল। চিন্তায় বালিকার কচি মুখ খানি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তাহা আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মাতার সহিত হেমকে কথা কহিতে দেখিয়া বালিকা নিশ্চিন্ত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। বাহির হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বালিকা বলিল—"মা, দোকানী দাদা এসেছে, দাদা সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, এক বার বাহিরে এস।"

মাতা বাহিরে আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বাহিরে আসিলেন। তখন, বৃদ্ধ দোকানী সকলের বসিবার বিছানা পাতিয়া দিল। সকলে বসিলে, সে গিয়া প্রতিবেশী এক জনের বাটী হইতে হুঁকা কলিকা আনিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। তখন কথাবর্ত্তা রাখিয়া হুঁকা টানার ধুম পড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে পাড়ার অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ আগন্তুদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল; কেহ তামাকু সাজিতে লাগিল, কেহ তামাকু খাইতে লাগিল, কেহ কেহ ভিতরে আসিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল, কেহ কাঠ কাটিল, কেহ তরকারি আনিল, কেহ দুধ আনিল, কেহ জাল ফেলিতে গেল। তখন, ভিতরেও পাড়ার অনেকগুলি স্ত্রীলোক আসিয়া রান্নাবান্নার জোগাড় করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কেহ কুট্‌না কুটিল, কেহ বাটনা বাটিল, কেহ চাউল ধুইয়া আনিল, কেহ জল তুলিয়া দিল। বসুমতী, যত তাহার ক্ষমতা, এই সব কাজে মার সহায়তা করিতে লাগিল। মাতা, তখন, স্নান করিয়া, আগে হেমের হবিষ্যের আয়োজন করিয়া, রন্ধন করিতে বসিলেন।

আহারে হেমের প্রবৃত্তি ছিল না; কিন্তু সকলের জেদ, কি করেন, স্নান করিয়া হবিষ্য চড়াইয়া দিলেন। তখন, আর আর সকলে স্নান করিয়া আসিলেন। যথাসময়ে আহারাদি শেষ হইল।

এখন, অনেকের পক্ষে এরূপ আহার বহু দিন জুটে নাই। অনেকের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বেলাটা কাটিয়া যায় যাউক, দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারটা নির্ভাবনায় যেখানে এরূপ সচ্ছন্দে চলে, হঠাৎ সে স্থান ত্যাগ করা যুক্তি সঙ্গত নয়। দুই এক জন বড় বড় উদ্গার তুলিতে তুলিতে বিছানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। আহারান্তে একটু বিশ্রাম চলিল।

বেলা একটা বাজিয়া গেল। পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ যাহারা আসিয়াছিল, দুই এক জন ছাড়া সকলে আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিল। মাতা অপরাপর সকলকে খাওয়াইয়া মেয়ের ও আপনার ভাত বাড়িয়া হাঁড়ি তুলিলেন। মেয়েকে সকাল সকাল খাইতে বিস্তর জেদ করিয়াছিলেন। বালিকা খায় নাই। ভাত বাড়িয়া বালিকাকে ডাকিতে যাইবেন, এমন সময় সে দৌড়িয়া আসিল। বালিকার সেই ভাসা ভাসা দুটী চক্ষে জল আসিয়াছিল। বসুমতী দেখিয়া আসিয়াছিল, কৈবর্ত্তদের কামিনী খেলা করিতে করিতে কাঁটায় বাঁধাইয়া তাহার কাপড় খানি একেবারে ফালা ফালা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাই দেখিয়া তাহার মা কাঁদিতেছিল, আর কামিনীকে মারিতেছিল। তার মা বড় গরিব—আর কেহই নাই। পূজার সময় এক জন দয়া করিয়া এই কাপড়খানি দিয়াছিল। আবার এখন সে কাহার কাছে চাহিবে? কে দিবে? হতভাগিনী তাই নিজে কাঁদিতেছিল, আর মেয়েকে মারিতেছিল। আহা সে কচি মেয়ে—কি জানে—সেও চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিতেছিল। বসুমতী তাহা দেখিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া মার কাছে দৌড়িয়া আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, মা?"

বালিকা ভয়ে ভয়ে বলিল—"একটা কথা বল্‌বো?"

মা। কি, বল্‌বে; তার ভয় কি, বল না।

বসু। 'মা, আমার সেই ছোট নূতন কাপড়খানি দিবে, মা?'

মা। এখন সে কাপড় নিয়ে কি করিবে?

বসু। আমি তাহা কৈবর্ত্তদের কামিনীকে দিব।

এই বলিয়া বালিকা, যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল তাহা মাতাকে বলিতে লাগিল। শুনিয়া, মাতা বালিকার মুখ চুম্বন করিলেন, বলিলেন—"যাও, মা, দিয়া এস।"

বালিকা কাপড় লইয়া চলিয়া গেল। পাশের ঘরে হেম শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, সমস্ত শুনিলেন। আ মরি মরি! এ মর্ত্ত্যে কোন্ দেবকন্যা! বিস্ময়ে হেমের রোমাঞ্চ হইল, নয়ন-কোণে দুই ফোটা জল দেখা দিল। আবার স্বপ্নের সেই কথা মনে পড়িল, আজেও তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতে লাগিল। এ কি রহস্য? ভগবন্, তুমি লীলাময়;

তোমার লীলা কে বুঝিয়া উঠিবে, ঠাকুর? নীরবে নির্ব্বাকে শয়ন করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় হেম আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। বালিকা ফিরিল না। দেখিতে দেখিতে আর আধ ঘণ্টা কাটিল। তখনও মাতা ভাত কোলে করিয়া বসিয়া। বালিকা ফিরিল না। মাতা অস্থির হইলেন। ভাতের পাত্র ঢাকা দিয়া বাহিরে আসিলেন। বালিকাকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। তখন, মেয়ের উপর একটু রাগ হইল। মাতা আবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু, সে মেয়ের উপর রাগ করিয়া কি থাকা যায় গা? তায় মার প্রাণ— আবার মনটা অস্থির হইয়া উঠিল; মাতা আবার বাহিরে আসিলেন। তখন, আর কোথাও না গিয়া একেবারে সেই কৈবর্ত্তদের বাটীতে গমন করিলেন। কৈবর্ত্তরমণী তখন কামিনীর পৃষ্ঠে প্রশস্ত স্থানে তৈল দিতেছিল, আর, কামিনী এক একবার ফোঁপাইতেছিল, আর এক একবার সেই নূতন কাপড়ের রাঙ্গা পাড়টীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। বসুমতীর মাতাকে হঠাৎ সেখানে দেখিয়া কৈবর্ত্তরমণী মনে করিল, বুঝি, বসুমতী মাকে না বলিয়া আপনি লুকাইয়া এই কাপড়খানি আনিয়াছিল, মাতা তাই জানিতে পারিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন – ভাবিয়া সে কিছু থতমত খাইল। কামিনী তখন কাপড়খানি পরিবার জন্য তাহার লাল পাড়টীর উপর হাত দিয়াছিল, তাহার হাত হইতে সেখানি কাড়িয়া লইয়া, সে বলিল—"তা, কি জানি, মা, আমি এত মানা করিলাম, তা, তিনি কিছুতেই শুনিলেন না।" মাতা কৈবর্ত্তরমণীর মনের ভাব বুঝিলেন। বলিলেন, "আমি সে জন্য আসি নাই; তুমি কেন অমন করিতেছ, কাপড়খানি উহাকে পরাইয়া দাও।" কৈবর্ত্তরমণী শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "আহা, মা আমার অন্নপূর্ণা; কি দয়ার শরীর! সার্থক মেয়েও গর্ব্ভে ধরেছিলে, মা!" মাতা বলিলেন "আর পোড়া মেয়ের কথা বলিও না, মা, আমাকে জ্বালিয়ে খেলে— এখনও তার খাওয়া হয় নাই, তাই ডাক্‌তে এসেছি।"

কৈবর্ত্তরমণী বলিল—"সে কি, তিনি বাড়ী যান্‌নি, অনেকক্ষণ তো এখান থেকে গিয়েছেন।"

মাতা শুনিয়া ভাবিতা হইলেন। বলিলেন "কৈ, বাড়ীতে তো যায় নাই।"

কৈবর্ত্তবধূ বলিল—"তবে বা, দামুঘোষেদের বাড়ী গিয়াছেন। তার ছেলেটির বাল্‌সা হয়েছে, ডরিয়ে ডরিয়ে উঠ্‌চে, সেখানেই বা গেলেন।"

মাতা বলিলেন—"কে জানে, বাছা? তা, দুটো ভাত মুখে দিবার কি সময় হয় না!"

কৈবর্ত্তরমণী দৌড়াইয়া দামুঘোষের বাড়ী গেল। অল্পক্ষণ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "না, সেখানে তো নাই। গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, তার পর অনেকক্ষণ বাড়ী যাই বলে গিয়েছেন। আপনি বাড়ী গিয়ে দেখুন দেখি, বোধ হয় এতক্ষণ গিয়ে থাক্‌বেন।"

মাতা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। বসুমতী আসে নাই। যেখানের যে জিনিষ সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে, বসুমতী গৃহে নাই। আবার নাম ধরিয়া উচ্চে ডাকিলেন। সাড়া পাইলেন না। প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। আবার বাহিরে আসিলেন। পথে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহই বলিতে পারে না। মাতা আপনার পাড়া খুঁজিয়া অন্য পাড়ায় গেলেন। পাড়ার সকলে মহা উৎকণ্ঠার সহিত সকল স্থানে খুঁজিতে লাগিল। কোথাও বালিকার সাক্ষাৎ মিলিল না। মাতা অস্থির হইলেন। চক্ষে জল আসিল। তাহা দেখিয়া অন্য সকলেও ব্যথিত হইল। আবার সকল জায়গা আতিপাতি করিয়া খুঁজিল। কৈ, বালিকা কোথায়? মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন।

একজন বলিল—"আমার বোধ হইতেছে, তাহাকে যেন একবার ব্রহ্ম-ঠাকুরুণের সঙ্গে কথা কহিতে দেখিয়াছি।"

তখন, আর একজন বলিল "সে কি, ব্রহ্মঠাকুরুণ তো সকালে তাহার নাত্‌জামাইয়ের বাড়ী গিয়াছে।"

আগে যে বলিয়াছিল, সে বলিল, "তা ত জানি, সকালে যখন যায়, তখন আমাদের উঠান দিয়া হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আহারান্তে ঘুমের পর যখন হাত মুখ ধুই, তখন যেন স্পষ্ট দেখিলাম, ব্রহ্মঠাকুরুণ আর আমাদের দিদিমণি

দুইজনে কি বলাবলি করিতে করিতে তাহার বাড়ীর দিকে যাইতেছেন।” বসুমতীকে গ্রামের অনেকে দিদিমণি বলিত।

প্রতিবাদকারী বলিল, “না, না, সে ঘুমের ঘোরে কি দেখিয়া থাকিবে।”

তখন, বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল, মাতা বড়ই রোদন করিতেছিলেন। অন্যান্য সকলে বলিল “তা, সে জন্য বাদানুবাদে আবশ্যক কি, চল, ব্রহ্ম-ঠাকুরুণের বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসি।”

সকলে মিলিয়া ব্রহ্মঠাকুরুণের বাড়ী গেল। মাতাও কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রহ্মঠাকুরুণের বাড়ী একটু দূরে। বাড়ীর সম্মুখে গোটাকত বাঁশঝাড়, তার তলায় এক হাঁটু বাঁশপাতা পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কত পাতা উঠানে পড়িয়া জমা হইয়া রহিয়াছে, উঠান কি বাঁশতলা তাহা সহজে চেনা যায় না। কেবল মধ্যস্থলে খানিকটা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করা। মাঝখানে একটা বুড়া কাঁঠালগাছ—তাহার পাতা পড়িয়া গিয়াছে, ডাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গায়ের ছাল উঠিয়া গিয়াছে। শুনা যায়, ব্রহ্মঠাকুরুণের বিয়ের বৎসর একবার এই গাছে গোটাকত কাঁঠাল ফলিয়াছিল, তার পর আর কেহ কখন তাহাতে ফল ধরিতে দেখে নাই। সেই কাঁঠালতলায় একটী তুলসী গাছ। গাছের তলায় পিঁড়ি, মাথায় ঝারা। বাড়ী খোলা, প্রাচীর ছিল না; কেবল বাঁশের বেড়া। সেই বেড়া পার হইয়া উঠানে আসিলেন। একখানি মাত্র মেটে ঘর। তাহার দুইখানি দাওয়া। পাশের খানি ঘেরা—তাহাতে রান্না হইত, আর সুমুখের খানিতে বসা দাঁড়ান চলিত। বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। কেহ ব্রহ্মঠাকুরুণকে ডাকিলেন, কেহ বসুমতীকে ডাকিলেন; কাহারও উত্তর মিলিল না। তখন, সকলে দাওয়ার উপর উঠিলেন। ঘরে চাবি বন্ধ। মাতার যে শেষ একটু আশা হইয়াছিল, তাহাও গেল। আবার উচ্চে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধানাদি করিতে অনেক সময় নষ্ট হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ইহার কিছুই জানেন না। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সঙ্গীরা অনেকে জাগিয়াছিল, কিন্তু, তাহাদের সে দিন যাইবার ইচ্ছা ছিল না, তাহারা মনে মনে রাত্রিকার আহারের গুরুত্ব বিষয়ে কল্পনা করিতেছিল। কেহ কেহ মাছের মুড়াটার পরিমাণ

লইয়াই মহা বিচারে মগ্ন ছিল। কেহ দুগ্ধের ঘনত্ব, কেহ সন্দেশের মিষ্টত্ব প্রভৃতি মহা মহা কূট মীমাংসা সকল তন্ময় হইয়া ভাবনা করিতেছিল। বিখ্যাত তত্ত্বদর্শী নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিয়াছিলেন, এ জগতে সকলই অনিত্য, এখানে কেবল কল্পনাই সুখ। নেপোলিয়ান এ মহাবাণী বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঠিক্ এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া কেবল কল্পনার পাখায় চাপিয়া উড়িয়া বেড়াইলে নেপোলিয়ান নেপোলিয়ান হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক, হেমচন্দ্রের সঙ্গীগণ যখন এক এক জন এক একটী নেপোলিয়ানের ন্যায় মুদিতকল্প চক্ষে ধ্যানস্থবৎ সেই মহাবাক্যের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন হঠাৎ একটা ক্রন্দনের রোলে তাঁহাদের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। মাছের মুড়া, দুধের বাটী, জলখাবারের রেকাব সমেত কল্পনাটা ভাঙ্গিয়া টুটিয়া চুরমার হইয়া গেল। তখনও হেমচন্দ্র নিদ্রা যাইতেছিলেন; ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সেই বালিকা বসুমতীর কথা স্বপ্নে দেখিতেছিলেন। সেই মুখ, সেই হাসি, সেই কথা,—হেমচন্দ্র ভাবিতেছিলেন, এ কোন্ নন্দনের পারিজাত ভুলিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়া ফুটিয়াছে? সহসা সে ক্রন্দনের শব্দ হেমের কাণে বাজিল। ত্রস্তে ধড় মড় করিয়া হেম উঠিয়া বসিলেন। উৎকর্ণ হইয়া শব্দ শ্রবণ করিলেন। এ যে নিকটে—অতি নিকটে—বহির্বাটীতে। ব্যস্ত হইয়া হেম বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, লোকে লোকারণ্য, সকলেই নিঃশব্দে রোদন করিতেছে; আর সেই রোরুদ্যমান লোকমণ্ডলীর মধ্যে বসুমতীর মাতা আছাড় পাছাড় খাইয়া উচ্চে রোদন করিতেছেন। হেমের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, নিঃশব্দে চক্ষের অগ্রভাগে জল গড়াইয়া পড়িল, বুকের ভিতর কে যেন ঘা মারিতে লাগিল, একটা অননুভবনীয় আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সহসা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইল না। নির্ব্বাকে এক পার্শ্বে হেম দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন, স্থির হইয়া সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া যাহা বুঝিলেন, তাহা অতি ভয়ানক। "বসুমতী—বসুমতী কোথায়!"—আর হেমের কথা ফুটিল না, কে যেন জোরে মাথা ঘুরাইয়া দিল। পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই হাতে কপাল টিপিয়া হেম সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

বুঝিবে না ?

১

নীরবে ওঠে যে ঢেউ, বুঝিতে চাহে না কেউ
সুস্থির হইয়া !
হায়, কত ক্ষুদ্র আশা, ভালবাসা ভাসা ভাসা,
কালসিন্ধু-গর্ভে যায় এরূপে ডুবিয়া !

হৃদয় ভাঙেনি যার,— ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ তার,
ক্ষুদ্র তার কাছে !
যে আছে জ্যোৎস্নায় ভুলে, ক্ষুদ্র তারা, ক্ষুদ্র ফুলে,
কি ক'রে বুঝাব তারে—কি জগত আছে !

কে বুঝিবে ?—প্রাণে যার দিন রাত অনিবার
বিঁধিতেছে সূচি !
নাহি যার দীর্ঘ-শ্বাস, অশ্রুজল, হা-হুতাশ,
কে বুঝিবে কথা তার, মন-ভাঙা কুচি !

২

বিন্দু বিন্দু বারি-ঘায় পাষাণ ভাঙিয়া যায়,
এ কথা ত মান';
ল'য়ে রূপ তিল তিল, বিশ্বকর্ম্মা নিরমিল
তিলোত্তমা, জান'।

অণু পরমাণু ল'য়ে ঘুরিছে বিব্রত হ'য়ে
ব্রহ্মাণ্ড মহান্ !
ল'য়ে পল বিন্দু বিন্দু ছুটে কাল-মহাসিন্ধু,
কি ভীম তুফান !

বুঝিবে না তবে, ধীর, এ হৃদয়-কামুকীর
প্রাণান্তক ভার?
অণু-পরমাণু আশা, মোহ, ভুল, ভালবাসা,
প্রসারিছে—সঙ্কোচিছে—যেথা অনিবার!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

যুগ-ধর্ম্ম।

অনাদিনিধনস্বভাব কালের অবস্থা-পরিবর্ত্তনকে কল্প ও মন্বন্তর বলে। সেই মন্বন্তরের অবস্থা বিশেষ বিশেষকে যুগ বলে। যুগের অবস্থাও পরিবর্ত্তনশীল। অবস্থানুসারে সেই যুগ চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় তাহার এক ভাগের নাম সত্য, দ্বিতীয় ভাগের নাম ত্রেতা, তৃতীয় ভাগের নাম দ্বাপর, চতুর্থ ভাগের নাম কলি। এই কলি আবার অবস্থাবিশেষ দ্বারা তিন প্রকার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কলি, প্রবল কলি, আর ঘোর কলি। কলির প্রথম ভাগ অতীত হইয়া এখন দ্বিতীয় ভাগে পতিত হইয়াছে। ইহার তৃতীয় ভাগ হইয়া শেষ হইবে। কলি প্রথম ভাগে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদাতা ছিল। বর্ত্তমান প্রবল কলিও তাহা প্রদান করিতে সক্ষম নহে। ইহার পর ঘোর কলিতে উক্ত চতুঃবর্গের নাম মাত্র থাকিবে এতাবন্মাত্র। সত্য যুগের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে লোক সকল সুন্দর, সুশ্রী, অত্যন্ত বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, অরোগী, অশোকী, ধনবান, ধার্ম্মিক, যোগী, জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু, পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয়, ক্রিয়াবান্ ও কেবল দেবাংশগত দেবতুল্য ছিল। এ কালে দেবতা ও পিতৃগণ পুণ্যাত্মা মানবদিগের বাটীতে আসিয়া আবশ্যক মতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। একালে মনুষ্যদিগের যোগ ও তপোবল এতই প্রবল ছিল যে দেবাসুর প্রভৃতি সকলেই সত্য-পূত মানবদিগকে ভয় করিতেন। তখন পার্থিব লোক সকল

এই পৃথিবীকে স্বর্গনাম করিয়া স্বর্গের সহিত স্পর্দ্ধা করিত। এ যুগে বৈদিক ক্রিয়াই প্রচলিত ছিল। অন্য কোন শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া হইত না। সত্যযুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তি যুগকে ত্রেতাযুগ বলে। সত্যতে যেমন সত্যধর্ম্ম সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ ছিল বলিয়া তাহার নাম সত্য হইয়াছিল, তেমনি যে কালে ধর্ম্ম ধন বল বীর্য্য তপস্যা যোগ পরমায়ু ক্ষয় হইয়া ত্রিপাদ ছিল, পার্থিব ধর্ম্মও যে সময়ে ত্রিভাগ মাত্র থাকিল, এই কালের নাম ত্রেতা-যুগ হইল। সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু যেমন ছিল এ যুগে তদপেক্ষা ন্যূন হইলেও দশ সহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল। এ কালে লোক সকলের ঐহিক পারত্রিকের কার্য্যাকার্য্য ও যোগ যাগ সকলি শ্রুতিস্মৃতি অনুসারে হইত। বেদের তেজঃ অল্প পরিমাণে কমিল। বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের নিয়মানুসারে শিব বলিয়াছেন যে প্রত্যেক যুগের শাস্ত্র সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ১৮৪টি যুগে একটি মন্বন্তর। এতৎসংখ্যক যুগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম, পৃথক্ পৃথক শাস্ত্র। বর্ত্তমান কলিযুগের জন্য যে নিয়ম ও যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ভবিষ্যৎ কলিযুগের নিমিত্ত অন্য প্রকার নিয়ম ও অন্য রকম শাস্ত্র প্রচার হইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। ত্রেতাযুগের পর দ্বাপরযুগ। এ যুগের যেমন পৃথিবীর অবস্থা তেমনি শাস্ত্র সকল প্রচার হইল। এ যুগে পুরাণ শাস্ত্রই প্রবল হইল। লোক সকল পাপতাপে জড়িত হইল। সুখ সচ্ছন্দতা কমিয়া গেল। ধর্ম্ম দ্বিপাদ, সত্যও দ্বিপাদ থাকিল। পৃথিবী ভারাক্রান্তা হইয়া গত-যৌবনার ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কুরু ও পাণ্ডব এবং শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথমে ও দ্বাপরের শেষে জন্মিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন। অনেকের বিশ্বাস যে ভবিষ্যৎ দ্বাপরের শেষে আর কলির প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ও কুরু পাণ্ডব জন্মিয়া পূর্ব্ববৎ লীলা করিবেন। এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত নহে।

যেমন মন্বন্তর আর যুগ যে কতই অতীত হইয়া গিয়াছে, তেমনি কল্পও অসংখ্য হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা তৎসমুদায় স্থির করিতে পারেন নাই। এইক্ষণ বরাহ কল্প। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে একটি কল্প হয়। কল্প সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বশিষ্ঠভূষুণ্ড সংবাদে প্রকাশ যে, প্রত্যেক কল্পে জগতের অবস্থা নূতন নূতন হয়। কোন কল্পে এই পৃথিবী কেবল পর্ব্বতমালায়

সমাচ্ছন্ন ছিল। কোন কল্পে কেবল জলময় ছিল। কোন কল্পে কেবল পাংশুময় ছিল। কোন কল্পে অরণ্যময় ছিল। কোন কল্পে চন্দ্র সূর্য্যের বিদ্যমানতা ছিল না, কেবল পর্ব্বতরাজ সুমেরুর অর্দ্ধাংশ দ্বারা আলোক পাওয়া যাইত। এখন যে দিককে পূর্ব্ব বলিয়া জানা যাইতেছে, কোন কল্পে তাহাকে পশ্চিম দিক বলিয়া জানা যাইত। শাস্ত্র সকলও তদনুরূপ ছিল। এখন স্ত্রীলোকের উপনয়ন নাই। কিন্তু অন্যান্য কল্পে স্ত্রীলোকের উপনয়ন ছিল যথা—"পুরাকল্পেত নারীনাং মৌঞ্জীবন্ধনমীষ্যতে" ইতি স্মৃতি। তখন তাহারা বেদেও পুরুষের ন্যায় অধিকারিণী ছিল। ইহার শাস্ত্রপ্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন কল্প, তদনুরূপ মন্বন্তর। মন্বন্তরের অর্থ সৃষ্টির প্রথমে যে মনুষ্য হইতে মানব জাতি সৃষ্টি হইয়া থাকে, ১৮৪টি যুগ তাঁহার নামানুসারে প্রচলিত থাকে। যেমন স্বায়ম্ভুব, সাবর্ণি, স্বারোচিষ, বৈবস্বত ইত্যাদি। আবার মন্বন্তরের অনুযায়ী যুগ প্রবর্ত্ত হয়। যুগানুযায়ী শাস্ত্র সকল প্রচার হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্বেতবরাহ কল্পের মধ্যে ১৪টি মনন্তর গত হইয়াছে। এইরূপ সপ্তম মন্বন্তরের নাম বৈবস্বত মন্বন্তর। ১৮৪টি যুগ এক এক মন্বন্তরের ভোগ কাল। ১৮৪ যুগের মধ্যে ১১১ যুগ গত হইয়া ১১২ যুগ প্রবর্ত্ত হইয়াছে। এই যুগের নাম কলিযুগ। এই কলিযুগের প্রথমাবস্থা অতীত হইয়া দ্বিতীয়াবস্থায় পড়িয়াছে। তৃতীয়াবস্থায় শেষ হইবে। তাহা হইতে বিলম্ব আছে।

দেশের ও কালের অবস্থানুসারে মনুষ্যের প্রকৃতি সংগঠিত হয়। শাস্ত্রও মনুষ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী। নচেৎ শাস্ত্রানুযায়িনী মানব-প্রকৃতি হয় না। যখন যেমন মানব প্রকৃতি নির্ম্মিত হয় শাস্ত্রকারেরা তদনুসারে শাস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন। সকল কল্পের, সকল মন্বন্তরের, সকল যুগের জন্য একই প্রকার শাস্ত্র প্রচার করেন নাই, পৃথক্ পৃথক্ যে শাস্ত্র সকল প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহার উদাহরণ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা গিয়াছে, যে, শাস্ত্রের একবাক্যতা সংস্থাপনার্থ বলিয়াছেন "কল্পভেদাদবিরুদ্ধং।" অর্থাৎ কোন কল্পে এইরূপ কোন কল্পে অন্যরূপ শাস্ত্র ছিল। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা জ্ঞানগুরু শিব তন্ত্রশাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, যে

"যুগাদৌ বেদমার্গেণ ত্রেতায়াং শ্রুতিসম্মতং দ্বাপরে চ পুরাণেন কলাবাগম-সম্মতং।" সত্যযুগে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষলাভ করিতে হইলে শুদ্ধ বেদ মতে ক্রিয়া করিবে। ত্রেতাযুগে কেবল শ্রুতি মতে, দ্বাপর যুগে কেবল পুরাণ মতে, কলিযুগে কেবল আগম মতে ক্রিয়া করিলে ক্রিয়া সফলা হয়।

সত্য যুগে বেদ যেমন জীবন্ত ও সর্ব্বাঙ্গবসম্পন্ন ছিল, আবার এই প্রবল কলিযুগে উহা নির্জীব অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বেদ কেন শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণেরও ঐ প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহার প্রমাণ—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সত্য যুগ হইতে কলির দুই সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় সম্রাট আর মুনিঋষি ও যাজ্ঞিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া বৈদিকাদি ক্রিয়ার ফল অব্যর্থ ছিল। তৎপর প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজার আর মুনি ঋষি ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব হইলে ক্রমশঃ কলি প্রবল হইলে বেদাদি শাস্ত্র সকল ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সুতরাং আগম শাস্ত্র অবলম্ব্য হইল। এত দিন প্রবল কলি হয় নাই, সেই হেতু অতীত পণ্ডিতেরা ও গুরু পুরোহিত সকল নিরবচ্ছিন্ন আগম মতে আশ্রমোচিত বর্ণধর্ম্মানুযায়িনী ক্রিয়া করেন নাই, এই মাত্র অনুভব হয়। যুগবিরুদ্ধ ক্রিয়া হওয়ার আর একটি কারণ এই, এইক্ষণকার অধিকাংশ হিন্দু হেতুপরতন্ত্র বলিয়া নিতান্তই কুসংস্কারাপন্ন, এবং কেবল বিশ্বাসমূলক আধ্যাত্মিক শাস্ত্রকে শ্রদ্ধা ও প্রত্যয় করেন না বলিয়া আগম শাস্ত্র বিশেষ আদৃত হইতে পারিতেছে না। আগম শাস্ত্র অহেতুক অথচ প্রত্যক্ষ ফলদাতা। ইহার ইতিবৃত্ত পর্য্যন্ত জানা নাই। তাহা দুই এক জন যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সংসর্গ ও সমাজের গুণে প্রকাশ করেন না। এই উপলক্ষে পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে হিন্দু শাস্ত্র সকলের মধ্যে কতক গুলি হেতুমূলক, আর কতকগুলি বিশ্বাসমূলক, কতকগুলি ব্যবহার শাস্ত্র, কতকগুলি কাব্যালঙ্কার নামক, কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ যোগ, ও জ্যোতিষ, আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, আর কতকগুলি অহৈতুক সিদ্ধান্ত বাক্যে পরিপূর্ণ আগম শাস্ত্র। এই আগম শাস্ত্র ব্যতীত আর আর শাস্ত্র সকল বর্ত্তমান সময়ে কেবল অর্থকরী শাস্ত্র হইয়াছে। আগম শাস্ত্র অতি গূহ্য।

সকলে ইহা জানে না। কিন্তু ভারতে আগম যত দিন প্রবল না হইতেছে তত দিন ভারতে একহৃদয়ী বীর হইতে পারিতেছে না একধর্মী হইতে পারিলে একহৃদয়ী বীর হওয়া যায়। লোক সকলকে একধর্মী ও এক জাতি করিতে তান্ত্রিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মই প্রভু।

এই প্রবল কলিকালে আগমোক্ত শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য সৌর প্রভৃতি বাবদীয় পথ ভয়ানক অথচ কণ্টকাকীর্ণ। প্রাগুক্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পথ অতি সুখসেব্য ও ভয়শূন্য। এ পথের যিনি পথিক হন, তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীষ্টান, না চীন, না মগ। কেবল শিবজাতি হন। শিবত্ব জন্মিলে লোক সকল সকল জীবকে আত্ম সহোদর বলিয়া জানেন। ইহা-দিগের তিনটি মাত্র নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা।—

"সত্য বচন, অধীনতা, পরনারী-নৈরাস।
এচমে গুরু না মিলে জামিন তারা দাস"।

যত দিন লোক সকল এই নিয়ম ত্রয়ের আস্বাদ না পাইবেন তত দিন তাঁহারা বীরত্ব বা শিবত্ব লাভ করিতে পারিবেন না।

তান্ত্রিক নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার কিয়দংশ যোগীবর গোরক্ষনাথ ভৈর-বের শিষ্য হইতে ক্রাইষ্ট ও শিখগুরু নানক প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ লোককে একহৃদয়ী বীর করিয়া গিয়াছেন। পেগম্বর মহম্মদও আপন কল্পি-পত ঈশ্বরারাধনার মত প্রচার করিয়া অনেক লোককে একহৃদয়ী বীর করিয়া গিয়াছেন বটে। কিন্তু তাঁহার উগ্র মত ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইতে না পারায় অকারণ নর-হত্যার পাতকে নামাঙ্কিত হইয়া ছিলেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কেবল অসঙ্গত প্রেম বিতরণ করিয়া দেশের সাধারণ লোকদিগকে ভিক্ষুক করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর নবাবি-ষ্কৃত পথের পথিক, তাঁহাদিগের হৃদয় বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ শূন্য। অথচ গৃহস্থ। ইহারা বিশুদ্ধ প্রেম কাহাকে বলে তাহা জানে না। কেবল মুখে প্রেম গড়িয়া পড়ে এই মাত্র।

তৎপর রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মে বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণতন্ত্রাদিমত মত প্রচার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্ম মুখে এক, কার্য্যে এক। এ সমাজের বর্ত্ত-মান নেতা সকল হিন্দুয়ানি রক্ষার্থ হিন্দুদিগের ন্যায় শ্রাদ্ধ বিবাহ উপনয়নাদি

কার্য্য করেন সত্য, কিন্তু তাহা কি হিন্দু শাস্ত্রসম্মত, কি খ্রীষ্টান কি মুসলমান শাস্ত্রসম্মত তাহা প্রকাশ নাই। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন ঠিক হিন্দু শাস্ত্রসম্মত। যাই হউক ইহাদিগের পরব্রহ্মে ভক্তি যে আছে তাহা অনেক সত্য; ইহারা যদি মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুসারে আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধনা করেন তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, এবং দেশেরও অনেক হিত হয়।

কেহ কেহ বলেন অনেক তন্ত্র নিতান্তই বেদবিরুদ্ধ দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় তন্ত্র বেদসম্মত প্রাচীন শাস্ত্র নহে, উহা নূতন শাস্ত্র। সর্ব্বত্র চলিত শাস্ত্র নহে। এ কথা নিতান্তই অল্পদর্শী ও অল্পজ্ঞানী অবিমৃষ্যকারীর কথা। বেদ শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র একই বস্তু। তবে বেদের নাম আর রূপ পরিবর্ত্তন হইয়া শ্রুত্যাদি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এতাবন্মাত্র। বেদ আপ্ত বাক্য তন্ত্রও আপ্ত বাক্য। যাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ নাই তাহাই আপ্ত বাক্য। এ বাক্য অপৌরুষেয়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ। যিনি সমগ্র অথর্ব্ববেদ ও আঙ্গীরসীয় শ্রুতি আর সমুদায় তন্ত্র অধ্যয়ন বা দর্শন করিয়াছেন, তিনি তন্ত্রকে অতি প্রাচীন, সর্ব্বত্র-প্রচলিত বেদ বলিয়া সম্মান করেন। বৈদিক মন্ত্রের যেমন ঋষি, ছন্দ, দেবতা আর প্রয়োজন আছে; তান্ত্রিক অনেক মন্ত্রেও তাহা আছে। ঋক্ যজুঃ সামবেদে যেমন ইন্দ্রাদি দেবতার আরাধনা আছে, আগমরূপী অথর্ব্ববেদেও পরব্রহ্ম ও বিষ্ণু শিব শক্তি সূর্য্য, গণপতি রূপ নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের মন্ত্রতন্ত্র আছে। এই সকল উপাসক ভারতের সর্ব্বত্র দেখা ও শুনা যায়। পরব্রহ্মোপাসক অতি বিরল।

নির্গুণ পরব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে যেমন আছে এমন আর কোন শাস্ত্রে নাই। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অতি প্রামাণিক ও সর্ব্বমান্য। এই তন্ত্রে হিন্দু গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অনেক প্রকার ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতিও আছে। তাহাই প্রবল কলিযুগের পক্ষে একান্ত হিতকর ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

এখন দেখা যাউক, প্রবল কলিযুগের হিন্দুরা বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের শাসন অবহেলনপূর্ব্বক মহাজনোচিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তি হইয়াছে কি না।

দেখা যাইতেছে যে এই প্রবল কলিযুগে হিন্দুজাতির মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রবৎ যবন ম্লেচ্ছজাতির দাসত্ব করিয়া

জীবন যাপন করিতেছেন। আর যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারাও প্রোক্ত ব্রাহ্মণগণকে অত্যাদরের সহিত কন্যাপুত্র প্রদান ও আদান কার্য্য করত তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পালন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন দান গ্রহণ ও যাজন ক্রিয়াদ্বারা যে অপবিত্র হইতেছেন তাহা কি তাঁহারা জানেন না? সংসর্গ দোষ এমন প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহা হইতে নির্লেপ ব্যক্তি কলিযুগে নিতান্তই বিরল। কলিযুগের প্রবল প্রতাপে অন্ন ও স্ত্রী এবং সম্বন্ধ বিচার নাই। হিংসা ও মিথ্যা কথা ব্যবহার করাকে কেহই পাপ বোধ করেন না। পরনিন্দা স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইয়াছে। মদ্য, মাংসের অবৈধ সেবা করা সামাজিক ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। নবীন ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি অভ্রান্ত সাধনা ধর্ম্ম হইত, তবে ৫০।৬০ বৎসর হইল, প্রচার হইয়াছে, উহাতে ২।১ জন লোকও সিদ্ধ হইতে পারিতেন। এ পর্য্যন্ত একজনও সিদ্ধ হইতে পারে নাই। যিনি যাঁহার সাধনা করেন তিনি তদ্বিষয়ে সিদ্ধ হইলে তৎস্বরূপ হইতে পারেন। ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধ হইলে ব্রহ্মাত্মা হইয়া পড়েন। ব্রহ্মাত্মা হইলে অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য তাঁহার করতলস্থ হয়। এতদ্ভিন্ন বাক্‌সিদ্ধ ও ত্রিকালজ্ঞ হন। কিন্তু ব্রাহ্ম বল, হিন্দু বল, এই যে কোটী কোটী লোক আছে তাহার ত এক জনকেও সিদ্ধ হইতে দেখা বা শুনা যায় না। কেন? যুগানুযায়িনী যথাশাস্ত্র সাধনা করা হইতেছে না বলিয়া কেহই সিদ্ধ হইতে পারিতেছেন না। নচেৎ অন্য কোন কারণ নাই। এই প্রবল কলিকালের আত্ম সাক্ষাৎকারের ও একপ্রাণ হওয়ার আর বীরত্ব-প্রাপণের তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। এ ধর্ম্ম সকল বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

সত্যযুগ হইতে এই প্রবল কলিযুগ পর্য্যন্ত যতই পৃথিবীপাল হইয়া গিয়াছেন ও বর্ত্তমান আছেন ইহাঁরা সকলেই সাধনা বলে বীর হইয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ সগুণ কেহ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় বীর। যিনি নাস্তিক তিনিও প্রকৃতির উপাসক ছিলেন। হিন্দুর মধ্যে অনেকে গুণময়ী প্রকৃতি দেবীকে সাকারা করিয়া আরাধনা করেন। কি হিন্দু কি যবন কি ম্লেচ্ছ ইহারা স্বভাবতেই ব্রহ্মোপাসক বীর। এই প্রবল কলিযুগের পক্ষে সত্যই সকলের অবলম্ব। যিনি যতই সত্যপূত হইবেন তাঁহার ভাগ্য-লক্ষ্মী ততই বৃদ্ধি হইবে,

এবং ঈশ্বর প্রসাদ ততই লাভ করিবেন। সত্যই ধর্ম্ম, সত্যই তপস্যা সত্যই যোগ, সত্যই যজ্ঞ, সত্যই স্বর্গ সত্যই মোক্ষদ্বার। সত্য সাধনায় তাদৃশ জ্ঞান বা যোগের অপেক্ষা করে না কেবল মনের দার্ঢ্যতা আবশ্যক করে। কুসংস্কার সত্যের প্রবল প্রতিবন্ধক। কুসংস্কারের দ্বারা সত্য মিথ্যা, মিথ্যা সত্য হইয়া থাকে। এ নিমিত্ত সাধু সদ্‌গুরুর আশ্রয় লওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

যতই কলি প্রবল হইবে ততই সাধু ও সদ্‌গুরুর অভাব অসত্যের বৃদ্ধি হইবে। যথা—

"যদা যদা সতাং হানির্ব্বেদ মার্গানুসারিণাং।
তদা তদা কলের্ব্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥"

কলি যে এখন অতি প্রবল তৎসম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বিশেষ প্রমাণ যাহা আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তন্ত্র বলেন, যে সময় এই আর্য্যপালিত ভারতে নিতান্ত ধনলোভী ম্লেচ্ছজাতি রাজা হইয়া হিন্দু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নিয়মাবলি দ্বারা ভারত শাসন করিবেন সেই সময়কে প্রবল কলি বলিয়া জানিবে। আর নদীপ্রধানা সমুদ্রগামিনী ভাগীরথী গঙ্গা যে সময় ছিন্না ভিন্না ও মন্দগতি হইবেন সেই সময়কে প্রবল কলি বলিয়া জানিবে। এখন রাজার আর গঙ্গার অবস্থা দ্বারা প্রবল কলি বলিয়া কেনা বিশ্বাস করিবে? এতদ্ব্যতীত প্রবল কলি সম্বন্ধে মহাদেব আর যতগুলি কথা বলিয়াছেন সে সকল গুলি ঘটিয়াছে। অতএব হিন্দুগণের এখন ক্রিয়া করিতে হইলে আগমোক্ত ক্রিয়া করাই শাস্ত্র ও যুক্তি সম্মত হইতেছে। ভারতীয় হিন্দু-জাতি যত দিনে এক ধর্ম্মানুসারে এক বর্ণ ও এক প্রাণ না হইতে পারিতে-ছেন, তত দিন তাঁহাদিগের পরস্পর ভ্রাতৃভাব ও স্বদেশানুরাগ আর বীরত্ব কোথায়! এখন হিন্দুজাতির যেরূপ অবস্থা ও আচার ব্যবহার হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে তাবতই বামাচারী কৌল বলিয়া বোধ হয়। এই কৌলভাব আর বামাচার যদি আগম সম্মত হইত তাহা হইলে উক্ত ভাবের ও আচারের প্রকৃত বীরত্ব আর এক প্রাণত্ব ফল অবশ্যই ফলিত। এতদ্ভিন্ন হিন্দুজাতির দৈব পৈত্র্য ক্রিয়াকলাপের অকৃত্রিম ফলও ভূরি ভূরি উৎপন্ন হইত। পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ও সার্থক হইত। আর ক্রিয়া

নিষ্পাদক সাধু গুরু পুরোহিতেরও অসদ্ভাব থাকিত না। এ সম্বন্ধে যুক্তি বলেন, "সামগ্রী চেন্ন ফলবিরহঃ [illegible]ন্ত মেবেতিতত্ত্বম্।" সামগ্রী থাকিলে অর্থাৎ উপাদান থাকিলে ফলের অভাব কখন হয় না ইহাই নাস্তি। অর্থাৎ স্থির সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় হিন্দুজাতির একহৃদয়তার ও স্বদেশানুরাগিতার এবং বীরত্বের সামগ্রী কেবল বক্তৃতা বা বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ শিক্ষা করা নহে, এইক্ষণকার সামগ্রী যুগানুযায়ী শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহার ও দৈববল উপার্জ্জন করা। কেবল দৈববলে কিম্বা আচার ব্যবহারে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহারা দৈববলের অনাকাঙ্ক্ষী ও কেবল আচার ব্যবহারের প্রত্যাশী তাঁহারা অর্দ্ধ সামগ্রীর ফল বৈ সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে পারেন না। ইহা আগমবিদ্‌গণের মত। [ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

বিবিধ চিন্তা।

বাতায়ন।গৃহের চক্ষু—হৃদয়ের দ্বার—প্রণয়ের মুখবন্ধ—নারীর স্বাধীনতা—মৃত্যুর জীবন—জীবনের মৃত্যু—অসীমের সসীম—আর আমার সব। এই চির-অবারিত রহস্যময় পথ দিয়া কোথাকার একটি কল্পনাময় নানাবর্ণে রঞ্জিত পাখী মধুর গান গাহিতে গাহিতে আসিয়াছিল। আবার এই চির পরিচিত অন্তহীন ভাঙ্গা গড়ার পথ দিয়াই সে কোথায়—কোন্ দূর মেঘাচ্ছন্ন দেব-দেশে—উড়িয়া গিয়াছে! এই বাতায়নই জগৎ-অতীতে পালাবার এক-মাত্র পথ। হায়, এই চির-দুর্ব্বোধ পথ-দ্বার খুলিয়া কত লোকের কত পাখী পলাইয়া গিয়াছে! আজও—এই মুহূর্ত্তে—কত যাইতেছে! সমস্ত বিশ্ব তিল তিল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও, আর তাহাদিগকে কোথাও পাইবে না! হায়! এ পথ কি রুদ্ধ করা যায় না? না। ইহা চির-অনবরুদ্ধ!

২

আজও ত আসিল না! কে? আমার কোথায়—কোন্ অসীম অন্ধকারের গর্ভে ভগ্ন হৃদয় খানি লইয়া কত কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে—চলিয়া গিয়াছে! হায়, কবে আসিবে সে? আজ কত—কত দিন যে সে আসে নাই! এই দীন হীন প্রাণ লইয়া শূন্য জগৎ-বাতায়নে তাহার জন্য কত দী—র্ঘ—দী—র্ঘ দিন রাত্রি ধরিয়া বসিয়া বসিয়া যে কাঁদিতেছি! এত কাঁদিতেছি তবু আসিল না! তবে আর বুঝি আসিবে না! আর আসে না!

৩

আজ আমি যে তাহাকে ঐ দূরাগত রহস্যময় organ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতময় শব্দের স্মৃতিময় বিষাদিত ছবির মধ্যে দেখিতে পাইলাম! যেন কোথাকার কোন্ অদৃশ্য-গানের দেশ হইতে সুর লইয়া সে আমাকে দেখিতে আসিয়াছে! আজ সে রাগিনীরূপিণী। যাহাদিগকে আমরা জীবনে ভুলিতে পারি না, যাহারা না থাকিলে জীবনের কোন অর্থ নাই, যাহারা অন্ধকারময় জীবন-গৃহের এক মাত্র প্রদীপ, যাহারা জীবনের সীমা, অসীম করিয়া দিয়াছে, যাহারা ভাবের অসীম সৌন্দর্য্যে বিশ্ব চিরদিনের মতন ডুবাইয়া গিয়াছে, তাহারা যখন অনন্ত অদৃশ্য জগৎ-কাব্যের হৃদয়ের মধ্যে একেবারে মিশাইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে আমরা বিশাল জগৎ-কাব্যের প্রতি পত্রে, প্রতি মুকুলে, প্রতি ফুলে, প্রতি ফলে, প্রতি পাখীর স্বরে, প্রতি নদীর তরঙ্গে, প্রতি ঋতুর অবসানে, প্রতি সুন্দর অক্ষরে দেখিতে পাই। সমস্ত বিশ্ব তখন তাহার আবাসস্থান। মৃত্যু, জগতে নাই। জগৎ, জীবন। জীবনের পরিবর্ত্তন—উন্নতি—বিস্মৃতি। একেবারে তাহারা এ পৃথিবী হইতে কখন চলিয়া যাইতে পারে না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আজ সে না থাকিলে কি তাহারগান ঐ বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে শুনিতে পাইতাম? সে না থাকিলে তাহার কেন্দ্রাতিগ শক্তি থাকিবে কেন? সে না থাকিলে কি আজ কখন ফুল ফুটিত? মলয় বহিত? অতীতের সুখ-দুঃখের কত কথা—কত মুখ—মনে জাগাইয়া দিয়া কি চাঁদ হাসিত? ঐ পথিক কি এই গভীর বিজন মনুষ্য-বিস্মৃত পুরাতন হৃদয়-পথ দিয়া কত কাহিনীতে জড়ান আশার ঐ মধুর বাসনা পরিপূর্ণ গান আকাশ ছাপাইয়া গাহিতে গাহিতে

চলিয়া যাইত? তাহা হইলে কি আজ আর তাহাকে আমার মনে পড়িত? হায় আমাদের কত আদরের প্রাণময় প্রিয়তম ধনদের, আমরা মোহের বশে চির দিনের মতন হারাইয়া ফেলি। কিন্তু তাহারা হারাইবার নহে। যাহারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের আর হারাই-বার স্থান কোথায়? আজ সে আমার যে, এই বিশ্বরূপে পরিণত। আগে সে আমার যে অহর্নিশি চোখের উপর বিরাজিত। তখন তাহাকে এক মাত্র স্থূল চক্ষু দিয়া দেখিতাম, আজ আমার অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম চক্ষু সমস্ত শরীর-রূপে পরিণত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। তখন সে কেবল মাত্র জ্ঞেয় ছিল, আজ সে জ্ঞেয়তার অধিক—জ্ঞানাতীত। তখন সে দেহের মিলন-পিপাসী গৃহসঙ্গিনী গৃহিণী ছিল; আজ সে জীবাত্মা ও পরমাত্মা সংযোগকারিণী বিশ্বরূপা যোগিনী। তখন সে কেবল রূপ ছিল; আজ সে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—সর্ব। আজ সে আমার দেহের প্রতি পরমাণু। জীবনের জীবন। আর তাহাকে কি ভুলিতে পারি? কি করিয়া ভুলিব? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তাহার বিচিত্র অপরূপ রূপ দেখিতে পাই। যে জল এই পান করিতেছি, ইহাও তাহারই রস। ফুল ফুটি-য়েছে, তাহার গন্ধ পাইতেছি। নিঃশ্বাস লইতেছি, সে আসিতেছে। আহার করিতেছি, সে প্রাণে মিশিতেছে। স্পর্শ করিতেছি, তাহার দেহে হাত পড়িতেছে। শব্দ শুনিতেছি, সে ডাকিতেছে। দিন যাইতেছে, এ জীবন তাহাতেই পরিণত হইতেছে। জগতের মূল কি জানি না। বোধ হয় নিরা-কার। জগতের আদ্যাশক্তি নিরাকার অব্যয়—অনন্ত। জগতের চরম ও সূক্ষ্ম, স্থূল নহে। দেহের পর আত্মা। ভোগের পর প্রেম। সসীমের পর অসীম। উন্নতি উন্নতি—উন্নতি। ক্রমেশবিশ্বপ্রাপ্তি। প্রেমের চির-মিলনের পরিচয়—বিকাশ, আত্ম-বলিদানে স্থূল দেহ পরিত্যাগে।

৪

যাহাকে একবার ভাল বাসিয়াছি, আর কি তাহাকে ভোলা যায়? যখন প্রেম, হৃদয়-সরোবর পরিপূর্ণ করিয়া উথলিয়া উঠিয়া অন্য সরোবরে মুক্তি-কামনায় প্রেমসুধা ঢালিতে যাইতেছে, তখন তাহাকে কে ফিরাতে পারে? ভাল বাসিয়া হৃদয়সসীম অনন্ত প্রেম-অসীমে মিশাইয়া আর কি ফিরান যায়—সসীমে

নামা যায়? কে বলে মরিলে সম্বন্ধ ফুরায়? আমি তাহা বিশ্বাস করি না। প্রেম কখন মরে না। দেহ-দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রেমের বিকাশ—বিস্তার। এবং প্রেমের অবস্থান ত্রিকাল যুড়িয়া। অতীত প্রেমের বীজ, বর্ত্তমান তাহার ফুল এবং অনন্ত ভবিষ্যত তাহার চিরফল।

প্রেম, আকর্ষণী শক্তি—সংযত শক্তির উন্মেষ। শক্তির গুণ, বর্দ্ধন—আকর্ষণ করা। প্রেমও আকর্ষণ করে, বিকীর্ণ হয়। প্রেমের ধর্ম্ম, প্রতি পদে অগ্রসর হওয়া, পিছাইয়া পড়া নহে। প্রেমে জগৎ ফুটিয়াছে, দানে জগৎ বাড়িয়াছে। এ জগতের তহবিলে যত জমা তত খরচ। সেখানে কৃপণতা, সঙ্কীর্ণতা নাই। তাই বলি, যদি সম্পূর্ণ মিলিতে চাও, যদি সম্পূর্ণ পাইতে চাও, যদি সম্পূর্ণ উন্নতি কামনা কর, তবে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে জগতের পদে বিসর্জ্জন কর। অনন্ত হও। যত দিবে তত বাড়িবে।

দেখ, ফিরিয়া কিছুই আসে না। আবার দিলেও ত কিছুই কমে না! প্রেমের ধর্ম্মই এইরূপ।

একবার জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। জগতের পাঠ অধ্যয়ন কর। জগৎ যে, এই প্রতিদিন তাহার সমস্ত সামগ্রী আমাদের জন্য স্বজন করিয়া আমাদিগকে দিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে সে কি পাইতেছে? কি চাহিতেছে সে? কোন একটী ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতিদানের জন্য কি সে তোমার দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসে? সব দিয়াও ত তাহার ভাঁড়ার আজও ফুরাইল না! জগৎ যে, প্রেমের ভাঁড়ার। প্রেমের ভাঁড়ার কখন ফুরায় না।

এ জগৎ উন্নতির গৃহ। অগ্রসরের সোপান। যখন জগৎ-সোপানে পা দিয়াছ, তখন আর ফিরিতে পার না। যখন প্রেমের ফুল একবার ফুটিয়াছে, তখন আর তাহার মৃত্যু নাই। এ পথ অনন্ত-গামী। যতদিন না তোমার কাজ পূর্ণ হয়, ততদিন তুমি জগতের অনন্ত ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাক। পিছনে যাওয়া যায় না। জগৎ-অগ্রসরের সদা-পরিবর্ত্তন-সোপানে উঠিতে উঠিতে, শক্তির বিপরীত মুখে পিছাইয়া যাওয়া যায় না। আমরা অগ্রসরের। পিছাইবার নহে। এ জগতের কিছু পিছায় না, বসিয়া থাকে না। তবে তুমি মিথ্যামিথ্যি কেন পিছাইয়া বসিয়া থাক! অগ্রসর হও। সঙ্কীর্ণতা দূর কর।

৫

প্রবৃত্তি, স্থূলভূত, মোহ—ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব—দেহ—অধীনতা। প্রবৃত্তি আত্মার কারাগার। নিবৃত্তি তাহার বাতায়ন—মুক্তি। প্রবৃত্তির অবসানে আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। নিবৃত্তি, প্রবৃত্তির বিরতি—বিশ্রাম। নিবৃত্তি, তীর্থস্থান—দেহের উন্নত অবস্থা—পরের আপন—দূরের নিকট। নিবৃত্তির এই অনন্ত উন্নতি-পথেই জীবাত্মার সহিত জগদাত্মার রাসায়ণিক বিবাহ। এবং ইহাই হিন্দুর জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতানে লয়—যোগ।

৬

তবু তুমি একা। তোমার কেহ নাই। তুমি জগতের, কিন্তু জগৎ তোমার নয়। তুমি মরিলে জগতের কোন কাজ বন্ধ থাকিবে না। ফুল ঠিক তেমনি ভাবে সকলকে সুগন্ধ বিতরণ করিবে। পাখী সমান ভাবে ডাকিবে চাঁদ চিরদিন ঠিক সেই ভাবে আকাশে হাসিয়া চির-প্রেমিকের মতন প্রকৃতির বুকের বসন খুলিয়া দিবে। এবং দিন ঠিক একই ভাবে হাসিতে কাঁদিতে যাইবে। তবে তুমি কেন অত অনিমেষ স্নেহ-নয়নে ঐ একখানি মুখের প্রতি প্রতিদিন চাহিয়া থাক? সমস্ত জীবন অত কাহার পিছনে দৌড়াইতেছ? কাহার জন্য চিন্তা করিয়া তনু অস্থিসার করিতেছ? যাহাকে তুমি চির-জীবন কল্পনার প্রেমময় সুখ-সিংহাসনে বসাইয়া তোমার হৃদয়-কুসুম দিয়া নিশি দিন পূজা করিয়াছ, সে তোমার কি সে, তাহা আজ পর্য্যন্ত ঠিক করিতে পার নাই, হায়, সে—তোমার সেই চির-আনন্দময়ী—আদরের আদর ত তোমার চির-সহচরী হইয়া তোমার অনন্ত অন্ধকারময় ভবিষ্য জীবন-পথ আলো ধরিয়া যাইবে না। তোমাকে শোকে ডুবাইয়া, তোমার সেই বড় কাতর মুখের প্রতি একটিবারও না চাহিয়া বিরাট জগৎ-স্রোতের মধ্যে সে একা ভাসিয়া যাইবে! সব একা। "তোমার" "আমার" কেবল কথা মাত্র। ওগুলো জীবনের সীমা—দু দিন।—আত্ম-বিড়ম্বনা! একবার আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আপনাকে অধ্যয়ন কর। তুমি যে, মোহে আবদ্ধ! তাইত তোমার এত গোলমাল; তাইত তুমি পথ চিন নাই। এখানে পথ দেখাইবার কেহ নাই! আপনার পথ আপনি চিনিয়া লও।

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু।

ঊষা।

রাত্রি হ'লো ভোর, ঊষা আসি ধীরে, সলাজ বয়ান খানি
তুলিয়া কহিল, "আর ঘুমা'ওনা, জাগ জাগ জগপ্রাণী।"
ধীরে ধীরে দুটী তুলিল বাহু
কনক মুকুট করে
সাদরে আসিয়া পরাইয়া দিল অটবীর শিরোপরে॥

২

আজি ঊষাবালা সোণার বরণে সেজেছে বড়ই সাজ।
ঊষারে ভূষিতে তাই বুঝি ফুল ফুটিছে কানন-মাঝ।
চুপি চুপি আসি পবন তার
পরিমল ল'য়ে যায়,
পরধন-চোরা পরধনে বুঝি ঊষারে তুষিতে চায়॥

৩

মাথাটি নাড়িয়া কুসুম সুন্দরী ধিক্ ধিক্ বলে তায়।
বলবান বায়ু না মানে বারণ—হেসে ফুলে ফুলে ধায়।
তাহার পীড়নে মধুপগণ
মধুপান আশা ছাড়ি,
অন্য ফুলে মধু খেতেছে পিইতে বাতাসেরে গালি পাড়ি॥

৪

পাখীরা উঠেছে, ডালেতে বসেছে, ছেড়েছে মধুর তান।
জাগায় সকলে;—দেখিয়া জুড়াও বিভুর মহিমা প্রাণ।
মহান অটবী ঊর্দ্ধে তুলি মাথা
দেখিতেছে বহু দেশ,
বাহু নাড়ি যেন বলিছে "সকলে ছাড়হ ঘুমের বেশ॥

নদীর উরসে, মরাল মরালী শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলে।
উষা আসিয়াছে মুক্তাহার নদী পরিয়াছে যেন গলে।
হৃদয়ে আনন্দ উছলি উঠে
তাই বারি তার ছোটে
হৃদয়ে আনন্দ রাখিতে পারে না তাই অত ঢেউ ওঠে।

৬

চারি দিকে যেন হাসিছে সবাই কেহই বিরস নাই।
আহা! উষা তোর কোমল বয়ান হেরেছে বুঝি বা তাই।
(তোর) কোমল পরাণ দয়ার হৃদয়
কে না তোরে ভালবাসে !
(তাই) অচেতন জীব সচেতন হয়ে এসেছে তোমার পাশে।

৭০

উঠিল ধরণী সাজিল সুসাজে পরিল ধবল বাস।
মাথার উপরে কনক কিরীট ধীরে হ'ল পরকাশ।
হাতেতে পরিল সুবর্ণ বলয়
তটিনী নদীর তরঙ্গ ছলে
শিশিরের বিন্দু, মুকুতার হার সাদরে পরিল গলে।

৮

উভয়ের পানে উভয়ে তাকায়ে হাসিল মধুর হাসি।
কি মধুর প্রেম বহিয়ে গেল রে উথলি আনন্দ রাশি।
ক্রমে উষাবালা "যাই যাই" বলে
বিদায় লইল অই ;
হাসি মুখে ধরা অমনি কহিল "ভুলনা আমারে সই।"

শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেন।

"কেন ও কেমন।"

মানুষের স্বভাব, সে সকল কথারই একটা 'কেন' জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না। বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত, মানুষ সকল অবস্থায় জিজ্ঞাসা করে 'কেন'? বাহ্য জগতের অনন্ত বৈচিত্রময় শক্তিবিকাশ দেখিয়াই হউক, আর, অন্তর-সমুদ্রের চিন্তা-তরঙ্গ দেখিয়াই হউক, মানুষ স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করে 'কেন'? এই 'কেন'-পরায়ণতা মানুষের স্বভাব। আমরা আজ এই 'কেন'-পরায়ণতা, এই কারণানুসন্ধিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে চাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিতেরা বলিয়া আসিতেছেন যে এই 'কেন' জিজ্ঞাসাবৃত্তিই মানুষের বিশেষত্ব। এই বৃত্তিই, মানুষকে নিকৃষ্ট পশুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবী দিয়াছে। এই বৃত্তিই, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলীভূত কারণ, এই বৃত্তিই সকল প্রকার উন্নতির মূল। এবং মানুষ যে আজ জগতের নিকৃষ্ট শক্তি সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপনার সুখ সমৃদ্ধি সাধন করিতেছে তাহারও মূলে এই বৃত্তি। যেমন এই ভাবটি পণ্ডিতদিগের মধ্যে বরাবর দেখা গিয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিপরীত ভাবেরও অস্তিত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি। সেই ভাবটি পূর্ব্বোক্ত কেন-পরায়ণতার প্রতি বিদ্বেষ। যেমন একদল পণ্ডিত এই বৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া জগতের জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ আর এক দল লোক বরাবর এই কারণতৃষ্ণার উপর গালি বৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন। কবিদের মধ্যে অনেকেই শেষোক্ত দলের লোক। ইঁহারা বলেন, 'ভাই হে, কি জন্য মিছে 'কেন কেন' করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছ, কেন'র কোন উত্তর নাই। থাকিলেও তাহা জানিয়া দুঃখ বই সুখ বৃদ্ধি হইবে না। দেখ ঐ চন্দ্রকরস্নাত কুসুম গুলির হাসিতে কুসুম উদ্যান কেমন আলোকিত হইয়াছে; শোন, ঐ প্রভাতবায়ুর স্পর্শে কেমন পাখি গুলি ডাকিতেছে, জিজ্ঞাসা করিও না 'কেন'। বালক বালিকার মধুর হাসির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য আছে, যুবতীর ব্রীড়াসঙ্কুচিত হাব ভাবের মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, তাহা

যদি সম্ভোগ করিতে চাও, তবে ভাই, তোমার 'কেন' ভুলিয়া রাখ। বিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছা সম্বরণ কর। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের সার, তার কি-যেন-কেমনটুকু, যেই তুমি সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণ আরম্ভ করিবে সেই তাহার প্রাণ বাহির হইবে।

এইরূপ কথা যে কেবল কবিদের মুখেই শোনা যায়, তাহা নয়। ধর্ম্ম জগতের কর্ত্তাদিগেরও মধ্যে এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়। Mystryর উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত। জগতের মূল রহস্য ভেদ করিলে, আর কেহ ঈশ্বর মানিবে না। ইহারা বলেন যে জগতের মূলে এক অভেদ্য রহস্য আছে, সেখানে জ্ঞানের রাজত্ব শেষ হইয়াছে, আর বিশ্বাসের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। সকল কেন'র শেষে এক কেন আছে, সে কেন'র আর কোন উত্তর নাই। মানুষের সকল জ্ঞানের সীমা এইখানে, এর পরই সব অন্ধকার। মানুষ যতক্ষণ তার কেন'র উত্তর পায়, যতক্ষণ সে বুঝিতে পারে, ততক্ষণ সে ঈশ্বরের কথা না জানিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু শেষ যখন তাহার জ্ঞানের সীমা দেখিতে পায়, যখন তাহার জ্ঞানালোকের চারিদিকে অন্ধকারের অনন্ত অনন্তবিস্তৃত দেখে, তখনই সে ভগবানকে ডাকে। যিনি এ রাজ্যেও তাঁহার ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রদীপটী লইতে চান, তিনি নাস্তিক। সকল নাস্তিকতার মূল এই খানে—যাহা জানিবার নয় তাই জানিবার ইচ্ছা।

আরও এক দল লোক আছেন এবং ইহাদের সংখ্যা বৈজ্ঞানিক জগতে নিতান্ত কম নয়, তাঁহাদের মতে, মানুষ একেবারেই কোন বিষয়েরই 'কেন' জানিতে পারে না। আমাদের জানিবার ক্ষেত্র—'কেমন'। কোন কথার 'কেন' আমরা বলিতে পারি না, জানিবার চেষ্টা বিফল। বিজ্ঞানের কার্য্য কেবলি কেমন করে কার পর কোন ঘটনা ঘটিল, কার সঙ্গে কোনটা থাকে, এই সকলের নির্ণয় করা। কারণ থাকিলেই কার্য্য হয়, আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে, দেখিয়াছি, তাই জানি। কেন কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, আগুনে হাত পোড়ে এ সকল প্রশ্নের উত্তর নাই। মানুষ অসভ্যাবস্থায় (theological and metaphysical stage) এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং তাহার উত্তর প্রস্তুত করিত। কিন্তু এই positive stage)-এ আর এ সকল প্রশ্ন লইয়া নাড়া চাড়া হইবে না। ইহাদের মোট কথা এই যে যেমন

এবং কালগত ঘটনা-শ্রেণীর দেশ এবং কাল গত সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন রূপ সম্বন্ধ জ্ঞান আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কোমৎ এই মতের স্রষ্টা না হইলেও আধুনিক জগতে তিনি এই মতের প্রধান শিক্ষাগুরু। এই কেন-বিরোধী মত আরও এক ভাবে দার্শনিক জগতে প্রচলিত আছে। ইহাদের মতে সকল প্রকার জ্ঞানের মূলেই, কতকগুলি মূল সত্য আছে, যে গুলির দ্বারা আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইলেও তাহাদের আর ব্যাখ্যা নাই। এই মূল সত্য গুলির সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা বিড়ম্বনা। কেন আমরা বিশ্বাস করি বাহ্যজগৎ আছে, কেন বিশ্বাস করি আমি আছি; এ সকল প্রশ্নের উত্তর নাই। যুক্তিতর্ক এইখানে শেষ।

এই যে কয়েকটি মতের কথা বলা গেল, তাহাতে কোন না কোন ভাবে একই কথা বলা হইতেছে. যে 'কেন'র উত্তর নাই। যিনি যে ভাবেই বলুন না কেন, সকলেই এক কথা বলিতেছেন যে, জ্ঞানের ভিত্তি অজ্ঞান। এখন আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব, যে এই 'কেন'-জিজ্ঞাসা-বৃত্তির প্রকৃত অর্থ কি, এবং যখন বলি যে 'কেন'র উত্তর নাই, তাহারই বা শেষ অর্থ কি দাঁড়ায়।

সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন, যে অর্থশূন্য প্রশ্ন বলিয়া একটা কিছু সংসারে আছে। ক—ক, ইহার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা করিলে আমরা তাহাকে বাতুল মনে করি এই সম্বন্ধে যদি একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে আমরা জানিতে পারি কি জন্য এখানে আর 'কেন' খাটে না। যাঁহারা বলেন যে অনেক 'কেন' আছে যাহার কোন উত্তর মানুষ দিতে পারে না, অথবা কোন 'কেন'রই উত্তর আমরা দিতে পারি না. তাঁহারাও স্বীকার করেন এমন অনেক স্থল আছে, যেখানে যে কেবল 'কেন'র কোন উত্তর আমরা দিতে পারি না তা নয়, অধিকন্তু সেখানে 'কেন'র কোন মানে নাই। কেন সেখানে অসঙ্গত প্রশ্ন (irrelevent)। তবে এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, কোথায় 'কেন' অসঙ্গত; কোথায় আর আমরা কেন জিজ্ঞাসা করি না। আমরা প্রথমে আমাদের উত্তরটি দিব, তারপর সে উত্তরটি ব্যাখ্যা করিব। উত্তর এই যে, যে সকল স্থানে জ্ঞান গত সম্বন্ধ দেখিতে পাই সেখানে 'কেন'র আর কেন নাই।

জ্ঞানগত সম্বন্ধ বলিলে কি বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের একটু দার্শনিক জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—জ্ঞানের ভিত্তি সম্বন্ধে একটু বিচার করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে এক স্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, জ্ঞানের অর্থ শেষ দাঁড়ায়, সম্বন্ধ। কোন একটা জিনিষকে জানিতে হইলে তাহার সহিত সম্বন্ধ অপর অনেক জিনিষকে জানা দরকার। এই যে একটি বৃক্ষ আমার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহার জ্ঞানকে যদি বিশ্লেষণ আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে দেখিব তাহা কতকগুলি সম্বন্ধ শ্রেণী (relation) ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রথমতঃ বৃক্ষটির দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি বুঝিতে হইলে, অপরাপর বৃক্ষের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতি বোঝা দরকার। বিস্তৃতি অনন্ত। এক হাত বলিয়া একটা প্রাকৃতিক মাপ নাই। যখন বলি একটা গাছ ১০ হাত, তখন এই বুঝায় যে, আর একটা জিনিষ, যাকে আমি ১ হাত বলিতে সম্মত হইয়াছি, এ গাছটি তার ১০ গুণ। বৃক্ষটির অবশ্য একটা রং আছে, সে রংটির জ্ঞানের পক্ষে, অন্য রঙের জ্ঞানের প্রয়োজন। এইরূপে বৃক্ষটির প্রত্যেক গুণকে জানিবার পক্ষে তাহার সহিত সম্বন্ধ অপর অনেক জিনিষের জ্ঞান আবশ্যক।

এইভাবে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের সকল জ্ঞানের মূলে দুই প্রকার সম্বন্ধ আছে। কোন ভাববিশেষের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে, এ ভাবটি আর একটি ভাবের মত, দ্বিতীয়তঃ এটি আর একটি ভাবের বিরুদ্ধ। এই সমীকরণ এবং বিভিন্নীকরণ (identity and difference) জ্ঞানের মূল। এই যে দুই প্রকার ক্রিয়া, ইহাদের সম্বন্ধে 'কেন' খাটে না। এখানে 'কেন' এবং 'কেমন' এক। জ্ঞানের অর্থই এই দুই ক্রিয়া, এবং জ্ঞান নিজের আলোকেই নিজে প্রকাশিত। ইহাদের 'কেন' বুঝিতে হইলে ইহাদেরই সাহায্যে বুঝিতে হইবে। সমীকরণের অর্থ বুঝিতে হইলে সমীকরণ এবং বিভিন্নীকরণের সাহায্যেই বুঝিতে হইবে। সমীকরণ কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে হইলে, সমীকরণ কিসের মত আর কিসের মত নয়, তাহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞানকে বুঝিতে হইলে জ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন। অথবা জ্ঞান নিজেই নিজেকে বুঝায়, তাহার 'কেন'র উত্তর সে নিজে। এখন দেখা যাউক যে পূর্ব্বোক্ত দুই

প্রকার ক্রিয়া ব্যতীত জ্ঞানের অপর কোন ক্রিয়া আছে কি না। আমরা পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে ইহা বলিয়াছি জ্ঞানের ক্রিয়া অসংখ্য।—মিলপ্রমুখ ইংলণ্ডীয় দার্শনিকগণ যদিও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ক্রিয়াতেই জ্ঞানের জীবন দেখেন, তথাপি আমরা সে প্রস্তাবে বলিয়াছি যে জর্ম্মান দার্শনিকগণকে অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে জ্ঞানের সম্বন্ধ অসংখ্য। এই অসংখ্য সম্বন্ধরাজির বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত মূল সম্বন্ধ দুইটি বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা খাটে। ইহারাও স্বীয় আলোকেই প্রকাশিত। ইহাদেরও 'কেন' নাই। ইহাদের বোঝা অর্থেও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বোঝা ব্যতীত আর কিছু নয়। পূর্ব্বোক্ত মূল দুই সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্য্য কারণ, বিষয় বিষয়ী প্রভৃতি সকল প্রকার সম্বন্ধগুলিই জ্ঞানের জীবন এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধেই পরস্পরকে বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানের সমগ্র জীবন সম্বন্ধেই এ কথা খাটে যে, জ্ঞান সম্বন্ধের 'কেন'র উত্তর জ্ঞান। এখানে যে 'কেন'র উত্তর নাই, তা নয়, তবে এখানে আর কেন জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। কেন জিজ্ঞাসার কোন সঙ্গতি নাই। কোন একটি বিশেষ জ্ঞানক্রিয়াকে বুঝিতে হইলে তাহাকে জ্ঞানের অপরাপর ক্রিয়ার সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে, এবং সেই পরস্পরের সম্বন্ধ জানিলে আর কিছু জানিবার থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি সাধারণ পাঠকের পক্ষে তত বোধগম্য হইল কি না, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তাই সেই জন্য আমি কথাটা আর এক ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কেন-বিরোধীগণের মধ্যে আমি শেষে এক দলের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের মতের সহিত তুলনা করিলে আমাদের কথাটা অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। তাঁহারা বলেন জ্ঞানের মূল স্বরূপ এমন কতকগুলি সত্য আছে যাহাদের সম্বন্ধে 'কেন' প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্ত তাহাদের 'কেন'র উত্তর নাই। আমরা বলি যে, হাঁ, জ্ঞানের মূল স্বরূপ কতকগুলি সম্বন্ধ ক্রিয়া আছে, যাহারা জ্ঞান হইতে বিভিন্ন নয়, বস্তুতঃ তাহাদের লইয়াই জ্ঞান এবং এই সম্বন্ধ সকলের 'কেন'র উত্তর তাহারা নিজে। 'কেন'-বিরোধী বলেন, জগত আছে ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য. ইহার কোন কারণ দেওয়া যায় না। আমরা বলি এ বিশ্বাসেরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন; এবং সে ব্যাখ্যার অর্থ জ্ঞানের অন্যান্য ক্রিয়ার সহিত ইহার

সম্বন্ধ প্রদর্শন। যাহা হউক, মোটের উপর আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, জ্ঞান (reason) নিজে নিজের ব্যাখ্যা। সে স্বপ্রকাশ। যখন কোন সম্বন্ধকে আমরা এই জ্ঞানের সম্বন্ধ বলিয়া জানিতে পারি, তখনই আমাদের কারণ জিজ্ঞাসাবৃত্তি সন্তুপ্ত হয়।

এতক্ষণ আমরা কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞানের দিক হইতেই কথা গুলা বলিয়াছি। এখন কিন্তু আর এক দিকে দৃষ্টি করা প্রয়োজন হইতেছে। এ কথা ঠিক যে, জগত কেবল আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে না, তুমি আমি থাকি আর না থাকি, জগৎ থাকিবে এবং তাহার অন্তঃস্থিত সম্বন্ধ সকলও থাকিবে। যে সকল সম্বন্ধের কথা আমরা এতক্ষণ বুঝিতে ছিলাম, আর এক ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারি, যে সে গুলি কেবল আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের সৃষ্টি নয়। সেই সকল সম্বন্ধ স্বয় জগতের মধ্যেও আছে। একটা জিনিস যে আর একটা জিনিসের মত, এ কেবল আমরা এইরূপ ভাবি বলিয়াই নয়, সে জিনিষ দুইটার মধ্যে বস্তুতই সেইরূপ সম্বন্ধ আছে। অথবা আমরা কেবল জগতস্থিত জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করি মাত্র। অতি প্রাচীন কাল হইতে একটা কথা চলিয়া আসিতেছে যে, like can only know the like—কথাটা নানাদিক হইতে নানা ভাবে আক্রান্ত হইলেও মূলে সত্য। জগতকে যে আমরা জানি, যত অল্পই জানি না কেন, এ যে বিন্দু পরিমাণেও জ্ঞানের সহিত মিলিতে পারে, তাহার অর্থ এই যে জগতের মূলে জ্ঞান আছে। এই জন্য বলা হইয়াছে, 'the understanding which conceiveth nature also maketh nature.'

এইবার আমরা আমাদের সেই গোড়ার প্রশ্ন বুঝিতে পারিব। যাঁহারা বলেন যে 'কেন'র উত্তর আছে, তাঁহাদের কথার শেষ অর্থ এই দাঁড়ায় যে, জগতের মূলে জ্ঞান বিরাজমান। আর যাঁহারা বলেন 'কেন'র উত্তর নাই তাঁহাদের কথার শেষ অর্থ এই যে জগতের মূলে জ্ঞান নাই। যিনি যে পরিমাণে জগতের ঘটনাশৃঙ্খলের মধ্যে জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পান, তিনি সেই পরিমাণে জগতকে বোঝেন, সেই পরিমাণে তাঁহার 'কেন'-তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হয়।

অবশ্য যাঁহারা বলেন যে আমাদের সকল 'কেন'র উত্তর আছে, তাঁহারা এ কথা বলেন না যে সকল কথারই 'কেন' তাঁহারা জানেন। তাঁহারা বলেন উপযুক্ত অবস্থায় সকল কথাই জানা যায়—জগতে একেবারে অজ্ঞেয় (absolutely unknowable) কিছুই নাই। জগতের সকল স্থলে জ্ঞান তত পরিস্ফুট না হইতে পারে ; নানা স্থানে জ্ঞানের বিকাশের পরিমাণ নানা প্রকার, কিন্তু জগতে এমন কিছুই নাই যাহাতে একবারে জ্ঞান নাই। যেখানে যে পরিমাণে প্রাকৃতিক বিকাশ সেখানে সেই পরিমাণ জ্ঞানজীবন পুরুষের বিকাশ। আমাদের 'কেন' জিজ্ঞাসার শেষ নাই, এই জন্য যে, জগতের মূলস্থিত জ্ঞানের সব আমরা একেবারে পুনরাবৃত্তি করিতে পারি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য, আমাদের সকল জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ এক মহাজ্ঞান জগতের আধারস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার জীবনে 'কেন' আর 'কেমনের' বিবাদ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। জ্ঞানের ক্রিয়াই সৃষ্টি ক্রিয়া।

বিপরীতবাদীদিগের কথা সম্বন্ধে অনেক বলিবার আছে, বারান্তরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

দ্রব্য-গুণ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আকনাদি।

অন্যনাম—পাঠা, আকন্দে, নিমুকো। লতা বিশেষ। ইহার পাতা গোল, পুষ্প কঠিন, ফল ক্ষুদ্র, গুচ্ছাকৃতি। ইহা তিক্ত, গুরু, উষ্ণ। মূত্রকর বলকারক, ঈষৎ রেচক। বাত, পিত্তজ্বর, শূল, বমন, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষদোষ, কৃমি, গুল্ম ও ব্রণাদি রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল বাটিয়া গোঘৃত সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার

সমালোচনা।

মিত্র বিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী—৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিরচিত। রাজকৃষ্ণ বাবু স্বর্গধামে গিয়াছেন; কিন্তু তিনি মর্ত্তলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন নাই। অনেকের সহিত তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছেন। তিনি মরিয়া স্বর্গে মর্ত্তে একসূত্রতা স্থাপন করিয়াছেন। সাবিত্রী লাইব্রেরী সেই সূত্রের একটী অংশ। লাইব্রেরী স্থাপনাবধি তিনি ইহার সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। লাইব্রেরীর প্রত্যেক কার্য্যে প্রগাঢ় সহানুভূতি, পরম যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা—লাইব্রেরীর সভ্যগণ—তাঁহার ঋণ কি কখনও পরিশোধ করিতে পারিব? আমরা যাবজ্জীবন তাঁহাকে স্মরণ-মন্দিরে পূজা করিয়া তাঁহার অশেষ গুণগান—বাঙ্গালীর জন্য, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য, দেশের জন্য তিনি কতদূর করিয়াছেন, তাহাই প্রদর্শন করিয়া তাঁহার ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিব। সেই জন্যই আমরা একে একে তাঁহার পুস্তকগুলির সমালোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। প্রথমে "মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলীর" সমালোচনা করিলাম।

রাজকৃষ্ণবাবু কিরূপ সরলহৃদয়, কিরূপ অমায়িক, কিরূপ স্নেহশীল লোক ছিলেন, মিত্রবিলাপে তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে প্রকৃত বন্ধু মিলা বড় কঠিন; প্রকৃত বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা। যে বন্ধুর জন্য তিনি এরূপ বিলাপ করিয়াছেন, সে বন্ধু এক জন ভাগ্যবান্ লোক ছিলেন, সন্দেহ নাই।

তিনি মিত্র সহবাসে যে যে সময় অতিবাহিত করিতেন, যে সব স্থানে ভ্রমণ করিতেন, মিত্রের সহিত যেখানে একত্র অবস্থান করিতেন, সেই সেই সময়, স্থান ও অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি কাঁদিয়াছেন। এক এক সময়ে যেন হৃদয়ের শোণিত উচ্ছ্বসিত হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইয়াছে।

মিত্র বিলাপ ব্যতীত ইহাতে "বৌদ্ধদেবের সংসার ত্যাগ" "নিশাকালে বিহঙ্গমরব" প্রভৃতি চৌদ্দটি অন্যান্য কবিতা আছে। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, মিত্র-বিলাপের সহিত এ কবিতাগুলির কি সম্বন্ধ? কিন্তু পুস্তক পাঠে তাঁহাদের ভ্রম দূর হইবে। তাঁহারা দেখিবেন, এই সকল কবিতার প্রত্যেকটীতে হৃদয়ের গভীর দুঃখ অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, প্রতি কবিতায় বিষাদের কালিমা-ছায়া পড়িয়াছে। কবিতাগুলি সুন্দরভাবে মিশ্ খাইয়াছে, কবি বেতালা নহেন।

পুস্তকের কবিতাগুলি অনেক প্রকার ছন্দে লিখিত। বর্ণনা অতি সুন্দর ও মনোহর; প্রায় সমস্ত কবিতা ললিত ও প্রাঞ্জল।

আমরা যে সংস্করণ সমালোচনা করিতেছি, তাহা ৪র্থ সংস্করণ, ১২৮১ সালে মুদ্রিত। আশা করি, এই বারো বৎসরে ইহার তিন চারি বার সংস্করণ হইয়াছে। এ পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিলক্ষণ উপযোগী। ছাত্রগণ ইহাতে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট নীতিশিক্ষা ও বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করিবেন। বিবিধ ছন্দে লিখিত এরূপ উত্তম কবিতাপুস্তক তাহাদের কবিতা রচনা শিক্ষাপক্ষে অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমাদের বিশ্বাস, স্কুল-বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়গণ নানাস্থানের বিদ্যালয়ে পাঠার্থে এ পুস্তক মনোনীত করিয়া থাকেন, এবং বরাবর করিবেন। যুবক ও প্রৌঢ়গণও এ পুস্তক পাঠে অল্প আমোদ ও শিক্ষা পাইবেন না।

উপহার। শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। এখানি কবিতা-পুস্তক। সকল গুলিই গীতি-কবিতা। বাঙ্গালায় গীতি-কবিতার আদর আজ কাল বাড়িয়াছে। আদর বাড়া উচিত। কিন্তু অনেকে এ ঔচিত্য স্বীকার করেন না। Subjective Poetry ও Objective Poetry লইয়া আজ কাল একটা দলাদলির মহা ঘোঁট চলিয়াছে। সেই দলাদলিতে মাতিয়া আপনার মত বজায় করিবার জন্য কোন কোন সমালোচকশ্রেষ্ঠ লেখকচূড়ামণি Shelleyকে Byronএর শ্রেষ্ঠ বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। অথচ শেলি যে বায়রণ হইতে কত ভিন্ন প্রকৃতির—কত উচ্চদরের—তাহা সেই দুই কবির স্বদেশীয়গণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু, সে সব অনেক কথা।

এ ক্ষুদ্র পুস্তকের সমালোচনায় তাহার উল্লেখে কাজ নাই। তাহা অনাবশ্যক। বলিতেছিলাম, গীতিকবিতার আদর আজ কাল বাড়িয়াছে। লব্ধনামা, অলব্ধনামা অনেক কবিই আজ কাল বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ চিরপ্রিয় সেই ঝিঁঝিট খাম্বাজে আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বেহাগের পিটপিটি বা তন্তোদিক দীপকের কসরত্ বাঙ্গালীর ক্ষীণকণ্ঠে আসে না। বুঝি চেষ্টা করিলেও ভাল শুনায় না। নগেন্দ্রবাবু একজন অলব্ধনামা কবি; ইঁহার এ "উপহার" গীতি-কবিতায় রচিত। উৎসর্গ পত্রে বলিয়াছেন—

> "সংসারের পথে পথে চলিতে চলিতে ভাই,
> মাঝে মাঝে যে গান গেয়েছি,
> লয়ে গোটাকত তার গেঁথে একখানা পাতে,
> উপহার তোমাকে দিতেছি।"

গীতি-কবিতা লিখিবার নগেন্দ্রবাবুর ক্ষমতা আছে। কিন্তু আজও পারদর্শী হন নাই। পুস্তকের মলাটেই তিনি যে Thomas Wyatt হইতে তুলিয়াছেন –

> "Blame not my Lute! for he must sound
> Of this or that as liketh me."—

ইত্যাদি—তাহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য, তাঁহার লেখার নিন্দা করি না বটে, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর অতটা অনুকরণ না করিলে ভাল হইত। তাঁহার একটু ক্ষমতা আছে, তিনি না করিয়া পারিতেন। অতি ছোট ছোট কথায় বেশ সুন্দর সুন্দর ভাব বর্ণনা করিতে তিনি সক্ষম।

বিমুক্ত বেণীবন্ধন নাটক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য আট আনা। বোধ করি পুস্তকখানি সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক অবলম্বনে রচিত। বেণীসংহার নাটক মহাভারতের অংশ বিশেষ লইয়া লিখিত। যুধিষ্ঠির পঞ্চগ্রাম চাহিয়া দুর্য্যোধনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সন্ধি প্রস্তাব করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে যাত্রা করিলেন। এই স্থান হইতে নাটক আরম্ভ। মহাভারতে লিখিত আছে, বিরাটরাজ্যে থাকিয়া পঞ্চপাণ্ডব শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনায় পাঠাইয়াছিলেন, এবং সেই স্থলে দ্রুপদীর রাজন্যবর্গের

সহিত সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিবর ভট্টনারায়ণ এবং আমাদের আলোচ্য নাটককার উভয়েই সেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিরুদ্ধ কায করিয়াছেন। একজন হস্তিনায় আর একজন ইন্দ্রপ্রস্থে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। যে দুর্য্যোধনের নিকট পাঁচ খানি গ্রাম ভিক্ষা চাহিয়া সন্ধি প্রস্তাব করিতে শ্রীকৃষ্ণকে প্রেরণ করা হইয়াছে, প্রস্তাবের ফলাফল জানিবার পূর্ব্বে আপনাদের প্রাপ্য বিষয় স্থির না হইতেই পাণ্ডবগণ সেই হস্তিনাপুরে দুর্য্যোধনের রাজধানীতে আসিবেন, ইহা বড় যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল না। ইন্দ্রপ্রস্থের ত কথাই নাই। প্রার্থিত পঞ্চখানি গ্রামের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ এক খানি। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে তাহা যুধিষ্ঠিরের মত ব্যক্তির দখল করিয়া বসিয়া থাকা কিরূপে সম্ভবে বুঝিতে পারিলাম না।

ষ্টার থিয়েটরে যে "সীতাহরণ" নাটক অভিনীত হয়, তাহার সীতাকে যখন রাবণ হরণ করিতে আসে, তখন সে সীতা প্রথমতঃ মূর্চ্ছিত এবং মূর্চ্ছান্তে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ক্রন্দন করিলেন না, তিনি রাবণের সহিত এক প্রকার মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির শ্রাদ্ধ এই খানেই হইল। বিযুক্ত বেণীবন্ধন প্রণেতাও দ্রৌপদীকে স্থানে স্থানে আজ কালকার বঙ্গীয় ললনাগণের ন্যায় উদ্ধতা ও প্রগল্‌ভা করিয়াছেন। মহাভারতে বনপর্ব্বে যে দ্রৌপদী কাম্যবনের কুটীরে বসিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম বুঝাইয়া দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন এবং কথোপকথনকালে প্রকৃত পতি-অনুগতা ভার্য্যার মত কত বিনয়ে, কত নম্রতার সহিত সেই সব কথা বলিতেছেন, নগেন্দ্র বাবু সেই দ্রৌপদীর মুখ হইতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি যেরূপ তীব্র শ্লেষোক্তি সকল উচ্চারণ করাইয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, পূর্ব্ব কালের মহাকবিগণ যাহা করিয়াছেন অবিকল সেই ভাবেই লিখিতে হইবে। মহাকবি ভবভূতি মূল বৃত্তান্ত মাত্র রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়া নূতন ভাবে উত্তর চরিত নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার 'ছায়া'' সংস্কৃত সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কিন্তু এরূপ সৃষ্টি কৌশল কয় জন বঙ্গীয় কবি দেখাইতে পারিয়াছেন?

নাটকের একটী গুণ, ক্রিয়া সকলের পারম্পর্য্য। কিন্তু এ পুস্তকে স্থানে স্থানে তাহারও অন্যথাচরণ দৃষ্ট হয়। সুভার হরণের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করিতে নারায়ণকে পৃথিবীর স্তব অপ্রামাণিক হইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, লেখক কেন ইচ্ছা পূর্ব্বক এ দোষ করিয়াছেন। আজ কালকার থিয়েটরগুলিতে আশ্চর্য্য মনোহর দৃশ্যপট দেখাইবার লোভ অতিশয় প্রবল হইয়াছে। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে কোন উপায়ে ইহা প্রদর্শিত হয়। গ্রন্থকার সাময়িক রুচির অধীন হইয়া বহু পূর্ব্বের ঘটনার বর্ণন করিয়া বসিয়াছেন।

প্রধান ঘটনার মধ্যে কর্ণের যুদ্ধ কাণ্ড ও দুঃশাসন বধ। এখানেও এক ঐতিহাসিক ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। দুঃশাসন কর্ণের পূর্ব্বে হত হইয়াছিল, কর্ণের পরে নহে। বেণীসংহারং নাটকে মহাভারতের কথাই আছে। এ পুস্তকে সে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ দেখিলাম।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের অবলম্বিত যে ভাঙ্গা ছন্দের অনুকরণ করিয়াছেন, আমরা নাটকের সে ভাষার পক্ষপাতী নহি। সাহিত্যের উন্নতি পক্ষে ইহা উপযোগী নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এরূপ ভাষায় লিখিতে গিয়া গিরিশ বাবু যে সকল দোষে পতিত হইয়াছেন, নগেন্দ্রবাবুও সে সব দোষের হাত হইতে একবারে অব্যাহতি পান নাই। তথাপি তিনি স্থানে স্থানে যেরূপ উৎকৃষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করি। দুই একটী ছাড়া, গানগুলি বেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মরত্নম্। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘটক (বিদ্যালঙ্কার) কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। হিন্দুধর্ম্ম আগাধ সমুদ্র, সেই সমুদ্রগর্ভে কত যে অমূল্য রত্ন লোকনয়নের অগোচরে অদৃশ্যভাবে নিহিত রহিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? যিনি বাছিয়া বাছিয়া সেই রত্নগুলির উদ্ধার করিয়া ডালি সাজাইয়া সাধারণে উপহার দিতে পারেন তিনি অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। ইংরাজি উচ্চশিক্ষার ধাঁধায় বাঙ্গালী আপনার চক্ষের মাথা খাইয়াছে—এক দিনে, একটী কারণে তাহার এ অধঃপতন ঘটে নাই—এ সময়ে যিনি তাহার আপনার রত্নগুলি তাহাকে চিনাইয়া দিতে পারেন, তিনি অবশ্যই প্রশংসার পাত্র। আমরা

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সাধু উদ্যমের প্রশংসা করি। নানা শাস্ত্র হইতে তিনি এই গ্রন্থ সংকলন করিতেছেন। প্রথম খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অন্নাচার ও বর্ণবিবেচনা—এই দুইটী বিষয় লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। বিষয় দুটী অতি গুরুতর, আজিকার দিনে ইহার শাস্ত্রোক্ত মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যার বড়ই প্রয়োজন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রথমতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া নিয়ে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছেন। অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটু আলোচনা ও ব্যাখ্যা থাকিলে আরও ভাল হইত। এ যুক্তি ও তর্কের দিনে কেবল অনুবাদে ততটা কাজ না হইতে পারে।

সধবা দিদি। শ্রীহরিমোহন বসু দ্বারা প্রণীত। এখানি উপন্যাস। কিন্তু উপন্যাসের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, এখানিতে তাহার অনেক অভাব। তবে, গল্পাংশে মন্দ নহে। উপকথা ও উপন্যাস এ দুইয়ের অর্থ আজকাল আমাদের দেশে এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গালার উপন্যাস-লেখক আজকাল অধিকাংশই এই ভ্রমাক্রান্ত। তাঁহারা লেখেন উপকথা, নাম দেন উপন্যাস। এতদুভয়ের ভিন্নার্থতা বোঝা সকলের উচিত। কিন্তু যখন এটা সাধারণ ভ্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন একা হরিমোহন বাবুকে লইয়া পীড়াপীড়ি করা কর্ত্তব্য নহে। হরিমোহন বাবু নিজে পাতিয়ালা কলেজের হেড মাষ্টার, তিনি আঁকিয়াছেন একজন হেডমাষ্টারের চিত্র; সুতরাং তাহা যথোপযুক্ত বর্ণফলিত হওয়াই সম্ভব। হইয়াছে বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার গ্রন্থের নায়ক ব্রাহ্ম “মাষ্টার বাবু” রবীন্দ্রনাথ, মাষ্টার কুলের কলঙ্ক। এরূপ ভণ্ড ব্রাহ্ম ও শিক্ষককুলগ্লানির চরিত্রের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি। বাস্তবিক, দীননাথ বাবুর ন্যায় যে সকল অদূরদর্শী সরলহৃদয় গৃহস্থ আপনাদিগের পরিবার মধ্যে এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল শিক্ষকদিগকে আশ্রয় দেন, তাঁহাদের সতর্ক হওয়া আবশ্যক। হরিমোহন বাবুর গল্পটী বেশ হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে চরিত্রবিন্যাসের পারিপাট্য নাই, ঘটনার শৃঙ্খলা নাই, বর্ণনায় জমজমাট নাই, লেখার কায়দা নাই। নহিলে, পুস্তকখানি এতদিন আদর লাভ করিতে

শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা।*

ইহা এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ। গ্রন্থকার উপক্রমণিকায় বলিতেছেন, "শ্রীমদ্ভাগবতের সারগ্রাহী অনুবাদ করিবার জন্য আমার নিতান্ত বাসনা ছিল; কিন্তু এবম্বিধ বিপুল গ্রন্থের অনুবাদ করণে আমার অবকাশ নাই। তজ্জন্য সম্প্রতি ঐ গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক প্রয়োজনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা গ্রন্থ রূপে সংগ্রহ করিলাম।" অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ সংহিতাকে এক অর্থে সারগ্রাহী বা আধ্যাত্মিক ভাগবত বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মেরও আনুষঙ্গিক বিচার করা হইয়াছে। এবং সর্ব্বশেষে কেদার বাবু উপক্রমণিকা ও উপসংহারে মধ্যে মধ্যে "প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে যুক্তিস্রোত যোগ করিয়াছেন।" গ্রন্থের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন "সম্প্রতি অস্মদ্দেশীয় অনেকে বিদেশীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাৎপর্য্য অন্বেষণ করেন। * * * যদি (ইহাঁদিগের) শাস্ত্রবিচার জন্য কোন গ্রন্থ থাকিত, তাহা হইলে আর উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম, বৈধর্ম্ম ও ধর্ম্মান্তরের কল্পনারূপ বৃহদনর্থ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পাইত না। উপরোক্ত অভাব পরিপূরণ করাই এই শাস্ত্রের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সংহিতার) প্রধান উদ্দেশ্য।" যে গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন আছে, যাহাতে ভাগবতের সার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত আছে, যাহা পাঠ করিয়া বিধর্ম্মীরা সৎপথে আসিবে, সে গ্রন্থ যে অতি উপাদেয় হইবে, ইহা নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার ধর্ম্মশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী, তাঁহার রচনাও প্রাঞ্জল। তিনি যেরূপ সহজে কঠিন কঠিন বিষয় সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। দেখুন তিনি লিখিতেছেন,

'বয়স্ত সংশয়ং ত্যক্ত্বা পশ্যামস্তত্ত্বমুত্তমং।
বৃন্দাবনান্তরে রম্যো শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌষ্ঠবং॥

* শ্রীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত।

নরভাব স্বরূপোঽয়ং চিত্তত্ত্বপ্রতিপোষকঃ।
স্নিগ্ধশ্যামাত্মকো বর্ণঃ সর্ব্বানন্দবিবর্দ্ধকঃ॥
ত্রিতত্ত্বভঙ্গিমাযুক্তো রাজীবনয়নান্বিতঃ।
শিখিপুচ্ছধরঃ শ্রীমান্ বনমালাবিভূষিতঃ॥
পীতাম্বরঃ সুবেশাঢ্যঃ বংশীন্যস্তমুখাম্বুজঃ।
যমুনাপুলিনে রম্যে কদম্বতলমাশ্রিতঃ॥”

হয়ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এইরূপ সংস্কৃতকে সংস্কৃতই বলিবেন না; তাঁহারা হয়ত ইহাকে বিভক্তিবিশিষ্ট বাঙ্গালা বলিবেন; কিন্তু অনেক পুরাণের ভাষা এইরূপ সহজ; এবং যাঁহারা অল্প সংস্কৃত জানেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অতি উপাদেয়। বিশেষতঃ কেদার বাবু বিষয়ী লোক হইয়া এবং সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও এইরূপ সংস্কৃত রচনা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প শ্লাঘা বা গৌরবের বিষয় নহে। আমরা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসা করিলাম; গ্রন্থের রচনা-কৌশলের প্রশংসা করিলাম; গ্রন্থকর্ত্তার বিদ্যাবত্তা, ধর্ম্মানুশীলন, প্রভৃতির প্রশংসা করিলাম। কিন্তু এখনও আমাদের সমালোচনা ফুরায় নাই। এই গ্রন্থ প্রচারে ধর্ম্ম জগতের, বিশেষতঃ অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মালোচনার কি পরিমাণে উপকার বা অপকার হইবে, এক্ষণে আমরা তদ্বিষয়ক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবেরাই প্রধানতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রণালী সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী। তাঁহারা প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় (পয়ারে) নিজের বক্তব্যটী প্রকাশ করেন, পরে শাস্ত্রোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ঐ বক্তব্যের সমর্থন করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চৈতন্য-চরিতামৃতের এক অংশ ধরুন।

“কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধকামী সকলি অশান্ত॥

তথাহি ভাগবতে

‘মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটীষপি মহামুনে॥”

এই প্রণালীতে পাঠকদিগের বিলক্ষণ লাভ হয়। কথাটা ভাল করিয়া বুঝা গেল; এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ থাকাতে কথাটীর উপর আস্থা ও বিশ্বাসও জন্মিল। এবং এই শ্লোকের পরেই পুনরায় যুক্তি, উপমা প্রভৃতি দ্বারা কথাটীকে আরও দৃঢ় করা হইয়াছে। যাঁহারা যুক্তি চান, তাঁহারা যুক্তি পাইলেন; যাঁহারা প্রমাণ চান, তাঁহারা প্রমাণ পাইলেন; কাহারও মনে কোন রূপ অভাব রহিল না। কেদার বাবু এই প্রণালী অবলম্বন না করাতে তাঁহার পুস্তকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পুস্তকের অতি অল্প স্থলেই প্রমাণ প্রয়োগের কথা আছে। সংস্কৃতে সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্ কোন্‌টী বা গ্রন্থকর্ত্তার ও কোন্ কোনটী বা পুরাণকর্ত্তার তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সুতরাং কেদার বাবুর সৎসিদ্ধান্ত ও অসৎসিদ্ধান্ত উভয়ের উপরেই পাঠকের সন্দেহ হয়। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত শ্লোক লিখিতেই কেদার বাবুর সময় কাটিয়া গিয়াছে। তিনি কোন কোন স্থলে যুক্তির অবতারণা মাত্র করিয়াছেন। সময় ও স্থান অভাবে যুক্তিগুলি সুন্দররূপে বিকশিত হইতে পায় নাই। পুস্তক খানি হইতে যে পরিমাণে উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, প্রণালীর দোষে সে উপকারটী প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না।

উপক্রমণিকায় কেদার বাবু অনেক গুলি ভ্রমাত্মক মতের অবতারণা করিয়াছেন। সেই সমস্ত মতের দ্বারা ধর্ম্মজগতের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমরা কয়েকটী মতের উল্লেখ করিতেছি।

ক। তিনি পঞ্চবিধ হিন্দু সম্প্রদায়ের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন, এবং অনেকে মর্ম্মপীড়িতও হইবেন। তাঁহার মতে,

শাক্ত—নিষ্ক্রিয় জড়ের উপাসক।

সৌর—সোত্তাপ অতএব সক্রিয় জড়ের উপাসক।

গাণপত্য—পশুচৈতন্য অথবা অধিকতর চৈতন্যময় পশুর উপাসক।

শৈব—নরচৈতন্য অথবা অধিকতর চৈতন্যময় নরের উপাসক।

বৈষ্ণব—পূর্ণচৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসক।

ইংরাজী করিয়া প্রকাশ করিলে কেদার বাবুর অভিপ্রায় আরও সুস্পষ্ট-

রূপে বুঝা যাইবে। মনুষ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতির অবস্থা পঞ্চপ্রকার।

মনুষ্যের প্রথম অবস্থার ধর্ম্ম Fetish Worship (শাক্ত)
মনুষ্যের দ্বিতীয় অবস্থার ধর্ম্ম Elemental Worship (সৌর)
মনুষ্যের তৃতীয় অবস্থার ধর্ম্ম Animal Worship (গাণপত্য)
মনুষ্যের চতুর্থ অবস্থার ধর্ম্ম Human Worship (শৈব)
মনুষ্যের পঞ্চম অবস্থার ধর্ম্ম Divine Worship (বৈষ্ণব)

আমাদের দেশে শাক্ত ও শৈব অনেক আছেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাখ্যাকে "সারগ্রাহী" ব্যাখ্যা বলিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। কেদার বাবু যাহাই বলুন, যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা শক্তিকে চিন্ময়ী ও ত্রিগুণাতীতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা যে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের ন্যায়, আমাদের দেশের হাড়ি ডোম প্রভৃতির ন্যায় "Stocks, Stones" লোষ্ট্র কাষ্ঠ পূজা করেন, ইহা তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। যাঁহারা শৈব, তাঁহারা যে তিব্বতবাসী প্রভৃতিদিগের ন্যায় কেবল নরপূজা করেন, ইহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয়, যে কেদার বাবু সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের অবমাননা করিয়া ও সমস্ত হিন্দু পদ্ধতির উপর পদাঘাত করিয়া এই অদ্ভুত মতের প্রচার করিয়াছেন। কোথায় দেবাদিদেব মহাদেব, আর কোথায় লামা প্রভৃতির ন্যায় প্রাকৃত মনুষ্য? কোথায় গণপতি হেরম্ব, আর কোথায় বর্ম্মাদেশীয় শ্বেতহস্তী? কোথায় ত্রিনয়না জগৎকর্ত্রী অম্বিকা, আর কোথায় ক্রিয়াবিহীন, চৈতন্যবিহীন, হাড়ি ডোম প্রভৃতির আরাধ্য জড়পিণ্ড? এ সকলে যিনি সমান বলিয়া মনে করেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের সার অংশ কেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশেরই তাৎপর্য্য গ্রহণে কৃতকার্য্য হন নাই। ভারতচন্দ্র হরিহরের অভেদত্ব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কেদার বাবু তাহা হইতে সারগ্রাহী অনেক কথা প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

"নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্বরজতমোগুণ প্রকৃতি তাঁহার॥

* * * *

সত্ব রজঃ প্রভাব জগৎ বিনা নয়।

তমোর প্রভাব দেখ চিরকাল রয় ॥

*　*　*　*

তমোগুণে প্রচার কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম ॥
রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে ॥
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ॥
তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয় ॥"

খ। কেদার বাবু যে শিবের দেবত্ব হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, এরূপ নহে। তাঁহার মতে শিব অনার্য্যদের একজন রাজা মাত্র। যে শিব বেদেও বীরভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া স্তম্ভিত হইতেন, যিনি রজতগিরির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, তিনি সাঁওতালের রাজা!! এই কি কেদার বাবুর সারগ্রাহিতার ফল? বরং হণ্টার সাহেব ভাল ছিল। সে তবু শিবকে অনার্য্যের দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

গ। কেদার বাবু শঙ্করাচার্য্যকেও অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেদার বাবু বলেন—"শঙ্করাচার্য্যের কার্য্য আলোচনা করিলে, ইহাঁকে পরশুরামের অবতার বলিয়া বোধ হয়। জন্মসম্বন্ধে ইহাঁর অনেক গোলযোগ ছিল। ইনি যেখানে বৌদ্ধদিগকে স্বদলভুক্ত করিতে না পারিতেন, সেখানে নাগা সন্ন্যাসীদল নিযুক্ত করিয়া খড়্গাদির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অবশেষে বেদান্তভাষ্য রচনাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড একত্র সম্মলিত করিয়া বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে একমত করিলেন।" কেদার বাবু সারগ্রাহী ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি কি করিয়া "বৌদ্ধদিগের জ্ঞানকাণ্ড" লিখিলেন তাহা বুঝিলাম না। কেন, ব্রাহ্মণদিগের কি জ্ঞানকাণ্ড ছিল না? ফলতঃ আমাদের বোধ হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখামাত্র। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা বুঝিত না, তাহারাই হিন্দুধর্ম্মের দুই একটী

মত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ হইত। পরে যখন শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের আমূল বিবরণ প্রচার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ভ্রম প্রতিপাদন করিলেন, তখন সকলেই ভ্রান্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিল। শঙ্করাচার্য্য তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ও নিতান্ত অহিন্দু না হইলে ধর্ম্মসংস্থাপক শঙ্করচার্য্যকে নিন্দা করা যায় না। কেদার বাবু সারগ্রাহী ভাগবত হইয়াও কিরূপে এই ঘোর নারকীয় দুষ্কার্য্য করিলেন, তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধির অতীত। কনকতক নাগা সন্ন্যাসী রাজা রাজাড়াকে বাহুযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল, ইহা হিন্দুবিদ্বেষী ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করিতে পারিবে না।

উপক্রমণিকায় কেদার বাবু যে পরিমাণে অহিন্দুত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সংহিতায় তিনি তদ্রূপ করেন নাই। তবে ইহাতেও খৃষ্টানি মত অনেক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দুই তিনটীর উল্লেখ করিতেছি।

১। অবতারবাদ। কেদার বাবু বলেন—"যখন জীব মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার। * * নরপশু ভাগবত জীবে তিনি নৃসিংহাবতার। ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র।" কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মৎস্য কূর্ম্ম নৃসিংহ প্রভৃতি সত্যযুগের অবতার। রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের অবতার। ইহাতে বরং ইহাই প্রমাণীত হয়, যে মনুষ্যের সভ্যাবস্থায় ভগবান্ কূর্ম্মাদি অবতার গ্রহণ করিয়া অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থায় রামাবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী Evolution মানিলে মনুষ্যের ক্রমোন্নতি বলিতে পারা যায়। কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি মানিলে মনুষ্যের ক্রমাবনতিই স্বীকার করিতে হয়।

২। কেদার বাবু বলেন যে, ঈশ্বর প্রেমলালসাবশতঃ জীবে স্বাধীনতা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা খ্রীষ্টানি মত। হিন্দুর ঈশ্বর আপ্তকাম, সুতরাং তাঁহার লালসা অসম্ভব। তিনি কি উদ্দেশ্যে মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বরং ইহাই বলা যায় যে, মনুষ্যের মধ্যে যে ঈশ্বরের অংশ আছে, সেই অংশের বলে ও গুণে মনুষ্য স্বাধীন।

বাহুল্য ভয়ে আমরা এখানেই উপসংহার করিতেছি। আমরা কেদার

বাবুর যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিলাম, তাহা বিদ্বেষবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া করি নাই। হিন্দুশাস্ত্রের নাম দিয়া হিন্দুর চিরবিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ করা নিতান্ত গর্হিত। আমরা সেই জন্যই পুস্তকস্থ দোষাবলীর এত দীর্ঘ উল্লেখ করিলাম। পুস্তকের যে যে অংশ চৈতন্য-চরিতামৃতের অনুযায়ী, তৎসমস্তের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার।

ভারতে ইংরেজাধিকার।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে আপনাদের অনেক সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে তাহারা রণনিপুণ বীরপুরুষ হইয়া উঠিবে, এ চিন্তা বা এ ধারণা প্রথমে ইংরাজের মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং ইংরাজেরা কখনও ইহা বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন না যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে সিপাহি সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনাদের অভীষ্ট কার্য্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী করিতে প্রবৃত্ত হন। ইংরাজেরা ফরাসীদিগের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্ত অনুসারে ভারতবর্ষীয়দিগকে আপনাদের সৈনিকদলে গ্রহণ করেন। এইরূপে ১৭৪৮ অব্দে দক্ষিণাপথে ইংরাজদিগের সিপাহি সৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়।

ভারতের এই সিপাহিসৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেজদিগের প্রধান সহায়। ইহাদের রণনৈপুণ্য, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন হইতেছে না। এক জন সদাশয় পুরুষ একদা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের নিকট ভারতবর্ষীয় সিপাহী-

দিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাহারা (সিপাহিগণ) যে, জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তিপূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্ত বোধ হইয়াছিল—আমাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষদলের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছে। তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন ভূপতিদিগের বিরুদ্ধে তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে।" বস্তুত, ব্রিটিশ সেনার সহিত ভারতবর্ষীয় সেনার তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানা বিষয়ে উভয়ে উভয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। এক জন বিদেশী প্রভুর দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মানুশাসনে সর্ব্বতোভাবে বিদেশীর ভৃত্যত্ব করে, অন্য জন তাহার স্বদেশী লোকের ও স্বদেশের কার্য্য সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে; এক জন অধিকাংশ সময়ে তাহার স্বজাতির, স্বধর্ম্মের ও স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়; অন্য জন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভুভক্তি, প্রভুদত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও প্রভুর সদাচরণে পরিবর্দ্ধিত হয়; অন্য জনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত পরিপুষ্ট হয় এবং আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বদা তাহার প্রভুর অনুগত ও তাহার প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থ ও সদাচারে যে প্রভুভক্তি ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময় প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। বহুবিধ কষ্ট বা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহি কখন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সিপাহি সর্ব্বপ্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমীহিত সাধনে উদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন অনিচ্ছা তাহাকে কর্ত্তব্য-পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধি-

নায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহি সর্ব্বদা প্রফুল্ল চিত্তে ও উৎসাহ সহকারে আপনার অবলম্বিত ধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধ ভাবে এই এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অম্লানভাবে তাহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহার সাধনা প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সহ্য গুণ অবনত হইয়া পড়ে না। সে বিপত্তি সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও আপনার যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রিটিশ সেনার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর হয়, ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্বিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সিপাহী সে স্থানেও অবাধে ও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপন করে এবং সে যুদ্ধের সময় আপনার বহু পরিশ্রমলব্ধ যৎসামান্য বেতনের অংশ দিয়া ইংরেজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতিপত্রে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তির চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার মহত্ত্ব, তাহার একপ্রাণতা, তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে। হিমালয়ের অযুত শৃঙ্গপাতেও তাহার গৌরবস্তম্ভ বিচূর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, এবং ভারতের মহাসাগরের সমগ্র বারিতে তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইয়া যাইবে না।

এই প্রভুভক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। এই প্রভুভক্ত সৈন্য প্রধানতঃ প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইংরেজদিগের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী, বিদেশী বিজাতির হস্তে আপনাদিগকে সমর্পণ করিতে কেন এত যত্ন করিয়াছে, আত্ম স্বাধীনতায় ঔদাসীন্য দেখাইয়া বিদেশী বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরূপ স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও জাতিপ্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সাহসে ও বীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। যখন মহাবীর সেকেন্দর সাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এসিয়ার আরবেরা একটি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী জাতি। স্বল্পকালে ইহাদের বিজয়-পতাকা মিসর, পারশ্য, স্পেন, তুরস্ক ও কাবুলে উড্ডীন হয়। কিন্তু আরবগণ এক শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষজয়ে সমর্থ হয় নাই। কাসেম সিন্ধুদেশ জয় করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই উহা আবার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। যাহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহারা পাঠান। পাঠানেরা আরবদিগের ন্যায় প্রতাপশালী বা সমৃদ্ধিশালী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয়। পৃথ্বীরাজের পর আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তায় অনাস্থা বা জাতীয়-জীবনের অবনতি। ধর্ম্ম-বিপ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিন্তাশীলতা প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহাদের বাহ্যসুখে অনাস্থা জন্মে। এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রপাত হয়। রাজা স্বদেশী কি বিদেশী হউন, তাঁহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানের রাজত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুতনা ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার গৌরব দেখাইতে পারে নাই।

যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানব জাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয়-গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের

পর আধিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একেবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের (ওক্) সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরোহিত (ড্রুইড্) গণের প্রাধান্য সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেকবার আপনাদের ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে, অনেক বংশ অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, মিবার আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, স্বতন্ত্রতা রক্ষায় ঔদাসীন্য দেখান নাই; মিবারের বীর-রমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই, মিবারের বীর-বালক জন্মভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই। ব্রিটিশভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

এই স্বাতন্ত্র্য-গৌরব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্য স্থানে এরূপ দৃশ্যের আবির্ভাব হয় নাই। স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার ন্যায় ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাবের আতিশয্য ছিল। বীর্য্যবন্ত আর্য্য পুরুষেরা যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক ভাব, দেখা যায় নাই। তাঁহারা তখন একতা-সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও ক্ষমতা বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার পরাক্রমে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে মিশিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। প্রতি মণ্ডলে ভিন্ন

জাতির, ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির, ভিন্ন ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন না। কোন সময়ে সমুদায় ভারত-বর্ষীয় পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হইল না, সুতরাং ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠার গৌরব দেখা গেল না। জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও বীরত্বে চির-প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আবার মুসলমানেরা যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া পড়ে, ভারতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অনুগত বা মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতের সৌভাগ্য-ক্রমে এই অনৈক্যের মধ্যেও একবার জাতি-প্রতিষ্ঠার অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতঃ-স্মরণীয় শিবজী আপনার মহামন্ত্র বলে একবার একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মহাজাতির পরাক্রমে বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুর পদানত হইয়াছিল। কিন্তু শিবজীর মৃত্যুর পর এই মহাজাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ড রাজ্যগুলি যখন স্ব স্ব প্রধান হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। তখন ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠার কোনও চিহ্ন ছিল না। তখন একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্তই অন্তর্ধান করিয়াছিল। দীর্ঘকাল বিদেশীর ও বিজাতির শাসনে থাকায় ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য-বোধ ছিল না। তখন দিগ্‌বিজয়ী মারহাট্টারা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর প্রতাপশালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতনা ক্রমে গৌরবশূন্য হইয়াছিল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্য দোষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হয়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। অযোধ্যার সুবাদার, স্বপ্রধান হইয়াছিলেন। তদানীন্তন মোগল সম্রাট হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতার সময় ফরাসীয়া

প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যে আপনাদের প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীয়েরা এইরূপে সাহায্য দানে অসম্মত হয় নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হইতেই বৈদেশীয় শাসনে ছিল, এখন অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইবার আশায় তাহারা অভিনব বিদেশীয় প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইংরাজেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের এইরূপ বীর্য্যপদ্ধতি দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশী জাতির আনুগত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে নূতন ছিল না। তাহারা পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশির শাসনাধীনে ছিল। ইতালী ও জর্ম্মনি সহজে নেপোলিয়ানের বশীভূত হইয়াছিল, যেহেতু ইতালী তখন সে ইতালী বা জর্ম্মনি সে জর্ম্মনি ছিল না। ইতালীয় ও জর্ম্মনিগণ তখন জাতীয় ভাব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল রাজ্যের অধঃপতন সময়েও ভারতবর্ষ পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ বা শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল না। সুতরাং ইংরেজ বণিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতবর্ষীয়েরা চারিদিকে ঘোরতর আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে বৃটিশ কোম্পানির সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং কার্য্যপারদর্শিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়া আপনাদের অভিনব প্রভুর অধিকার বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবাসী ইংরেজের পক্ষ হইয়া আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে সুতরাং তাহারা স্বদেশদ্রোহী। তাহারা দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া, অবলীলায়, অসঙ্কোচে, একদল বিদেশী বণিককে আপনাদের অধিপতি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ছিল না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল। কেহ ভারতবর্ষের কোন ভূখণ্ডে একাধিপত্য করিতে সমর্থ ছিলেন না। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পাঁচ জাতি, চারিপাঁচ ভাষার লোক পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ বা দ্বিতীয় শিবজীর আবির্ভাব হইত তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপান্তর পরিগ্রহ করিত।

মহারাজ রণজিৎ দ্বিতীয় শিবজী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব মোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতন সময়ে হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানী উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আর ভারতবর্ষীয়গণ এক অধীনতা-পাশ হইতে আর এক অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য তাহাদের সহায় হইয়াছিল। সুতরাং কেবল ইংরেজের বাহুবলে বা ইংরেজের কর-ধৃত অসির ক্ষমতায় ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ইংরেজ যদি সমস্ত ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের প্রতিকূলাচরণে ব্যাপৃত থাকিত, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ দৃশ্যের বিকাশ দেখা যায় নাই। ভারতবাসী ইংরেজ শাসনের অনুকূলতা করিয়াই আসিতেছে। ইংরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রধানতঃ এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের সহিষ্ণুতা ও অনুকূলতার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

পলাসীর প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে যখন হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌল্লার অধঃপতন হয়, তাহার পর হইতেই বাঙ্গালায় ইংরেজের ক্ষমতা ও আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া উঠে। ইংরেজের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি প্রধান যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং বিংশতিবর্ষীয় তরুণমতি সিরাজউদ্দৌল্লা সর্ব্বপ্রকার পাপের—সর্ব্বপ্রকার পাশব আচারের অদ্বিতীয় আশ্রয়ভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। আমি উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে চাহি না, তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে পলাসীর যুদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রধান যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইতে পারে না, এবং হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌল্লাও প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্ত্তিমান পাপ বলিয়া, ইতিহাসে বর্ণিত হইতে পারে না। পলাসীর যুদ্ধে যাঁহারা বিজেতা বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাঁহারা আপনাদের লোকাতীত শূরত্ব বা অসাধারণ পরাক্রম দেখান নাই। দেওবীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, প্রাতঃস্মরণীয়-প্রতাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরাক্রমশালী রণজিৎ সিংহ নওশেরার যুদ্ধে জয়শ্রী অধিকার করিয়া, সিন্ধুনদের অপর পারে হিন্দুবিজয়ী পাঠানের শোণিতজলে পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহের আত্মার তর্পণ করিয়া আফগানের অধিকৃত পেশাবরে আগ-

নার জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতের মহাশক্তিরূপিণী কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে কোতবদ্দীন্ ইবকুকে পরাজিত করিয়া, স্বরাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষত করিয়াছিলেন। বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণাপথের যুদ্ধে মোগল সৈন্যের ক্ষমতা রোধ করিয়া, হিন্দুজয়ী মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে বিজেতার বিজয়িনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়—বিজেতারা এই সকল যুদ্ধেই আপনাদের বীরত্ব ও ক্ষমতাবলে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করেন। ইতিহাসে এই সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। কিন্তু পরে পলাসীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, মিরজাফর ইংরেজের নিকট আত্মবিক্রয় করেন, ব্যবসায়ী ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধি-বিগ্রহ-ঘটিত রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হন, তাহাতে বিজেতা ইংরেজ আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দেন নাই। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এ কথা পলাসীযুদ্ধের সম্বন্ধে প্রয়োজিত হইতে পারে না। অকৃতজ্ঞতায় এই যুদ্ধের উৎপত্তি, বিশ্বাসঘাতকতায় এই যুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের প্রাণনাশের সহিত তাঁহার অতুল ধনসম্পত্তিতে অকৃতজ্ঞ আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ—এই যুদ্ধের পরিণাম। মহারাজ পুরু যদি বীরোচিত তেজস্বিতা ও মনস্বিতা দেখাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেকন্দর সাহের উদারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। সিরাজের অকৃতজ্ঞ কর্ম্মচারীগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাসীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না।

সিরাজউদ্দৌলা কোন অংশে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি ইংরেজ বণিকদিগের সহিত কখনও কোন দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই। সে সময়ে যাঁহারা বাঙ্গলার অবস্থা পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজউদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালা পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধ, বহুজনাকীর্ণ, সুকর্ষিত ছিল। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকও বণিকের ধনগৌরবে সমর্দ্ধিত। জনসাধারণ সুখে ও শান্তিতে কালাতিপাত করিত। ইংরেজ এরূপ সুখ শান্তিপূর্ণ জনপদের অধিপতিতে নানা কলঙ্কের আরোপ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করেন, এবং অকৃতজ্ঞ মিরজাফরকে অকৃতজ্ঞ-

তার পারিতোষিক স্বরূপ বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার রাজাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া তুলেন। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে লর্ড ক্লাইব যে নীতি অবলম্বন করেন, ভারতের ইংরেজাধিকারের পরিবর্ত্তী ইতিহাসে সেই নীতির বিকাশ হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বহুবিস্তৃত জনপদের অধিকারী ও বহু সম্পত্তি-শালী, সুতরাং তিনি ঘোর অত্যাচারী; এই অত্যাচারীর অপরাধে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করাই উচিত। আবার ধন-সম্পত্তির মহিমায় ও দেববাঞ্ছনীয় কহিনুরের বিমল বিভায় পবিত্র পঞ্চনদ ভারতের তুলনা-রহিত, সুতরাং লাহোর দরবার উচ্ছৃঙ্খল ও শান্তির বিরোধী; এজন্য বালক দলীপ সিংহকে রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অযোধ্যা লক্ষ্মীর প্রিয়নিকেতন, সুতরাং অযোধ্যা ঘোর অত্যাচারে পূর্ণ। অযোধ্যার নবাবকে মুচীখোলায় নির্ব্বাসিত করাই কর্ত্তব্য। দাহিরের দুহিতা সুন্দরী না হইলে সিন্ধুজয়ী কাসিমের শিরশ্ছেদ হইত না। হতভাগ্য ভারতের রাজ্যগুলি ধনসম্পত্তিতে গৌরবান্বিত না হইলে রাজ্যাধিকারিরা দুর্দ্দশায় পড়িতেন না। এই লোভ-লালান্বিত নীতির সূত্রপাত লর্ড ক্লাইব করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী সময়ে লর্ড ডালহৌসী তাহার সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ইংরেজাধিকারের মূলগ্রন্থি পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় ভারতের ইতিহাসে অনেকবার দেখা গিয়াছে। ডালহৌসীর সময়ে ইংরেজের ভারত সাম্রাজ্য পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া জিগীষু মোগলের সাম্রাজ্যকে অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ইংরেজ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অনেক বিষয়ে উহার অনেক আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া, দেশের অক্ষয় আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে আমরা ইংরেজের মহদুপকার কখনও ভুলিতে পারিব না। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, ইংরেজ ভারতশাসনে সমদর্শিতা ও উদারতার সম্মান রাখিতে পারেন না। ভারতে ইংরেজের রাজনীতি শ্রেণীভেদে, বর্ণভেদে এখনও অতি সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে। মুসলমানেরা প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষমতায় ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুরাজগণ, আপনাদের রত্ন, ভূমি অবলীলায় মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করেন নাই। দৃষদ্বতীতীরে পাঠানেরা জয়ী হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব সুখ ভোগ

করিতে পারেন নাই, তবুও মুসলমানদিগের অবলম্বিত নীতি সমদর্শিতার সম্মান রাখিত। গেয়াসউদ্দীন যদিও হিন্দুদিগকে প্রধান রাজকীয় পদ সমর্পণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে হিন্দুদের হস্তে প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার ছিল। প্রথম মোগল সম্রাট বাবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ মানসে পঞ্জাবে উপনীত হন, তখন হিন্দুগণ তাঁহার সাহায্য করেন নাই। কিন্তু এই মোগলের বংশধরদিগের রাজ্যে হিন্দুদিগের অসীম প্রতিপত্তি ও অসীম ক্ষমতা ছিল, মোগলেরা সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয় ছিলেন। ভারতবর্ষীয় হইলেও তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা তোড়রমল আকবরের প্রধান রাজস্বমন্ত্রী এবং রাজা বীরবল ও মানসিংহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজা রঘুনাথ আরঙ্গজেবের মন্ত্রিত্ব এবং জয় সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ সেনাপতিত্ব করিতেন। রাজা রতনচাঁদ সম্রাট ফররোক্ শেরের প্রধান মন্ত্রীর কাজ চালাইতেন। বিক্রমজিৎ ও রাজা ভীম, সম্রাট শাহজাঁহার প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সহায় ছিলেন। ইংরেজের বর্ণিত ঘোর অত্যাচারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বেও আমরা এই সমদর্শিতার পরিচয় পাই। তখন বাঙ্গালী সেনাপতি, বাঙ্গালী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এবং বাঙ্গালী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এখন ইংরেজাধিকারে এ সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। বীরবল, তোডরমল প্রভৃতির বিবরণ এখন কেবল ইতিহাসের কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া লোকের পূর্ব্বস্মৃতিতে বিরাজ করিতেছে। আর হতভাগ্য বাঙ্গালী? নবাব সিরাজের সময়ে যাহারা শাসন কার্য্যের অস্থিমজ্জাস্বরূপ ছিল, ইংরেজাধিকারে তাহাদের কি দশা ঘটিয়াছে? বাঙ্গালী আজ ইংরেজরাজের মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশের অনধিকারী। রাজপুরুষের অনুমতি ব্যতীত এক খানি সামান্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে আজ বাঙ্গালীর কোনও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা শ্বেতপুরুষকে বাঙ্গালায় স্বর্ণসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণই আজ এইরূপ ক্ষমতাশূন্য ও অধিকারশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। মোগল সম্রাট আকবরের উদার রাজনীতির গুণে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য বদ্ধমূল ও সম্প্রসারিত হয়, সাম্রাজ্যের

এই সম্প্রসারণে বিজিত হিন্দুরাই বিজেতা মোগলের প্রধান সহায় ছিলেন। শেষে আরঙ্গজেব এই উদারতা ও সমদর্শিতার মূলে আঘাত করিয়াই আপনার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ধ্বংশের পথ সুগম করিয়াছেন। [ক্রমশঃ

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শিশু কন্যার স্মৃতি।

বুকের ভিতরে সে যেন কোথায়
এখনো লুক্যয়ে আছে।
শূন্য মন হ'লে ধীরে ধীরে আসি
দাঁড়ায় প্রাণের কাছে॥
উদাস দেখিয়ে কচি বাহু দুয়ে
জড়াইয়া ধরে প্রাণ।
কত হাসি হাসে, কত সুধা ভাষে,
করে কত চুমো দান॥
সে স্নেহ-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে
আমি ঘুমাইয়া পড়ি।
স্বপনের সনে যাই মিশাইয়া
তাহারে হৃদয়ে ধরি॥
স্বপনো ফুরায় সে কোথা লুকায়
তাহারে না পাই আর।
নয়ন বিঁধিয়ে সে শূন্য সংসার
ফুটে ওঠে চারি ধার॥

আঁখি ভ'রে তায় পাইনি দেখিতে,
কেবল দেখিব ব'লে।

রাখিতে ছিলাম আঁখি তার পানে
অমনি সে গেল চ'লে॥
প্রাণ ভ'রে ভাল বাসিতে নারিনু
সবে রেখেছিনু প্রাণ।
যতন করিয়ে বাসনা ভরিয়ে
নারিনু করিতে দান॥
সাজাতে তাহায় করিনু সঙ্কল্প
জগতের কত সুধা।
বুকের সে সাধ রহিল বুকেতে
মিটিল না স্নেহ-ক্ষুধা॥
মানুষের বুকে দেবতার আশা
জাগাইল সে আমার।
কোথায় মিটাব এ আশা আমার
কোথা দেখা পাব তার॥

এস ছায়াময়ী স্মৃতি অতীতের
আইস হৃদয় ময়।
হেরিলে তোমারে সে প্রতিমা খানি
নয়নে জড়ায়ে রয়॥
রাখিলে নয়ন হৃদয়ে তোমার
হেরি যে সুখেরি ধরা।
সেই অধরের অমিয়া রাশিতে
হেরি এ জগত ভরা॥
তার আধ আধ বাবা সম্বোধনে
যেন শূন্য ধরাতল।
আনন্দে গলিয়া প্রাণের পিপাসা
করিয়েছে সুশীতল॥

মনে হয় যেন বুঝিয়া তনয়া
পিতার অতৃপ্ত ক্ষুধা।
খুলি নিজ বুক তুলি বিশ্ব তায়
মাখাইছে নিজ সুধা॥
এস স্মৃতি বুকে হৃদয় ভরিয়া
কাতরে তোমারে ডাকি।
জীবন ভরিয়া তোমারে ধরিয়া
প্রাণেতে জড়ায়ে রাখি॥

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আঁধার না আলোক?

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"
ভগবদ্গীতা। ২।২৬।

অন্ধকার। সকলই অন্ধকার। ঘনঘোর আঁধার! এই অনন্ত চরাচরের সকল সামগ্রীই বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের বিকট অট্টহাসির ভীষণ তরঙ্গে ভাসিতেছে। সকলই সেই বিকট হাসির মহাতরঙ্গে আপন আপন হাসি ডুবাইতেছে। সকলই সেই আঁধার-হাসির আঁধার-তরঙ্গে বুদ্বুদের ন্যায় উঠিতেছে—ফুটিতেছে—আবার কোথায় ভাসিয়া, সেই আঁধার-তরঙ্গেই লীন হইয়া যাইতেছে।—আঁধারে আঁধার মিশিয়া এক হইতেছে। অনন্ত জগৎ-সংসার মহান্ধকারের চির-আঁধারময় হাস্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। এই তামস-হাসির ভীষণ ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া বিশ্ব চরাচর আজন্ম ঘুরিয়া মরিতেছে। মহাকালের অনন্ত মহাশরীরের উপর দিয়া অন্ধকারের অনন্ত হাস্য-তরঙ্গ লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে। সে মহাতরঙ্গের বিশ্রাম নাই—শেষ নাই। অনাদি অনন্ত-কাল হইতে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিতেছে।

অন্ধকারের সেই ভীষণ অদম্য হাস্য-তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে কত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিমিষের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত হইয়া আবার সেই মহাতরঙ্গেই নিঃশব্দে বিলীন হইতেছে। আবার সেই অনন্ত-আঁধারের অনন্ত হাস্য-তরঙ্গে কত শত নূতন জগৎ নিমিষের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।

কি সুন্দর অন্ধকার! মহাপ্রকৃতির বড় চমৎকার—বড় মনোহর—আঁধারমাখা ছবি। অনন্ত অন্ধকারের প্রদীপ্ত আঁধার-প্রভায় উদ্ভাসিত এই ভীম অনন্ত দৃশ্যপটে অনন্ত-আঁধার ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! আঁধার-আকাশের আঁধার-ছায়ায় নিমগ্ন তারাগুলি অন্ধকারের প্রখর জ্যোতিতে নিষ্প্রভ হইয়া, সম্ভ্রমে স্তম্ভিত হৃদয়ে মহান্ধকারের প্রতি মিটিমিটি তাকাইয়া আছে। আঁধার-ঘেরা পৃথিবীর আঁধারে-ডোবা ফুলগুলি, ঘোর-আঁধার মাঝে আঁধার হাসি হাসিয়া, আপন আপন ক্ষুদ্র হৃদয়-দ্বার খুলিতেছে; আর সম্মুখে অন্ধকারের মহাভীম বিরাটমূর্ত্তি দর্শনে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া—প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া আঁধারের ছায়ামাখান কেমন এক সুন্দর হাসির তরঙ্গ তুলিতেছে। এই হাসি-কান্না মিশান অনন্ত মহাসঙ্গীতের লয়-লহরীতেই যেন এই অনন্ত বিশ্বচরাচর একপ্রাণে বাঁধা রহিয়াছে। অনন্তব্যাপি অন্ধকারের পশ্চাতে এই অনন্তভরা বিশ্বসঙ্গীতের মহাতরঙ্গের পশ্চাতে—এক প্রেমভরা শান্তি-মাখা অনন্তজ্যোতি হাসিতেছে। এই বিশ্ব-সঙ্গীত-তরঙ্গে ডুবিয়া আত্মহারা হইলে, প্রাণের ভিতর স্বতঃই সেই মহাজ্যোতির আভা দেখা দেয়। কিন্তু এই অনন্ত জলন্ত-আঁধার ভেদ না করিতে পারিলে, সে জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই মহাজ্যোতির আভা—এই অনন্ত প্রদীপ্ত অন্ধকার-শিখায় অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ক্ষীণ মানব-চক্ষু ঘোরান্ধকারের প্রখর ধাঁধাঁতেই ঝলসিত, সে আলো—সে স্বর্গীয় প্রভা দেখিতে পায় না।

আঁধার!—আঁধার!! চারি দিক ঘোর আঁধারে পরিব্যাপ্ত। বিশ্ব-সংসার অনন্ত অন্ধকার-ক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত। ভয় নাই,—একবার নিমীলিত নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ। দেখিবে,—কেমন আঁধারে আঁধারে মাখামাখি—মিশামিশি—কোলাকুলি।—কেমন প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন! কেমন আঁধার প্রাণে আঁধার-প্রাণ মিশিয়া হাসিতেছে! সেই হাসিতে কেমন বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইয়া বিশ্ব-সংসার কাঁপাইতেছে।

অন্ধকার?—ঘোর আঁধার?—ভুল কথা। ভ্রান্ত মূর্খ মানব, তুমি অন্ধকার কোথায় দেখিলে? এ ত শারদীয় বিনোদ পূর্ণিমায় সুবিমল সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না। তুমি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিবে—পাগল, ঘোরা তামসী অমানিশিতে পূর্ণিমার চাঁদের আলো?—ভীম প্রভঞ্জন-বিতাড়িত প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ-দগ্ধ মহামরুভূমে জীবন-দায়িনী অমৃত-নিস্যন্দিনী নির্ঝরিণী?—জগৎ-ত্রাসিত প্রখর নিদাঘ তপনে বাসন্তী-চন্দ্রমা?—পূতিগন্ধ-পূর্ণ চিতাধূমাচ্ছন্ন মহাশ্মশানে স্বর্গীয় নন্দন-শোভা! দুরাচারী নরহন্তারক ঘোর পাপীর মধ্যে প্রেমপুত্তলি বালিকার প্রেমমাখা সরল হাসি? মহাপ্রলাপ—ঘোর উন্মাদের কথা।

কিন্তু তাই কি? ভাল, তোমার সেই স্বপ্নময় জগতের ভৌতিক আলোর ছায়া প্রতি একবার চাহিয়া দেখ, দেখি, সে আলোর ছায়াবাজি অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নয়ত। সুধামাখা চাঁদের আলোতে অন্ধকারের কঠোর তীব্রতা, বিকশিত কুসুমের সুষমাতেও অন্ধকারের ঘোর ঘোর ছায়া। পবিত্র-হৃদয় সুন্দর শিশুর আধ হাসিতে অন্ধকারের ভীষণ ক্রীড়া ভাসিতেছে, ফুটন্ত-যৌবন রমণীর প্রেম-বিস্ফারিত মুখমণ্ডলেও অন্ধকারের বিভীষিকাময় প্রেতমূর্ত্তি প্রতিফলিত। আলো কোথায়? সবই যে আঁধার। আঁধার—আঁধার—আঁধার।

আলো বলিয়া তবে কি কিছু নাই? উহা কি কেবল একটা কথার কথা? উপন্যাস?—মিথ্যা কথা। যে বলে, সেই ঘোর প্রলাপী। আলো কি তা চিনিলে না—বুঝিলে না, অথচ আলো আলো করিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিলে কি হইবে? আলোর জন্য প্রাণ লালায়িত—মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়াই মন আলোর জন্য ধাবিত হয়। কিন্তু ক্ষীণ মন সম্মুখস্থ ভৌতিক আলোর মুগ্ধকরী প্রখর ধাঁধাঁতেই পড়িয়া যায়! প্রথমে সেই আলোতে মন বড় মুগ্ধ হয়—মোহে জ্ঞানলোপ হইয়া যায়। কিন্তু কৈ, প্রাণের পিপাসাত মিটে না! ক্রমে সেই আলোতে আগুণ জ্বলিয়া হৃদয় স্তরে স্তরে পোড়াইতে থাকে। শেষে সেই আলো-আগুনেই তুচ্ছ মানব-জীবনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয়। জন্মিয়াই যে অন্তর্ভূত আলোর জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাহা বাহ্যজগতের সামগ্রী নহে,—তাহার জন্য

সুদূর অন্বেষণ করিতে হয় না। অন্তর্জগৎ অনুসন্ধান কর, সেই আলো দেখিতে পাইব। বাহ্য আলোকের ভৌতিক আলোক-ধাঁধাঁয় না পড়িয়া সেই অন্তর্জাত আলোর জন্য আত্মবিসর্জ্জন কর—আপনার সত্তা ভুলিয়া যাও—হৃদয়ে স্বতঃই সেই আলো উদ্ভাসিত হইবে।

মনুষ্যজগৎ বাহ্য আলোর জন্য জ্ঞান হারাইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। কিন্তু হায়, ভ্রমক্রমেও কেহ এক দিন ভাবে না যে, সেই আলোই তাহার মৃত্যু—মূর্ত্তিমান কালের শিখাময় জলন্ত নিশ্বাস। এই আঁধার-সংসার আলোর জন্য লালায়িত—আলোর জন্য অনুক্ষণ উচ্চৈস্বরে চীৎকার করিতেছে;—কিন্তু পাগল, আলো কোথায়? অম্বরাকাশ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ভ্রান্ত, তোমার ভৌতিক আলো এ ঘোর আঁধারে কি আলো জ্বালিতে পারে? তোমার আলোক কয়লাকে পুড়াইয়া ছাই করে,—কিন্তু তাহাকে হীরকে পরিণত করিতে পারে না। প্রকৃত আলো চিনিতে না পারিয়া তোমার আলোর কুহকময় দীপ্তিতে পুড়িয়া এই দগ্ধ-সংসার প্রধূমিত-চিতাপূর্ণ ভীষণ শ্মশান হইয়া যাইতেছে।

ঘোরভ্রান্ত অবোধ মানব জন্মিয়া মরণান্ত পর্য্যন্ত প্রকৃত আলো ভ্রমে ভৌতিক আলোকে পুড়িয়া দগ্ধ হইতেছে। শৈশবে—পতঙ্গের ন্যায় মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া প্রদীপ্ত দীপ-শিখাকে আলোজ্ঞানে ছুটিয়া ধরিতে যাইতেছে।—সেই আলোকে আলো না পাইয়া, তাহার প্রখর উত্তাপে ঝলসিয়া, শেষে উচ্চরবে কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। যৌবনে—আলো ভাবিয়া, রমণীর হাসিভরা চন্দ্রমুখ সোহাগভরে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করিতেছে।—কিন্তু হায়, সুধা কোথায়?—সে চুম্বনে যে হলাহল উঠিতেছে, তাহার অসহ্য জ্বালাতেই জর্জ্জরীভূত হইয়া আজীবন ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতেছে! প্রৌঢ়ে—আলোভ্রমে প্রিয়দর্শন পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিতেছে।—দুদিন পরে সেই আলোই আবার বজ্রাগ্নিতে পরিণত হইয়া সর্ব্বশরীর দগ্ধ করিতেছে!—কখন বা সেই আলো সংসার-ছায়াবাজির ঐন্দ্রজালিক ধাঁধাঁতে মুগ্ধ করিয়া—সেই স্বতঃউদ্ভূত প্রাণের পিপাসা ভুলাইয়া অন্ধকারময় হৃদ্‌কন্দরে অনন্ত আঁধার রাশি ঢালিয়া দিতেছে। মহাভ্রান্ত মানব আলো ভাবিয়া ঐশ্বর্য্যের অতি তীব্র অথচ নেত্রমুগ্ধকর—প্রাণোন্মত্তকর আলোক

ধরিতে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে,—কতবার পড়িতেছে, পা ভাঙ্গিতেছে, শ্বাস রুদ্ধ হইতেছে, মুখে রক্ত উঠিতেছে,—তাহাতে দৃকপাতও নাই। যতই জ্ঞান হারাইয়া ছুটিতেছে, মনকাননের সেই ঐন্দ্রজালিক আলো মরীচিকার ন্যায় ততই বৰ্দ্ধিত হইয়া সম্মুখে আগে আগে সরিয়া যাইতেছে, আলোর সাধ মিটাইবার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া এক প্রকাণ্ড অতি ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত আলোক-প্রান্তরে ছাড়িয়া দিতেছে। শেষে তৃষিত হরিণের ন্যায় প্রলোভিত হইয়া অনন্ত সংসার-মরুভূমে ভীষণ আলো-মরীচিকায় পড়িয়া,—সেই আলোতে আঁধার দেখিয়া,—পুড়িয়া মরিতেছে! বাৰ্দ্ধক্যে—ভৌতিক আলোতে দগ্ধ হইয়া, হতাশ অন্তরে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। অন্ধকারময়-অতীতে অন্ধকারময়-স্মৃতির ভীষণ দংশনে আৰ্ত্তনাদ করিতেছে,—শেষে, পরিণাম ত আঁধার ভিন্ন কিছুই নয়! সেই আঁধারেই ত—জ্বলন্ত আঁধারের সাক্ষাৎ-মূৰ্ত্তিস্বরূপ মনুষ্যলোকের মহাসমাধি গঠিত হইতেছে!

তাই বলি মহাভ্রান্ত, তোমার আলো আলোই নহে। তোমার আলোর পরিণাম ত অন্ধকার! তোমার আলোইত অন্ধকারের মূল। তোমার আলোই সমগ্র মনুষ্যজাতিকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভীষণ অন্ধকূপে ফেলিয়া দেয়। আঁধার হৃদয়ে জ্বলন্ত অন্ধকার ঢালিয়া দেয়। তোমার আলোতে প্রথমেই চক্ষু ঝলসিয়া যায়—পরে যে অন্তর পুড়িয়া ছাই হয়! কিন্তু কৈ, অন্তর্জাত প্রাণের মহাপিপাসা—সেই স্বতঃ উদ্ভূত আলোর জন্য দারুণ তৃষা একটুওত মিটে না! ভ্রান্ত, ধূম্রান্ধকারময় ভস্মাচ্ছাদিত হৃদয়ে প্রকৃত আলোর সম্ভব কোথায়? হৃদয় অন্ধকারে ভরা।—জীবন অন্ধকারে পূর্ণ। এ ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর ছায়া এ দগ্ধ হৃদয়ে আসিতে পারে না।

অনন্ত অন্ধকারের অনন্ত প্রবাহে অনন্তকাল ভাসিয়াই বেড়াইতেছি,—কখন কূল পাইলাম না! তবে আলো কোথায় পাইব? অনন্ত অন্ধকারে ভাসিলাম—আবার ভাসিতে ভাসিতে ঘোরান্ধকারের ভিতর দিয়া আঁধারময় জননীজঠরে প্রবেশ করিলাম। যেন এক মহাসমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে, প্রবলতরঙ্গ-প্রবাহে এক অসীম ক্ষুদ্র সরসীমধ্যে আসিয়া পড়িলাম। তার পর যখন মাতৃগর্ভ হইতে এ সংসারে আসিয়া পড়িলাম, তখন এ দগ্ধ সংসারের অন্ধকার আরও জ্বলন্ত—আরও ভীষণতম বোধ হইল। যে

অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই আসিলাম। এতদিন অন্ধকারে ভাসিতেছিলাম—সে দিন যেন অন্ধকারের ঘোর তিমিরগর্ভে নিমগ্ন হইলাম। এবারও জন্মিয়া কৈ আলো পাইলাম না দেখিয়া, আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিলাম। ক্রমে সেই অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইতেছে। বয়স যত বাড়িতেছে, অন্তরের অন্ধকার ততই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতেছে। ক্ষুদ্র হৃদয় ঘোর অন্ধকারের ভীষণ পেষণে পেষিত হইতেছে।—সূচীভেদ্য অন্ধকারের তীক্ষ্ণধার সর্ব্বাঙ্গে আমূল বিদ্ধ হইতেছে। অন্তরে—বাহিরে অন্ধকার! এই অনন্ত জগৎ সংসার অন্ধকারে পূর্ণ - অন্ধকারে মাখামাখি।

অতীত—বর্ত্তমান—ভবিষ্যৎ অন্ধকারের ভীষণ ছায়াতে ঘোর বিভীষিকা দেখাইতেছে। অতীত—অন্ধকারের অনন্তগর্ভে নিহিত ছিলাম, সে দিকে আর দৃষ্টি করিবার শক্তি নাই—ভাবিতেও হৃদয়ের অন্ধকার যেন ভীষণ-জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে। বর্ত্তমানে—অন্ধকার-বক্ষে সাঁতরাইয়া বেড়াইতেছি—কত অনন্ত-আঁধারময় প্রবল তরঙ্গাঘাতে হাবুডুবু খাইয়া, সমস্ত বিশ্ব-সংসারেই অন্ধকারের অনন্ত জীবন্ত-মূর্ত্তি দেখিয়া সন্ত্রাসে কাঁদিয়া উঠিতেছি। ভবিষ্যতে—অন্ধকার—আরও অন্ধকার; আরও ভয়ানক।—অন্ধকারের ভীষণ অনন্ত-কুণ্ড সেই দিকে আহ্বান করিতেছে। প্রেতাত্মার লীলাভূমি ঐ মহাশ্মশান অন্ধকারের অনন্ত-আঁধার-চিতাতেই সংকার সাধিত হইবে। ঐ ভীষণ আঁধার-প্রবাহেই ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। তাই, আমার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—একই।—সেই একই অন্ধকারের একই অনন্ত আঁধারময় কূপে নিহিত।

অন্ধকারে ছিলাম - অন্ধকারে আছি - আবার অন্ধকারেই যাইব। আমি আঁধারে উত্থিত—আঁধারে বর্দ্ধিত—আবার আঁধারেই বিলুপ্ত হইব। হায়! আমি আলো কোথায় পাইব? শক্তি-উপাসক মহাশক্তির সেই ঘোর-মসীবর্ণা কাল-করাল-কাদম্বিনী কালিকামূর্ত্তিতে বিশ্ব-ভুবন-প্রকাশিনী জগৎ-সংসার-হাসিনী অনন্ত দিব্য-আলোক দেখিতে পায়। সাধক বৈষ্ণব মহাপুরুষের সেই সুচিক্কণ নবজলধর-শ্যাম কৃষ্ণমূর্ত্তিতে স্বর্গের অনন্ত জ্যোতি—মহাপ্রেমের বিশ্বজনীন ভাব দেখিতে পায়। যাঁহাদের মন অনিত্য সংসার-স্বপ্ন-জালে জড়ীভূত নয়—যাঁহাদের হৃদয় অসৎ-ভৌতিক-আলোর ছায়া-

বাহিরে বিমোহিত নয়, সেই ধ্যাননিরত মহাযোগীগণও অন্ধকারের অতি ভীষণ বিকট-মূর্ত্তিতে পূর্ণপুরুষের পূর্ণ-জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির পূর্ণ-বিকাশ দেখিতে পান—এই অনন্ত-ঘোর-আঁধারেই অনন্ত-পুরুষের শান্তিময় অনন্তব্যাপ্ত মহা জ্যোতি দেখিতে পান। যেন প্রতি অন্ধকার-কণিকাতে সেই অনন্ত-পুরুষের নীলিমাময় জ্যোতিষ্মান্ অনন্তদেহ ভাসিতেছে! কিন্তু হায়, মহাভ্রান্ত ঘোর তামসিক আমাদের কি পুণ্য আছে যে, সে আঁধারের আলোক—অসারের সার—অসতের সৎ হৃদয়ের অনন্ত মণিকে দেখিতে পাইব!

সে অনন্ত অন্ধকারেই চতুর্দ্দশ ভুবন বিভাসিত। সেই অন্ধকারই চাঁদের আলো;—ফুলের প্রাণহরা সুবাস;—শিশুর সুধামাখা অর্দ্ধস্ফুট কথা,—রমণীর প্রেমভরা দৃষ্টি;—কোকিলের প্রাণপোরা পঞ্চমস্বর,—নির্ঝরিণীর শ্রুতি-মধুর স্বর্গীয় সঙ্গীত,—কৌমুদীমাখান নৈশ-সমীরে বাসন্তীবল্লরীর ঈষৎ-দোলনী। অন্ধকারই সুখ। অন্ধকারই প্রাণ। অন্ধকারই জীবনের আলো। অন্ধকারই সর্ব্বস্ব। অন্ধকারেই বিশ্ব-জগতের উৎপত্তি—অবস্থান—লয়। সে অন্ধকারই আলো।—সে অন্ধকারকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি।—তাই এ আঁধারময় হৃদয়ে অনন্ত অন্ধকার এত ভাল লাগে। কিন্তু সে রহস্যময় অন্ধকার তোমার আমার নিকট অন্ধকার হইলেও, তাহাই প্রকৃত আলোক! প্রকৃত যোগী না হইলে, সে আঁধার-রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত আলোক—যাহার পিপাসা জন্ম হইতেই অন্তরে স্বতঃ উদ্ভূত হয়—সে আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্বপ্নময় আলোই ঘোর আঁধার!—অনন্ত অন্ধকার! হায়! কবে আঁধারে আলো, ও আলোতে আঁধার দেখিতে পাইব?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা।

বেদের অনিত্যতা—সাহেবদিগের মত।

বৃষ্টি পতিত হইয়াই বাষ্পাকারে পরিণত হয় অথবা চন্দ্রাদিতে অন্তর্হিত হয়, অতএব বৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। চন্দ্র পর্ব্ব

দিবসে সূর্য্যের অভ্যন্তরে লীন হয়, চন্দ্র সূর্য্যের অভ্যন্তরে সেইরূপ লীন হইয়া অদৃশ্য হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। সূর্য্য অস্তগত হইয়া অগ্নিতে লীন হন, অতএব সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিবে। অগ্নি আকাশে অন্তর্হিত হন, অতএব অগ্নি নির্ব্বাণ হইবার সময় সেই পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। আমরা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ দেবতার লয় স্থান বলিয়া যাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিলাম, তাহাদিগকে উহাদের উৎপত্তি-স্থান বলিয়াও জানিবে। অগ্নি আকাশ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ইহা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, অতএব অগ্নিকে পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—"অগ্নি পুনর্ব্বার প্রত্যুজ্জীবিত হোক্; কিন্তু আমার শত্রু যেন পুনর্ব্বার উৎপন্ন না হয়, সে একেবারেই বিনষ্ট হোক্।" এইরূপ সূর্য্যকে অগ্নি হইতে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে দেখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে—"সূর্য্য পুনর্ব্বার উদিত হৌন্; কিন্তু আমার শত্রু যেন আর উৎপন্ন না হয়" ইত্যাদি। এই অভিচার বা শত্রু-ধ্বংসন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার কর্ত্তব্য—"শত্রুর বসিবার পূর্ব্বে তিনি বসিতে পারিবেন না, অন্যদিকে যতক্ষণ শত্রুকে দণ্ডায়মান বিবেচনা করিবেন ততক্ষণ স্বয়ংও দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবেন। শত্রুর শয়ন করিবার পূর্ব্বে শয়ন করিবেন না, কিন্তু শত্রু যতক্ষণ বসিয়া থাকিবেন ততক্ষণ বসিয়া থাকিবেন। এইরূপ শত্রু যতক্ষণ নিদ্রা না যাইবে তাহার মধ্যে তিনি নিদ্রা যাইবেন না, কিন্তু শত্রুকে যতক্ষণ জাগরিত বিবেচনা করিবেন ততক্ষণ জাগিয়া থাকিবেন। এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিলে শত্রুর মস্তক প্রস্তরনির্ম্মিত হইলেও তাহা খণ্ডশঃ হইয়া যাইবে, শত্রু বিনষ্ট হইবে।

এই ঐতরেয় বা অন্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থনিচয়ে যে সকল উপকথা বা গল্প লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগের দ্বারা যজ্ঞ বিশেষের (যাহাদিগের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) মূল এবং ফল কেবল স্পষ্ট করিয়া বুঝান হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল উপকথা বা গল্প দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের একটি অতি অপূর্ব্ব এবং অনেকাংশে সমালোচ্য ঐ কথা, হোতা নামক আচার্য্য সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া অভিষিক্ত রাজার নিকট বলিবে, এবং আর এক জন পুরোহিত উক্ত রূপ মহার্ঘ আসনে উপবিষ্ট হইয়া হোতার বাক্য সকলের পুনরুচ্চারণ করিবে। বিজয়াশংসী নরপতি স্বয়ং স্বহস্তে যজ্ঞকার্য্যের অনু-

ষ্ঠান না করিলেও এ গল্প শ্রবণ করিতে পারেন। এবং সন্ততিলিপ্সু মনুষ্য যদি নিয়মপূর্ব্বক ঐ কথা শ্রবণ করেন তাহা হইলে তাঁহার পুত্র লাভ হয়। ঐ গল্পের নাম শুনঃশেফের গল্প—উহা এইরূপে রচিত।

কোন সময় ইক্ষাকু বংশোদ্ভব বেধার পুত্র হরিশ্চন্দ্র নামক রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার শত স্ত্রী সত্ত্বেও কোনটি দ্বারা পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সন্তানলিপ্সা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হইয়াছিল। এমন সময় একদিন পর্ব্বত এবং নারদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি নারদ তাঁহার সন্তানপ্রাপ্তির উপদেশ করিলেন।

নারদের উপদেশানুসারে মহারাজা হরিশ্চন্দ্র জলাধিপতি বরুণের স্তব করিয়া বলিলেন, যদি তাঁহার প্রসাদে পুত্র লাভ হয়, তবে তাঁহার নিকট ঐ পুত্রকে বলিদান করিবেন। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তখন বরুণ সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বলি প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন, "পশু দশ দিন অতীত না হইলে বলিদানের উপযুক্ত হয় না, অতএব আমার পুত্রের দশ দিন অতীত হৌক্, আমি বলিদান করিব।" বরুণ বলিলেন, তথাস্তু। তাহার পর দশ দিন গেল, বরুণ আবার আসিয়া প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পশুদিগের দন্ত না উঠিলে বলি দিবার যোগ্য হয় না, অতএব আমার পুত্রের দন্ত উঠুক, তবে বলিদান করিব। বরুণ আবার বলিলেন তথাস্তু। ক্রমে রোহিতের দাঁত উঠিল, বরুণ সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পশুদিগের দুধে দাঁত যখন খসিয়া যায় তখন তাহারা বলি দিবার যোগ্য, আমার পুত্রেরও দুধে দাঁত খসিয়া যাউক, বলিদান করিব। বরুণ পুনর্ব্বার তথাস্তু বলিলেন। ক্রমে রোহিতের দুধে দাঁত ভাঙ্গিল। বরুণ আসিয়া উপস্থিত। হরিশ্চন্দ্র বলিলেন পশুদিগের যখন দুধে দাঁত ভাঙ্গিয়া আবার উত্থিত হয়, তখন তাহারা বলিদানের যোগ্য হয়, আমার পুত্রের দাঁত আবার উঠিলে বলিদান করিব। বরুণ সে কথাও মানিলেন। রোহিতের আবার দাঁত উঠিল। বরুণও নাছোড়বান্দা। দাঁত উঠার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। তখন হরিশ্চন্দ্র বলিলেন যোদ্ধা এবং বীরপুরুষও বলির উপযুক্ত, মাত্র আমার পুত্র অস্ত্র ধরিতে শিখুক, বলি দিব। বরুণ অগত্যা তাহাও স্বীকার করিলেন। রোহিত ক্রমে অস্ত্রে

পারদর্শী হইলেন। রোহিতকে অস্ত্রে পারদর্শী দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, হে পুত্র আমি তোমাকে বরুণের প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমি তোমাকে বরুণের নিকট বলিদান করিব। তাহাতে রোহিত অস্বীকার করিল। তাহার নিজের ধনুকখানি হস্তে লইয়া অরণ্যে পলায়ন করিল। এক বৎসর সেই বনের মধ্যে বাস করিল। এদিকে বরুণ আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে মেধরোগ গ্রস্ত করিলেন। অগত্যা হরিশ্চন্দ্র কিছুকালের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিলেন। রোহিত এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রের নিকট যাইয়া সমুদয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। ইন্দ্র তাহাকে নিরুপায় দেখিয়া ছয় বৎসর অবধি সেই নিভৃত অরণ্যে বাস করিতে বলিলেন।

অনন্তর রোহিত বরুণের নিকট পিতৃ অঙ্গীকৃত সময়ের অবসান দেখিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। অরণ্যে অজিগর্ত্ত ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অতি দরিদ্রাবস্থায় দেখিলেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল। একটির নাম শুনস্পুচ্ছ, দ্বিতীয়ের নাম শুনঃশেফ, তৃতীয়ের নাম শুনোলাঙ্গুল।

রোহিত তাঁহাকে বলিলেন, যদি সেই ঋষি রোহিতের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিদানার্থ একটি পুত্র অর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একশত গাভী দিবেন। অজিগর্ত্ত তাহাতে সম্মত হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী ছোট পুত্রকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, উভয়েই শুনঃশেফকে বলিদানার্থ প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন। রোহিত তাঁহাকে আপনার পিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং হরিশ্চন্দ্র ও বরুণও উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কারণ, ব্রাহ্মণের শরীর ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন এবং ঐ যজ্ঞে বলিদানার্থ পশুর প্রতিনিধি শুনঃশেফকে কল্পনা করিলেন। ঐ যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতৃর কার্য্য করিয়াছিলেন, জমদগ্নি অধ্বর্য্যুর কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠ ব্রহ্মার কার্য্য করিয়াছিলেন। এইরূপে মূল কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে বলিদানের অবসর হইল। কিন্তু শুনঃশেফকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিতে কেহই অগ্রসর হইল না। ঐ সময় অজিগর্ত্ত ঋষি বলিলেন, তাঁহাকে আর এক শত গাভী দিলে তিনি ঐ কার্য্য সমাধা করিবেন। তাঁহারা সকলে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর শুনঃশেফ স্বপিতা কর্ত্তৃক যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার মস্তকচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইল না। আবার অজিগর্ত্ত স্বয়ং অগ্রসর হইলেন, তিনি আবার পূর্ব্বের মত বলিলেন যে আর এক শত গাভী দান করিলে তিনি স্বহস্তে শুনঃশেফকে বলিদান করিবেন। তাঁহারা সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে অজিগর্ত্ত অস্ত্র শাণিত করিয়া তাঁহার পুত্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পিতা স্বয়ং শাণিত খড়্গ লইয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে পুত্র আর কাহার শরণ লইবে? তখন শুনঃশেফ ছল ছল কাতর চক্ষে ঊর্দ্ধ-মুখ করিয়া আপনার মুক্তির নিমিত্ত দেবতাদিগের শরণাপন্ন হইল। সে প্রথমে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রজাপতির স্তব করিল। প্রজাপতি বলিলেন, তুমি অগ্নিকে স্তব কর, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবে। শুনঃশেফ আর একটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া স্তব করত অগ্নির শরণাপন্ন হইল। অগ্নি বলিলেন তুমি সাবিত্রীকে শরণ লও। সাবিত্রী ঐরূপ আহূত হইলে তিনি বলিলেন বরুণকে শরণ লও, বরুণ আবার তাঁহাকে অগ্নির নিকট প্রেরণ করি-লেন। বালক শুনঃশেফ অতি কাতরভাবে আবার অগ্নিকে আহ্বান করিল। অগ্নি বলিলেন, তুমি একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া সমুদয় দেবগণকে স্তব কর, শুনঃ-শেফ তাহাই করিল। তখন তাহার বন্ধন মোচন হইল। হরিশ্চন্দ্রও পীড়া হইতে মুক্ত হইলেন। বন্ধন মুক্ত হইয়া যখন শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের নিকট তৎপিতা কর্ত্তৃক নীত হইলেন, তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, "না, ইহাকে আর তুমি পাইতেছ না, দেবতারা ইহাকে আমায় অর্পণ করিয়াছেন।" সেই সময় হইতে তাঁহার নাম শুনঃশেফের পরিবর্ত্তে দেবরাত হইল, এবং বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি হইল।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতেই বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সাধারণত ভাবটা কিরূপ। ইহার পর কেবল প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ গ্রন্থের নাম উচ্চারণ করিলেই হইবে। তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য বুঝিতে হইলে ঐ সকল ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সমালোচিত বৈদিক কৃত্য সকলের বিষয় সমালোচনা করা আবশ্যক, এবং সেই প্রাচীন সময়ের উপন্যাসগুলির অব-স্থাও ভালরূপে আলোচিত করিতে হয়। [ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

হেমচন্দ্র

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দেখ, সম্মুখে ঐ নীলনীরদখণ্ডবৎ অনন্তবিস্তৃতা অশ্রান্তবাহিনী ভাগীরথী কল কল স্বরে হৃদয়ের কি এক স্বপ্নময় গান গাহিতে গাহিতে ধীর-তরঙ্গ-বিক্ষেপে কে জানে কোথায় বহিয়া চলিয়াছে। সেই গানে মজিয়া উর্ম্মির পর উর্ম্মি জড়াজড়ি করিতে করিতে তালে তালে নাচিতেছে। দুই পার্শ্বে কত পল্লী, কত গ্রাম, কত নগর সেই গান শুনিবার জন্য অন্য অন্য গ্রামাদি পিছে রাখিয়া আগে হইতে সেই তীরে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে,—ভ্রূক্ষেপ নাই, ভাগীরথী আপন মনেই গাহিয়া চলিয়াছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ অপনা আপনিই নাচিয়া যাইতেছে। তীরের বড় বড় গাছগুলা অবাক্ হইয়া তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। আশে পাশে অগণ্য পোত ভাসিতেছে। দূর হইতে আরও নৌকা আসিতেছে—দেখিতে দেখিতে আবার চলিয়া যাইতেছে। বৃক্ষগুলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাও দেখিতেছে, কখনও কোন দ্রুতগামী নৌকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, ধরিতে পারিতেছে না, সাঁ সাঁ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে, তখন শ্রান্তির ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে। নৌকার পর নৌকা কত এল, কত গেল, একখানিও ধরিতে পারিল না। দূরে বেলা দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজিল। সেই সময়ে একখানি ভাউলে সন্ সন্ করিতে করিতে অতি তীব্রবেগে বহিয়া যাইতেছিল; দুই ধারের গাছগুলা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বড়ই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল। পারিল না। পলকের মধ্যে নৌকা তাহাদের দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া যাইতে লাগিল। সে নৌকা-রোহীর মধ্যে একমাত্র শ্যামসুন্দর বাবু বসিয়া বসিয়া কেবল বারবার ঘড়ি খুলিয়া দেখিতেছেন, আর মাঝিকে শীঘ্র যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। মাঝি কিন্তু মাঝিগিরির চাল ছাড়ে না। সে হালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আর তিনটা দাঁড়ীর দাঁড় টানিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে।

বাহিরে বাবুর এক ভৃত্য বসিয়াছিল। তাহার ঝিমৃকিনি গোছের একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। নৌকায় অন্য লোক ছিল না।

দেখিতে দেখিতে নৌকা কলিকাতা বড়বাজারের ঘাটে আসিয়া লাগিল বাবুর মুখমণ্ডল ঈষৎ হর্ষপ্রফুল্ল হইল। একবার চারিদিকে চাহিলেন। কি অপূর্ব্ব শোভা! জাহ্নবীর জল অবিরল উছলিয়া উছলিয়া চলিয়াছে; জলের উপর অগণ্য পোত। স্থানে স্থানে জল পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। কোথাও পান্সী বা ভাউলে করিয়া অসংখ্য আরোহী গতায়াত করিতেছে; কোথাও ডিঙ্গি করিয়া জেলেরা মাছ ধরিতেছে; কোথাও বড় বড় ভড়, বজরা ও মহাজনি নৌকা সকল বিপুল শরীর ভাসাইয়া মন্থরগতিতে চলিয়াছে; কোথাও ষ্টীমার বায়ুবেগে জল কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে—উপরে ধূম উঠিতেছে, চাকা অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, কলে কেবল 'তফাত তফাত' শব্দ হাঁকিতেছে; ক্ষুদ্র নৌকাগুলা ভয়ে বিশ হাত তফাতে গিয়া খেয়া দিতেছে। বড় বড় জাহাজ সকল এ সব দেখিয়া নীরবে একস্থানে দাঁড়াইয়া এ উহার পানে কটাক্ষে চাহিতেছে, আর মাস্তলের বস্ত্র-সঞ্চালনে আপনাদিগের বিপুল দেহ-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বয়াগুলা আগ্রীবনিমজ্জিত হইয়া মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতেছে, আর ঢেউ আসিয়া তাহার চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিতেছে। দূরে শশক ডুবিতেছে, উঠিতেছে, উঠিয়া আবার ডুবিতেছে। ঘাটে অসংখ্য লোক—বালক, বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী—কেহ স্নান করিতেছে. কেহ কাহাকে স্নান করাইতেছে, স্নানান্তে কেহ পূজা করিতেছে, কেহ ফোটা কাটিতেছে, কেহ গা রগড়াইতেছে, কেহ ডুব দিতেছে, কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ অপরের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেছে—অপূর্ব্ব শোভা—তীরের উপর ততোধিক আরও অপূর্ব্ব শোভা। অমরাবতীর সৌন্দর্য্যকে অধঃকৃত করিয়া ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা নগরী শোভা পাইতেছে। নানা বর্ণের নানা প্রকার বাড়ী কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া, তাহার পদপ্রান্তে সুপ্রশস্ত রাজপথ, সেই রাজপথে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কোলাহলে দিক্ পূরিয়া উঠিতেছে। সে সব কি দুই চক্ষে দেখিবার? মানুষের সব

কয়টা ইন্দ্রিয় যদি চক্ষু হইয়া যায় তবু সে শোভা দেখিয়া ফুরাইয়া উঠে না। কিন্তু এ সকল দেখিবার সময় তাঁহার নাই। ঠং করিয়া একটার ঘড়িতে ঘা পড়িল। ব্যস্ত হইয়া বাবু উপরে উঠিলেন। নৌকা যখন তীরলগ্ন অসংখ্য নৌকাশ্রেণী ভেদ করিয়া ঘাটে আসিয়া লাগে, তখন সম্মুখস্থ একখানি নৌকার মাঝি আপতনোন্মুখ নৌকাখানি একগাছি লগি দিয়া ঠেলিয়া দেয়। ঠেলিতে গিয়া লগি সেই নৌকার উপরস্থ ভৃত্য পরমানন্দের গায়ে লাগিল। পরমানন্দ তখনও বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল, আর বাবুর বাড়ীর বামা দাসীর সেই বাঁউড়ীপরা গোলগাল হাতখানির কথা ভাবিতেছিল। বামা দাসীর হস্তের সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশের সংস্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে এ স্পর্শটা তাহার বড় ভাল লাগিল না। অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি করিয়া একবার পিঠের উপর হাত দিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে বিস্মিত হইল। বাবু তখন উপরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। কিন্তু তার পরই দেখিল, বাবু একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহাতে উঠিতেছেন এবং তাহার প্রতি কতকগুলি সাধুশব্দ প্রয়োগ করিতেছেন। সুতরাং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে পরমানন্দ তথায় বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া ধীরে ধীরে গাড়ীর উপরে গিয়া আরোহণ করিল। ঘর্ঘর চক্রে গাড়ি ছুটিয়া চলিল। বামাদাসীর হাতটা আচম্বিতে কেমন করিয়া এরূপ অকোমল ও তিক্তস্পর্শ হইল পরমানন্দ কোচবাক্সে বসিয়া এক মনে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ী আসিয়া লালদিঘির উত্তর পশ্চিম কোণে এক প্রকাণ্ড বাড়ীর প্রকাণ্ড ফটকে লাগিল। সেই বাড়ীতে গলষ্টন পামর কোম্পানির আফিষ। হৌস্ বড় ভারি। প্রবাদ এত বড় সদাগর এদেশে আর কখন আসে নাই। সাহেব যেমন কারবারি, তেমনই অমায়িক। বিশেষ গুণ, তিনি বড়ই বাঙ্গালি-ঘেঁসা। কারবারও খুব ফেলাও। সদাগরির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের কাজও চলিত। সাহেবের সুদের হার বেশী, সুতরাং অনেকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া সেই সাহেবের আপিষেই টাকা রাখিত। প্রকাণ্ড বাড়ী, অগণ্য কেরাণী—হৌস্ সর্ব্বদাই লোকে

গিস্‌গিস্ করিত। টাকার ঝন্‌ঝনানি, লোকের কলকলানি, দালাল মুৎসুদ্দি, ক্রেতা বিক্রেতার হন্‌হনানিতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত গম্‌গম্ করিত। কিন্তু এ কি! আজ সে প্রকাণ্ড পুরী শূন্য কেন? গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাবু বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে গেলেন। দ্বার রুদ্ধ। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। সেই প্রাসাদ-সদৃশ অট্টালিকা নির্জ্জনতায় ভীষণভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এ কি এ? তাঁহার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতে লাগিল। প্রত্যেক দরজায় করাঘাত করিতে লাগিলেন, সকল দ্বারই রুদ্ধ। তখন দ্বারবানের গৃহে গেলেন। গৃহ জনশূন্য। হতাশ হইয়া বাহিরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ভদ্রলোকটী তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় কাহাকে খুঁজিতেছেন?"

এতক্ষণে বাবুর দেহে যেন অর্দ্ধেক প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তিনি ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সাহেবকে খুঁজিতেছি, হৌস্ কি আর কোন জায়গায় উঠিয়া গিয়াছে?"

ভদ্রলোকটী কিছু আশ্চর্য্য হইল। বলিল, "সে কি, আপনি শোনেন নি, সাহেব যে ফেল হইয়াছে। কোর্ট তাহাকে ইন্সল্‌ভেণ্ট দিয়াছে।"

অকস্মাৎ বাবুর মস্তকে কে যেন লগুড়াঘাত করিল; কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হরিয়া গেল। কথা কহিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন "আপনি কি কলিকাতায় থাকেন না, কোথা হইতে আসিয়েছেন?"

"আসিতেছি—আসিতেছি অনেক দূর হইতে—তা, সাহেব সত্যই ইন্সল্‌ভেণ্ট হইয়াছে—কবে হইয়াছে, মহাশয়?"

"সত্যই হইয়াছে—কাল পাঁচটার সময় হুকুম হইয়া গিয়াছে।"

সে ভদ্রলোকটী আর দাঁড়াইলেন না। শ্যামসুন্দর বাবুকে এরূপ আকুল দেখিয়া আরও গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দূরে তাঁহার প্রভুর গাড়ি টিফিনের পর ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সভয়ে সশব্যস্তে একদিক্ দিয়া সরিয়া পড়িলেন। স্থির হইয়া শ্যামসুন্দর সেইখানে দাঁড়াইলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। ত্বরিতপদে বাহিরে আসিলেন। পথে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল। পার্কষ্ট্রীটে সাহেবের বাসা—গাড়ি সেইখানে যাইতে বলিলেন। গাড়ি অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে একটী নির্জ্জন বাটীর ফটকে গিয়া পৌঁছিল। গাড়ি হইতে নামিয়াই বাবু সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে গেলেন। বাহিরে বেহারা বসিয়াছিল, সে রুখিল। বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া তাহার হাতে একটী টাকা ফেলিয়া দিলেন। সে আর বিশেষ কোন আপত্তি করিল না। বাবু একেবারে উপরে উঠিয়া পড়িলেন। বারাণ্ডায় সাহেব পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বারাণ্ডার বাহিরের দিকে চিক্ ফেলা ছিল। বাবুকে উপরে দেখিয়াই সাহেব একটু বিস্মিত হইল—একটু থতমত খাইল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া ঈষৎহাস্যে—"হ্যালো! বাবু, গুডমর্ণিং" বলিয়া করমর্দ্দন করিলেন। সাহেবটী খাস বিলাতী; আদব কায়দায় বড় পটু। মুখে হাসিটুকু সদাই লাগিয়া রহিয়াছে। সাহেব হাসিমুখে সেই অমলধবল হস্তে যখন বাবুর হাতখানি ধরিলেন, তখন মুহূর্ত্তের জন্য বাবু আপনার প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। কি বলিয়া কথা আরম্ভ করিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন, বেহারা দুইখানি চৌকি দিয়া গেল। দুই জনে দুই খানিতে বসিলেন। "হাডু ডু" বলিয়া সাহেব প্রথমেই কথা আরম্ভ করিল। সে কেবল এ ও তা আশপাশ কথাই কহিতে লাগিল। আসল কথা পাড়ে না। কি বলিয়া আসল কথা উত্থাপন করিবেন বাবুও তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিলেন না; তাঁহার ইচ্ছা সাহেবই আগে সে কথা পাড়ে। কিন্তু সে ধূর্ত্ত সে দিকে যায় না। অন্য কথা কয়, আসল কথা পাড়ে না। তখন, বাবু নিজেই তাহা পাড়িবেন মনে মনে স্থির করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সাহেব বড় চতুর, সে তাহা বুঝিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। বাবু যেন কিছুই জানেন না, কিছুই শোনেন নাই, এমনি করিয়া তখন কথা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন "বেলা গেল, আমি আপনার কাছে টাকার জন্য আসিয়াছিলাম, আপিষে গিয়াছিলাম, আপিষ বন্ধ দেখিয়া এখানে আসিয়াছি।

সাহেব হাসিয়া বলিল "উত্তম করিয়াছেন। আমার সৌভাগ্য, আপনাকে আমার দরিদ্র কুটীরে আজ পাইয়াছি।"

শ্যামসুন্দর মনে মনে ভাবিলেন "সাহেব কি বিনয়ী।" সাহেব ভাবিলেন "মূর্খ বাঙ্গালীকে যদি কথায় ভুলাইতে না পারিব, তবে বৃথায় সাতসমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলাম।" প্রকাশে বলিলেন "এতদিনে জানিলাম, আপনি আমার প্রকৃত বন্ধু, যে হেতু এই বিপদের সময় দয়া করিয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

বিপদ! বাবু একটু সূত্র পাইলেন। বলিলেন "কি বিপদ হইয়াছে আপনার?"

সাহেব সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন—"কিন্তু বড় দুঃখ যে আপনাদের ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই যাইতে হইবে।"

শ্যামসুন্দর আগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কি অন্য কোথাও যাইবেন স্থির করিয়াছেন?"

সা। বোধ হয়, আজ না আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইত না।

শ্যা। হঠাৎ এরূপ কি বিপদ হইল যে একেবারে এস্থান ছাড়িয়া যাইতে হইল?

সা। আমার স্ত্রীর বড় কঠিন পীড়া, কিছুতেই আরাম হইল না। ডাক্তার বলিয়াছেন, ইংলিষ চ্যানেলের বায়ু সেবন না করিলে এ রোগ আরাম হইবে না।

শ্যা। তবে কি বিলাত যাওয়াই স্থির হইয়াছে?

সা। কি করি, এতদিন এখানে থাকিয়া দেখিলাম, কিছুইতো উপকার হইল না।

শ্যা। এ অধীনদিগকে একেবারে ভুলিবেন না।

সা। ছি ছি! বলেন কি, আপনারা কি ভুলিবার? কফিনের ভিতর এ দেহ পচিয়া যাইবে, তথাপি আপনাদের স্মৃতি এ বুক হইতে মিলাইবে না।

শ্যা। এক্ষণে, আমাদের টাকা কড়ির হিসাবটা—

পার্শ্বের কামরা হইতে ক্ষীণকণ্ঠে কিসের শব্দ হইল। সাহেব ত্রস্তে উঠিয়া বলিলেন, "মাপ করিবেন, আমায় একবার গৃহের ভিতর যাইতে হইবে. বুঝি মেমের অসুখ বাড়িয়াছে।

সাহেব উঠিয়া চলিয়া গেলেন। শ্যামসুন্দর একাকী তথায় বসিয়া

রহিলেন। হতবুদ্ধি, লুপ্তজ্ঞান, হৃতচৈতন্য। গৃহে আর কেহই নাই কেবল ভিত্তিগাত্রে একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি টিক্‌টিক্ করিয়া অবিরাম শব্দ করিতেছে; আর বুকের ভিতর তদধিক অবিরাম টিক্‌টিক্ শব্দ হইতেছে। উপায়! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামসুন্দর বলিলেন, উপায়! নির্জ্জনগৃহে সে শব্দের প্রতিধ্বনি হইল, কেহই তাঁহার উত্তর দিল না। দেয়ালের ঘড়িটা যেন তাঁহাকে দেখিয়া আরও তাহার আওয়াজ বাড়াইল। শ্যামসুন্দর অস্থির হইয়া পড়িলেন। উঠিয়া কয়েক পা বেড়াইলেন। আবার বসিলেন। আবার উঠিলেন। এমন সময়ে সাহেব সে গৃহে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। দেখিয়া শ্যামসুন্দরের ভগ্ন হৃদয়ে কতক ভরসা হইল।

সাহেব বলিলেন, "বাবু, আপনি একা রহিয়াছেন, সে জন্য আমি অসীম দুঃখিত। বাহিরে আসিবার আমার এখন সময় নহে, কিন্তু আপনাকে ফেলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আসিতে হইল"—এই বলিয়াই সাহেব "বেহারা বেহারা" বলিয়া ডাকিলেন। বেহারা আসিয়া সেলাম করিল। "যাও—ডাক্তার সাহেবকো বোলায় লে আও।" বলিয়া সাহেব চেয়ারে বসিলেন। বেহারা "যো হুকুম" বলিয়া দৌড়াইল। সাহেব চিন্তাম্লান মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। শ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "মেম সাহেবের কি অসুখ বড় বাড়িয়াছে?"

সা। অত্যন্ত। সদাই তাহাকে হারাইবার আশঙ্কা হইয়াছে।

শ্যা। আমায় তবে বিদায় দিন।

সা। আসুন।

সাহেব একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শ্যামবাবু বলিলেন "আমার হিসাব—টাকা কড়ি—"

সাহেব অপ্রসন্ন হইলেন। বলিলেন—"এরূপ অসুস্থ মনে কি করিয়া হিসাব হইতে পারে?

শ্যা। আপনি বিলাত চলিয়া যাইবেন, হয়ত আজ না আসিলে আর দেখা পর্য্যন্ত হইত না।

সা। তা কি করিব, আপনার হিসাব অপেক্ষা আমার মেম আমার বেশি প্রিয়।

শ্যা। তাহা বলিতেছি না। কিন্তু অত গুলা টাকা—তাহার তো একটা কিনারা চাই।

সাহেব রাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন "আমি আপনার ঋণের কথা জানাইয়াছি, আপনি কোর্ট হইতে আপনার পাওনা বুঝিয়া লইবেন।

শ্যা। সাহেব, টাকা আমি আপনার হাতেই দিয়াছিলাম। কোর্ট তাহা জানিত না।

সা। তখন জানিত না, এখন জানে। তুমি জানাও নাই, আমি জানাইয়াছি। ইংরাজ চোর নহে।

শ্যা। আপনি রাগ করিবেন না। শুনিলাম, আপনি ইন্সলভেন্সি লইয়াছেন, যদি তাহাই হয়, আমার ৫০ হাজার টাকা, কোর্ট হইতে ৫০ টা কড়ি পাইবারও আশা আমার নাই।

সাহেব নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। বলিলেন—"তাহাই যদি জান, তবে এখানে কি করিতে আসিয়াছ? ইউ অ্যারাণ্ট নেভ্! সন্ অফ অ্যান ইন্‌ফার্ণাল বিচ্!

শ্যামসুন্দর যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তখনই একটা হাতাহাতি হইয়া যাইত। কিন্তু যে বাঙ্গালী কথা কহিতে শিখিয়াই তাহার পৈত্রিক বুলি আওড়াইতে অভ্যাস করে—"স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনাং"—সেই বাঙ্গালীর বংশধর হইয়া শ্যামবাবু যে হঠাৎ অন্যরূপ ব্যবহার করিবেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি তদ্দণ্ডেই সেই মহাবাক্যের অনুসরণ করিতেন, কিন্তু—পঞ্চাশ হাজার—অনেকটা টাকা, তাহার মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আপনি গালি দিবেন না। দশ টাকা বিশ টাকা নয়, টাকায়, পয়সায়, নোটে, কাগজে মোক পঞ্চাশ হাজার টাকা গণিয়া আপনার হাতে দিয়াছি, আপনি আমায় গালি দিবেন না।"

সাহেব সেইরূপ উগ্রভাবে বলিলেন "গালি দিবে না—তোমাকে চাবুক দিবে। কি করিতে আসিয়াছ? আমাকে উপহাস করিবার জন্য? ইউ অন্‌গ্রেটফুল রোগ অফ এ বেঙ্গলি।"

শ্যা। হাতে দু ঘা মারার চেয়ে আপনি আমাকে জন্মের মত মারিয়াছেন। দোহাই ধর্ম্ম, আমার অন্য উপায় আর নাই।

শ্যামসুন্দর রোরুদ্যমান হইলেন। সাহেব বলিলেন "চোপ্, চিল্লাও মৎ, মেম বেমার হ্যায়।"

শ্যা। পঞ্চাশ হাজার টাকা গেল, তা এক ফোটা চোখের জলও ফেলিতে পাইব না!

সাহেব বলিলেন "তুমি বড় অনৃগ্রেটফুল। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, তুমি সুদে আমার নিকট পঞ্চাশ হাজারের উপর আদায় করিয়াছ। কোর্ট হইতে তুমি আর কিছু পাইতে পারিবে, কিন্তু আমি কোর্টকে লিখিয়া যাইব তোমায় যেন এক পয়সাও না দেয়। Now be gone, or the bearer will show you the door.

শ্যা। দোহাই সাহেব, আমায়—

সা। I won't hear you—বদ্‌জাত, নিমকহারাম, বেইমান, শূয়ার।

শ্যা। সাত দোহাই রক্ষা কর—আমি বড়—

সা। One word more, and I shall kick you out.

"হা ধর্ম্ম, তুমি কি একেবারে—" আর শ্যামসুন্দরের কথা কহিতে হইল না। সাহেবের বুট-শুদ্ধ পা আসিয়া শ্যামসুন্দরের গায়ে আঘাত করিল। চেয়ার ভীষণ ভাবে নড়িয়া উঠিল। শ্যামসুন্দর পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন। সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্যামসুন্দর এক গা ঘামিয়া ফেলিলেন।

আমরা সত্য বলিব, বাঙ্গালী হইলেও শ্যামসুন্দরের হাত সে সময়ে আপনা আপনিই দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল; দন্তে দন্তে ওষ্ঠ নিষ্পেষিত হইল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাহেব কর্কশ কণ্ঠে 'বেহারা বেহারা' বলিয়া হাঁকিলেন। বেহারা দৌড়িয়া আসিলে তাহাকে বলিলেন "যাও, এ বজ্জাতকো নেকাল দেকে ফাটক বন্ধ কর্ দেও।"

সাহেব আর দাঁড়াইলেন না, ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেহারা আসিয়া শ্যামসুন্দরের হাত ধরিল। দুঃখে, ক্ষোভে, রোষে শ্যামসুন্দর মনে মনে বলিলেন—"হে পৃথিবি, তুমি দোফাক হও, আমি তোমার ভিতর প্রবেশ করি।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামসুন্দর বাবু কে তাহা এখনও বলা হয় নাই। তাঁহার অন্য পরিচয়ের কথা না পাড়িয়া আমরা মোটামুটি একটা কথা বলিতেছি।

এই আখ্যায়িকার আরম্ভে যে বাড়ীর কথা উল্লেখ করিয়াছি—হেমচন্দ্র তাঁহার মাতা ও ভগ্নীর সহিত যে বাড়ীতে বাস করিতেন, মহামায়া যাহার গৃহিণী—শ্যামসুন্দর সেই বাড়ীর কর্ত্তা। শ্যামসুন্দর বাবুর নাম ডাক খুব ছিল। দশক্রোশ যুড়িয়া খ্যাতি। ক্রিয়া কর্ম্ম, পাল-পার্ব্বণ তাঁহার বাড়ীতে প্রায় ফাঁক যাইত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান-ধ্যানের ব্যাপারেও তাঁহার বেশ যশ ছিল। মিত্রপক্ষের তো কথাই নাই, শত্রুপক্ষীয়েরাও বলিত, "হাঁ লোকটা মন্দ নয়, শ্যামসুন্দর এক জন দোষেগুণে মানুষ।" শ্যামসুন্দরের পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি কিছুই ছিল না। টাকা কড়ি, ধন দৌলত, জমি জমা, যা কিছু সকলি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত। "স্বনামা পুরুষো ধন্য" বলিয়া অনেক চাটুর্য্যে, বাঁড়ুয্যে, ঘোষজা, বোসজা তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার গুণগান করিত। তাঁহার অর্থের পরিমাণ লইয়া অনেকে আঁচাআঁচি করিত। কেহ বলিত, তিনি লাক টাকা গণিয়া দিতে পারেন; কেহ বলিত, তিন লাক টাকার কাগজ কোম্পানিতে জমা আছে; কেহ বলিত তাঁহার শুইবার ঘরে পাঁচটা সিন্ধুক মোহরে বোঝাই করা। যাহা হউক, শ্যামসুন্দর দেশে বিলক্ষণ গৌরবে কাটাইতেন। অনেকেই তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত, সুতরাং অনেকেই তাঁহার বশীভূত। শ্যামসুন্দরের সকলি সুখের হইয়াছিল, কেবল বিবাহটী সুখের হয় নাই। বড় কুলগ্নে পতি-পত্নীর মিলন হইয়াছিল। সকল সুখের মধ্যে কেবল এক অসুখের কারণ তাঁহার পত্নী মহামায়া। মহামায়া দুঃশীলা, মহামায়া খলস্বভাবা, মহামায়া অপ্রিয়ভাষিণী। কিন্তু মহামায়া সুন্দরী। কাঁচা সোণার মত রঙ্, নিখুঁত গড়ন, এক ঢাল চুল। শ্যামসুন্দর সে রূপে মুগ্ধ। তিনি পত্নীকে ভয় করিতেন, অথচ প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন। মহামায়ার বাক্যের জালায় দূরে পলাইতে চেষ্টা করিতেন, অথচ তাহাকে এক দণ্ড না দেখিলে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেন। মহামায়া স্বামী-গৃহে আসিয়াই দেখিলেন, মাথার উপর খাশুড়ী ননদ কেহ নাই, তিনিই একা-ঘরের একা-গৃহিণী। বৎসর কয় পরে ভাইটীকে আপ-

নার সংসারে আনিলেন। দেখিবার কেহ নাই, তাই বহিয়া যায়। আর এক বৎসর না ফিরিতে, কাযেই মাতাও সেইখানে আসিলেন। ছেলেটি মেয়েটি ছাড়িয়া মা একা থাকেন কেমন করিয়া? বিধবা বোন্ সেই বা যায় কোথায়? মার সঙ্গে সঙ্গে সেও আসিল। তার পর ভাইজ-টীকেও কাজেই আনিতে হইল। চির কাল কিছু বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখা ভাল দেখায় না। শ্যামসুন্দর ইহা দেখিলেন। ভাবিলেন, সেই তো অন্য পাঁচ জনে খাইতেছে, না হয় ইহারাও কিছু খাইল। কিছু বলিলেন না। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। ক্রমে তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা প্রভু হইয়া উঠিল। তিনি যাহা না খান, না পরেন, মহামায়ার ভাই তাই খায়, তাই পরে। কিন্তু তাহা ফুক্‌রাইবার যো নাই। শ্যামসুন্দর নীরবে তাহা সহিতে লাগিলেন। মহামায়ার গর্ভে তাঁহার গুটিকত পুত্রসন্তান হইয়াছিল, ক্রমে তাহাদের পাছে অযত্ন হয় এই ভয়ে শ্যামসুন্দর সদাই অস্থির হইতেন; তাঁহার নিজের কথা আর মনে আনিতেন না। এইরূপে ধনে মানে ভয়ে বন্ধনে শ্যামসুন্দর বাবুর সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। পাঠক জানেন, হেমচন্দ্রের মাতার মৃত্যুর দিন তিনি বাড়ী ছিলেন না, তাহার সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখনও বাড়ী ফিরেন নাই। কলিকাতায় তিনি বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সে বিষয় কার্য্য কি, তাহা বলিয়াছি। কিন্তু সপ্তাহকাল ধরিয়া কলিকাতায় তিনি কি করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছি, শুনুন।

সেই পামর পামার সাহেব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ধীরে ধীরে শ্যামসুন্দর বাহিরে আসিলেন। মুখে কথা নাই, শরীরেও বুঝি স্পন্দ নাই। চোখে এক একবার জল বেগে উছলিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ক্রোধের দীপ্ত শিখায় তাহা শুকাইয়া যাইতেছে। মাথার ভিতর একটা ঘূর্ণি অবিরত পাক দিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অন্য বাহিরের কিছুরই অস্তিত্ব লক্ষিত হইতেছে না। চিন্তার বিষম দংশনে মর্ম্মের পরতে পরতে তীব্র জ্বালা জ্বলিতেছে। নীরবে শ্যামসুন্দর বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে গাড়ি দাঁড়াইয়া। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসিল "কোথায় যাইবেন?" কোথায় যাইবেন?

এ কথার উত্তর কি দিবেন! জগতে যে কোথাও যাইবার তাঁহার আর স্থান আছে, ইহা তিনি ভাবিতে পারিলেন না। তাঁহার বিষয়, জমিদারি, সে সংসার, সে বাড়ী, সে স্ত্রীপুত্র, আত্মীয় স্বজন সব যেন এক দণ্ডে কোথায় উবিয়া গিয়াছে, আর যেন কেহই নাই, কাহাকেও মনে পড়ে না। এ পৃথিবী ইহার সকল সামগ্রী লইয়া এক পা এক পা করিয়া তাঁহার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে—তাঁহার দাঁড়াইবার আর স্থান নাই—পৃথিবীর পরই দারুণ শূন্য তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য যেন ভীষণরূপে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। কোথায় যাইবেন?—শ্যামসুন্দরের চক্ষে জল আসিল। কোঁচার কাপড়ে চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন। পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, আপনার কি কোন অসুখ করিয়াছে?"

শ্যা। না।

প। চারিটা বাজিল। আর সময় নাই, তবে কালেক্‌টারি চলুন।

কালেক্‌টারি যাইবে বলিয়া পরমানন্দ জাগর বাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল। সে এইরূপ প্রতিবারে আসিত। বলিল, "আর সময় নাই—তবে কালেক্‌-টারিতে চলুন।"

আবার—আবার সেই কথা—সেই কালেক্‌টারি! শ্যামসুন্দরের মাথা ঘুরিতে লাগিল; হৃদয়ের অন্তস্তলে কে যেন অঙ্কুশ ফুটাইয়া দিল। কি উত্তর দিবেন ঠাহরিয়া পাইলেন না। কলে বলিলেন—"চল।" গাড়ী সেই দিকে ছুটিল। ভাবিতে ভাবিতে শ্যামসুন্দর যাইতে লাগিলেন। ভাবনা অসীম, মুর্ম্মদাহী, মর্ম্মচ্ছেদক। পঞ্চাশ হাজার টাকা এক কথায় কোথায় গেল! কত কষ্টের—কত অনাহার অনিদ্রা মরণাধিক যাতনার—কত প্রাণান্তিক পরিশ্রমের—সে টাকা দেখিতে না দেখিতে, শুনিতে না শুনিতে কি যাদুবলে কোথায় উড়িয়া গেল। সে কি কম? টাকায় ঘরে ধরিত না, কাগজে সিন্দুকে আঁটিত না—রাতারাতি কর্পূরের ন্যায় কোথায় উবিয়া গেল! কেমন করিয়া গেল! কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, কত মৃত্যুমুখে পড়িতে পড়িতে সেই টাকা উপায় করিয়াছেন একে একে সে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল, দীর্ঘনিশ্বাসে বুকখানা যেন শতহস্ত দমিয়া যাইতে লাগিল। হায় হায়, কেন এমন কর্ম্ম করিয়াছিলেন। বেশি সুদের লোভে কেন তাহা

ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া এই সাহেবের আপিষে রাখিয়াছিলেন? আ মরি মরি সে মায়া কি ভুলিবার? শ্যামসুন্দরের কান্না আসিল। শ্যামসুন্দর কাঁদিলেন। কিন্তু তাই কি দুদণ্ড কাঁদিয়া সে দারুণ শোক লাঘব করিবার সময় আছে? মানুষের দুর্ভাগ্য একা আসে না। কাপড়ে এক যায়গায় একটা ছিদ্র হইলে তাহা ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িতে আরম্ভ হয়।

কালেক্টারি খাজনার আজ শেষ দিন—সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সময়—তার পর? তার পর সে ভবিষ্যৎ ভাবিতে শ্যামসুন্দর শিহরিয়া উঠিলেন। বালুচকের প্রজারাই মাতব্বর প্রজা. কালেক্টারির বার আনা খাজনা সেখান হইতে আদায় হয়। এবার তাহারা এক পয়সাও দেয় নাই। শ্যামসুন্দরের শ্যালক শশিভূষণ এক জন প্রজার ঘর জ্বালাইয়া দেওয়ায় তাহারা সকলে মিলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে। শ্যামসুন্দর শ্যালকের স্বভাব জানিতেন, সেই জন্য তাহাকে কদাচ জমিদারিতে যাইতে দিতেন না। কিন্তু ভার্য্যা মহামায়ার একান্ত অনুরোধ। শ্বশ্রুঠাকুরাণীও বলেন—"ছোঁড়াটা খারাপ হইয়া গেল, কিছুই কাজ বুঝিল না. আর আপনার জনেই যদি কাজ কর্ম্ম না শেখাবে, তবে শিখিবেই বা কেমন করিয়া?" মহামায়াও তাই ধরিয়া স্বামীকে বলিতেন "সেই তো অপর লোককে মাহিয়ানা দিয়া নায়েব রাখিতে হয়, তা আপনার লোক বসিয়া থাকিতে পয়সা দিয়া অন্য লোক রাখা কেন?" প্রথম প্রথম শ্যামসুন্দর বাবু ভার্য্যার কথায় "তা হবে—দেখা যাবে" বলিয়া কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু, পুরুষ মানুষ যে বড় বোকা, অর্থনীতির কিছুই বুঝে না মহামায়া স্বামীর দেখা পাইলেই ভ্রাতার কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া ইহা তাঁহাকে বিধিমতে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও প্রথম প্রথম শ্যামসুন্দর হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। শেষ, আর হাসি তামাসায় চলিল না। মহামায়া এক দিন সাফ বলিলেন, "যদি আমার কথা তোমার এতই অগ্রাহ্য হয়, আর মনের ভিতর কিছু থাকে তা ভেঙ্গেই কেন বল না, পেটে একখানা মুখে একখানার দরকার কি? সত্যি সত্যি খেতে পায় না বলে চাট্টি ভাতের জন্য ওতো আর তোমার বাড়ি পড়ে থাকে নি, তাই বল, না হয় শশে আপনার বাড়ী চলে যাক্।" শ্যামসুন্দর দেখিলেন, আজ আর সহজে হইবে না। কথাটার ভিতরে

অনেক অর্থ আছে। শশী বাড়ী যাইলেই সুতরাং তাহার মাকেও যাইতে হইবে; মা গেলেই কাজেই মহামায়াও প্রায় সেখানে যাইবেন। তা ছাড়া তাঁহাকে দুটা সংসার টানিতে হইবে। অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া শ্যামসুন্দর বলিলেন "আমার কি অমত? তবে ছেলে মানুষ, কোথায় বিদেশে গিয়া থাকিবে সেই জন্যই এত দিন যাইতে দিই নাই, তা তোমার যদি একান্ত মত হয়, শশীকে গিয়া বল, তৈয়ার হউক, কালই বালুচকে যাইবে।" মহামায়া বলিলেন, "তা হবে, তুমি এখন হাত মুখ ধোও, একটু জল খাও।" মহামায়া মাতাকে গিয়া এ সংবাদ দিলেন। শশিকে ডাক পড়িল। দুই জনে তাহাকে অনেক শিখাইলেন পড়াইলেন। পর দিন সুবাতাস উঠিলে শশিভূষণ সাজিয়া গুজিয়া নৌকায় গিয়া আরোহণ করিলেন। তার পর বালুচকে গিয়া শশিবাবু যে সব কীর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, সে অনেক কথা। শ্যামসুন্দর সে সংবাদ পাইয়া শশিভূষণকে নাম মাত্র নায়েব রাখিয়া তথাকার আমিনকে সকল কাজ তদারকের ভার দিলেন। কথায় কথায় নায়েবে আমিনে খুটিনাটি চলিতে লাগিল। আমিন বুড়া; বুঝিল শশিভূষণ কর্ত্তার যিনি কর্ত্রী তাঁহার সহোদর—মাথার মণি, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করা অসম্ভব। বুড়া চাকুরি ছাড়িয়া দিল। শ্যামসুন্দর প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারেন না। গোপনে গোপনে নূতন আমিনের জন্য লোক খুঁজিতে লাগিলেন। তখন জানি সম্মুখে, পাকা লোক সহজে মিলে না। দিন কয়েক বিলম্ব হইল। এই সময়ে শশিভূষণ এক দিন এক প্রজার একটি যুবতী কন্যার উপর আক্রমণ করিল। প্রজা গাঁয়ের মোড়লদের জানাইল। মোড়লেরা গিয়া শশিভূষণকে কিছু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। তাহারা আগে হইতেই তাঁহার উপর চটিয়া ছিল। রাগে দুই প্রহর রাত্রে শশি তাহাদের এক জনের ঘর জ্বালাইয়া দিলেন। প্রাতে শশিকে মারিবার জন্য সকলে লাঠি হাতে কাছারি বাড়ীতে ছুটিল। কিন্তু তাহার দেখা কেহ পাইল না। রাত্রেই সে স্থান হইতে সে পলাইয়াছিল। তখন সকলে ধর্ম্মঘট করিল, এ সন এক পয়সাও কেহ খাজনা দিবে না। এসব কথা শ্যামসুন্দর যথা সময়ে জানিতে পারে নাই। তাহা হইলে নিজেই বালুচকে যাইতেন। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভাল দেখিয়া এক আমিন পাঠাইয়া

দিলেন। আমিন কার্য্যস্থানে আসিয়া ফাঁকরে পড়িলেন। অনেকে তাঁহাকেই মারিতে উদ্যত হইল। অনেকে আবার তাঁহাকে নিরপরাধ জানিয়া তাঁহার পক্ষ হইল। তখন লাটের কিস্তির আর সপ্তাহ মাত্র বাকি। একটীও পয়সা চালান আসিল না দেখিয়া শ্যামসুন্দর ভাবিত হইলেন। আমিনের কাছে লোক পাঠাইলেন। আমিন সকল কথা খুলিয়া লিখিয়া সেই লোক ফিরাইয়া পাঠাইলেন। শ্যামসুন্দর পত্র পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। লোক আসিতে যাইতেও পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। এখন যে তিনি নিজে গিয়া আর কিছু করিতে পারিবেন সে ভরসা নাই। সে সময়ও নাই। কাল লাটের কিস্তি! গায়ে বিষের জ্বালা রি রি করিয়া জলিয়া উঠিল। মহামায়াকে ভৎর্সনা করিবার জন্য পত্র লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মহামায়া তখন দর্পণের কাছে দাঁড়াইয়া মুখে শর মাখিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "কি—কি হইয়াছে? অমন করিয়া আসিয়াছ কেন?" শ্যামসুন্দর পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। মহামায়াকে ভৎর্সনা করিতে গেলেন। মহামায়া উচ্চে "ভাইরে—আমার!" বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। নীচে, ভাঁড়ার ঘরে মহামায়ার মাতা ঝির সঙ্গে কোন্দল করিতেছিলেন, মেয়ের রোদনশব্দ পাইয়া দৌড়িয়া উপরে গিয়া "ওগো কি হলো গো—ওগো আমার মা লক্ষ্মী এমন করে কেন গো।" বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। দেখিয়া শুনিয়া শ্যামসুন্দর হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহামায়ার কান্না কিছুতেই থামে না। সুতরাং তাঁহার মাতারও কান্না অনিবার্য্য—তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত হইল, জামাই তাঁহার মেয়েকে মারিয়াছে, সেই সিদ্ধান্তে জামাইকে সহস্র তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তার পর মেয়ের চোখ মুছাইয়া বলিলেন, "কেন মা, তোমার কান্না? চল এখনই আমরা এখান হ'তে বেরুই, পেটে যখন জায়গা দিয়াছি তখন হাঁড়িতেও জায়গা দিতে পারবো।" এই বলিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া উঠাইতে গেলেন। মহামায়া তখন চোখ মুছিয়া বলিলেন—"আ মরণ, ওকথা তোমায় কে বল্লে?" "ওমা, তা না, তবে কি, মা?" বলিয়া মাতা আবার কন্যার মুখ মুছাইতে বসিলেন। মহামায়া তখন কাঁদিয়া সব বলিলেন। তখন "ওগো আমার বাছা কোথায় গো—আমার সোণার যাদুকে এনে দাও গো।"

বলিয়া মাতা উচ্চে স্বর তুলিলেন। মহামায়ারও ভ্রাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। শ্যামসুন্দর বলিলেন—"কাঁদিলে কি হইবে? এখন থাম। এদিকে লাটের কিস্তি, বিষয় যায়।"

মহামায়া বলিলেন—"রাখ তোমার কিস্তি! আমার ভাই এনে দাও—নহিলে তুমি তোমার বিষয় নে থাক—আমি বিষ খাব!"

শ্যামসুন্দর বলিলেন—"আজই আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

মহামায়া বলিলেন—"তা হবে না। তোমার বিষয় বড় না আমার ভাই বড়? আগে আমার ভাইয়ের খোঁজ কর, তবে যাইতে পাইবে।"

অগত্যা শ্যামসুন্দরের সে দিন কলিকাতায় যাওয়া হইল না। শ্যালকের অনুসন্ধানে নানা স্থানে লোক পাঠাইলেন। রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন একজন গোমস্তা শশিবাবুকে লইয়া আসিল। শশিবাবু তালুক হইতে পলাইয়া দিন কয়েক এদিক্ ওদিক্ করিয়া সেই দেশেই আসিয়াছিলেন, তবে হঠাৎ বাড়ী যাইতে সাহস না হওয়ায় এক স্থানে গোপনে বাস করিতে-ছিলেন। সময় বুঝিয়া আপনিই ধরা দিলেন। শশিবাবু বাড়ি আসাতে তাঁহার যে ভয় হইয়াছিল তাহার আর কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। কেহ ভৎসনা গঞ্জনা করিল না। মহামায়া ও মাতা "ওগো আমার হারা-ধন ফিরে এল গো!" বলিয়া দৌড়িয়া গেলেন। শশিবাবু দেখিলেন যে, মন্দ নয়, কোথায় তিরস্কারের ভয় না এ পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদর। মনে মনে বড়ই আহ্লাদ হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলেন, তিনি যেন একটা দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন। সে রাত্রে সকলেরই আনন্দের সীমা নাই। মহামায়া ও তাঁহার মাতার আনন্দ তো হইবেই, চাকর দাসীদেরও মহা আনন্দ—এই সুযোগে মা ঠাকুরুণের কাছে তাহারা বখশিষের আশা করিতে লাগিল। সবারই আনন্দ, কেবল শ্যামসুন্দর নিরানন্দ, ম্রিয়মাণ ও চিন্তা-মগ্ন। কোনরূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাত হইল। আজ লাটের শেষ দিন। শ্যামসুন্দর মুখ হাত ধুইয়াই পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে কলিকাতায় চলিলেন। তাঁহার একমাত্র শেষ ভরসা, পামার সাহেবের নিকট হইতে টাকা লইয়া সেবারের কালেক্টারি খাজানা দাখিল করিবেন। সেই শেষ ভরসায় বুক বাঁধিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া যাহা যাহা ঘটিল তাহা বলিয়াছি। তাঁহার চক্ষে সকলই প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি জাগ্রত কি নিদ্রিত এক এক বার তাহা সন্দেহ হইতে লাগিল। এ কি কখন সম্ভব—ইহা কি হইতে পারে—মানুষের এমন কখনও কি হয়—শ্যামসুন্দর এত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একমাত্র যে আশালতায় তাঁহার প্রাণ বাঁধিয়াছিলেন, সে আশালতা আজ একেবারে নির্ম্মূল—প্রাণও বুঝি আর রহে না। গাড়িতে বসিয়া শ্যামসুন্দর আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। পরমানন্দকে ডাকিলেন। বলিলেন, "গাড়ি ফিরাইতে বল, কালেক্টারি আর যাইতে হইবে না। খিদিরপুরে চল।" খিদিরপুরে বাবুর এক আত্মীয় থাকিতেন। পরমানন্দ গাড়ি সেইখানেই যাইতে বলিল। যথাসময়ে খিদিরপুরে গিয়া পৌঁছিলেন। আত্মীয় পরমাহ্লাদে আহারাদির আয়োজন করিতে গেলেন। শ্যামসুন্দর বলিলেন "বড় অসুখ—আহার করিব না।" সুতরাং সন্ধ্যার পরই শয্যা হইল, তিনি অনাহারে গিয়া শয়ন করিলেন। অনিদ্রার যন্ত্রণাময় দীর্ঘরাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে যখন সেই আত্মীয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া শ্যামসুন্দর বাবুকে দেখিতে গেলেন, তখন তাঁহার দুই চক্ষু জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, মুখ ভার, গায় আগুণ ছুটিতেছে—প্রবল জ্বরে বিছানায় পড়িয়া তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন।

বিদায় ভিক্ষা।

অদৃষ্টে তাড়নে, সখি, দুজনে পড়িব দূরে
হৃদয় না স'বে এ বেদন,
সহেনা, কভুনা স'বে, হৃদয় আপনি লবে
খুঁজি তার মমতার ধন!
রহিবে লোহার মত চুম্বকের গায়,
পরাণে পরাণ বাঁধা কায়ার ছায়ায়!

২

সত্য সখি, সত্যই কি ছেড়ে যেতে হবে
লয় হবে স্বপ্নময় আনন্দ উচ্ছ্বাস,
ঢাকিবে উষার রবি বিষাদ বারিদে
ফুরাবে কি পরাণের বসন্ত বাতাস?
পাখীর কূজনে আর মধুরতা পাব না
চাঁদের অমিয়া হবে বিষ,
পাগল ফুলের গন্ধে ছুটে ছুটে যাব না
সৌরভে ভরিলে দশদিশ!
প্রকৃতির শোভা হেরি মনে সুখ পাব না
যেন কি অভাব তার মাঝে,
একখানি হাসিমুখ— মোহময়, স্বপ্নময়,—
রবে ফাঁক প্রকৃতির সাজে!

হায় সখি সত্যই কি দূরে চলে যেতে হবে
দেখা আর পাব না তোমার!
মধুর বচনে তোর কভু কিরে অভাগার
বাজিবে না পরাণের তার?
নিরজনে শূন্য মনে হেরি কভু ছবি তোর
পরাণে কি আঁকিতে পাব না
সুধু দেখা তার সাথে মুখের মধুর বাণী
এ পরাণে ধরিতে পাব না?
ভাবিতে পারি না আর পরাণ কাটিয়ে যায়,
মস্তিষ্ক বিকৃত করি ঘূর্ণিত ঝটিকা ধায়;
একবার দিও সখি দেখা
ভাল না বাসিতে পার, দয়া করে কথা কোয়ো
যদি থাকে বিধাতার লেখা।

আকুল পরাণ মোর মানা ত মানে না সখি
বল তায় আমি কি করিব ?
যদি কভু হয় দেখা করুণা করিও দান,
দয়াভিক্ষু দুয়ারে রহিব !

৪

গৌরবে তোমার বায়ু সৌরভ বহিবে যবে
অধিক বিনয় আর অধিক গরিমা ভরে
ফুল্লপ্রাণে থাকিবি যখন,
তোর সে হরিষ প্রাণে আঁকিস্ বিষাদ ছবি,
তোমারি দুয়ারে সখি তাপিত তোমারি কবি
হতভাগা ছিল একজন।

৫

তুমি আনন্দে অধীরা যবে
পাশে সখা তোমার রবে
সখি ভাবিও বারেক তবে
এই কাতর কবির কথা,
তাপিত দীনের বিষাদের ছবি
হৃদয়ে আঁকিও ব্যথা !
সখি, যখন সাঁঝের বেলা
হেরি নবীন ফুলের খেলা
দেখি গগনে তারার মেলা
সখি, হইবে হরিষ প্রাণ ;—
দেখো তখনি বিষাদ ছবি
দূর গগনে সাঁঝের রবি
শুনো পাখীর বিদায় গান।
তবে বুঝিবে তোমার কবি
সখি হয়েছে সাঁঝের রবি
তার প্রতিভা [illegible]

তায়, পরাণ গাহিছে বিদায়ের গান
মনে কোরো একবার!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু সমাজ ভগ্ন-সেতু নদী-প্রবাহের ন্যায় নানা-পথগামী হইয়া পড়িতেছে। যে সকল কারণে ধর্ম্মসেতু ভগ্ন হইয়াছে তন্মধ্যে রাজ ও সমাজ শাসনাভাব যেমন প্রবল কারণ তেমনি শাস্ত্রসঙ্করও মহদ্দোষের হেতু। সকল প্রকার দোষ হইতে, চেষ্টা করিলে, নিস্তার পাওয়া যায়। শাস্ত্র-সঙ্কর দোষ হইতে হঠাৎ উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে যুগের জন্য যে যে শাস্ত্র নির্দ্ধারিত আছে সেই সেই শাস্ত্র মতে ক্রিয়া না করিলে শাস্ত্রসঙ্কর দোষ ঘটে। যেমন সত্যযুগে কেবল বেদ মন্ত্রে ক্রিয়া করিবে, ত্রেতাতে শ্রুতি মতে, দ্বাপরে পুরাণ মতে, কলিতে কেবল তন্ত্র মতে কার্য্য করিলে ফল লাভ হইবে; এরূপ না করিয়া বেদ শ্রুতি পুরাণ মতে ও তন্ত্র মতে কলি ও প্রবল কলিতে কর্ম্ম করিলে শাস্ত্রসঙ্কর দোষ জন্মে। যে যে ক্রিয়ায় সাঙ্কর্য্য দোষ ঘটে সে সকল ক্রিয়া বৃথা হয়। যেমন বৈদ্য ও রোগসঙ্কর রোগীর পক্ষে, তেমনি কর্ম্ম কাণ্ড পক্ষে শাস্ত্রসঙ্কর।

মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্র এক কোরাণ, খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের শাস্ত্র এক বাইবেল, কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মের চারি বেদ ও বহুতর শ্রুতি ও স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র যামল ডামর ও সংহিতা ইত্যাদি অগণ্য শাস্ত্র। এই অগণ্য শাস্ত্রে হিন্দুয়ানির বিধি নিষেধ আছে। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে সাঙ্কর্য্য দোষ সহজে ঘটিয়াছে, এবং তাহা ঘটিয়াছে বলিয়াই হিন্দুধর্ম্মকর্ম্মের প্রকৃত ফল লাভ হইতে পারিতেছে না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র যদি কোরাণ আর বাই-বেলের ন্যায় সসীম ও পরিষ্কৃত হইত, তবে হিন্দুধর্ম্ম ঠিক থাকিত। বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমান কলিযুগের পূর্ব্বে সত্য

ত্রেতা দ্বাপর যুগের হিন্দু ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য সত্যে বেদ, ত্রেতায় শ্রুতি স্মৃতি দ্বাপরের জন্য পুরাণ, কলির জন্য আগম, প্রবল কলির জন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্র নির্দ্ধারিত আছে। এরূপ শাস্ত্র ছিল বলিয়াই পূর্ব্বে হিন্দুয়ানির হানি হয় নাই। এই কলিযুগের ২১ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজা আর স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর তাঁহারা যথাশাস্ত্র যুগধর্ম্ম প্রতি-পালন করিতেন বলিয়া তৎকালে হিন্দুশাস্ত্রে সাঙ্কর্য্য দোষ-স্পর্শ হয় নাই, শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফলও অব্যর্থ ছিল। পরে কলিযুগ ২২শত বৎসর বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে পর যে ভয়ানক প্রবল জলপ্লাবন হয় তাহাতে ভারত একেবারে প্রজা ও শাস্ত্রশূন্য হইয়া পড়ে ও পুরাতন শাস্ত্র সকল বিলোপ প্রায় হইয়াছিল। পরে পার্ব্বত্য দেশ হইতে অল্পে অল্পে প্রজা পত্তন হইতে আরম্ভ হইলে যিনি যেমন দেশে বাস করিতে লাগিলেন সেই সেই দেশোপযোগী আচার ব্যবহার ও শাস্ত্র সকল প্রস্তুত হইল। আদিম বৈদিক শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার প্রায় লোপ পাইল। এ কালের শাস্ত্রের নাম কল্পসূত্র হইল। এ শাস্ত্র সকল শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র হইতে সংরচিত হওয়ায় লোকসমাজে আদৃত হইয়া ৩।৪ শত বৎসর কাল অব্যাহত থাকিল। তৎপর বৌদ্ধ বিপ্লাবন উপস্থিত হইয়া ক্রমাগত এত কাল বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল হেতুও হিন্দু ধর্ম্ম বিলোপ হইবার উপক্রম হইল। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম নানা দোষাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যোগ যাগ থাকিল না। বৌদ্ধ বিপ্লাবনের পর পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে প্রবল হইতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য হইতে পৃথ্বীরাজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ হইয়া পড়ায় তন্ত্র শাস্ত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য নিজে বেতালসিদ্ধ ছিলেন। বেতাল, ভৈরব সাধনার প্রকরণ তন্ত্র শাস্ত্রেই দেখা যায়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্রে দেখা যায় না। ইহা ছাড়া কবি-কুলতিলক কালিদাসের জীবনীতে প্রকাশ আছে যে তিনি একরাত্রি মাত্র সাধনা করিয়া বাগ্বাদিনী সিদ্ধ হইয়া ছিলেন। তান্ত্রিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়ায় এরূপ সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না।

পৃথ্বীরাজের পিতা তন্ত্রোক্ত তন্ত্রকালীর উপাসক ছিলেন, ইহা মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের কৃত রাজাবলিতে প্রকাশ আছে। তন্ত্র শাস্ত্র অতি গোপনীয়

শাস্ত্র বলিয়া উহা অপ্রকাশ্য হইয়া আছে। শাস্ত্র কেবল মন্ত্রময়। মন্ত্র আর মন্ত্রণা যতই প্রকাশ হইবে ততই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। এই জন্য জগৎগুরু শিব বলিয়াছেন যে, তন্ত্র শাস্ত্র অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধুর ন্যায়। আর আর শাস্ত্র সকল বারবিলাসিনীর ন্যায়। ১৯২ খানি তন্ত্র ৬খানি ডামর আর ৬খানি যামিল মানব হিতার্থে প্রকাশ পায়। এই সকল তন্ত্র আর ডামর ও যামল এবং বেদ ও শ্রুতি স্মৃতি আলোড়ন করত প্রবল কলিকালের মানব-হিতার্থে শিব মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ তন্ত্রের আশ্রয় লইলে বেদ পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি ও আর আর তন্ত্রের গোলযোগে পড়িতে হইবে না। এই তন্ত্র অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জাঁকজমকপূর্ণ বা দাম্ভিক নহে। শিবের সিদ্ধির ঝুলির বিষয় যে প্রবাদ আছে তাহাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

বেদ যে সময়ে প্রকাশ হয় তখন বেদ বৈ আর কোন শাস্ত্র প্রকাশ পায় নাই। আর তখনকার লোক এমনি পুণ্যবান্ তপস্বী ছিলেন যে অনায়াসে বেদার্থ বুঝিতে পারিতেন ও উচ্চারণক্ষম ছিলেন। এমন কি সঙ্গীতস্থলে বেদ মন্ত্র ও স্তোত্র সকল স্বর ও তালমান লয় মিশ্রিত গান করিলে স্ত্রীপুরুষ বালবৃদ্ধ সকলে মোহিত হইতেন। ইহার নাম সত্যযুগ। তৎপর শ্রুতি স্মৃতির সময় উপস্থিত হইলে বেদ সকল সময়ের গুণে কঠিন বোধ হইতে লাগিল বলিয়া শ্রুতি আর স্মৃতি প্রচার হইল। এই শ্রুতি আর স্মৃতি বেদমূলক। কিন্তু বেদ হইতেও কিছু সহজ হইল। ঐকালের তাবৎ ক্রিয়া কলাপ কেবল শ্রুতি আর স্মৃতি অনুসারে নির্ব্বাহ হইত। এই কালের নাম ত্রেতাযুগ হইল। এ কালেও শাস্ত্রসঙ্কর দোষ ঘটে নাই। অতঃপর দ্বাপরযুগ উপস্থিত হইলে তৎকালের রাজা ও পণ্ডিতগণ একতা পূর্ব্বক হিন্দুদিগের অবস্থা ও বলাবল ও রুচি অনুসারে তাবৎ কর্ম্ম কাণ্ডের নিমিত্ত বেদসম্মত পুরাণ নামক শাস্ত্র প্রচার করায় লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এই পুরাণ নানা স্থানের জন্য নানাপ্রকার গঠিত হইল। গুরু ও পুরোহিতের গুণে এ কালেও সাঙ্কর্য্য দোষ নাই। প্রণালিমত কার্য্য ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের অধস্তন সন্ততিপর্য্যন্ত থাকিল। তৎপর প্রকৃত ক্ষত্রিয় রাজার আর মুনিঋষির অদর্শন হইলে সমগ্র দেশ নিঃশাস্ত্র হইয়া পড়ে। কেহ কেহ এই ভীষণ ধর্ম্মপ্লাবনকে যুগপ্রলয় বলিয়া জানেন। এই প্রলয়া-

বসানের পর ভারতে শাস্ত্র সকলের অর্থাৎ বেদ, পুরাণ শ্রুতি স্মৃতির নূতন রূপ যেমন হইল, কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতিও তদনুরূপ হইয়া উঠিল। ভারতের ক্রিয়া কলাপের যে সকল শাস্ত্র প্রস্তুত হইল তাহা বেদ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্র মিশ্রিত হইয়া হিন্দুয়ানি রক্ষা হইতে লাগিল। এইরূপ ক্রিয়া কলাপের পদ্ধতিতে সাঙ্কর্য্য দোষ যে ঘটিয়াছিল তাহা বুঝা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে বেদ সত্য যুগের, শ্রুতি স্মৃতি ত্রেতা যুগের; পুরাণাদি দ্বাপর যুগের ধর্ম্মশাস্ত্র—এক যুগের শাস্ত্র কখনও অন্য যুগে ব্যবহৃত হয় নাই; সুতরাং কলিযুগে তাহাদের একত্র ব্যবহার হওয়া যে সম্ভবপর তাহা কখনই বোধ হয় না। বিশেষ, যে যুগের যে শাস্ত্র তাহা যখন পরবর্ত্তী যুগেও প্রচার ছিল না, তাহা যে তাহার এত পরেও সেই যুগশাস্ত্র রূপে প্রচারিত হইবে ইহা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। শাস্ত্রসঙ্কর মানব মঙ্গলের নহে। কলিযুগে যে শাস্ত্রসঙ্কর ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই, তাহা কখনই হইতে পারে না। যিনি মঙ্গলনিলয়, তিনি অবশ্যই তাহার অন্য কোন ব্যবস্থা করিয়াছেন। শাস্ত্রসঙ্কর পরিত্যাগ করিয়া সেই ব্যবস্থানুসারে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাই তন্ত্রকার বলিয়াছেন,

> যুগাদৌ বেদমার্গেণ ত্রেতায়াং শ্রুতিসম্মতং।
> দ্বাপরে চ পুরাণেন কলাবাগমসম্মতং॥
> আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ ভজেৎ সুধীঃ।
> নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলাবন্য বিধানতঃ॥

[ক্রমশঃ

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

গৃহ।

এই সেই শত-প্রেম-কাব্যের রাজধানী গৃহ—আমার কত ভাবী আশার সাধের চাঁয়া বাঁধানো-পাথরে নির্ম্মিত ইহজীবনের একমাত্র সুখের জন্মভূমি—আজ অতি পুরাতন, মলিন, ভগ্ন, পরিত্যক্ত! আজ ইহাকে আর

চিনা যায় না। আজ ইহা অন্ধকারের বিপুল রাজধানী! সে সুন্দর প্রাণ-উদাসী বাতায়ন আজ চিররুদ্ধ! ধূলি-জালে ঢাকা। তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্য-কিরণের অবিরাম ছায়া-খেলা আর দেখা যায় না। আজ এ গৃহ পেচক-বাদুড়-হিংস্র জন্তু প্রভৃতির বিচরণ-ভূমি! গভীর অন্ধকার রজনীতে কেহ ইহার মধ্যে একা প্রবেশ করিতে সাহস করে না। জনপ্রবাদ, ইহা এখন প্রেত-নিবাস!—আর দুঃখের বাকি কি?—হা প্রকৃতি, তোমার অনন্ত লীলা!!

আজ কত—কত দিনের পর শত-মূর্ত্তিময়ী বিশ্বাসঘাতিনী স্মৃতির নীরব মোহমন্ত্রময় বাঁশী শুনিতে শুনিতে কোথাকার পথ ভুলিয়া আবার সেই হৃদগুস্থায়ী অতীত সুখের অবসান—গৃহে আসিয়াছি। দিবসের কর্ম্মশ্রমে শ্রান্ত বিবসনা সন্ধ্যার এই শান্তিপ্রদ স্তব্ধতার শিথিল ক্রোড়ে বসিয়া এই গৃহ আজ কি ভাবিতেছে? এ গৃহ কি সেই শত হাসি-জ্যোৎস্না-রূপ-রঙ্গের কেন্দ্রভূমি? তবে কিছু আর দেখিতে পাইতেছি না কেন? সে লাজমাখা মধুর অস্ফুট গলা আর শুনিতে পাইলাম না কেন? সে হাসি কোথায়? সে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি কোথায়? অস্ফুট গোলাপের মতন অবগুণ্ঠনে ঢাকা সে মধুর লজ্জা কোথায়? গভীর অনন্ত সাগরের মতন সে অতলস্পর্শ প্রণয় কোথায়? দূরাগত সঙ্গীতের মতন সেই সুখের উচ্ছাসময় আন্দোলন কোথায়? সেই সুধামাখা প্রাণ-জুড়ান কথা কোথায়? হৃদণ্ডের অদৃশ্যের সেই প্রাণ-হরা ব্যথা কোথায়? জড়প্রকৃতির কোমলতার সমষ্টি সেই প্রেম-ময় চাঁদ আজ কোথায়? প্রাণের অনন্ত তৃষা-মিটান সেই মধুর স্বপ্নময় নিশি কোথায়? সেই জীবনময় বসন্ত কোথায়? সেই পাখী কোথায়? লতাবঁধুদিগের সেই নীরব কোলাকুলি কোথায়? সে সব সুখ দিনের ছবি মধুর স্নিগ্ধকর—পুরাতনের সেই মধুর স্নিগ্ধকর বাতাস কোথায়? দিবসের সেই সুখ-দুঃখ-জাগান অস্ফুট বিচিত্র ছায়া-খেলা কোথায়? জগৎবাঁশীর সে অপূর্ব্ব প্রাণ-উন্মাদকারী বিবিধ তান আর শুনিতে পাই না কেন? কই?—এ কি দেখি?' সব শূন্য যে! তাই এমন নীরব! যেন ইহা কাহার সমাধির ভগ্নাবশেষ!! সমাধি? কাহার? সে নহে কি? আজ আমি কি তবে তাহার সমাধি দেখিতে আসিয়াছি! তাই কি গৃহ, আমাকে

দেখিয়া ঐ ভগ্ন কপাটের মধ্য দিয়া সমীরণের "হায় হায়" শব্দে কাঁদিয়া উঠিল। হৃদয় ফাটিয়া যেন বলিয়া উঠিল—"সব অবসান! ভ্রমের খেলা সাঙ্গ! আর তোমার অত মমতাপূর্ণ আত্ম-বিস্মরণকারী মধুমাখা দৃষ্টি কেন? কেন চক্ষু অশ্রুপূর্ণ? জাননা কি নিষ্ঠুর আপন কার্য্যে সদা-ব্যস্ত অন্ধ জড়-প্রকৃতির এই নিয়ম? তোমার সাধের গৃহ চিরদিনের মতন ভাঙ্গিয়া—তাহার কার্য্য শেষ করিয়া—সে চলিয়া গিয়াছে!" হায়, কে বলিয়া দিবে আমাকে সে কোথায়—কোন্ দেশে—কোন্ সমুদ্রের তীরে চলিয়া গিয়াছে!

কে সে? যে অতীত সুখের চিহ্নস্বরূপ কত স্মৃতি-জাগান এই সোণার গৃহের একমাত্র গৃহিণী ছিল! যে এক দিন এই অন্ধকারময় গৃহ রূপে আলো করিয়াছিল! যে এক দিন এই গৃহ নাট্যমন্দিরে কত সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের কত বিরহ-মিলনের অভিনয় দেখাইয়া আমাকে চিরদিনের মতন মুগ্ধ করিয়া তাহার অভিনয় শেষ করিয়া—তাহার শেষ কথা বলিয়া—চলিয়া গিয়াছে! যাহার লাজমাখা মধুর দৃষ্টির অস্ফুট কিরণ, এই গৃহের চারি দিকে স্মৃতির অশরীরী স্পর্শের মতন নৃত্য করিয়া বেড়াইত! যে সন্ধ্যাতারার মতন এই কোলাহল-শূন্য গভীর শান্তিপূর্ণ বিজন গৃহ-আকাশে প্রতিদিন অলিত! যে কত শত দিন এই গৃহের ঐ দক্ষিণা বাতাস-বহা বাতায়নে বসিয়া কবিত্বময় স্মৃতির রঙ্গভূমি ঐ অনন্তনীল নির্ম্মল আকাশের কোলে প্রেমের কত সুমধুর কোমল স্বপ্নময় আশার ফুল ফুটিতে দেখিয়া ভাবিয়াছে যে, এ দিন কি আমার ফুরাইবে! আবার কত বিশ্ব-অন্ধকারকারী স্বত-প্রাণ-কেঁদে-ওঠা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাহার বিপরীত দেখিতে পাইয়া সেই দুখানি বড় বড় নির্ম্মল স্নেহস্ফুট চক্ষের অনন্ত বারিধারায় ঐ বাতায়ন ভাসাইয়া দিয়াছে! যে কত গভীর চির-স্বপ্নছবিময় শারদ-জ্যোৎস্না-নিশীথে দূরাগত বাঁশীর তানের মতন প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আমার হৃদয়ের অন্তঃপুরে কত নীরব প্রেমগীতি চালিত—কত মধুর বিচিত্র উপকথা শুনাইত! যে এক দিন এই গৃহে বসিয়া তাহার ক্ষুদ্র জ্ঞান লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "Is matter certain?" জীবন কি স্বপ্ন? কবিত্ব কি দুদিনের তুচ্ছ খেলা? মরীচিকা? যে এক দিন এই দুঃখে-ভরা আঁধার গৃহ-সিংহাসনের উপর রাণীর মতন বসিয়া আমাকে কত কল্পনাতীত জগত-ভুলান বেশে সাজাইয়াও আশা মিটাইতে পারে নাই!

যে প্রতিদিন এই গৃহ-উপকূলে মলিন মুখে দাঁড়াইয়া আকুল অন্তরে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। যে এই রৌদ্র-তপ্ত ঝড় বৃষ্টি-প্রপীড়িত মরুভূমিপ্রায় গৃহের চিরশান্তিদাতা চিরছায়া ছিল! যে কতদিন মুহূর্ত্তের জন্য অদৃশ্য হইয়া শূন্য গৃহে আমার ভাব—মূর্ত্তি ত্রুক্ষইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিব মনে করিয়া—কি জানি কি ভাবিয়া—কাঁদিয়া ফেলিত! যে এই গৃহের—এই নিদ্রিত গৃহের চির-জাগরণ ছিল! যে আমার এই স্তব্ধ গৃহের একমাত্র আহ্বান ছিল! কে সে? কোথায় সে?

হায়, আজ সেই গৃহের মুখ কি মলিন! কি শীর্ণ! কি বিস্মৃত! গৃহখানি যেন আর একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন গৃহ! আজ আমি সেই গৃহের—আমার অতীতের মোহময় নন্দনকাননের—সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন স্বপ্ন দেখিতেছি! যেন আমার আজ আত্ম-বিস্মৃতি উপস্থিত! এ কি সেই গৃহ?

হায়, পূর্ব্বেকার সঙ্গে এখনকার কত খানি প্রভেদ! আর সে শোভা নাই! সে গাছ নাই! সে ফুল নাই! সে পাখীর ডাক নাই! সে উৎসব নাই। সে প্রেম নাই। সে স্বর্গ নাই। স্বর্গের সে বাতাস নাই। আর সে-ছেলে-খেলা নাই। সব—সব ডুবিয়া—মরিয়া কোথায় চিরদিনের মতন ভাসিয়া গিয়াছে। আছে কেবল অনন্ত অন্ধকার—অসীম শূন্যতা—চিরদিবসের বিরহ—সদা হায় হায়—অতীত-ছায়া—দুঃখের ইতিহাস—ফুলের গন্ধটুকুমাত্র—স্মৃতি—গৃহের ভগ্নাবশেষ—মৃত্যু!!!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১

চারি মাস হইল রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু মনে হইতেছে, যেন চারিদিন মাত্র তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন

এখনও যেন তাঁহার সেই চির-প্রসন্ন মুখ, সেই প্রীতিভরা দৃষ্টি দেখিতে পাইতেছি; এখনও যেন তাঁহার অমৃতময় বাণী কাণে বাজিতেছে। তাঁহার জন্য আমাদের দুঃখ অবসান হইবার নহে। তাঁহার জন্য আমরা যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি, ঈশ্বর করুন, এরূপ ব্যথা যেন আর পাইতে না হয়। একাধারে এত গুণের মানুষ এ সংসারে অতি বিরল। তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার বিদ্যা সর্ব্বমুখী ছিল, তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত; তিনি আজীবন জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া, জ্ঞানে মজিয়া গিয়া, জ্ঞানময়প্রাণ হইয়া জ্ঞানের অনুশীলনেই জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ অগাধ জ্ঞান, অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁহাকে অন্যজনসুলভ গর্ব্বে স্ফীত করে নাই। অহঙ্কার বা অভিমান তাঁহার উন্নতচিত্তে স্থান পায় নাই। তিনি সে সকল হীন বৃত্তি হইতে অনেক উচ্চে ছিলেন। 'মাটীর মানুষ' যাহাকে বলে, তিনি তাহাই ছিলেন। তিনি এতদূর বিনয়ী, এতদূর নম্র ছিলেন, যে অনেক সময়ে আমাদের ভ্রম হইত, ইনি বুঝি তত বিদ্বান্ তত জ্ঞানী নহেন। কৃত-বিদ্য ব্যক্তির মুখ দেখিলেই যে সুশিক্ষিত বলিয়া ধারণা হয়, তাঁহার মূর্ত্তিতে সে ভাব প্রকাশ পাইত না। বিদ্বান হইলে যে গাম্ভীর্য্য জন্মে সে গাম্ভীর্য্য তাঁহার ছিল না; তিনি বালকের ন্যায় সরল ছিলেন। বোধ হয় তিনি আপনাকে আপনি চিনিতে পারেন নাই। আপনি যে কত বিদ্যা, কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছেন, আপনি তাহা ঠাওরাইতে পারেন নাই। জ্ঞানের ভাবে ভোর হইয়া, জ্ঞান সমুদ্রে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করিতেছিলেন; দেখিবার অবসর ছিল না, ভ্রুক্ষেপ ছিল না কত রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাকেই নিষ্কাম ভাবে জ্ঞানালোচনা বলে। এরূপ শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। এরূপ জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আজিকার এই আড়ম্বর-প্রিয়তার দিনে, এ আদর্শ আমাদের নিকট মহান্ আদর্শ। রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনের এই ভাব হইতে আমরা এক মহাশিক্ষা পাইয়াছি। আমরা—বাঙ্গালী, বিদ্যার ভাণ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারি না। প্রকৃত জ্ঞানী হইতে গেলে নিরহঙ্কারী, নিরভিমানী হইয়া সর্ব্ব প্রকার আড়ম্বর পরিহার করিয়া যে উন্মত্ততা, যে তন্ময়ত্ব আবশ্যক, রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবন হইতে আমদের এই সারশিক্ষা প্রাপ্ত করা উচিত। আমরা যে কেবল অসারতা, কপটতা, হীনতা শিখিতেছি, দিন দিন মনুষ্যত্ব হারাইতেছি,

রাজকৃষ্ণ বাবুকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলে অচিরে আমাদের সে দুর্দ্দশা মোচন হইবে, আমরা কৃতার্থ হইব।

জ্ঞানীলোকের আরও যে সকল মহৎ গুণ আবশ্যক এবং আমাদের জাতিতে যাহা অল্প ব্যক্তিরই আছে, রাজকৃষ্ণ বাবু সেই সমস্ত গুণে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার অহঙ্কারশূন্যতা, নিরভিমানিতা, বিনয় ও নম্রতার বর্ণনা করা যায় না। সেই সত্যব্রত, অনলস, নিস্পৃহ, মাতৃভাষানুরাগী, ঈর্ষ্যাবিরহিত, প্রীতিমান্, প্রসন্ন, নিরপেক্ষ, অসম্প্রদায়িক লোকের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায় না। আমরা অতিবাদ করিতেছি না, যিনি তাঁহার সহিত দুই দণ্ড আলাপ করিয়াছেন, কি যিনি তাঁহার পুস্তক বা প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া তাঁহাকে জানিয়াছেন, তিনিই বলিবেন, তাহার সম্বন্ধে কিছুই বাহুল্য-বর্ণনা হয় না। একাধারে এত গুণ প্রায় থাকে না, দেখা যায় না। এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার কি পরিচয় দিব? তবে সাধারণকে তাঁহার আভাস মাত্র দিবার জন্য আমরা এ স্থলে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিতেছি।

কেবল সত্যবাদী হইলে 'সত্যব্রত' হয় না। চিন্তায়, কার্য্যে, ব্যবহারে যিনি সত্যাচরণ করেন, সত্যানুশীলন যাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্য্য, সত্যানুসন্ধানে যিনি আজীবন প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তিনিই কেবল সত্যব্রত নামে অভিহিত হইতে পারেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর সেই মহৎ গুণ ছিল। যাঁহারা তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" এবং "নানা প্রবন্ধ" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার ও সত্যানুশীলনের পরিচয় দিতে হইবে না। বাঙ্গালার ইতিহাসে তিনি এতগুলি সত্য তথ্য বাহির করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও ইংরেজি ইতিহাসে পাওয়া যায় নাই। কারণ, সে সকল ঐতিহাসিকের ইতিহাস প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র; একমাত্র সত্যে তাঁহাদের গাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি ছিল না। তারপর, তাঁহার নানা প্রবন্ধ নামক পুস্তকের কথা। ইহার সম্যক পরিচয় স্থল ইহা নহে। এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ (antiquarian) নাম পাইয়াছেন। সত্যাপেক্ষা ইহার যে কিছুই প্রিয় ছিল না, দেশানুরাগ প্রভৃতি অপেক্ষা সত্যানুরাগ যে অধিকতর প্রবল ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা "বিদ্যাপতি," "জ্ঞান ও নীতি" প্রভৃতি প্রবন্ধে দেখিতে পাই।

বিদ্যাপতির মত উৎকৃষ্ট কবিকে বাঙ্গালা দেশের কবি বলিতে পারিলে যে বাঙ্গালা দেশের মহাগৌরব হইবে, ইহা জানিয়া অনেকে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালা দেশের কবি বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অন্ধ দেশভক্তির নিকট সত্যকে বলি দেন নাই। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, বিদ্যাপতি মিথিলা দেশীয়। "জ্ঞান ও নীতি' নামক প্রবন্ধে তিনি নিঃসঙ্কোচে, সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া প্রাচীন জ্ঞান ও নীতির কতকগুলি দোষ এবং বর্ত্তমান জ্ঞান ও নীতির কতকগুলি গুণ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার সত্যনিষ্ঠার অধিক পরিচয় দিবার স্থান নাই। এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে, তিনি কোনও বিষয় সাধ্যমত প্রমাণ ব্যতীত লিখেন নাই। যে কথায় তাঁহার নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মিয়াছে, সে কথা সাধারণকে জানান নাই। এই সত্যানুসন্ধিৎসা তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হইয়াছিল; এই জন্য ইদানীং তিনি ভারতবর্ষের একটী সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ যথার্থ ইতিহাস প্রণয়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন। কত ভাষার কত গ্রন্থ যে পড়িয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ইহাই তাঁহাকে শেষ দশায় পালিভাষা শিখিতে উত্তেজিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ দেবের সময় ভারতবর্ষের এক প্রধান যুগ। সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য পালিভাষা শিখিয়াছিলেন। অনুবাদে পূর্ণ সত্য মিলিবে না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু, সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁহার কাল হইল। সত্যের আলোচনায় অবশেষে তিনি প্রাণ হারাইলেন। আমরা, আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অকালে হারাইয়াছি! অকালে আমরা মহান্ আদর্শে বঞ্চিত হইয়াছি! জাতীয় জীবন-গঠনের মূলমন্ত্রদাতা অকস্মাৎ আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছেন।

ইহার পর তাঁহার অনলসতার অধিক পরিচয় দিতে হইবে না। গবর্ণমেন্টের অনুবাদকের কার্য্যে 'হাড়ভাঙ্গা' পরিশ্রম করিয়া যতটা অবসর পাইতেন, ততটা অধ্যয়নে কাটাইতেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক প্রধান জাতির সাহিত্যের সার গ্রহণাভিপ্রায়ে সেই সকল জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইদানীং আবার জ্যোতিষ শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এজন্য আপনার উচ্চ পদমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া, কুটীরে কুটীরে ভ্রমণ করি-

য়াছেন। তিনি এক মুহূর্ত্তও বৃথা ব্যয় করিতেন না। তরুণ বয়সেও যে এ গুণের যথেষ্ট বিকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার অধ্যয়নকালের কীর্ত্তি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। অলস-প্রধান বাঙ্গালীর কি তিনি সামান্য শিক্ষক? অলস বলিয়া আমরা কোন কার্য্য করিতে পারি না। আমাদের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র অভাব, এক আলস্য আমাদিগের উদ্যম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে নির্জীব করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার নিষ্কামভাবে জ্ঞানালোচনার উল্লেখ করিয়াছি। আমাদের দেশে জ্ঞান বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে যে কাজ হয় অনেকের মধ্যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য যশোলাভ। কিন্তু তাঁহার সে স্পৃহা ছিল না। তিনি যতটা জ্ঞানসঞ্চয় করিয়াছিলেন, ততটা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে বা সাধারণকে দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। আমরা তাঁহার জ্ঞানের শতাংশও পাই নাই, বলিলে হয়। তিনি জ্ঞানের জন্য জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন।

তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ অতুলনীয়। সাধারণের শিক্ষার সামগ্রী। তিনি যখন বিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া অধ্যাপকদিগের নিকট বিদেশীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন, তখন হইতেই তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ। সহপাঠীগণ কখন তাঁহার নিকট সেই বিদেশীয় সাহিত্যের প্রশংসা করিলে, তিনিও তাঁহাদিগের সহিত প্রশংসা করিতেন বটে, কিন্তু তখনই আবার বলিতেন—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে আপন ভাষা পুরে কি আশা?"

নিধু বাবুর এই মহৎ বাক্যের গভীরতা তিনি বাল্যকাল হইতেই বেশ অনুভব করিয়াছিলেন, কৈশোরের সেই কোমল হৃদয়-ফলকে এই অক্ষর কয়টী যে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা এক দিনের তরেও মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। পরে যখন তিনি নানা ভাষায় নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অগাধ পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, তখনও তাঁহার সেই একই কথা —একই বুলি। ভিন্ন দেশীয় ভাষার গরিমায়, কবিত্বের মধুরিমায় যখনই তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, মগ্ন হইয়া তাহার ভাবরস পান করিতেন, তখনই যেন আপনা হইতে হৃদয়ে সেই কথা জাগিয়া উঠিত, তিনি বলিতেন—

"নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,
বিনে আপন ভাষা পুরে কি আশা?"

কিন্তু এ কথা তিনি কেবল কথাই রাখিয়া যান নাই। মাতৃ ভাষার উন্নতি-সাধনে তিনি কোনও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। নানাভাষা হইতে নানা-ভাবরত্ন সংগ্রহ করিয়া ইহার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় তিনি এক জন প্রধান দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং কবি। এই দরিদ্র বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে সকল রত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দুর্লভ সামগ্রী। হায়, কবে সকল কৃতবিদ্য বঙ্গসন্তান তাঁহার ন্যায় মাতৃভক্ত হইবে, তাঁহার মত মাতৃসেবা করিতে শিখিবে, আপনার ভাষার সম্যক আদর ও অনুশীলন করিতে যত্নবান হইবে!

তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ, দার্শনিক, কবি ও ভাষাবিৎ ছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কি তাঁহার সমকক্ষ কেহ কি ছিল না? অনেকে ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁহাদিগের প্রতি অন্যজন-সুলভ ঈর্ষ্যা করিতেন না। বরং যাঁহারা এই সকল গুণে গুণবান্ ছিলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহার্দ্দ ছিল। কলিকাতার এমন কোন সুলেখক বা এমন কোন পণ্ডিত নাই, যাঁহার সহিত তাঁহার প্রণয় ছিল না। তিনি সকলের সহিত মিশিতেন, সকলের মধ্যে যে সার পাইতেন, তাহা গ্রহণ করিতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। সঙ্কীর্ণতা, পক্ষপাতিতা তাঁহার উদার, বিশাল হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি কোন সম্প্রদায়ের বিপক্ষ ছিলেন না; কোন সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিতেন না। সকল সম্প্রদায়ে নিঃসঙ্কোচে অবিকৃত হৃদয়ে মিশিতেন; সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস, প্রত্যেক লোকের মধ্যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে কিছু না কিছু সত্য আছে। সেই মহাধন লাভ করিবার জন্য তিনি সকলের অন্তর খুঁজিতেন। তাঁহার মত সত্যব্রত না হইতে পারিলে, তাঁহার মত সকলের প্রিয়কারী এবং সকলের প্রিয়ভাজন হওয়া যায় না। তিনি কাহা-কেও ঘৃণা করিতেন না; সকলেরই প্রতি প্রীতিমান্, স্নেহশালী ও দয়ালু ছিলেন। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা, ঘৃণা, অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না বলিয়া তিনি সদা হাস্যময়, সদা প্রসন্ন ছিলেন। তাই

তাঁহার হৃদয়ে চিরশান্তি বিরাজ করিত। তাই তিনি বোধ হয়, প্রকৃত সুখী ছিলেন। এ পাপ সংসারে এরূপ লোক বড় বেশী জন্মায় না। এরূপ মহাত্মা এ সংসারে বিরল। এরূপ লোকই আমাদের আদর্শ হইবার উপযোগী। তাই সে দিন আমরা সকলে সাবিত্রী লাইব্রেরীতে একত্রে মিলিত হইয়াছিলাম। আমরা যে কি মণিরত্ন হারাইয়াছি, সকলে বোধ হয়, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সে শোক ভুলিবার নহে। আমাদের দুঃখের অবধি নাই। আশা করি, সকলে তাঁহার অমূল্য স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁহার গুণাবলীর অনুকরণ করিবেন। হৃদয়মন্দিরে তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে আমরা সৎ, উন্নত, মহৎ হইব। আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

মা।

হৃদয়ের সুধা দিয়ে, চুম্বনে হইয়া সারা,
স্নেহ-খানি বিকাইয়া চরণের তলে,
সুখেতে আপনা-হারা—
'মা' ব'লে শিখাত বলিতে রে 'মা'
জননী আলোর ধারা!

তুই, কোথা হ'তে এলি, ছোট ফুল-বপু-খানি
বুকেতে বাঁধিলি বাসা মায়ার ডোরেতে,
পদে পদে অভিমানি!
কোলে এসে ধেয়ে—হাসিতে ভুলায়ে—
মা হলে মা কিসে, রাণি!

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

ভারতে ইংরেজাধিকার।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।]

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে কারারোধ করিয়া, ভ্রাতাদিগকে নিহত করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু রাজদণ্ড গ্রহণের পর তিনি সুনিয়মে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্য কালেই প্রজাদিগের জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়া উঠেন। যখন সম্রাট্ শাহজাহাঁ সুরম্য দেওয়ানী-খাসে জগতে অতুলনীয় সুদৃশ্য ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তখন আওরঙ্গজেব প্রায়ই তাঁহার কাছে বসিয়া অনেক জটিল বিষয়ে আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিতেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের বয়স দ্বাদশ বৎসর। দ্বাদশবর্ষীয় বালক এক সময়ে রাজকার্য্যে যে অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন. দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করার পর তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব পাপের গতি নিরোধ করিতে অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তিনি প্রতিদিন বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকের সাহায্যে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার আদেশে কাবুল হইতে আরঙ্গাবাদ্ পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত রাজপথের পার্শ্বে পথিকদের সুবিধার জন্য পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পথিকেরা এই স্থানে রাজকীয় ব্যয়ে কাঠ, পাকপাত্র, চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য পাইত। পূর্ব্বতন সম্রাটেরা রাজপথের পার্শ্বে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন আওরঙ্গজেব তৎসমুদায়ের জীর্ণ সংস্কার করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পারের জন্য সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং বৃহৎ নদীর পার হওয়ার নিমিত্ত নৌকার বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আদেশে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপকদিগের বেতন রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইতে থাকে। সম্রাট্ নানা স্থান হইতে নানা বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালোচনার সুবিধা করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং সুলেখক ছিলেন. তাঁহার লিখিত লিপি সকল

লালিত্য ও মাধুর্য্যগুণে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজ-কর্ম্মচারীদিগের লিখিত লিপি নিজেই সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার সময়ে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। সুদূর দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে। রাজপুতশ্রেষ্ঠ জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ তাঁহার প্রাধান্য ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখার জন্য যত্নশীল হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে দক্ষিণাপথে বিশাল সৈন্য-সাগরের আবির্ভাব হয়। ভারতের মুসলমান রাজত্বে আর কখনও এরূপ দৃশ্যের বিকাশ হয় নাই। এরূপ বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, এরূপ ধন সম্পত্তির অধিস্বামী ও সৈন্য বলের অধিকারী হইলেও আওরঙ্গজেব মোগলের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নানা গুণে অলঙ্কৃত হইলেও সমদর্শী বা উদারপ্রকৃতি ছিলেন না। সমদর্শিতা ও উদারতার বলে যে, সাম্রাজ্য দৃঢ়তর হয় তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার রাজ্যে সকল শ্রেণীর প্রজারা নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে নাই। তিনি অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে অনুচিত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়া, আপনার বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনিই বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলেন। আকবর যে জীজীয়া কর রহিত করিয়া, হিন্দুদের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে বিরক্ত করিয়া তুলেন। মিবারের রাজধর্ম্মবিৎ রাজন্য-শ্রেষ্ঠ রাণা রাজসিংহ তাঁহাকে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিলেও তিনি সেই পরামর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। রাজসিংহ জীজীয়া কর গ্রহণের বিরুদ্ধে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে যে পত্র লিখেন. তাহার ভাব' আমি এস্থলে প্রকাশ করিতেছি :—

"সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হইক। সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবান্বিত আপনার বদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এই হিন্দুস্থানের রাজা, রায় ও সম্ভ্রান্তগণের, ইরাণ তুরাণ, শাণ ও রুমের ভূপতিগণের, সপ্তকুল জনপদের অধিপতিগণের এবং স্থলপথ ও জলপথ যাত্রিগণের সর্ব্বাঙ্গীন উপকারসাধনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। এ

বিষয়ে বোধ হয়, আপনার কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য আমি আমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া এবং আপনার শীলতা ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের স্বার্থ-সংস্থষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

"আমি অবগত হইয়াছি, যে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন এবং আপনার শূন্য ধন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

"আপনার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ জালাল উদ্দীন আকবর সমদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত বায়ান্ন বৎসরকাল এই সাম্রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বে সকল জাতির লোকই সুখস্বচ্ছন্দে ছিল। ঈশা, মূসা বা মহম্মদের শিষ্যই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দুজাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতিই অনুগ্রহ ও শীলতা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সমদর্শিতার জন্য, তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতার আবেশে তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া অভিহিত করিত।

"স্বর্গীয় নুরউদ্দীন জাহাঁগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজাপালন করিয়াছেন। মিত্ররাজগণের প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রদর্শন করাতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন।

"মহিমান্বিত শাহজহাঁ বত্রিশ বৎসর শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া, দয়া, ও ধর্ম্মের গৌরবযুক্ত পুরস্কার—অক্ষয় সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন।

"আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের লোক-হিতকর কার্য্য এইরূপ। তাঁহারা এই-রূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ করিতেন, সেই স্থানেই বিজয়লক্ষ্মী ও সৌভাগ্য-শ্রী তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইত। তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছে। এখন অত্যাচার ও অবিচারস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান ঐরূপ হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। আপনার প্রজাগণ পদ-দলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ ইংধুদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত,

হইয়াছে। যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হন, তখন সম্ভ্রান্ত লোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে? সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জন সাধারণ রাত্রিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে।

"যে রাজ্যাধিপতি এরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর কর-ভারে নিপীড়িত করিবার জন্য আপনার ক্ষমতা বিনিয়োগ করেন, তাঁহার মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দ্দশার সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ তৈমুর বংশের গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জ্জন-স্থানবাসী নিরপরাধ তপস্বীদিগের উপর আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিরই ঈশ্বর; তিনি কেবল মুসলমানদের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য বর্ণভেদ কেবল তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতি মাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বের আদি কারণ। আপনাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ঘণ্টা-ধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। অপরাপর লোকের ধর্ম্ম ও অত্যাচারের অবমাননা করা, আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত কাজ করা, উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতই আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। এই জন্য কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে।

"আপনি হিন্দুদিগের নিকট যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়পরতার বহির্ভূত। উহা সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকন্তু উহা, হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি আপনার ধর্ম্মান্ধতা আপনাকে ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের প্রধান রাজসিংহের

নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীকে কর দিতে আদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও প্রকৃত মহানুভাবকত্বের লক্ষণ নহে। আপনার অমাত্যগণ যে ন্যায়পরতা ও সম্মানের সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আপনাকে সদুপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে।"

রাণা রাজসিংহের পত্রে এইরূপ শীলতা অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা ও এইরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত দিল্লীর সম্রাটকে অপকর্ম্মে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজনীতির উচ্চতায়, ভাবের গভীরতায়, উদারতার মহিমায় ও প্রকৃত বীরত্বের অপূর্ণমানকতায়, ঐ পত্র পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের, যে কোন সময়ের রাজনীতিজ্ঞের নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পারে। ঐ পত্রের প্রতি অক্ষরে হিন্দু আর্য্যের প্রকৃত হিন্দুত্ব পরিস্ফুট হইতেছে, এবং হিন্দু রাজার প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু আওরঙ্গজেব এই পত্রানুসারে কার্য্য না করিয়া আপনার দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয় দেন। এইরূপ নানা দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্তই তাঁহার সাম্রাজ্যের বলক্ষয় হয়। তাঁহার দক্ষিণাপথস্থ বিশাল সৈন্য সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং তাঁহার জীবন নিজের অকার্য্যজনিত নানা দুশ্চিন্তায় বার্দ্ধক্যজনিত অবসন্নতায় আওরঙ্গাবাদে নির্জ্জন গৃহে অতীত কালের অনন্ত সাগরে নিমজ্জিত হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন ভারতের এই পরিবর্ত্তনের মূলে সুসভ্য ব্রিটীশ শাসনেও তাহার আভাস দেখা যাইতেছে। ইংরেজ যাহাদের সাহায্যে ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছেন, প্রধানতঃ যাহাদের সহিষ্ণুতায় ইংরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য সুব্যবস্থিত ও সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহারাই এখন অনেক সময়ে ইংরেজের নিকটে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়। তাহাদের স্বত্ব, তাহাদের অধিকারের প্রতি অনেক সময়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে আমরা ইহার জ্বলন্ত পরিচয় পাইয়াছি। আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতা-মূলক রাজনীতিতে ভারতে যে দৃশ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল,

ইংরেজ রাজত্বে যে তাহার পুনরাবির্ভাব হইবে আমি এ কথা কখনও বলি না। ভারতবাসী রাজভক্ত; ইংরেজ-রাজত্বে তাহাদের অনেক উপকার হইয়াছে বলিয়া তাহারা ইংরেজ রাজের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহারা ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে না। ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিতে তাহাদের কোন ক্ষমতা বা ইচ্ছা নাই। তাহারা নিরাপদে নির্ব্বিবাদে ব্রিটিশ অধিকারে বাস করিতে ভাল বাসে। শান্তির এই সুখময় রাজ্যের বহির্ভূত হইতে তাহাদের কখন আগ্রহ জন্মে না। কিন্তু তাহারা ন্যায়ানুগত স্বত্বের প্রার্থী। ইংরেজ ভারতে যে শিক্ষার বীজ নিহিত করিয়াছেন, তাহা হইতে এখন একটা সতেজ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মহা বৃক্ষের সুদূরবিস্তৃত ছায়ায় সমবেত হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন এবং পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একতার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছেন। এই রমণীয় চিত্র পূর্ব্বে কাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। ইংরেজের প্রসাদে, ইংরেজী শিক্ষার গুণে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একতা জন্মিতেছে, মুসলমান রাজত্বে তাহার আবির্ভাব দেখা যায় নাই। আশা আছে, সমগ্র ভারতবাসী এক সময়ে এই একতার বলে বলীয়ান হইয়া ইংরেজ রাজের সমক্ষে আপনাদের এ ন্যায়ানুগত স্বত্ব রক্ষায় সমর্থ হইবে, এবং শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিয়া, শৃঙ্খলা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, আপনাদের কৃতকার্য্যতায় আপনারাই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। মহারাণীর ঘোষণাপত্র চিরকাল উপেক্ষিত থাকিবে না। সরলহৃদয় লর্ড রীপণ যাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী কোন উদারহৃদয় ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি হয়ত এক সময়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবেন। ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ সময়ে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব। প্রজারাই সন্তুষ্ট থাকিলে আমি আপনাকে নিষ্কলঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব, এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব।" এই মহাবাক্য এক সময়ে সর্ব্বাংশে

সার্থক হইবে। যদি ন্যায়ের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, সাধুতার রাজ্য অটল রহে, নিরপেক্ষতার শাসন সম্ভাড়িত, নিষ্পেষিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া না যায়, তাহা হইলে রাজসিংহ ও জয়সিংহের লীলাভূমিতে, আবুলফজল ও তোড়ল মল্লের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে এই পরাধীন, পরপীড়িত, ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভূখণ্ডে হয়ত এক সময়ে ব্রিটিশ শাসনের অমৃতময় ফলের বিকাশ দেখা যাইবে এবং ব্রিটেনিয়ার অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

হেমচন্দ্র।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"তার পর ?"

পরমানন্দ বলিল—"তার পর সকলে মিলে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন "যা, তোর মা ঠাক্রুণকে এখানে নিয়ে আয়।" বাবুকে ছেড়ে আমার আস্‌বার বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি; সকলে বল্‌তে লাগ্‌লেম, তাই এলেম।"

মহামায়া আবার জিজ্ঞাসিলেন, "ডাক্তারে কি বলে ?"

পরমানন্দ বলিল—"ডাক্তার তো বলে, কোন ভয় নাই, পনর দিনের ভিতর সেরে উঠ্‌বেন।"

মহামায়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। নিকটে তাঁহার মাতা দাঁড়াইয়া ছিলেন। "হে মা দুর্গা, হে মা কালি—কি ক'রে মা" বলিয়া তাঁহার চক্ষে অশ্রু উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তারকনাথ, কালীঘাটের কালী, মা মঙ্গলচণ্ডী, শুভচনি, একদীল, গৌরচাঁদ—হিন্দু মুসলমান যত দেবতার নাম সে জানিত একে একে সকলের কাছে বাবুর কল্যাণে পূজা

ঝরিতে আরম্ভ করিল। চক্ষের জল বিন্দু বিন্দু হইতে বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হইল, ক্রমে স্রোত বহিতে লাগিল। মহামায়া দেখিয়া বলিল—"আ মরণ, অমন করে মরচো কেন? হয়েছে কি, একটু অসুখ বৈ তো নয়. অমন কার না হয়? ও যেমন বাবু-সোহাগে চাকর, তাই দৌড়ে বাবুর উপর সোহাগ জানাতে এসেছে।" বুড়ী থতমত খাইল। ভয়ে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। একটু নাক ঝাড়িয়া, একটু কাশিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"তা কি জানি, বাছা, ও মিসে এমনতর তা কি জানি! কি আক্কেল, বাপু, অবাক্ করেছে, ও মা, শুধু শুধু কাঁদিয়ে দিলে কি না।"

পরমানন্দ বড়ই ব্যাকুব বনিয়া গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার মহামায়ার ও একবার মহামায়ার মাতার মুখ পানে চাহিল। শেষে বলিল—"তা দেখুন, যা ভাল বুঝেন করবেন; আমাকে কাল সকালেই আবার চলে যেতে হবে।"

মহামায়া বলিলেন "আচ্ছা—আচ্ছা—তুই যা; কি করি না করি সে পরামর্শ তোকে দিতে হবে না।"

পরমানন্দ আর কিছু বলিল না। বলিতে তাহার সাহস কুলাইল না। ধীরে ধীরে সে বাহিরে চলিয়া গেল।

তখন, মা মেয়েকে বলিলেন, "সত্যিই যদি বাবুর অমন অসুখ হয়ে থাকে!"

মহামায়া রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "হয়ে থাকে তো আর কি হবে!"

"সে কি কথা মা! অসুখ হওয়াই সম্ভব। নহিলে তিনি বাড়ী ছেড়ে কল্‌কেতায় কখন এতদিন তো থাকেন না;"

"তুমি যেমন নেকী; জান না, এবার বাড়ী থেকে কি ক'রে বেরিয়েছে। ও কেবল আমাকে জব্দ করা। তা আমারও প্রতিজ্ঞা, আমি যদি বাপের বেটী হই, দেখবো কে কারে জব্দ করে।"

"সে বড় মিছে নয়, তাঁর ঐ এক কেমন রকম। থাকেন থাকেন কি হয়ে পড়েন। কিন্তু মনে নিচ্চে, তাঁর যেন সত্যিই বড় অসুখ করেছে।"

"করে থাকে তো কি কর্ত্তে হবে?"

"বলি, একবার গেলে ভাল হতো না।"

মহামায়া রাগিল। বলিল—"উঃ বড় যে সোহাগ! হাঁ, মর্চ্ছি আর কি। আমার এই শরীর—আমায় দেখে কে তার ঠিক্ নেই। শুনেছি, কল্‌কেতা নাকি বড় কহ্‌যিয়্যি জায়গা, গলি ঘুঁজি ময়লা—রান্না ঘরের কাছে পাইখানা—মা! শুন্‌লে বমি আসে—সেখানে কি আমরা থাক্‌তে পারি! তার পরের বাড়ী—কোথায় বস্‌বো, কোথায় শোবো তার ঠিক্ নেই। এই বিছানায়ই ঘুম হয় না, সেখানে গিয়ে কি ঘুমতে পাব! গেলে নিশ্চয়ই একটা উৎকট রোগ হয়ে পড়বে। আর রোগেরই বা বাকি কি? তা কাকে বা বলবো, কেই বা বুঝ্‌বে? আমার শরীরের উপর কার তো আর দরদ নেই। ভগবানই যখন বিমুখ তখন মানুষে না হবে কেন? নহিলে আমার এই শরীর দেখেও মা হ'য়ে কি কখন এমন কথা বল্‌তে পারে?"

মহামায়া আরও কিছু বলিতেন, কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। চক্ষের জলে মুখখানা ভাসিয়া গেল, গলাটা ধরিয়া আসিল।

মাতা বলিলেন "ও মা তুই কাঁদ্‌লি বাছা, আমি তো মন্দ কিছুই বলি নি।"

মহামায়া বলিলেন—"আমার কপালই যখন মন্দ, তখন তুমি আর মন্দ বলে কি করবে।"

মা বড়ই অপ্রতিভ হইল। একটু ভয়ও হইল। অথচ তাহার কারণ যে কি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু মনে মনে স্থির করিল—মেয়ের কাছে আর কখন কলিকাতায় যাওয়ার কথা পাড়িবে না। প্রকাশ্যে বলিল—"আমার মাথা খা, চুপ কর্ মা। আমি অভাগী না বুঝে কি বলেছি, তা বলে মার উপর রাগ করিস্ নে বাছা।"

তখনও মহামায়ার চক্ষের জল একেবারে শুকায় নাই, তখনও তাঁহার নাকের ফোঁস ফোঁস ফোঁত ফোঁত শব্দ থামে নাই, এমন সময়ে বিরাজ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল "কি, দিদি, কাদ্‌চ কেন? মুখুয্যে মশাই ভাল আছেন তো?"

মা বলিলেন, "বালাই, ভাল আছেন বৈকি, তবে পরমানন্দ বয়ে একটু অসুখ হ'য়েছে।"

বিরাজ। না মা, একটু অসুখ হ'লে তিনি অবশ্য বাড়ীতে আস্‌তেন। আমার বোধ হয় বেশি অসুখ করেছে, পরমানন্দ বলে নি।

মা। কি জানি মা, কালী করুন, ভাল থাকুন, আর শিগ্‌গির বাড়ী আসুন।

বি। তা, চল না কেন, আমরা কল্‌কেতায় যাই। তাঁকে নিয়ে আসি। বিদেশ, না জানি কত কষ্ট হচ্চে, পরমানন্দ তাঁকে ছেড়ে এল কেন?

মা। ও এক হতভাগা চাকর। তাইত বলি, তুই বাপু ফেলে এলি কেন? যদি আমাদের যেতেই বলে থাকে, ডাকে একখানা চিঠি পাঠালেই তো হ'তো।

বি। তবে কি, পরমানন্দ আমাদের নিতে এসেছে? সে কি বল্লে মা? মুখুয্যে মশাই কেমন আছেন, মা?

বালিকার স্বভাবসুলভ কোমল হৃদয়খানি আকুল হইয়া পড়িল। মহামায়াকে নীরব ও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আগ্রহে বলিল "দিদি, কি ভাব্‌ছ দিদি? চল না তবে আজই রাত্রে আমরা কল্‌কেতায় যাই।"

মহামায়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, বিরাজের কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"থাম্—থাম্—তোর এত ছেলে মুখে বুড়ো কথা কেন র‍্যা ছুঁড়ি?

বিরাজ উত্তর শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। দিদিকে সে বড়ই ভয় করিত, সেই দিদির উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বালিকা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। মাতা ইতিপূর্ব্বেই মেয়ে কর্ত্তৃক মৃদুমন্দ ভংর্সিত হইয়াছিলেন, মনের ভিতর একটু দুঃখ বা রাগ হইয়াছিল। এখন বিরাজকেও সেইরূপ অকারণ কটূক্তি করায় কিছু অসহ্য হইয়া উঠিল। মহামায়াকে বলিলেন—"তুমি বাছা, বল্লে রাগ কর, কিন্তু আজকাল কেমন খিট্‌খিটে হয়েছ, ভাল মন্দ বল্লে কিছুই শুন্‌বে না, অথচ লোককে যা না বল্‌বার তাই বল্‌বে।"

মহামায়া রাগিল। বলিল—"কি তোমায় যা না বল্‌বার তা ব'লেছি!"

মাতাও একটু উত্তেজিত হইয়াছিলেন, বলিলেন—"না বল্লেই বা কি! এই আমাকে বল্লে—তার পর বিরাজকে বল্লে। কেন, আমাদের দোষটা কি?"

মা মেয়ের সঙ্গে এই প্রথম সমান জবাব করিলেন। কিন্তু এই প্রথমেই যে শিক্ষা পাইলেন, তাহাতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে এমন কর্ম্ম আর কখন করিবেন না। তাঁর দুর্ভাগ্য, তাই সে দিন মুখ দিয়া এতটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মুখের কথা না ফুরাইতেই মহামায়া ঝঙ্কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "তা জানি গো জানি, দোষ কারও নয়, দোষ কেবল আমার, আর আমার অদৃষ্টের। তোমার মেয়েকে ব'লেছি তাই গায় বড় লেগেছে, তা বুঝেছি। আমি তো তোমার কেহ নই, যে আমার উপর দরদ থাকবে। আমি মলেই তোমাদের হাড়ে বাতাস লাগে। তা ভালইত। থাক তোমার খাঁড় মেয়ে নিয়ে, আমি দূর হই।"

দলিতফণা কালনাগিনী আততায়ীর প্রতি যেমন গর্জ্জন করিয়া উঠে, সেই-রূপ আক্রোশে মহামায়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চক্ষু লাল হইয়া উঠিল, নাসিকা স্ফীত হইল, কপালে বড় বড় রেখা সকল দেখা দিল, মাথার চুল গুচ্ছে গুচ্ছে দুলিতে লাগিল। বসিয়া ছিলেন, হাত নাড়িয়া মহামায়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চুড়িগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। দৃপ্তপদে গৃহের বাহির হইতে গেলেন; দ্বার ভেজান ছিল, জোরে তাহা খুলিয়া ফেলিলেন, দেয়ালে লাগিয়া কপাট দুখানা বিষম বাজিয়া উঠিল; মহামায়া গৃহের বাহির হইয়া বারাণ্ডায় গিয়া রণরঙ্গিনীবেশে দাঁড়াইলেন। অবাক্ হইয়া বিরাজ ও তাহার মা সেই ঝনঝনায়মান কপাট দুখানার দিকে চহিয়া রহিল।

তখন সূর্য্য পশ্চিমে ডুবিয়া আসিতেছিল, অস্তাচলশিখরাবলম্বী সূর্য্যের চূর্ণ রশ্মি যেখানে সেখানে পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। পশ্চিমাস্য বারাণ্ডায় ঝিল্‌মিলের উপর পড়িয়া তাহা খেলা করিতেছিল; রশ্মির উপর রশ্মি পড়িয়া জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে তাহা ঝিল্‌মিলি হইতে উঠিয়া যেখানে স্ফুরিতাধরা ভ্রুকুটীকুটিলাননা রোষবিকম্পিতদেহা মহামায়া রেলিঙের উপর বক্ষ স্থাপন করিয়া তির্য্যক্ নয়নে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে পড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। রশ্মিগুলা মহামায়াকে দেখিয়া উল্লাসে মধুরে মিলিবে বলিয়া লাফালাফি করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ছুটিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে উপরে উঠিয়া পড়িল। বাঙ্গালীর ঘরে রমণীর এমনই

দেবীমূর্ত্তি যে তাহা দেখিলেই সব ফেলিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে ইচ্ছা যায়, কিন্তু সময়বিশেষে তাহারা এমনি রাক্ষসীর রূপ ধারণ করে, দেখিলে আতঙ্কে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে, ভয়ে শত যোজন দূরে পলাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে হয়।

মহামায়া বারাণ্ডায় সেই ভাবে দাঁড়াইয়া। ফণিনী যেমন নিষ্কম্প হইয়া উন্নতমস্তকে আকুঞ্চিতবীর্য্যে দেহ ফুলাইয়া সরল ভাবে দাঁড়াইয়া শিকারের জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালিত করে, মহামায়া সেইরূপ দৃষ্টিতে সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া। বিধাতার কেমন বিচার জানি না এমন ক্রূর কাল সর্পেরও নিরীহ-প্রাণ শিকার জুটাইয়া দেন, কালনাগিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার সকল বিষ সেই হতভাগ্যের গায় ঢালিয়া দেয়, ক্ষুদ্র প্রাণ ভেক যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে থাকে। ভগবান্ উপরে বসিয়া তাহা দেখেন। তাঁহার অনন্ত খেলা। তাঁহারই খেলায় সেদিন সেই উন্নতফণা ফণিনী সদৃশ মহামায়ারও এক নিরীহ-প্রাণ শিকার জুটিয়া গেল।

নীচে মনোরমা তাহার মাতার জন্য রোদন করিতেছিল। আজ তিন দিন তাহার মা তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন; এ তিন দিন বালিকা আহার নিদ্রা কাহাকে বলে জানে নাই. তবে বিরাজ বড় পীড়াপীড়ি করিত, তাই বালিকা দিনান্তে একবার উঠিয়া হাতে মুখে জল দিয়া আসিত। তিন দিন —তিন দিন কেন, তিন বৎসর বালিকা এই ভাবে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধূলায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইতে পারে, কিন্তু সে মা—সেই ইহ সংসারে হতভাগিনীর মুখের দিকে চাহিবার, বড় কষ্টে আহা বলিবার একমাত্র জন—সেই চির-আনন্দ-প্রবাহিনী স্নেহপ্রফুল্লময়ী বাৎসল্যে-আপনা-হারা সে মা আর কি আসিবে? কেন এমন হয়? যে এত ভালবাসিত, কখন চখের আড় করিতে পারিত না, সে কেন না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যায়?—যায় তো একবার গেলে আর আসে না কেন? বালিকা তিন দিন ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে, সত্যই কি সে মা আর আসিবে না? মা যদি না আসে, তাঁর কাছে কি যাওয়া যায় না। সে কোন্ দেশ, তাহার কোন্ পথ? বালিকা ভাবিত, আবার উচ্চে 'মা মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। বিরাজ বুঝাইত, চক্ষের জল মুছাইয়া দিত, সান্ত্বনা

করিতে আপনি কাঁদিত। মনোরমা তাহার কান্না দেখিয়া মুহূর্তের জন্য আপনার কান্না ভুলিত। বিরাজ ভিন্ন আর কেহ সে দিক্ মাড়াইত না। বিরাজও প্রায় তাহার কাছছাড়া হইত না। তবে, মা বোনের তাড়না—কাজেই মাঝে মাঝে ফেলিয়া যাইতে হইত। এখন বিরাজ নীচে নাই, মনোরমা একা ধূলায় পড়িয়া, মার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দাদার কথা মনে পড়িল। তিনি আজও আসিলেন না কেন—কাল চতুর্থের দিন, মনোরমা চতুর্থ দিবসে মাতার শ্রাদ্ধ করিবে, কিন্তু সে তো কাল—মাঝে একটা রাত্রি মাত্র—তাহার কোন উদ্যোগ নাই—কেই বা করে? দাদা কেন আসিলেন না? তাঁহার কি হইল? মনোরমা আবার ভাবিল, কোন সঙ্গীও তো আজও ফিরিয়া আসে নাই, অনেক পথ—তাই বুঝি দেরি হইতেছে। আবার মনে হইল, অথবা দাদার কি হইয়াছে তাই তাঁহাকে পথে ফেলিয়া কেহ আসিতে পারিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে বালিকা অস্থির হইয়া পড়িল। উচ্চে 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই রোদন শব্দ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মহামায়া শুনিলেন। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত-দৃষ্টি ফণিণীর শিকার মিলিল। তখন সেই উগ্রমূর্ত্তি উগ্রতর হইল, মাথার চুল গোছায় গোছায় দুলিয়া উঠিল, ঘন ঘন হাত নড়িতে লাগিল, হাতের বালা ও চুড়ি একত্রে লাগিয়া খন্ খন্, ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। মুখখানা বৈশাখী আকাশের ন্যায় অকস্মাৎ অন্ধকারময় হইয়া আসিল। রেল ধরিয়া উন্নত গ্রীবা বক্র করিয়া মহামায়া বলিয়া উঠিলেন—"আ মর মর! রাত দিন চেঁচানি—রাত দিন চেঁচানি, এতে কি আর গৃহস্থের ভালাই হ'য়ে থাকে। মা যেন আর কারো মরে না। মনে করি কিছু বলবো না! তা না মরেও তো বাঁচিনে। ভুগ্‌তে হয় তাই বলি। ঐ ছুঁড়িই তো কেঁদে কেঁদে এই অমঙ্গলটা ঘটালে। দূর হ'য়ে যা—দূর্ হয়ে যা। যার জন্যে এত টস্ পড়ে থাকে তো, আপনার কোনো চুলো থাকে তো সেখানে যা না, সেখানে গিয়ে চেঁচিয়ে মর্ না।" মহামায়ার সেই ভীমকণ্ঠের ভীম আওয়াজে বালিকার সে ক্ষীণ রোদনশব্দ কোথায় ডুবিয়া গেল। সমস্ত বাড়িটায় সেই শব্দ বাজিতে লাগিল।

মনোরমা সে গর্জ্জন শুনিল। চোখের জল, চোখে রহিয়া গেল।

বালিকা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। বালিকা আজও সংসারের কিছুই জানে নাই; এখনও আপনায় পরে কত তফাৎ তাহা ভাল করিয়া বুঝে নাই। তবে, এ বয়সেও সে অনেক সহিয়াছে,অনেক দেখিয়াছে; মাতার কষ্ট দেখিয়া পরের সংসারে থাকা কি প্রকার তাহাও কতক বুঝিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া এত মর্ম্মান্তিক শোকের সময়ও যে প্রাণ ভরিয়া একটু কাঁদিয়া জুড়াইবার, কি দু ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবার যো নাই তাহা সে বুঝে নাই। মাতা যে সর্ব্বদা বলিতেন "বাছা, পরভাতি হইও তো পরঘরি কখন হইও না" বালিকা আজ সে কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিল। তখনও মহামায়ার সে ভীষণ স্বর তাহার কানের কাছে বাজিতেছিল। মুহূর্ত্তের জন্য শোক ভুলিয়া গেল, ভয়ে বালিকা কাঁপিয়া উঠিল।

তোমরা কেহ বিশ্বাস কর বা না কর, কিন্তু আমি খুব ভাল ভাল সূত্রে শুনিয়াছি, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নাড়ীর সংখ্যা একটা বেশী। তাহার কার্য্যও খুব বেশী। সচরাচর তাহাকে "কুঁদুলে নাড়ী" বলে। 'পাড়া কুঁদুলী' বলিয়া যাঁহাদের বিশেষ প্রসিদ্ধি,তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে সে নাড়ীর গতি অতি বিচিত্র। জলৌকার ন্যায়। সহজে অতি সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে; কিন্তু জলৌকার শোণিত গন্ধের ন্যায় কোন্দলের গন্ধ পাইবা মাত্র তাহা আপনা আপনি ফুলিতে থাকে, ক্রমে কোন্দলের যতই শব্দ পায় ততই ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া উঠে। সেই নাড়ীর নাচনিতে সর্ব্ব শরীর নৃত্য করিতে থাকে। তার পর, মৃগী পোকা যেমন কামড়াইয়া কামড়াইয়া রোগীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে, সে তখন বিকৃত ভাবে কি করে না করে কিছুই ঠিক্ থাকে না; তেমনি সেই নাড়ী নাচিয়া নাচিয়া সেই সুন্দরীকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে; তখন্ তিনি বিকারীর ন্যায় কি করেন না করেন কিছুই ঠিক্ থাকে না। এমন কি, সহজ অবস্থায় যে ভাশুরের সুমুখে দেড় হাত ঘোমটা টানিয়াও বাহির হইতে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়েন, এ অবস্থায় সেই ভাশুরের পৃষ্ঠে সম্মার্জ্জনীর প্রচণ্ড আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তবে, সবারই যে এ অতিরিক্ত নাড়ীটা আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে সন্দেহের কথা বলিলে, তাঁহারা বলেন, স্ত্রীলোক মাত্রেরই উহা আছে, তবে কিছু কম আর বেশী। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

তার সাক্ষ্য বিরাজ ও তাহার মাতা। মহামায়ার এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া বিরাজ একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় খানি মনোরমার জন্য শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল; নীচে নামিয়া তাহার কাছে যাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। বিরাজের সেই নাড়ীটা খুব কম ছিল, কি আদৌ ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহার মাতার যাহা ছিল তাহা বড়ই প্রবল। মহামায়ার কোন্দলের শব্দ পাইয়া তাহার সেই কুঁদুলে নাড়ীটা একেবারে ধড়ফড় করিয়া উঠিল, যেন ঘুমন্ত ব্যাঘ্রকে কে গোঁচা মারিয়া জাগাইয়া দিল। আর কি সে ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিতে পারে? মেয়ের উপর তাহার সকল দুঃখ অভিমান মূহুর্ত্তের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল। লাফাইয়া গৃহের বাহির হইয়া সেই বারাণ্ডায় মহামায়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"কোনো চুলো থাকলে তো সেখানে যাবে, ওরা নিজে যেমন হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া, তেমনি তোমাদেরও হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া না করে ছাড়বে না। মা গো মা! দিন নেই রাত নেই—ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান, আমরাই জ্বালাতন হ'য়েছি, তা এতে কি আর লক্ষ্মী টিকিতে পারেন!"

সেই এক কথায় মায়ে ঝিয়ে মিল হইয়া গেল। মেয়ে দেখিলেন, মা তাঁহার পক্ষ হইয়াছেন। মা এ সব বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অনেক পটুতরা। তখন বর্দ্ধিতবলা মহামায়া আরও উচ্চে বলিলেন—"দেখ না আস্পর্দ্ধা। যার খাবে তারই বুকে ব'সে দাড়ি উপড়াবে। আ ম'লোরে। দূর হ—দূর হ।"

মা বলিলেন—"আর এমন বেহায়া নিঘৃণে নিলর্জ্জ লোকও তো দেখিনি। তা হবে না? যেমন পেটে জন্ম। হাজার বল কও, গাটী নাড়া নেই। গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।"

মহামায়া বলিলেন—"সেই আঁকেলখেগো, অপ্পেয়ে মিন্সেরই তো যত আস্কারা! তখনই আমি বলেছিলুম গো যে ওদের এনো না; তা হতভাগা তখন শুনলে না। তার কি? তাকে তো আর ভুগতে হয় না।"

মা বলিলেন "আমি যদি এমন সংসার জানতেম, তা হলে এ ঘরে কি আর তোর বিয়ে দিই। কটা ছেলে হয়েছে, তা আমার কি বুক পুরে আহ্লাদ করবার যো আছে; সদাই আশঙ্কা, আবাগীদের ঘ্যান ঘ্যানানির জ্বালায় কোন্ দিন কোনটার কি হবে পড়ে।"

মহামায়া বলিলেন—"আমিও আর খাতির রাখিনে। এখন বুঝেছি কথায় ওদের কিছু হবে না। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর চাই। আসুক আগে শেষে বাড়ী, কাল ঝাঁটা মেরে সব পাপ বিদায় ক'রবো।"

মাতা যখন দেখিলেন কোন্দলের শেষ সীমায় আসিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখে হর্ষচিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু এমন এক-তরফা জয়ে তাঁহার আশা তেমন পুরিল না। বিপক্ষও কোমর বাঁধিবে, হাত মুখ নাড়িবে, কথার জবাব কাটাকাটি করিবে, তবেই তো সেই কোন্দলে সুখ। সমানে সমানে হইল না বলিয়া মহামায়ার মাতার ততটা মনের সুখ ঘটিল না। তবে মহামায়া এত দিন পরে উহাদিগকে যে ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করিয়া দিতে সংকল্প করিয়াছে, ইহাতেই তাহার মহা আনন্দ। সে আনন্দের চিহ্ন চাপিয়া রাখিয়া মহামায়ার সেই দৃঢ় সংকল্প আরও দৃঢ়তর করিবার জন্য বলিলেন "না বাপু, তোমার কিছু ব'লে কাজ নেই, আবার তিনি বাড়ী এসে কাঠে খড়ে আগুন লাগাবেন!"

মাতার কথা শেষ হইতে না হইতে মহামায়া গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"উঃ সেই ভয় করে চল্‌তে হবে নাকি। আমার প্রতিজ্ঞা, আমি যদি বামনের মেয়ে হই, তবে কাল সকালেই ওদের এ বাড়ী থেকে বিদায় ক'রবো। যদি কথায় না হয়, ঝাঁটা মেরে তাড়াব। দেখি, সে এসে আমার কি ক'র্ত্তে পারে!"

সে প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মাতাও শীহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু মনে মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। তখন মেয়েকে বলিলেন—"তা যাও, সন্ধ্যা হ'লো, কাপড় কেচে এস গে।"

মহামায়া বলিলেন—"যাব এখন, বিরাজ কোথায়?"

মা বিরাজকে ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। ঘরের ভিতর আসিয়া দেখিলেন, বিরাজ সেখানে নাই। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া মনোরমার কাছে গিয়া বসিয়াছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ রাত্রি বলিতে হয় বল, কিন্তু ঠিক্ ঊষা বলিও না। এখনও তাহার বিলম্ব আছে। গোটাকত কাক একবার ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা জ্যোৎস্নালোক কি দিবালোক ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারে নাই। দোয়েল এখনও তাহার প্রথম ডাক ডাকে নাই। আকাশের নক্ষত্র এক একটী করিয়া ডুবিয়া যাইতেছে বটে. চাঁদও পাংশুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া এখনও আকাশের গায় জ্বলিতেছে। নীচে অট্টালিকার ধারে ধারে, কুটীরের পাশে পাশে, গাছের তলায় তলায় অস্পষ্ট অন্ধকার স্তূপে স্তূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই আঁধার ভেদ করিয়া একটী বালিকা গ্রামের প্রান্তলগ্ন ক্ষুদ্র পথ বাহিয়া একাকিনী কোথায় চলিয়াছে। পথের ধারে কোথাও ঝোপ, কোথাও ঢিবি, কোথাও দুই ধারে বড় বড় বাগানে বড় বড় গাছ গুলা পথ অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোথাও বাঁশে বাঁশে জড়াজড়ি করিয়া রাস্তার উপর নোয়াইয়া পড়িয়াছে—মাথার উপর কেবল বাঁশের চন্দ্রাতপ, অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না। সে পথ দিয়া যাইতে বালিকা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িতেছে। বাঁশে বাঁশে লাগিয়া শব্দ হইতেছে, গাছের গলিত পত্র পড়িয়া শব্দ হইতেছে, কখন বা বাতাস আসিয়া জোরে গাছগুলাকে সর সর করিয়া নাড়িয়া দিতেছে, বালিকার বুকের ভিতর গুর গুর করিয়া উঠিতেছে। দুই চক্ষে জলের ধারা বহিতেছে। হৃদয়ে দারুণ শোক, দারুণ দুঃখ, কিন্তু সকল অপেক্ষা ভয় তখন আরো দারুণতর। বালিকার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। প্রাণপণ সাহসে পথ বহিয়া চলিতে লাগিল। বাগান পার হইয়া গেল। তখন দুই ধারে মাঠ। জনহীন, শব্দহীন—ধূ ধূ করিতেছে কেবল মাঠ। সেই মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট খড় বন। সেই বন হইতে দুই একটা শৃগাল বালিকার পদশব্দ পাইয়া ইতস্ততঃ দৌড়িয়া গেল। ভয়ে বালিকার অন্তরাত্মা শুকাইল। জিহ্বা টানিতে লাগিল। এক ঘটি জলের তৃষ্ণা পাইল। ভয়ে একবার চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই। কেবল মাঠ; আর উপরে সেই অনন্তবিস্তারি নীরব নিস্তব্ধ আকাশ, মধ্যে বালিকা

একেলা। যেখানে দিবা দ্বিপ্রহরে আসিতেও লোকে ভয় পায়, সেই মাঠে এই রাত্রিকালে বালিকা একেলা! আর পা নড়ে না। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। চক্ষু বুজাইয়া বালিকা সেইখানেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। "মা গো, তুমি কোথায়, মা!" বলিয়া সেই বিজন প্রান্তরে বসিয়া বালিকা তাহার অচিরমৃতা মাতার জন্য রোদন করিতে লাগিল। সেই মাতৃহীনা যখন তাহার মাতার জন্য কাঁদিল, তখন হৃদয়ের অনেকটা ভয় কমিয়া গেল। ভয় ভুলিয়া, আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া, বালিকা সেই পথের ধুলায় পড়িয়া একাকিনী অজস্রধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সে বালিকা, মনোরমা।

ক্রমে রাত্রি পোহাইল। সকাল হইল। রোদ উঠিল। বিরাজ উঠিয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইল না। হাত মুখ ধুইতে গিয়াছে ভাবিয়া ক্ষণেক অপেক্ষা করিল। আর আর সবাই আসিল, মনোরমা আসিল না। ঘাটে খুঁজিতে গেল, মনোরমা নাই। পাড়ার দুই এক জনের বাড়ী অনুসন্ধান করিল, মনোরমা সেখানে যায় নাই। তখন সন্দেহ হইল, সন্দেহ হইতে আশঙ্কা হইল, মনোরমা তবে কি রাতারাতি কোথাও চলিয়া গিয়াছে। তাহাই সম্ভব। যে ঝি আগে উঠিয়াছিল সে বলিল যে, সে উঠিয়া খিড়কির দ্বার খোলা দেখিয়াছিল। তবে তো সত্য। বিরাজ ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িল। আহা! এই দারুণ শোক, আজ চারি দিনও হয় নাই, ইহার উপর এই বেদনা সে কেমন করিয়া সহিবে? যে বাটীর বাহির হয় নাই, সে কেমন করিয়া পথ চলিবে? আজ চারি দিন তাহার মা মরিয়াছেন, আজ চারি দিন তাহার পেটে ভাত নাই—সে কি এই কষ্টে বাঁচিবে? রাত্রি হইলে যাহাকে ঘাটে আসিতেও দাঁড়াইতে হইত, সে গভীর রাত্রে একেলা কেমন করিয়া চলিয়া গেল? বালিকার ভাবিতে ভাবিতে ভয় হইল। মনোরমা তো আত্মহত্যা করে নাই? প্রাণের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। তখন মাতা ও ভগ্নী কেহ বিছানা হইতে উঠেন নাই। বালিকা আর বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিল না। নিজে যতদূর পারিল, আতিপাতি করিয়া খুঁজিল। সকলের আগে ঘাটে ঘাটে অন্বেষণ করিল, কোনও সন্ধান পাইল না। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, বালিকার আকুলতাও বড় বাড়িতে লাগিল। কিন্তু সন্ধান

যতই নিষ্ফল হইতে লাগিল, ততই তাহার মুখখানি শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

বিরাজ খুঁজিতে খুঁজিতে যাইতেছিল, পথে নীলুময়রা তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা যাচ্চ গা, মাসিমা?" বিরাজকে গ্রামের অনেকে 'মাসিমা' বলিয়া ডাকিত। বিরাজ আপনার চিন্তাতে মগ্ন ছিল, নীলুর কথা শুনিতে পায় নাই। নীলু বালিকাকে শুষ্কমুখ ও নিরুত্তর দেখিয়া বলিল "আহা, মা, এ কি সামান্যি কথা! শুনে অবধি আমাদেরই হাত পা পেটের ভিতর সেঁধিয়েছে, তা তোমরা কি আর তোমাতে আছ!"

এবার কথাটা কতক বিরাজের কানে গেল। বলিল "কি, নীলমণি!"

নীলমণি বলিল "তাই বলি মা; আহা অমন বাবুরও এমন হয় গা।"

বিরাজ অবাক্ হইয়া গেল। কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল—"কার কি হ'য়েছে, নীলমণি?"

তখন নীলমণি আকাশ হইতে পড়িল। বলিল "তবে কি মা তোমরা শোন নি। বাবুর যে বড় বিপদ—"

বিরাজ চমকিয়া উঠিল। বলিল "বাবুর—আমাদের বাবুর!—কি বিপদ, নীলমণি?"

নীলমণি আমৃতা আমৃতা করিতে লাগিল। বলিল "তা, মা, যখন তোমরা শোন নি, তখন আর নাই শুন্‌লে।"

বালিকা আগ্রহে আকুল হইল। বলিল "তা হবে না, কি হইয়াছে, বলিতে হইবে, বল।"

তখন নীলমণি বলিল "কে জানে, মা, শুন্‌লেম, বাবু নাকি কল্‌কেতায় যে সাহেবের কাছে টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন, সে ফেল্ হ'য়ে গেছে, এক পয়সাও পান নাই। সেখান থেকে টাকা নিয়ে লাটের কিস্তি দিতেন। কাজেই সে কিস্তি দেওয়া হ'লো না। এ দিকে তালুক নিলাম হয়ে গেল। সে শোক সামলাতে না পেরে বড় ব্যামোয় পড়িয়াছেন। এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়েছে। কেন, পরমানন্দ কিছু বলে নি?"

শুনিবামাত্র বিরাজ হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। কে যেন অকস্মাৎ তাহার মাথায় লোহার একটা প্রকাণ্ড মুগুর মারিল। তাহার সংজ্ঞা লোপ হইয়া

আসিতে লাগিল। সহসা নীলমণির সকল কথা গুলা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অথচ অবিশ্বাস করিবারও কিছুই নাই। বালিকা কাঁপিয়া উঠিল. চক্ষু জলে পুরিয়া আসিল, পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল, জিভ ধূলা পিটিল, কথার শক্তি হরিয়া গেল। একবার নীলমণির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল, যে জল চোখের কোণে টলটল করিতেছিল তাহা ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। শিশিরসিক্ত স্থলপদ্মের ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে যেমন ঝর ঝর করিয়া সে শিশির-জল পড়িয়া যায়, তেমনি সেই দুটী ফুটন্ত পদ্ম সদৃশ আয়ত চক্ষু হইতে অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া নীলমণির চক্ষে জল আসিল। বলিল "কেঁদ না, মা, ভগবান একেবারে বিমুখ হবেন না। চল, মা, বাড়ী চল।"

বিরাজ তখন জ্ঞান হারাইয়াছিল, তাহার প্রাণের ভিতর যে কি করিতেছিল তাহা সে বালিকা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, অথচ যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। মনোরমার চিন্তা তখন তাহার মনে ছিল না। সে নিজে জাগ্রত কি নিদ্রিত তাহাই তাহার ঠিক ছিল না তখন অন্য চিন্তা করিবে কি প্রকারে? বালিকা জানিত, ভগবান্ কখন কাহাকেও একেবারে মারেন না। তিনি যে দয়াময়। তবে কেন হঠাৎ এমন সর্ব্বনাশ হইল? ভগবান্ কেন এমন করিলেন? বিরাজ শাস্ত্রে শুনিয়াছিল, তিনি দয়াময়, কিন্তু পাপীর দণ্ডকর্ত্তা। এ কি তবে পাপের দণ্ড? মুখুয্যে মশাই তো কোন পাপ করেন নাই। তিনি যে মাটীর মানুষ। তবে কি ইহা তাহার দিদির পাপে হইল? বালিকা তাহা ভাবিতে শিহরিয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার দিদির সেই কটু বচন, সেই উগ্রমূর্ত্তি, মাতার সেই খলস্বভাব, দাদার সেই জঘন্য নীচ চরিত্র—সব কথা মনে পড়িল। বালিকা আর ভাবিতে পারিল না। মনে মনে বলিল "হে ভগবন্, তোমার এ কি বিচার, প্রভু? একজন পাপ করে, আর একজন তাহার ফল ভোগে. কেন ঠাকুর?" বালিকার মাথা ঘুরিতে লাগিল। স্থির হইয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

দেখিয়া শুনিয়া নীলু বড়ই বিপদে পড়িল। সে বুঝিল, পরমানন্দ এ কথা বাড়ীতে বলে নাই। কিন্তু পরমানন্দ যদি বাড়ীতেই না বলিবে তবে বাড়ীর দাসী বামাসুন্দরী কেমন করিয়া এ কথা জানিল. তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে

পারিল না। তাহা ভাবিতে নীলু গোলে পড়িল। পরমানন্দ যদি জানিত যে নীলুময়রা এ কথা শুনিয়াছে, তবে সেও ঐরূপ গোলে পড়িত। বাবুর বাড়ীতে কর্ত্রীর নিকট সেইরূপ ভৎসিত হইয়া পরমানন্দ মনটাকে একটু দুরস্ত করিয়া লইবার জন্য সন্ধ্যার পর বামাসুন্দরীর গৃহে গমন করিল। বামা সন্ধ্যা হইলেই তাহার ঘরে যাইত, রাত্রে বাবুর বাড়ী থাকিত না। দাসী-মহলে সেজন্য কানাকানি চলিত, বামা তাহা গ্রাহ্য করিত না। গৃহিণী কিছু বলিলে সে নানা রকম কারণ দর্শাইত। বামা কিছু মুখরা, এক কথা বলিলে দশ কথা শুনাইয়া দিত, কাজেই কেহ বড় তাহার সঙ্গে লাগিত না। বামার আরও অনেক দোষ ছিল। সে বালবিধবা, তথাপি গোড়ে গোড়ে পাড়-ওয়ালা ধুতি পরে, হাতে কাচের চুড়ি দেয়, পান খায়, মিশি দাঁতে দেয়। পাড়ার কয়েকটা ত্রিপণ্ড ছেলে বামার গালিতেও ভয় না করিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। কিন্তু ইদানীং শশীবাবু বামার সহায় হওয়ায় কোন ছেলে আর বড় কিছু বলিত না। শশীকে সকলে বড়ই ভয় করিত। হাতে তাগা, গলায় দানা, ঠোঁটে মিশির ছোপ—বামা হাত দোলাইতে দোলাইতে পথ দিয়া যাইত, দেখিয়া অনেকে হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত; অনেক ভট্টাচার্য্য আহ্নিকের মন্ত্র ভুলিয়া যাইত; পোড়াবমুখী বামা তাহা দেখিয়া টিপি টিপি হাসিত। বামার একটা খুব গুণ ছিল। তাহার গলা বড় মিঠা। বাসরঘরে তাহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিত প্রভুত্ব। যে বাসরে বামা গান না গাহিত সে বাসর বৃথা যাইত, সে বর মন্দভাগ্য বলিয়া সকলের কাছে পরিচিত হইত। এ-হেন বামাসুন্দরী যখন সন্ধ্যার পর গৃহে আসিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে-ছিল ও গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল, সেই সময়ে পরমানন্দ স্বয়ং গিয়া তথায় দর্শন দিলেন। দেখিয়া বামা একটু হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল। তার পর উভয়ে কত কথাবার্ত্তা চলিল। পরমানন্দ জানিতেন, তখনও বুঝি-লেন, বামা তাঁহারই—তখন তিনি মন খুলিয়া বামার কাছে বাবুর কথা পাড়িলেন। কথাটা এতক্ষণ তাহার মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছিল শুনিয়া বামা শীহরিয়া উঠিল। কথা যাহাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য পরমানন্দ বামাকে অনুরোধ করিল। বামাও প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু কথাটার

কেমন দোষ, পরমানন্দ পুরুষ হইয়াও সে যখন তাহা হজম্ করিতে পারে নাই তখন বামা সামান্য স্ত্রীজাতি হইয়া কি প্রকারে জীর্ণ করিতে পারিবে? রাত্রি দশটার সময় পরমানন্দ উঠিয়া গেল। বামারও বদ্‌হজমি বড়ই বাড়িয়া উঠিল। পরমানন্দ জানিত না যে তাহার ন্যায় অনেকে বামাকে অনুগ্রহ করে অথবা আপনারা অনুগৃহীত হয়। দৈবক্রমে নীলুময়রার সহিত বামার সাক্ষাৎ হইল। বামা তখন অজীর্ণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইল। টিপিয়া টিপিয়া নীলুকে কথাটা সব বলিল। শুনিয়া নীলমণির শরীর রোমাঞ্চ হইল। বামা কিরূপে জানিল, তাহা সে জিজ্ঞাসা করিল না। জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও ছিল না। এখন, নীলু যখন জানিতে পারিল যে, বাড়ীর কেহ এ কথার বিন্দু বিসর্গও শুনে নাই, অথচ বামা সব ঠিক্‌ঠাক্ বলিল, কাজেই নীলু কিছু গোলে পড়িল। কিন্তু সে চিন্তার অবসর তখন নাই। সম্মুখে শরবিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় বালিকা কাঁদিতেছে। নীলমণি বুঝিল, এ শর সেই নিক্ষেপ করিয়াছে। মনে মনে আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিল। কেন তাহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির হইল? সে না বলিলে, উহারা এখন তো এ কথা কেহ শুনিতে পাইত না। নীলমণি আপনাকে গালি দিল। কি বলিয়া বালিকাকে সান্ত্বনা করিবে তাহার কথা খুঁজিয়া পাইল না।

দূরে কে 'বিরাজ বিরাজ' করিয়া ডাকিতেছিল। বিরাজ ও নীলমণি দুই জনেই আপন আপন চিন্তায় মগ্ন ছিল, সে ডাক কেহ শুনিতে পায় নাই। যে ডাকিতেছিল, সে নিকটে আসিল। বিরাজকে দেখিতে পাইয়া উচ্চে ডাকিল। বিরাজ ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মা। তখনও বালিকার চক্ষে জলের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল, বালিকা সেই অশ্রুপ্লুত মুখখানি তুলিয়া মাতার দিকে চাহিল। কোন কথা বলিতে পারিল না। মা বলিলেন, "ওমা! তুই এখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিস্! আমি তোরে খুঁজে খুঁজে সারা হয়েছি—তা, এখানে কেন, আয়, বাড়ী আয়।"

বিরাজ কোনও উত্তর করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে মার সঙ্গে চলিল। নীলমণি আপন স্থানে চলিয়া গেল। তখনও বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতেছিল, নীরবে মার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া বিরাজ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইল। দেখিল, পেটারা,

বাক্স ও গাটরিতে উঠান বোঝাই হইয়া গিয়াছে, দুইখানা গাড়ি বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, চাকরেরা একে একে সেই সব পেটারা বাক্স গাড়িতে তুলিয়া দিতেছে। সবারই চোখে জল, কেহ ফোঁপাইতেছে, কেহ নাক ঝাড়িতেছে, কেহ বা কাপড় চোখ রগড়াইতেছে, বাড়ীময় ফোঁস ফোঁসানির একটা বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলিতেছে, "হা ভগবন্" কেহ বলিতেছে, "হে মা কালী কি কল্লে মা" কেহ বলিতেছে, "এমন মানুষেরও এমন হলো গা—" তাহারই টীকা করিয়া কেহ বলিতেছে "ইহাকেই বলে ঘোর কলি।" বিরাজ বুঝিল, বাড়ীর সকলেই সেই সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছে। কিন্তু দিদি কোথায়? এ গাড়ী কেন? এ সব বাক্স পেটারা কিসের জন্য? মাতাই বা এ অবস্থায় তাহাকে খুঁজিতেছিলেন কেন? তবে কি আমাদিগকে কলিকাতায় যাইতে হইবে? আহা, ভগবান্ দিদির এমন মতি কি করিবেন? বালিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্যামসুন্দরের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিল; তাঁহার শুষ্ক মুখ, শীর্ণ দেহ, অবমানের অবনত দৃষ্টি—সব যেন চোখের উপর দেখিতে পাইল। সেই তপ্তকাঞ্চনগৌর কান্তি কালি মাড়িয়া গিয়াছে, সে প্রসন্ন বদন চিন্তায় দুঃখে লজ্জায় এতটুকু হইয়া গিয়াছে, সে উন্নত দেহ দুদিনে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, ভাসা ভাসা চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, রোগের যন্ত্রণায়, তদধিক চিন্তার বিষম দংশনে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। বালিকা যেন সম্মুখে সব দেখিতে পাইল। সর্ব্বশরীর শীহরিয়া উঠিল। আহা, দুটা সান্ত্বনার কথা কয় এমন আপনার জন ও কাছে কেহ নাই—বালিকা কতক্ষণে যাইতে পারিবে তাহার জন্য আকুল হইয়া পড়িল। কতক্ষণে দিদি আসিবেন সে জন্য উপরের দিকে চাহিল। তখনও মহামায়া নামে না। বালিকার আর অপেক্ষা সহিল না। আস্তে আস্তে উপরে উঠিল।

মহামায়া তখন গহনার বাক্স গুছাইতে ছিলেন, বিরাজকে দেখিয়া বলিলেন "বিরাজ, আসিয়াছ?" বিরাজ আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিল। মহামায়া বলিলেন "কেঁদ না, চুপ কর।"

বিরাজ তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "তা, আর দেরি করিতেছ কেন? চল, যাই। আহা না জানি, তাঁর কত কষ্টই হইতেছে, তবু ছেলেদের দেখ্‌লে মনটা অনেক ভাল হইতে পারে।"

মহা। সে কি! আমরা তো কলিকাতায় যাইব না।

বিরাজ যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল "আমাদের কলিকাতায় যাওয়া হবে না! তবে এ সব উদ্যোগ কিসের?"

মহা। কলিকাতায় কোথায় যাব? চল, আমাদের বাড়ী যাই।

বিরা। সে কি!—কলিকাতায় যাবে না, বাড়ী যাবে! কেন? কলিকাতায় না যাও, তো এখানে থাকিবে না কেন? যদি তিনি একটু সারিয়া বাড়ীতে আসেন, এ সময়ে আমাদের অন্য জায়গায় যাওয়া কি উচিত?

মহামায়া রাগিলেন! বলিলেন "কি উচিত অনুচিত তা তোর অপেক্ষা আমি বেশি বুঝি। তোকে আর আমায় শেখাতে হবে না।"

বিরাজ কাঁদিল। বলিল, "রাগ করিও না, কিন্তু তাঁর কথা একবার ভাব দেখি, দিদি।"

মহা। সে তো গিয়াছেই। এখন ছেলে কটাকেও কি তার সঙ্গে যেতে হবে।"

বিরাজ। বালাই, অমন কথা মুখে আনিতে নাই।

মহা। মুখে আনিতে নাই কিন্তু কাজে হবে। যা ছিল, সব তো গিয়াছে এখন থাকিবার মধ্যে বাড়ী খানা আর কয় খানা গহনা।—তা, এখানে থাকিলে তার কিছুই থাকিবে না। বাবুর নাকি আরও দেনা ছিল, যারা পাওনাদার তারা ডিক্রি করিয়াছে। এখন যা আছে বেচিয়া কিনিয়া লইবে। হয়তঃ কালই পুলিশের লোক এখানে আসিবে। তা—

বিরাজ শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। সে আবার কি? হে ভগবন কি করে ঠাকুর? বালিকা ভয়ে জড় সড় হইয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে পড়িল, নীলু তো এ কথা কিছু বলে নাই, দিদিকে কেহ মিথ্যা বলিয়া থাকিবে. বালিকা সাহস করিয়া বলিল—

"না না, এ কথা তোমায় কে বলিল! আমি নীলুর মুখে সব শুনিয়াছি, সে তো ইহা বলিল না।"

বিরাজ তখন নীলমণির মুখে যাহা শুনিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া মহামায়া বলিলেন, "তবে সে তোমাকে সব বলে নাই। আমিও উহাই শুনিয়াছি, তা ছাড়া যা বলিলাম তা, আর—" এই বলিয়া মহামায়া স্বর

অত্যন্ত খাট করিয়া চুপে চুপে বলিলেন "আর, ব্যামস্যাম সব মিছে, বাবু এখন জেলে আছেন।"

"অ্যাঁ—কি সর্ব্বনাশ!"—বিরাজ ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তখন মাতা সেখানে আসিয়াছিলেন, তিনি বিরাজকে ধরিলেন। বালিকার সর্দ্দি-গরমি হইবার লক্ষণ হইল। সামলাইতে অনেকক্ষণ গেল। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বালিকা মা ও বোনের দিকে চাহিয়া রহিল।

হে রচনাকুশল ঘোষকগণ! ধন্য তোমাদিগের বিচিত্র রচনাপটুতা, ধন্য তোমাদিগের মহীয়সী কল্পনা শক্তি! তোমরা না করিতে পার, এমন কাজ দেখি না। কখন জীয়ন্তকে মারিয়া ফেল, কখন বা মরাকে বাঁচাইয়া দাও। তোমরাই ভারতীর বরপুত্র; তোমাদিগেরই জিহ্বাগ্রে সরস্বতী সদত বিরাজ করিতেছেন। আমি ক্ষুদ্র লেখক তোমাদিগের অপার মহিমা কেমন করিয়া বর্ণিব? তোমাদিগেরই কৃপায় এই কথাটা যখন মহামায়ার কানে উপস্থিত হইয়াছিল তখন এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল।

বিরাজ বালিকা, স্বভাবতঃ ভয়শীলা ও পরদুঃখকাতরা, কিন্তু তাহা হইলেও তাহার হৃদয়ে সত্যের বল ছিল। প্রথম কাতরতা দূর হইলে, হৃদয়ে সেই বলের সঞ্চার হইল। সে বলে সে কোন মতে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। এত যে ভয়—এত যে আকুলতা, তবু যেন কিসের বলে সে কথাটাকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া দিতেছে। কে যেন প্রাণের ভিতর চুপি চুপি বলিতেছে, 'না, ইহা কখনই নয়।' সাহসের কাছে ভয় স্থান পায় না। বালিকার কিসের বল—কিসের সাহস, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে না, তবু এ ভয়ানক কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সে বলিল—"না, দিদি, তুমি কি শুনিতে কি শুনিয়াছ, ইহা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা। সত্য কি মিথ্যা, ভাল, চল না কেন, কলিকাতায় গিয়া জানিয়া আসি।"

মহামায়া বলিলেন "তুই বড় নুঝিস্! আর যদি তাই হয়, তবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? আর ছেলেগুলোরই বা কি উপায় হবে? শুনচি, আজি নাকি রাত্রে পুলিশের লোক আসিবে, তখন থালাখানা বাটিটা পর্য্যন্ত—"

মা বলিলেন "সত্য, বাছা, না, আর একদণ্ড এখানে থেকে কাজ নেই। চল গাড়িতে গিয়ে উঠি।"

বিরাজ। তা যাই হউক, এ সময় নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমাদের সেখানে গিয়া থাকা কি ভাল ?

মহা। আঃ এ ছুঁড়ির রকম দেখে যে আর বাঁচিনে গা ? তা মন্দটাই বা কি ? আর যদি কথাটা সত্যই না হয়, খবর পেলেই আবার এখানে তখন সকলে চলে এলেই হবে। বাপের বাড়ী যাব—আর কোথাও নয়—এর আবার ভাল মন্দ কি ?

মা বলিলেন—"আমি মিথ্যে মনিষ্যি; তা নৈলে আজ আমিই যে এ খবর পেলে জোর ক'রে তোমাদের নিয়ে যেতাম, তোমাদের এমন ক'রে সেজেগুজে যেতে হবে কেন বল। তা ভগবান মেরেছেন—" মাতা আর কিছু বলিতেন, কিন্তু বহুদিনের শোকটা একেবারে হুস্ করিয়া উথলিয়া উঠিল। কাজেই নাকের জলে, চোখের জলে, ফোঁত ফোঁত শব্দে কথাটা থামিয়া গেল। মাতা কাঁদিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া বিরাজ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সহসা কিছু বলিতে পারিল না। বলিলেন,—"আয়, বাছা, নেমে আয়।"

বিরাজ নড়ে না।

মা আবার বলিলেন, "ঐ গাড়োয়ান হাঁকিতেছে, আর দেরি করিস্ নে।"

বিরাজ নড়ে না।

মহামায়া এক হাতে গহনার বাক্স ও অন্য হাতে কনিষ্ঠ পুত্রের হাত ধরিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিলেন। বিরাজকে ডাকিলেন "আয়, বিরাজ, আয়।

তবু বিরাজ নড়িল না। চুপ করিয়া সেই একই স্থানে বসিয়া রহিল।

মহামায়া মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—"ও আবার কি ঢং ! চুপ ক'রে বসে রহিলি যে।"

মা বিরাজের হাত ধরিলেন। বলিলেন "উঠ, চল যাই।"

বিরাজ বলিল—"তোমরা যাও, আমি যাইব না।"

শুনিয়া মা অবাক্ হইয়া গেলেন ! মহামায়া বলিলেন, "যাবি নে তো থাক্‌বি কোথায় ? খাবি কি ?"

বিরাজ কাঁদিল। বলিল—"যাহারা ভিক্ষা করিয়া খায়, তাহাদেরও দিন

কাটে, আমার না কাটিবে কেন? তোমরা যাও, মুখুয্যে মশাইর ঠিক্ খবর না পেলে আমি যাব না।"

মহামায়া রাগিয়াছিলেন। মুখ ঘুরাইয়া ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন "ওরে আমার টসি!—তবে থাক্।" রাগে ছেলেটাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া মহামায়া নীচে নামিতে লাগিলেন। ছেলেটার প্রাণ অস্ত হইবার যো হইল। মহামায়া নীচে নামিতে লাগিলেন। কিন্তু মা পারিলেন না। হাজার হউক, মার প্রাণ। বিরাজকে কখন ভাল কথায়, কখন "তোর গোষ্ঠীর পায়ে পড়ি" বলিয়া কত অনুনয় বিনয়ে, কখন বা "হতভাগা মেয়ে" বলিয়া কড়া কথায়, যাইবার জন্য এত বলিলেন, তবু সে 'হতভাগা মেয়ে' শুনিল না। যেখানে বসিয়া ছিল, সেখান হইতে উঠিল না। বিরাজ তখন মাতা ও ভগ্নীর ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিল, তখন তাহার চক্ষে জলও ছিল না। ভাবিতে ভাবিতে সে নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল। ওদিকে মহামায়া নীচে নামিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। মা তখন বড়ই বিপদে পড়িলেন। শেষ কি করেন, বিরাজ যখন একান্তই উঠিল না, তখন কাজেই তাহাকে গালি দিয়া নীচে নামিলেন। বাহিরে গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, সকলে গিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। ছেলেরা আগে হইতেই গাড়ীতে গিয়া চড়িয়া বসিয়াছিল। শশীবাবু আজ কয়েক দিন বাড়ীতে ছিলেন না। তখন সরকার, চাকর, দাসী সকলে আসিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিল। মা সরকারকে সেই "হতভাগা" মেয়েটাকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল, মা গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া বাড়ীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর, গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে, সরকার বাড়ীর ঘরে ঘরে চাবি বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দুই একজন ছাড়া সকল চাকর দাসীই একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। মহামায়া পূর্ব্বেই তাহাদিগকে জবাব দিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে কোলাহলপূর্ণ প্রকাণ্ড পুরী শূন্যভবন হইয়া পড়িল। কেবল সেই শূন্যঘরে তখন রহিল—একেলা বিরাজ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

স্বপ্ন সংগীত।

চুপ্ চুপ্ ফেল না নিশ্বাস,   তুলিও না রোদনের রোল ;
অলসে আলুয়া সখাটিরে   ভাগীরথী দিয়াছেন কোল।
লহরীর বিমল আঁচলে   স্থূলদেহ রেখেছেন ঢাকি ;
ধীরভাবে সূক্ষ্ম দেহ পানে   অনিমিষে এস চেয়ে থাকি।
মাধুর্য্য গোপনে করে বাস,   রসগ্রাহী নয়ন যাহার,
আস্বাদিতে পারে সেইজন,   সুধামাখা আস্বাদন তার।
চন্দ্রকরে প্রাঙ্গণে আকাশে   জ্বলিতেছে সৌন্দর্য্যের শিখা,
লিখে যেন গিয়াছে সে জন   আপনার হৃদয়ের লিখা।
মাঝখানে অকূল অভাব,   এক পারে গিয়াছে সে জন,
আর পারে বসিয়া আমরা   করিতেছি অশ্রু বরিষণ।
বিন্দুমাত্র অশ্রু বিরসণে   অভাব যে লঘু হয়ে যাবে,—
বালকের ক্ষুদ্র দুঃখ মত   এ জ্বালা কি ক্ষুদ্রত'কে পাবে!
রোদনের সীমার বাহিরে   এসেছি যে আমরা ভাসিয়ে,
অবাক্ জড়িমা হেথা সব,   অনুভবে আছি জড়াইয়ে।
হয়ে গেছি অশ্রুর আকর,   চেয়ে আছি পবিত্রতা পানে,
চারিধারে জ্যোতির লহরী   ঢালে শান্তি আঁধার পরাণে।
দু দণ্ডের অশ্রুজল সখে   দুই দণ্ডে যায় শুকাইয়া;
এমন অভাবে ঘিরিয়াছে   মরণের ভয়ে কাঁদে হিয়া।
মরণের অটুট মিলন—   বন্ধনেতে শিথিলতা নাই।
ছায়া হেথা রয়েছে পড়িয়া   আলো রাশি খুঁজিয়া না পাই।
ছায়াতে মিশায়ে হেথা ছায়া   ঘনীভূত করি অন্ধকারে,
মমতার ক্ষুদ্র দীপ শিখা   নিবাইয়া দেই অশ্রু ধারে।
প্রণয়ের কোমল প্রাঙ্গণে   সান্ত্বনার লৌহ চূর্ণ রাশি

অতি ধীরে জড়াইয়া দিয়া পাষাণ হইতে অভিলাষী।
হৃদয় রে হয়ো না পাষাণ। চেয়ে থাক কোমলতা পানে;
ভালবাসা পান করিবারে আত্মা তার আসিবে এখানে।
তার মুখে অলকার কথা, তার মুখে অমরের গান,
দিন রাত করিয়া শ্রবণ জুড়াইব তাপিত পরাণ।
মরণ তো স্বাধীনতা-মন্ত্র প্রাণে করে শ্যামিকা বিহীন,
জীবিত মরণ দিয়ে ঘিরে জীবনেরে করে বিমলিন।
আলাপনে কুসুম-চয়নে, রোদনে যতনে শুশ্রূষায়
যত চিন্তা জন্মেছিল প্রাণে হাসে তারা জীবন শোভায়;—
প্রাণময় বেড়াইছে ছুটি বিভেদকারিণী দৃষ্টি দিয়া,
জগতের আবরণ-ভেদী দৈব মূর্ত্তি দেখিছে চাহিয়া।
জীবিত এ ভাবনা গুলিকে পান করাইয়া হলাহল
প্রবোধ পাষাণে বাঁধি মন ফেলিব কি দুই বিন্দু জল?
দুই বিন্দু নয়নের জলে এ যন্ত্রণা যেন না ফুরায়।
নূতন আমোদ যেন আসি যন্ত্রণার রুধির না খায়।
সীমাহীন বিচ্ছেদের জ্বালা জীর্ণ শীর্ণ যদি হ'য়ে যায়,
মিশাইয়া হইবে থাকিতে দীন হীন ক্ষুদ্র নীচতায়।
বিস্মৃতিরে কঙ্কাল বদনা অভাবের গহ্বর গভীর
হৃদয়েতে বসিয়া আমার ঢালিও না ভ্রান্তির মদির।
পুত্রহীনা যার মনে পশি শোক তার লঘু ক'রে দিস্,
প্রণয়ীর ছিন্ন কুঞ্জ মাঝে নিজ হাতে বিছানা পাতিস্।
মৃতের ভাবনাগুলি ল'য়ে চিরদিন সুখী হ'য়ে র'ব,
পদতলে দলিয়া এদের করিস্ না আমারে নীরব।
গন্ধভরা স্নেহেরি কুসুম, প্রীতিমাখা নির্ম্মল আদর,
যত্ন করি সখার কারণ রাখিয়াছি ভরিয়া অন্তর।
প্রাণ পূজা প্রকৃতি ধরম— স্নেহ দিয়ে পূজেছি যাহায়,
নূতন আমোদে মাতি পুনঃ কেমনে ঠেলিব তারে পায়।
প্রকৃতি গো জননী আমার, পূর্ণ কর অভ্যাস তোমার,

নিবেদন, এ মহা বিবর পরিপূর্ণ ক'রো না আমার।
সূক্ষ্মতর হয়েছে দর্শন চারি ধারে করি বিলোকন
জ্যোতির্ম্ময় পরিমলভরা প্রাণময় সখার বদন।
বন্ধুতার তেজোময় শিখা নির্ব্বাচিত হৃদয়ে কেবল
স্বর্গ হতে আসে গো নামিয়ে হৃদয়েরে করিতে উজ্জ্বল।
গ'ড়েছিনু যে মহা জগত মিলে গুলে সখায় সখায়
নহে তাহা ধূলির মতন অকিঞ্চন এ ছার ধরায়।
জগতের বার হ'য়ে গিয়ে গ'ড়েছিনু জগৎ সুন্দর
মরণে কি সৌন্দর্য্য তাহার অকারণ হইবে অন্তর?
বিজলি-হিল্লোলে সদা প্রাণ ছুটে গিয়ে গৃহে আপনার
প্রাণের সহিত আলিঙ্গনে প্রাণ করে প্রণয় প্রচার।
স্থায়ীর মরণে নাহি ভয়, অস্থায়ীর জনমে সংশয়,
হবে বলি বিনষ্ট অস্থায়ী কাঁপে তার মরণে হৃদয়।
প্রণয়ের নির্ম্মল সুরভি, স্নেহের ললিত ফুলদল,
সুকুমারী বিধবা বালার শোকের প্রথম অশ্রুজল,
আপনার উত্তপ্ত নিশ্বাসে বিষাদিত মলিন সোদর
স্নেহ ল'য়ে রহেছে বসিয়া তোমাকে হে করিতে আদর।
এ সকল স্নেহ-উপহার আসিবে না ল'তেকি হেথায়?
ভালবাসা পান করাইতে আমরা কি পাব না তোমায়?
আশাভ্রষ্ট জনক তোমার হ'য়েছেন শোকে জ্ঞানহারা
বাহ্যসংজ্ঞা নাহিক তাঁহার বহে মাত্র নয়নের ধারা।
স্বর্গবাসী অশরীরী সখে এ সময়ে আসি একবার
মৃদু হস্তে ক'রে যাও দূর তাপিদের হৃদয়-বিকার।
মুক্ত আত্মা জীবিতের সনে আসে না কি করিতে আলাপ
সন্তাপীর হৃদয়-আবেগ তবে কি গো নিতান্ত প্রলাপ?
চুপ্ চুপ্ ফেল না নিশ্বাস, তুলিও না রোদনের রোল
নিদ্রাময়ী শান্তিদেবী আহা সুজনেরে দিয়াছেন কোল।
দেখ যেন ঘুম নাহি ভাঙ্গে আমরা তো অবোধ স্বপন

সবে মিলে যাই ধীরে ধীরে নিদ্রামাঝে হইতে মগন।
যত দিন না পারিব আহা ও নিদ্রাটি করিতে পরশ,
সংসারের কঠোর জ্বালায় হ'য়ে রব নিতান্ত অবশ।
ধর্ম্মের নির্ম্মল পর্যঙ্কিয়া ঘুমাইতে চল যাই সবে
প্রভুর করুণা-গুণে সখা অবশ্যই আমাদের হবে।

নিবেদন।

অবজ্ঞার বিষম বিষাণে সখা তুমি বিঁধেছ আমায়,
করুণা করিয়া আর কেন বিষাণ তুলিতে এলে হায়!
প্রলেপের নাহি প্রয়োজন, মর্ম্মে চর্ম্মে বিঁধেছে এ বাণ,
তুলিলে রুধির ধারাসনে প্রাণের হইবে অবসান।
প্রেমের কি এই পরিণাম একেই কি বলেরে নিরাশ—
ভাল যারে বাসি প্রাণ ভোরে সেই কি ঘটায় সর্ব্বনাশ!
যদি দুঃখ হ'য়ে থাকে মনে যদিরা বাসনা আছে জীয়ে,
তারে সখা অনুগ্রহ ক'রে শেষ বাণে যাও হে বধিয়ে

শ্রীবেণোয়ারিলাল গোস্বামী।

সাহিত্যের অবস্থা।

ফুল শুকাইলে ফুলে আর গন্ধ থাকে না। বৃক্ষ মরিলে ফলের আশা করা বৃথা। জীবন যাইলে শরীরের ক্রিয়া, গতি একেবারে বন্ধ হয়। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যেরও কি আজ ঠিক সেই অবস্থা নয়? সাহিত্যটা অসময়ে বার্দ্ধক্য-প্রাপ্ত হইল!—অর্থাৎ মারা গেল। সকলেই না পড়িয়া পণ্ডিত। এক ছত্র না লিখিয়াও গ্রন্থকার। মুখে-মুখে সমালোচনা। কেহ কোন কথা শুনিতে চায় না। বুঝে না। সকলেই বলিবার জন্য বড় ব্যস্ত।

যেন আমার মতন পণ্ডিত আর নাই! এই অন্ধ আত্ম-বিশ্বাস-প্রিয়তাই আমাদের এই নবীন সাহিত্যের কাল হইয়াছে। আর, কালের কারণ—বাঙ্গালির নির্জীবতা। ভোগ-পরায়ণতা। য়ুরোপীয় সাহিত্যানুশীলনের বিশেষ অভাব। সাহিত্যের গুরুতর দায়িত্ব-বোধ কাহারু নাই। সাহিত্যের প্রতি এত অবহেলা আর কোন দেশে দেখি না।

বলিবে—সে ত সুখের কথা, আশার বিষয়। বলিতে তোমাকে ত কেহ বারণ করে না। বলিতে পারিলে ত আমাদেরই গৌরবের কথা। কিন্তু বলিবে কি? বলিবার শক্তি কোথায়? বলিবার জন্য কবে কি করিয়াছ? বলিবার মূলে যে আজীবন কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছ। কালভেদে, সমাজের বয়সের সহিত শিক্ষারও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। অর্থাৎ জ্ঞান ক্রমে বাড়িতে থাকে। এ বাঙ্গালায় তাহা কৈ? বাঙ্গালায় যে, তাহার বিপরীত ভাব। হায়, কি বিড়ম্বনা! কথার জড়তা ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতেই Shelley, Tennyson'র উপর গালি বর্ষণ করিয়া আসিতেছ। কখন তাহা পড়িয়াছ কি? জ্ঞানের এই উন্নতি-দিনে যাহা-তাহা একটা বকিলেই হইল কি? Ruskin, Mathew Arnold'র সেই অনিন্দিত ফুল-ফোটার নিয়মে প্রস্ফুটিত ও সুস্থ নূতন art'র মধ্যে কখন প্রবেশ করিয়াছ কি? তবে খোঁড়ার সমুদ্র পার হইবার আকাঙ্ক্ষা কেন? কেন এ প্রগল্‌ভতা? George Elliot ত কিছুই নয়। জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্য্যন্ত কয় জন তাহার মতন মানবচরিত্র বিশ্লেষণে অমন সূক্ষ্ম চাতুর্য্যময়ী আভ্যন্তরিকা দৃষ্টি দেখাইতে পারিয়াছে? জীবনের বিভিন্ন অবস্থার প্রচ্ছন্ন ভাবগুলি অমন সুন্দর সুকল্পনা-সঙ্গত করিয়া আঁকিতে পার কি? চরিত্র গড়িবার অমন দোরস্ত হাত তোমাদের কয় জনের? কেবল কতকগুলো অপুষ্টিকর সকলের-জানা পুরাতন উপদেশ-বোল, কতকগুলো শুষ্ক অঙ্গ হীন তর্ক, অন্ধ স্বদেশ-ভক্তির অরুচিকর কতকগুলো "হিন্দু-ধর্ম্ম," "হিন্দু-শাস্ত্র," "হিন্দু পত্নী," "আর্য্য," "আর্য্য-সমাজ" প্রভৃতি ফাঁপা, মোটা মোটা কথাই কি সাহিত্য? সাহিত্যটা কি কেবল কতকগুলা শব্দের যোজনা? নীরস শুষ্ক ফুলের মালা? না, তা কখনই নয়। সাহিত্য, মনুষ্য-জীবন লইয়া। মানবীয় সুখ-দুঃখ লইয়া। মানবীয় হাসি-কান্নার জোয়ার-ভাঁটা লইয়া। সাহিত্য মিথ্যা নহে, শিল্পি

করা নহে। সাহিত্য সত্য, খাঁটি সোণা। ছায়া নহে, প্রাণ। সাহিত্য, প্রভাতের সূর্য্য। রজনীর চন্দ্র। সাহিত্য, ফুলের হাসি। বসন্তের বাতাস। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। জীবনের উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। খুঁজিলে সাহিত্যের উদ্দেশ্যও পাওয়া যায়। তাহা বলিয়া জীবনের সকল কার্য্য ত্যাগ করিয়া, আগে থেকেই তাহার উদ্দেশ্য কি জানিবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া ভাবিলে কি জীবন চলে? না, টিকে? ফুল-ফোটার উদ্দেশ্য কি, এই ভাবিয়া যদি ফুল ফুটিত, তাহা হইলে কি কখন আমরা ফুলের মধুর স্বাস্থ্যকর সৌরভ পাইতাম? না, ফুলের মালা গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইয়া কি কখন আনন্দ উপভোগ করিতাম? ফুল লইয়া কাহার জীবিকানির্ব্বাহ চলিত? আরও এক কথা, সাহিত্যের অঙ্গপুষ্ট হইতে না হইতেই এই সময় থেকেই অত "উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য" করিয়া চীৎকার করিলে উহার অঙ্গ আর কখন পুষ্ট হইবে কি? আপনারা এক একজন বিজ্ঞ-রাজ বলিয়া কি সাহিত্যটাও এই অল্প বয়সে বিজ্ঞ হইয়া পড়িবে? দেখিতে পাই, কেহ কেহ এই বালক-সাহিত্যের মুখ হইতে একেবারে সকল কথা—সকল প্রকারের ভাব—বাহির করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহারা জানে না যে, তাহাদের সে উদ্দেশ্য—ভারাক্রান্ত প্রাণহীন কাজ, প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল নিয়মের বিরুদ্ধে। তাহাও কি কখন হয়? যাহা চির দিন হইয়া আসিতেছে, তাহাই যদি সত্য হয়, তবে, যতই কঠিন নিয়ম কর না কেন, অঙ্কুরে প্রথমেই ফল ফলিবে না। ফলিলেও, তাহার পরিণাম বিশ্বামিত্রের জগতের সঙ্গে এক! প্রকৃতির উপর টেক্কা দেওয়া চলে না। আন্তরিক দৃষ্টি কাহার নাই। অন্তর্জগৎ লোপ পাইতেছে। বাহ্যজগৎ প্রাধান্য লাভ করিতেছে। সাহিত্যটা দিন দিন ছোট হইয়া আসিতেছে, মরিয়া যাইতেছে। পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিলেই কি সাহিত্যের উন্নতি হয়?

আমি এই স্থানে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য-পতির নবপ্রকাশিত "সীতারাম" গ্রন্থ সম্বন্ধে দু-চার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে সাহস করি না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের তিনি শরীরী—জীবন্ত সমষ্টি। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালা

সাহিত্যে দাঁড়াইতে পারে না।* আমি তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করি। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা লইয়া সর্ব্বদাই গৌরব করি, কিন্তু আজ আমাকে সত্যের অনুরোধে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবী মঙ্গলের দিকে চাহিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইতেছে। আশা করি তিনি আমার এই সত্যা-দিষ্ট অসৌজন্যতা ক্ষমা করিবেন। আমি মনের কথা খুলিয়া বলিলাম

কর্ত্তার দোষে, কর্ত্তার অতি-পাণ্ডিত্যেই গৃহ ভাঙ্গে। নেপোলিয়নের কার্য্যের ফল আজও ফ্রান্সে ফলিতেছে। সর্ব্বত্রই এই রূপ। আমাদের এই সাহিত্যটা দেখিলেই কথাটা বুঝা যাইবে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-পতি ধর্ম্ম লইয়া মাতিয়াছেন। জানি না, কেবল ধর্ম্ম-প্রচারকের পদে সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দাওয়া কতটা। ধর্ম্মের দ্বারা বঙ্গের দুরদৃষ্ট ঘুচিবে ভাবিয়াছেন। সেই জন্য তিনি এখন, কাগজে-কলমে ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। তাঁহার শেষের পুস্তক তিন খানিই ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়। কেবল ধর্ম্মই তাহাদের উদ্দেশ্য। আমি তাঁহার তিন খানি পুস্তকই পড়িয়াছি। আজ তাঁহার শেষ পুস্তক সীতারামের উপর কিছু বলিব।

সাহিত্য-পতি, সীতারামকে উপন্যাস বলিয়াছেন। আমি সীতারামকে উপন্যাস বলিতে পারি না। সীতারাম উপন্যাসাকারে ধর্ম্মব্যাখ্যা— তত্ত্ব। গ্রন্থকারের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের চিত্র। বুঝি বা ইহা বয়সের ধর্ম্ম। বুঝি জীবনের সন্ধ্যাকাল আসিয়াছে দেখিয়া কবি ধর্ম্ম কথা আরম্ভ করিয়াছেন। উপন্যাস কি করিয়া বলিব? উপন্যাসের সে স্বতঃপ্রস্ফুটিত art কোথায়? চরিত্রের সে বৈচিত্র্য কোথায়? সীতারামে পুরুষ কৈ? বাঙ্গালির চরিত্র গঠন করিবার আদর্শ-চরিত্র কোথায়? ধর্ম্মের জন্য সে আকাঙ্ক্ষা কোথায়? কিসের জন্য ধর্ম্ম? সীতারামে ধর্ম্ম বড়ই অস্ফুট। গ্রন্থকার যে কথাটি বলিতে চান, সেটা যেন এখন ফুটে নাই। চরিত্রগুলিকে ত মানুষ বলিয়াই বোধ হয় না! যেন কতকগুলা অশরীরী মানবীয় বৃত্তি চোখের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা কি উপন্যাস? সীতারামের রাজ্যধ্বংস হইবেই ত। সীতারাম যে, তাহার ধর্ম্ম এখন, পরিপাক করিতে পারে নাই। সীতারাম পড়িলে ধর্ম্ম-জীবন প্রচ্ছন্ন। কেবল কতকগুলা ধর্ম্ম-কথা মাথা উঁচু করিয়া জাগিয়া আছে। আমরা ধর্ম্মের তত্ত্ব, নিয়ম,

শুনিবার আগে, ধর্ম্মময় জীবনের কার্য্য, চিত্র দেখিতে চাই। দুধে-জলে যেমন মিশে, ধর্ম্মের সঙ্গে চরিত্রের সেরূপ মিশান চিত্র সীতারামে কোথায়? বঙ্কিমবাবু, চরিত্রের সঙ্গে ধর্ম্ম সেরূপ মিশাইতে পারেন নাই। সীতারামে ধর্ম্ম—সকল স্থানেই—চরিত্রের আগে দৌড়াইয়াছে। চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় নাই। সাহিত্যে এই ধর্ম্মের এত বেশী স্থান বড়ই অস্বাস্থ্যকর—অশান্তিজনক—ন্যায়শাস্ত্রের নিতান্ত বিরুদ্ধে। ধর্ম্মের এই অসহনীয় ভারে ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সাহিত্য মর-মর। ইহার মধ্যেই সাহিত্যে ধর্ম্ম ঢুকিল।—কেহ যেন না মনে করেন আমি ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছি। ধর্ম্মের নিন্দা, আমার উদ্দেশ্য নহে।—আমি এই বলিতেছি যে, আমাদের জাতীয় সাহিত্য যে এখন গঠিত হয় নাই। জাতীয় চরিত্র কোথায়? ধর্ম্মের ভিত্তি নাই ধর্ম্ম দাঁড়াইবে কাহার উপর? আমরা এখন ধর্ম্ম চাই না। চাই সাহিত্য। চরিত্র চাই। জীবন চাই। বাঙ্গালীকে মানুষ কর। জগতী-তলে যে বাঙ্গালির স্থান নাই।

বলিয়াছি, কর্ত্তার দোষে সংসারে যত বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব। সাহিত্যেও তাই। আজ যে সাহিত্যে এত গোলমাল, এত যে তাহার অধোগতি, কেবল কি তাহা সাহিত্য-পতির কার্য্য-নিপুণতার অভাবে নহে? সেই জন্য সাহিত্যে সকলেই "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।" সেই জন্য একটা কথাও কাহার শুনিবার যোগ্য নহে। কথা কহিতে কেহ জানে না। কে তাহাদের শিখাবে? দেশে মাষ্টারের অভাব। মাষ্টার-আর্ট তাহারা কি করিয়া শেখাবে? মাটি যথেষ্ট আছে। পাকা পটুয়া নাই। সেই জন্য একটা পুঁতুল সৃষ্ট হইতেছে না। পুঁতুল গড়িবার শক্তি কাহার নাই। সে শিল্প-কৌশল তাহারা জানে না। তাই সকলেই এক একটা বাঁদর গড়িয়া বসিতেছে। হায়, বাঙ্গালীর কি দুরদৃষ্ট!

আর ভাই বাঙ্গালি, তোমাকে একটা কথা বলি। বলি, সে দিন গিয়াছে। অজ্ঞতা, মিথ্যা, গোঁজামিলনের দিন আর নাই। এখন যুগান্তর উপস্থিত। সকল জিনিসের উপরে ভাসিয়া বেড়াইবার দিন গিয়াছে। চির দিনের মাছি-স্বভাব পরিত্যাগ কর। অন্তরে প্রবেশ করিবার এখন দিন আসিয়াছে। যাহা সত্য, তাহা বল। অনুমানের উপর নির্ভর করা

করিও না। তাহা কখন টিকিবে না। যাহা তুমি বুঝ নাই, অপরে তাহা কি বুঝিবে? অনাদি চির দিবসের সত্য-পথে চল, আলো পাইবে। অনুমানের অন্ধকারময় পথে চিরজীবন ঘুরিয়া বেড়াইলেও আলো কখন মিলিবে না। এমন মালা গাঁথ, যাহা বাঙ্গালির হৃদয়ে যুগযুগান্তর ধরিয়া শোভা পাইবে।

যত দিন বঙ্কিম বাবু, সাহিত্য লইয়া ছিলেন, ততদিন তিনি আমাদের ঘরের কাছে, আমাদের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া ছিলেন। "বঙ্গদর্শন" এ কথার সুন্দর প্রমাণ। ততদিন বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন গোলই ছিল না। কাজ বেশ চলিতেছিল। যে দিন হইতে তিনি ধর্ম্মে হাত দিয়াছেন, সেই দিন হইতেই তিনি আমাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছেন। আজ আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার কথা শুনিতে পাইতেছি না। তিনি যেন সুদূরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতেছেন। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত, বিষবৃক্ষ, কি কেবল বক্তৃতা—বেদীর উপর দাঁড়াইয়া উপদেশ? না। তাহারা এক একটি জীবন। চির প্রবাহিত প্রাণের বিচিত্র খেলা। মরীচিকা নহে। জীবনের অনন্ত তৃষা-নিবারণের চির-নিঃসৃত প্রবাহিনী। টানাপাখার বাতাস নহে। স্বাস্থ্যজনক দক্ষিণা বাতাস। ধর্ম্ম-স্রোতের অস্থায়ী তৃণ নহে। তাহারা পৃথিবী-বেষ্টনকারী শক্তির সহিত একসূত্রে, এক নিয়মে গ্রথিত। সেই শক্তি বলে তাহারা অবিনশ্বর। সে শক্তি, বাঁচিয়া থাকিবার সে অসীম আত্মনির্ভর বল, সীতারামের কোথায়? আজ আমি সাহিত্যপতির নিন্দা গাহিতে বসি নাই। দুঃখের কান্না কাঁদিতেছি। সাহিত্যপতির কাছে আমাদের গভীর অভাব জানাইতেছি। সাহিত্যের এ দুর্ভিক্ষ দিনে তিনি কেন অবসর লইলেন? এ দুর্দ্দশার হাত হইতে তিনি ভিন্ন আমাদের আর কে রক্ষা করিবে? এ সাহিত্যের আর কে আছে! এ সাহিত্য তাঁহারই। এ সাহিত্যের ভার কে লইবে? সাহিত্যের মর্য্যাদা কে রাখিবে? একদিন তিনিই না "উত্তররামচরিত" সমালোচনার সময় বলিয়াছিলেন যে, "কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতি নির্ব্বাচনের দ্বারা (কখন) শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতি শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" তাই কবি-

দের স্থান, সকলকার উপরে। তা, এ কথা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন? এ কথার পরও কেন আজ তিনি কেবল ধর্ম্মের উপদেশ, ধর্ম্মের theory খাড়া করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তশুদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন? সেই জন্যই ত সীতারামের উদ্দেশ্য বিফল হইয়াছে। সেই জন্যই ত সীতারামে সৃজন-কৌশলের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। সেই জন্যই সীতারাম রক্তমাংস-বর্জ্জিত। রসোদ্ভাবনের মোহিনীশক্তির অতীত। তা, সীতারাম যাহাই হউক, আমরা সীতারাম চাই না। সীতারামের ধর্ম্মও চাই না। বাঙ্গালা সাহিত্য যিনি সৃজন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকেই চাই। বাঙ্গালা সাহিত্য যায়। তিনি আসিয়া রক্ষা করুন। তিনি অবসর লইয়াছেন বলিয়াইত চারিদিকে এত তর্ক, এত গোলমাল। বাঙ্গালা সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য। তাঁহার স্থান তিনি আসিয়া পূর্ণ করুন। সে স্থানের অধিকারী আর কেহ নাই

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ পুস্তক সকল যজুর্ব্বেদের পর হইতেই বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। কারণ, দুর্ব্বোধ বৈদিক মন্ত্রাদির ব্যাখ্যার নিমিত্তই ব্রাহ্মণদিগের সৃষ্টি। সকল বেদের মধ্যে যজুর্ব্বেদের মন্ত্রাদির বিশেষ ব্যাখ্যার আবশ্যক; কাজেই ঐ সময় হইতেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকলের বিশেষ পারিপাট্য হওয়াই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

আরও আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ সম্মিষ্ট, আমরা কেবল শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণকে (যদিও উহা অতীব অধুনিক বলিয়া বোধ হয়) ব্রাহ্মণ গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সুশৃঙ্খল ও সম্পূর্ণরূপ দেখিতে পাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের মত ইহাও যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উক্ত হইয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। সংহিতার মত ইহা মাধ্যন্দিন এবং কণ্ব এই দুই শাখায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে মাধ্যন্দিন শাখা চতুর্দ্দশ কাণ্ডে বিভক্ত এবং সমুদায়ে একশত অধ্যায় সম্পূর্ণ। ইহাতে আটষট্টি প্রপাঠক, চারিশত আটত্রিশ ব্রাহ্মণ এবং সাত হাজার ছয় শত চব্বিশ কাণ্ডিকা আছে। কণ্ব শাখা সপ্তদশ কাণ্ডে বিভক্ত এবং সমুদায়ে একশত চার অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার ব্রাহ্মণ সংখ্যা চারিশত আটচল্লিশ এবং কাণ্ডিকা পাঁচ হাজার অটশত ছেষট্টি। এই ব্রাহ্মণের প্রথম নয় কাণ্ড মূল সংহিতার প্রথম অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রত্যক্ষর সম্পূর্ণরূপে অনুগমন করিয়াছে, অর্থাৎ যথাক্রমে এক একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞীয় ব্যবহার দেখাইয়াছে। অবশিষ্ট নয় কাণ্ড এরূপ সম্পূর্ণ নয়, ইহা মধ্য মধ্য হইতে অংশবিশেষের ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। ইহাতে বোধ হইতেছে ইহা পর সময়ে বর্দ্ধিত হইয়া থাকিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ স্বয়ং টীকা স্বরূপ এবং আধুনিক হইলেও সায়নাচার্য্যের টীকা ব্যতীত ইহার সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। ইহাও অনেকাংশে সংহিতার অনুগামী।

সায়নাচার্য্য সামবেদের ব্রাহ্মণ আটটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) প্রৌঢ়, তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, (২) ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ, (৩) সামবিধি, (৪) আর্ষেয় ব্রাহ্মণ, (৫) দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ, (৬) উপনিষৎ যাহা অধ্যাপক মূলরের (Am. Sank. Lit. p. 349) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছু নয়। উপরি-উক্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণদ্বয় অতিশয় উপকারী। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একশত দিন সম্পাদ্য সোম যজ্ঞের বিষয় উক্ত হইয়াছে। ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণে নানাবিধ বশীকরণাদি সাধক যজ্ঞকর্ম্মের উক্তি দৃষ্ট হয়। ইহার শেষ অধ্যায়ে জরাদি রোগের শান্তিকর্ম্ম উক্ত হইয়াছে। কেবল তাহা

নহে, ভূমি কম্পাদি ভৌতিক বা অন্য কোন গ্রহাদি জন্য উপদ্রব শান্তির কথাও দৃষ্ট হয়।

অথর্ব্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ এবং যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী এবং চরকদিগের বিবাদ দৃঢ় রূপ আবদ্ধ হইলে পর এবং বাজসনেয়ী সংহিতার সম্পূর্ণ রচনা হইবার পর এই গোপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয়। কারণ, যেখানে এই গোপথ ব্রাহ্মণে অন্য বেদবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে সেই খানেই দেখিবে প্রথম ছত্র যজুর্ব্বেদ হইতে উদ্ধৃত, তাহাও আবার কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ হইতে, নয় বাজসনেয়ী সংহিতা হইতে। অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ইহাতে আকস্মিক ঘটনার উক্তিটা কিছু বিস্তৃত রূপ। অন্যান্য ব্রাহ্মণ নিচয়ে যেমন যাগ যজ্ঞের বিষয় উক্তি আছে, গোপথ ব্রাহ্মণেও সেইরূপ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সংহিতা এবং মন্ত্র উভয় ভাগ একত্রিত হইয়া হিন্দুদিগের নিকট বেদ নামে অভিহিত হয়। এই উভয়ের আর একটি সাধারণ নাম শ্রুতি। বেদের কথা বলিতে ঐ সকল শ্রেণীর পুস্তক যাহা ইহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ, তাহাদের নাম পরিত্যাগ করা আমাদের কেবল অনুচিত নয়, প্রস্তাবও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কতকগুলি বেদের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ট রূপে সম্বদ্ধ, আর কতকগুলি কিছু অল্প অল্প ভাবে। যে গুলি ঘনিষ্ট ভাবে সম্বদ্ধ তাহারা বেদাঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বেদের সহিত সম্বদ্ধ পুস্তকের মধ্যে উপনিষৎই প্রধান। উহা বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আজকাল য়ুরোপে উপনিষদের অত্যন্ত প্রচার।

[ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

কানন।

কানন একেলা বসে কেন নদীতীরে,
সংসারের দূরে এসে ভাবিছে গভীরে!
কি তার মনের কথা, কি তার প্রাণের ব্যথা,
ঝাউবন হ'তে শ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে।
কানন একেলা বসে কেন নদীতীরে!

কুলু কুলু কল্লোলিনী গাহিতেছে গান,
মজিয়া গিয়াছে কি সে শুনি সেই তান!
লহরে লহরে লীলা তরঙ্গিণী করে খেলা,
আনমনে ব'সে বা কি দেখিতেছে তাই,
কানন কি ভাবে একা বুঝিয়া না পাই।

দূর গ্রামে কোলাহল ওঠে অনিবার—
বায়ু তার ধীরে ব'য়ে আনে সমাচার,
কোন দিকে নাহি কান, কে জানে কাহার ধ্যান
একাকী সে ব'সে ব'সে করে নিরালায়,
নীরব নিঝুম মূর্ত্তি দেখে ভয় পায়।

না জানি অপেক্ষা কার করে ব'সে ব'সে—
যত তরী আসে যায় দেখে অনিমেষে।
দূর তরী আসে কাছে, ফেলে পুন যায় পাছে,
তবু ত আসে না তার বাসনার ধন;—
সবে আসে, সবে যায়,—সে কেন এমন!

তার কি গো আসিবার না হয় সময়,—
শুধু অপেক্ষায় প্রাণ আর কত রয়?
দূরে পদশব্দ হয় কানন চমকি' চায়,
দেখে কুম্ভ লয়ে যায় ধীবররমণী;
হায় হায় সত্য সে তো আসিবে না জানি!

দেখিতে দেখিতে বেলা ফুরাইয়া যায়,
গোধূলি নামিয়া আসে গগনের গায়।
বসে বসে পথ চাহি কত যুগ গেল বাহি,
আসিবার নয় সে যে, বৃথায় আশ্বাস,—
নীরবে নয়ন মুছি ফেলে দীর্ঘ শ্বাস।

গোধূলিও চলে গেল, সন্ধ্যা আসে পিছে,
পাখিরা ডাকিয়া বলে 'আর ভাবা মিছে।'
শরীর শিহরি উঠে, স্বপ্ন তার যায় টুটে,
ম্লান মুখখানি আরো ম্লান হ'য়ে যায়,
শূন্যে চেয়ে একা বসি করে হায় হায়।

তবু ত নদীর ধারে ছাড়ে না কানন।
সেই সে একই স্থানে বসিয়া তেমন।
থেমে গেল লোকশব্দ বায়ুটিও হলো স্তব্ধ
তরীদের যাওয়া আসা গেল বন্ধ হয়ে,
আঁধারে বিজনে একা তবু বসে চেয়ে।

ক্রমে রাত্রি ঘোর বেশে নামে ধীরে ধীরে,
আঁধারেরা চারি দিকে আসে ঘিরে ঘিরে।
কিছুতেই লক্ষ্য নাই, বসে আছে শূন্যে চাই,
না জানি কেমন সে যে শঙ্কা নাহি লাগে,
বাসনাটি বুকে ক'রে সারা নিশি জাগে।

এত প্রেম কোথা পেলে নাহি কি অবধি!
এত কি বাসনা তার যাঁর এ সমাধি!
কে তার প্রাণের ধন, সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
নিশি দিন পথ চেয়ে ব'সে নদীতীরে,
সে তো ভুলে এক দিনো নাহি দেখে ফিরে!

কভু আসিবে না সে ত জানে ভাল মনে,
তবু বড় সুখ তার আসার কল্পনে।
না না কিছু ব'লো নারে, সে কি ও ছাড়িতে পারে,
দুদণ্ড তা হলে প্রাণ রবে না শরীরে,
কানন শুকায়ে যাবে অই নদীতীরে।

শিবস্তোত্র।

শ্রুতৌ সংশ্রূয়ন্তে মরুদনলভাস্বৎসিতরুচি-
বিয়ৎপৃথ্বীপাথোহবননিপুণমূর্ত্তয় ইমাঃ।
যদীয়া লোকানামবিমলধিয়াং জ্ঞানবিষয়া
প্রভূনাং দেবোহসৌ ভবতু ভুবি ভব্যায় ভজতাম্ ॥ ১ ॥

অবিমলবুদ্ধি মানবগণের জ্ঞানের বিষয়ীভূত মরুৎ, অনল, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, ও পৃথিবী, যাহার এই অষ্টবিধ মূর্ত্তি আমরা শ্রুতিতে শুনিতে পাই, সেই দেবদেব পৃথিবীতে ভক্তবৃন্দের মঙ্গল সাধন করুন। ১।

ত্রয়ীময়ো যো দ্বিজবর্য্যদত্তান্
পুষ্পাঞ্জলীনাদৃত আদদাতি।
বিশ্বেষু বৈশ্বানরমূর্ত্তিরীশো
ভূয়াৎ স ভব্যায় ভবার্ত্তিহারী ॥ ২ ॥

যিনি ত্রয়ী স্বরূপ, যিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের দত্ত পুষ্পাঞ্জলি সমাদরে গ্রহণ করেন, যিনি বিশ্বমণ্ডলে অগ্নিরূপে বিরাজমান আছেন, সেই সংসারদুঃখহারী দেব শুভ সংসাধন করুন। ২।

তমো বিদলয়ন্ মনঃকমলসংঘমুন্মীলয়ন্
মুনীন্দ্রহৃদয়াম্বুবৎ করুণয়া সমুদ্দীপয়ন্।
দ্যুতিকগরয়ন্ নহোহহিমসিতাংশুসম্বন্ধিনীং
মহেন্দ্রমহিতো মহোময়বপুর্মহেশোহবতু ॥ ৩ ॥

যিনি মুনীন্দ্রগণের অজ্ঞানতিমির বিদলিত ও মানসরূপ কমল সমূহ উন্মীলিত করিয়া করুণাপূর্ব্বক হৃদয়াকাশ প্রকাশিত করেন, যাঁহার জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রবর্দ্ধিত হয়, মহেন্দ্রপূজিত সেই তেজোময় মূর্ত্তিধারী মহেশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩।

লীলাখেলনকং বিভাতি নিখিলং যস্য প্রকাশং জগৎ
মায়াতীতমনন্তবিশ্বনিলয়ং মায়াপতিং মানদম্।
উগ্রং ঘোরজটাধরং ফণধরৈর্ভীমং মনোজান্তকং
বিদ্যাদীপিতমস্থনার্দ্ধমচলং দেবেশমীশং ভজে ॥ ৪ ॥

এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান অখিল বিশ্বমণ্ডল যাঁহার লীলাখেলনক স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, যিনি স্বয়ং মায়াপতি হইয়াও মায়াতীত, যাঁহাতে এই বিশ্বমণ্ডল বিলীন হইবে, যিনি একমাত্র জ্ঞানালোকে প্রকাশিত এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্য স্ত্রী-পুরুষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, সেই উগ্র, ভীষণ জটাধারী ভুজঙ্গভূষিত কামহন্তা দেবাদিদেব মহাদেবকে আমি ভজনা করি।৪।

ধ্যায়ন্তুস্তসমস্তদোষমগুণং ক্লিশ্যন্তু বা কর্ম্মভিঃ
বিদ্যাভির্বিবদন্তু বা বহুমতৈস্তত্রালসাঃ স্মো বয়ম্।
লীলালীনজগৎপটে স্মরহরে দাক্ষায়ণীবল্লভে
সর্ব্বে বিশ্বভয়াপহারিণি মনোবিশ্রামমাশাস্মহে ॥ ৫ ॥

লোকে সমস্ত দোষশূন্য নির্গুণ ব্রহ্মকে ধ্যান করুক, নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা ক্লেশ পাক, বিদ্যা বা বিবিধ মত লইয়া, পরস্পর বিবাদ করুক, আমরা সে বিষয়ে দৃক্‌পাতও করিব না ; যিনি আলীলাক্রমে আপনাতে এই জগৎপটলীন করিতেছেন, সেই কামহন্তা দাক্ষায়ণীবল্লভ বিশ্বভয়াপহারী দেবদেবে আমাদিগের মন বিশ্রামলাভ করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। ৫।

রে রে মানস মে প্রদীপ্তমহসো জ্ঞানস্য জ্ঞেয়স্য চ
দেবানমপি দৈবতস্য খলুতে পুত্রস্য বিদ্বেষিণঃ।
পাদাম্ভোরুহমায়নান্ধকরিপোঃ সংসারগর্ত্তে সুধা
কিং ত্বাং ক্ষিপ্যসি পুত্রশুক্‌চভবতো নৈতানতা যাস্যতি ॥ ৬ ॥

রে মন প্রদীপ্ত তেজঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ দেবাদেব অন্ধক রিপুর পাদপদ্ম

ধ্যান কর, তুমি কি তাঁহাকে, তোমার পুত্র মনোভূর বিনাশ কর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহার ধ্যান বিমুখহইয়া আমাকে সংসারগর্ত্তে নিক্ষেপ করিতেছ? তোমার সে আশা নিষ্ফল, ইহার দ্বারা তোমার পুত্রশোক দূর হইবে না॥ ৬॥

যাহি ক্ষ্মাধরতুঙ্গশেখরমকূপারং তথা সংতর
দেশাংশ্চ ব্রজ শাধিরাজ্যমতুলং কীর্ত্তিং লভস্বাতুলাম্।
আশা তে নতু শান্তিমেষ্যতি নমু ক্ষেমে তবেচ্ছাস্তি চে
দন্তে ভীমকৃতান্তকৃন্তনমমুং শ্রীপার্ব্বতীশং ভজ॥ ৭॥

তুমি মহীধরের উত্তুঙ্গ শিখর দেশেই আরোহণ কর, সমুদ্রই উত্তীর্ণ হও, দেশ দেশান্তরেই বা যাও, অতুল রাজ্যই বা শাসন কর অথবা বিপুল কীর্ত্তিই লাভ কর, তোমার আশার শান্তি কোথায়, যদি অন্তিম কালে স্বীয় কুশল প্রার্থনা কর, তবে সেই করাল কালের হন্তা শ্রীপার্ব্বতীপতিকে ভজনা কর॥ ৭॥

স্বল্পে স্বল্পরসে সদা পরবশে ক্লেশোত্তরে ভঙ্গুরে
শূন্যেঽস্মিন্ মরুকাননাভবিষয়ে তৃষ্ণাতুরো ধাবসি।
আনন্দং পরিপূর্ণমন্তরহিতং স্বাত্মানমেকং শিবং
চিত্তে স্বীকুরুষে ন কিং নমু মহামোহন্ধং বিদূরীকুরু॥ ৮॥

মন! সামান্য ও স্বল্পাস্বাদবিশিষ্ট, সর্ব্বদা পরাধীন, ক্লেশ-প্রধান, ক্ষণস্থায়ী, শূন্য, মরুভূমি-সদৃশ এই বিষয়বাসনায় আতুর হইয়া প্রধাবিত হইতেছ, সেই আনন্দময় পূর্ণ-অনন্ত শিবস্বরূপ আত্মাকে কেন অবলম্বন করিতেছ না। তোমার মোহান্ধকার বিদূরিত কর॥ ৮॥

মিত্রৈশ্চিত্রকথৈঃ সদা বিহরসি স্ত্রীভিঃ সুতৈঃ ক্রীড়সি
হন্তাত্যন্তসুদুর্জ্জয়ং ন মনুষে কালং করালং রিপুম্।
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়পাদপদ্মশরণং যাপ্লুস্য জীবাভয়ং
ব্রহ্মেন্দ্রাদিসুদুর্লভং নমু পদং হস্তাবচেয়ং ভবেৎ॥ ৯॥

হে জীব! চিত্রালাপী মিত্রবর্গের সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেছ—স্ত্রী ও পুত্রগণের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছ, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অত্যন্ত সুদুর্জ্জয় করাল কালকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিতেছ না। দেখ যাহারা শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ের পাদপদ্মের শরণাগত হইয়াছেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের দুর্লভ পদও তাঁহাদিগের হস্তলভ্য॥ ৯॥

ত্রিসন্ধ্যাশুচিমানসা অপি জপন্তি যং ব্রাহ্মণাঃ
মনুং প্রণবপূর্ব্বকং সপদি তেজসাং বর্দ্ধকম্।
সভর্গ ইতি-বিশ্রুতঃ শ্রুতিষু যশ্চ দেবোঽব্যয়ঃ
স এব হৃদয়াম্বরে স্ফুরতু কোপি কণ্ঠেশিতঃ॥ ১০॥

ত্রিসন্ধ্যাশুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সদ্যতেজোবর্দ্ধক প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক যে মন্ত্র প্রতিদিন জপ করিয়া থাকেন, যে অবিনাশী দেব ভর্গ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জরূপে শ্রুতিতে বিশ্রুত আছেন, এবং যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, সেই দেবদেব আমার হৃদয়াকাশে স্ফুরিত হউন॥ ১০॥

ময়ন্নাশং শীঘ্রং রবিরিব তমোজালনিচয়ং
সদা চিত্তাম্ভোজে মম তু বিতর জ্যোতিরমলম্।
প্রগাতুং কীর্ত্তিং তে মনসি মম বাঞ্ছাতিমহতী
দয়া ভূতে নিত্যা তবহি বিদিতা ভূতনিলয়॥ ১১॥

হে ভূতনিলয়! তুমি রবির ন্যায় সমস্ত অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমার হৃদয়-কমলে বিমল জ্যোতিঃ বিতরণ কর, আমার একান্ত বাসনা যে তোমার কীর্ত্তি গান করি, সর্ব্বভূতে তোমার দয়া নিত্য বিদিত আছে॥ ১১॥

ভজিষ্ণূনাং মৃত্যুং জয়সি সততং পাতকমিব
ততো বেদা মৃত্যুঞ্জয় ইতি সমাম্নাপয়তি হি।
কদা বাস্মাকীনং হরসি চ পুরা মৃত্যুমনঘ
বয়ং ত্বাং জানীমো জনিমৃতিজরাহেতুমচলম্॥ ১২॥

হে দেব! তুমি ভজনশীল ব্যক্তিগণের যেমন সর্ব্বদা পাতক হরণ কর, সেইরূপ মৃত্যুও জয় করিয়া থাক, সেই জন্য বেদ তোমাকে মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, হে নিষ্পাপ! তুমি কবে আমাদের মৃত্যু হরণ করিবে, আমরা তোমাকে জন্ম মৃত্যু ও জরা একমাত্র কারণরূপে জানি॥ ১২॥

রবিশ্চন্দ্রস্তারাশিশিরশরদাদ্যাশ্চ ঋতব
উদধচ্ছন্না ভূঃ প্রিয়কসদৃশী দেব সততম্।
সদা মার্গে স্বে স্বে ভ্রমতি গগনে যন্নিয়মতো
মহিম্নস্তে শক্তি স্ত্রিপুরহর সা বিশ্বনিয়তা॥ ১৩॥

রবি, চন্দ্র, তারা, শিশির, শরৎ প্রভৃতি ঋতুগণ ও সমুদ্র মেখলা কদম্ব

কুসুম-সদৃশ এই ভূমণ্ডল আকাশ পথে সর্ব্ব কালে নিরন্তর যে নিয়মিতরূপে সঞ্চরণ করিতেছে, হে ত্রিপুরহর দেব! তাহাও তোমার বিশ্বনিরত মহিমার শক্তি ॥ ১৩ ॥

ন ন্যূনং নহি চাধিকং নিয়মতো যাত্যেকযদ্ভাস্করঃ
কালস্য প্রণয়ন্ ক্ষণপ্রভৃতিকান্ ভাগান্ প্রভাদীপিতঃ।
সাপি ত্বন্নিজকার্য্যসংস্থিতিরিয়ং যামাশ্রিতা মানবাঃ
স্বং স্বং নিষ্ক্রিয় কার্য্যজাতমনিশং কুর্ব্বন্তি মৃত্যুঞ্জয় ॥ ১৪ ॥

তেজঃপ্রদীপ্ত ভাস্কর যে কালের ক্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশসমূহ প্রণয়ন করিয়া নিয়ম হইতে না ন্যূন না অধিক গমন করিতেছেন, হে নিষ্ক্রিয় মৃত্যুঞ্জয়! সেও তোমারই কার্য্যের নিয়ম, মানবগণ সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য সর্ব্বদা করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

নো দেবা নচ দানবা ন ভুজগা নো বা বিধির্নো বিধুঃ
কেবা তে মহিমানমাকলয়িতুং শক্তাস্তথা কীর্ত্তিতুম্।
মূঢ়ং মাং মুখরীকারোতি ভগবন্ সংসারতাপত্রয়-
স্ফূর্জ্জং-ক্লেশপরম্পরা জনিভয়াদ্ভীতং কৃপাবারিধে ॥ ১৫ ॥

কি দেবগণ, কি দানবগণ, কি ভুজগনিচয়, কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু তোমার মহিমা বর্ণন বা কীর্ত্তন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। হে দয়াময়! আমি মূঢ় পুনর্জন্মে ভীত, আমাকে এই সংসারের আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ সমুদ্ভুত ক্লেশপরম্পরা তোমার গুণ কীর্ত্তনে মুখর করিতেছে ॥ ২৫ ॥

সপ্তদ্বীপসমুদ্রশৈলনিবহাক্রান্তাং ফণামণ্ডলেহ-
খণ্ডাং ধারয়তে ধরাং গিরিশ যঃ সর্ব্বামিমাং লীলয়া।
শেষঃ সোপি ভবদ্ভুজাঙ্গদপদং লেভে ভুজঙ্গাঙ্গদ
কিং ব্রুমো মহিমানমাকলয়িতুং কেবা বরাকা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

হে ভুজঙ্গভূষণ হিমালয়শায়ী দেব! যে শেষ সপ্তদ্বীপ সমুদ্র ও পর্ব্বত সমূহাক্রান্ত এই অখণ্ড ধরামণ্ডল অবলীলাক্রমে স্বীয় ফণামণ্ডলে ধারণ করিতেছেন, তিনিও তোমার বাহুর অঙ্গদরূপে পরিণত হইয়াছেন, আমরা কি বলিব, আমরা তোমার মহিমা আকলন করিবার কে? ॥ ১৬ ॥

ভৈক্ষং ভক্ষ্যমহো বিভূষণমহির্বাসো গজানাং ত্বচং
সম্পদ্ভস্মনরাস্থিরাজিরচিতা মালা শ্মশানং গৃহম্।
বৃদ্ধোক্ষা তব বাহনং ন চ কুলং চিত্রং চরিত্রং তব
দেবা কিন্তু নমন্তি নাথ নিখিলাস্ত্বৎপাদপঙ্করুহম্ ॥ ১৭ ॥

হে দেব! ভিক্ষালব্ধ অন্ন তোমার ভক্ষ্য, সর্প তোমার ভূষণ, গজচর্ম্ম তোমার পরিধেয়, চিতাভস্ম তোমার সম্পদ্, তোমার মালা নরাস্থি নির্ম্মিত, শ্মশান তোমার গৃহ, বৃদ্ধ বৃষ তোমার বাহন, তোমার কুল নাই, তোমার চরিত্র অত্যাশ্চর্য্য, কিন্তু সমস্ত দেবগণ তোমার পাদপদ্মে প্রণত ॥ ১৭ ॥

এতেতে বিভবা ময়া হি কথিতা সংসারতাপাপহ,
পূর্ণজ্ঞানময়শ্চ যোগনিধিভির্নিত্যো ভবান্ ঘুষ্যতে।
ঐন্দ্রাদীনি পদানি দেবনিবহৈর্লব্ধানি তে তোষতঃ
নো জানে তুহিনাচলে চ ভবতা কিম্বা তপস্তপ্যতে ॥ ১৮ ॥

হে সংসারতাপহারী দেব! তোমার সমস্ত বিভব তো বলিলাম, যোগীগণ তোমাকে পূর্ণজ্ঞানময় ও নিত্য বলিয়া ঘোষণা করেন, দেবগণ তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া ইন্দ্রত্বাদি পদলাভ করিয়াছেন, তথাপি তুমি হিমালয়ে কি জন্য তপস্যা কর, তাহা আমার বোধগম্য নহে ॥ ১৮ ॥

সপ্তদ্বীপমহীপতিত্বমপি যল্লেভে দশাস্যঃ পুরা
ব্রহ্মেন্দ্রাদিসুরৈশ্চ যৎ ত্রিজগতাং পূজ্যত্বমাসাদিতম্।
পারং যান্তি মুমুক্ষবশ্চ যৎ সংসারবারাংনিধেঃ
হেতুস্তত্র তবৈব খণ্ডপরশো কারুণ্যলেশোদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

হে খণ্ড পরশু! পূর্ব্বে যে দশানন এই সপ্তদ্বীপ মহীর অধীশ্বর হইয়াছিল, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ যে ত্রিভুবনের পূজ্য হইয়াছেন, মুমুক্ষুগণ যে এই সংসার সমুদ্রের পারে গমন করিতেছেন, ইহার কারণ একমাত্র তোমার কারুণ্য কণার বিকাশ ॥ ১৯ ॥

ত্বং মূলপ্রকৃতির্মহানপি তথাহঙ্কাররূপঃ পুমান্
তন্মাত্রানি তথেন্দ্রিয়ান্যপি ভবান্ স্থূলানি ভূতান্যপি।
যৎকিঞ্চিৎ সমবায়িকারণতয়া পর্য্যাপ্তি বিশ্বস্য চ
ত্বত্তোহন্যন্নহি ভাতি দেব হৃদয়ে পূর্ণং ত্বয়েদং জগৎ ॥ ২০ ॥

হে দেব! তুমিই মূল প্রকৃতি, তুমিই মহৎ, তুমি অহংকার, তুমি পুরুষ তুমি পঞ্চতন্মাত্র, তুমি ইন্দ্রিয়, এবং তুমিই স্থূলভূত। আমি এই বিশ্বমণ্ডলের যাহা কিছু সমবায়িকারণ রূপে দেখিতে পাই, তোমা ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কিছুই প্রতিভাত হয় না, হে দেব তুমি সমস্ত জগৎ পূর্ণ করিয়া আছ॥২০॥

অদ্বৈতো জননাবনপ্রণশনে শক্তঃ স্বয়ম্ভূর্ভবান্
বেদান্তেষু পরাত্মবোধগুরুণা ব্যাসেন মীমাংসিতঃ।
যোগে যোগফলপ্রদশ্চ মুনিনা যোগীশ প্রক্তো ভবান্
যজ্ঞানাঞ্চ ফলপ্রদাননিপুণং ত্বমাজগৌ জৈমিনিঃ॥ ২১ ॥

হে দেব! বেদান্তে পরমাত্মজ্ঞানগুরু ভগবান্ ব্যাস তোমাকেই অদ্বৈত সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সমর্থ স্বয়ংভূ বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, হে যোগীশ পতঞ্জলি মুনি তোমাকেই যোগের ফলপ্রদানকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং মীমাংসা-প্রণেতা জৈমিনি তোমাকেই যজ্ঞফলদাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ২১ ॥

পূর্ণানন্তবিশেষ-শূন্যমহসো ব্যোমাত্মনোযো গুণঃ
সোঽপি ব্রহ্মময়স্ততো জগদিদং জাগতঞ্চ সংশ্রূয়তে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ খমার্গহিতৌ নেত্রায়মানৌ চ তে
লোকানাং সদসৎ প্রপশ্যত ইমৌ কার্য্যং হি গৌরীপতে॥ ২২ ॥

হে গৌরীপতি! তুমি পূর্ণ অনন্ত নির্ব্বিশেষ, তেজোময়, আকাশ স্বরূপ; তোমার যে গুণ শব্দ, সেও ব্রহ্ম স্বরূপ, শুনিয়াছি তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশমার্গনিহিত চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার নেত্র; ইহারা লোকের সদসৎ কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন॥ ২২ ॥

মায়া তে পরপুরুষে পরিণীতা পঞ্চৈব সূতে সুতান্
ভূতান্ ভূতপতে তদীয় মিলনাৎ ভূতং মমেদং বপুঃ।
চিন্তাধূমময়ং শ্মশানসদৃশং বক্ষু শ্মশানপ্রিয়
নিত্যং সন্নিহিতোঽত্র মুগ্ধমনসা সংদৃশ্যসেনো কথম্॥ ২৩॥

হে ভূতপতি! তোমার মায়া পরপুরুষে উপগতা হইয়া ভূতস্বরূপ পাঁচটি পুত্র প্রসব করিয়াছে, আমার শরীর সেই পঞ্চভূত নির্ম্মিত, এবং ইহাতে চিন্তা রূপ ধূম নিরন্তর উত্থিত হইতেছে, সুতরাং শ্মশানসদৃশ, শ্মশানপ্রিয় তুমিও

এই দেহে সর্ব্বদা সন্নিহিত রহিয়াছ, তবে মুগ্ধচিত্ত আমি তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? ॥ ২৩ ॥

নেন্দ্রত্বং ন চ ব্রহ্মতাং নহি পরং বিষ্ণোঃপদং প্রার্থ্যতে
নো বা নন্দনকাননেঽমরবধূ সার্দ্ধৈর্বিহারং সা মম।
গচ্ছামো ভবদন্তিকং হি প্রকৃতিং প্রাপ্যৈব পৈশাচিকী-
মিত্যেতদ্ দ্রুহিণাদিবন্দিতপাদে তে নাথ নাথামহে ॥ ২৪ ॥

হে নাথ! আমি ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব বা বিষ্ণুর পরম পদ প্রার্থনা করি না, কিম্বা নন্দন কাননে অপ্সরাগণের সহিত বিহার করিবার আমার বাসনা নাই, ব্রহ্মাদি-দেবগণের বন্দনীয় তোমার চরণে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন অন্তকালে পৈশাচিক প্রকৃতি লাভ করিয়া তোমার নিকট যাই ॥ ২৪ ॥

প্রমথাধিপ তে চরণৌ ভজতাং
ন ভবন্তি ভবপ্রভবাসুগদাঃ
অতিদীনদয়ালুতয়া স্বয়মেব
পরিপাসি জনান্ ভয়তোহি সদা।
জনতাপরিপালনতৎপর হে
পরিতাপহরো ভব মে চ মুদা
শুভমস্তু সতাং ত্বয়ি যে প্রণতা
সততং খলু তে স্মৃতনামপদাঃ ॥ ২৫ ॥

হে প্রমথগণের অধিপতি! যাঁহারা তোমার চরণ ভজনা করেন, তাঁহারা কখন সংসার জন্য রোগ ভোগ করেন না; তুমি স্বীয় দীনদয়ালুতা গুণে সর্ব্বদা সকলকে ভয় হইতে রক্ষা করিতেছ। হে জগজ্জনপালক! তুমি আমার পরিতাপ হরণ কর, যাঁহারা নিরন্তর তোমার নিকট প্রণত ও তোমার নাম ও চরণ যুগল স্মরণ করেন, সেই সাধক ব্যক্তিগণের শুভ হউক ॥ ২৫ ॥

শ্রীকানাই লাল শাস্ত্রী।

সাবিত্রী।

বিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বৎসরের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাবলী এবং সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে পুরস্কার-প্রাপ্ত নারী-রচনাগুলি লইয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশক, সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক, বাবু গোবিন্দলাল দত্ত। সাবিত্রী লাইব্রেরী বা গোবিন্দলাল বাবু কল্পনার পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। নানা কারণে তাঁহাদের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালায় সাধারণ পুস্তকালয়ের মধ্যে এই সাবিত্রী লাইব্রেরী কিরূপ সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে। আজ দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে যে সাধারণ পুস্তকালয়ের কথা শুনিতে পাই, তাহার অধিকাংশই এই লাইব্রেরীর অনুকরণে ও আদর্শে গঠিত। বাঙ্গালায় এই লাইব্রেরীর উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠান ও কার্য্যপ্রণালী যেমন নূতন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উচ্চাদর্শের; এ পুস্তকখানিও তেমনি নূতন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উচ্চাদর্শের হইয়াছে। নূতন—কেন না, লাইব্রেরীতে পঠিত প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে এরূপ ভাবে বাঙ্গালায় আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—কেন না, সাহিত্য, কি সমাজ কথা, কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মতত্ত্ব সকল বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে; আমরা জানি, এই সকল বিষয় লইয়া এক এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। উচ্চাদর্শের—কেন না, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সমস্ত লেখক জ্ঞানী, বহুদর্শী ও চিন্তাশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদিগের দ্বারা এই সকল প্রবন্ধ লিখিত; এতগুলি উৎকৃষ্ট লেখকের এতগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ একত্রে কোনও পুস্তকে আমরা দেখি নাই। সাবিত্রী লাইব্রেরী যদি বাঙ্গালার গৌরবের সামগ্রী হয়, এ পুস্তকখানিও অবশ্য সাবিত্রী লাইব্রেরীর গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে।

পুস্তকে যে কয়েকটী বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা একে একে সংক্ষেপে সে গুলির আলোচনা করিতেছি।

১। বাঙ্গালা সাহিত্য (বর্ত্তমান শতাব্দীর)—লেখক শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইহার ভাষার ওজস্বিতা, লেখার মনোহারিত্ব ও বর্ণনার বিদ্যুত্বরিত গতি অতি চমৎকার। বাঙ্গালা ভাষা সেই Transition period হইতে আরম্ভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহাই এই প্রস্তাবে দেখান হইয়াছে। দেখান হইয়াছে, বহু বৎসর পূর্ব্বে মহামতি বীমস্ সাহেব যে বলিয়াছিলেন, "That the Bengalis possess the power, as well as, the will to establish a national literature of a very sound and good character cannot be denied." সেই মহাবাক্য আজিকার দিনে কেমন সুন্দররূপে, অসংখ্য লেখকে, অসংখ্য পুস্তকে, যথার্থ কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। এত অল্প দিনের মধ্যে আর কোন দেশের কোন সাহিত্য এমন উন্নতিলাভ করে নাই। কিন্তু একটা কথা এই, আজ কাল যে কেহ সাহিত্য লিখিতেছেন, সকলেই amateur; সাহিত্য যতদিন না ব্যবসায় হইতেছে,—profession হইতেছে, ততদিন ইহার উন্নতির মূল সুদৃঢ় হইতেছে না। তাহাই যাহাতে হয়, এখন তাহা করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। সে যে দিন হইবে, সে দিন হরপ্রসাদ বাবুর ন্যায় সকলেই দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইবেন যে, "একটি গৌরবান্বিত মহা শক্তিমান্ মহাজাতি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উত্থিত হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে বর্ত্তমান পুরুষের মহামহোপাধ্যায়ের গুণ গান করিতেছে; আর মহা আনন্দভরে দেবনির্ব্বিশেষে বর্ত্তমান নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষী মহোদয়দিগকে পূজা করিতেছে।"

২। আমাদের অভাব—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু এই প্রবন্ধের রচয়িতা। আমাদের অভাব অসংখ্য—কি ধর্ম্মে, কি সামাজিকতায়, কি রাজনীতিতে সকল বিষয়েই অসংখ্য অভাব। এ অভাব যতদিন না পূরণ হইতেছে, ততদিন আমরা প্রকৃত মানুষ হইতে পারিতেছি না, প্রকৃত জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেছি না। এই প্রবন্ধে কেবল রাজনৈতিক অভাবের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। সেই অভাব কিসে মোচিত হইতে পারে, তাহারও উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহার লেখায় পূর্ণ বাবুর প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার আমরা বিশেষ পরিচয় পাই। স্থানে স্থানে আমাদিগের সহিত মতের অনৈক্য হইলেও আমরা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। পূর্ণ

বাবু বলেন, আমাদের প্রধান অভাব, আমাদের জাতীয় চরিত্র-বল। সেই জাতীয় চরিত্রবল সৃষ্টি করিতে হইলে য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যশ্রেণীর ন্যায় ভারতে একটী মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক। জ্ঞান ও শিক্ষার রাজ্য বিস্তার করা বিশেষ প্রয়োজন। "আমাদিগের অভাব মোচনের সূত্রপাতমাত্র হইয়াছে। যে দিবসের আলোকে আমরা প্রভাসিত হইব, তাহার প্রভাত-রশ্মি দেখা দিয়াছে।"

৩। হিন্দুপত্নী
৪। বিবাহের বয়স এবং উদ্দেশ্য। } লেখক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু।

এরূপ সরস, সারগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ ও ভাবুকতাময় প্রবন্ধ আমরা অল্পই পাঠ করিয়াছি। আশ্চর্য্যের কথা, শুনিতে পাই, অনেকে ইহাতে কবিত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। যাঁহারা হিন্দু হইয়াও হিন্দু নহেন, যাঁহারা সংসারে থাকিয়াও সংসারের ধার ধারেন না, কেবল কল্পনার পাখায় চাপিয়া যাঁহারা উড়িয়া উড়িয়া বেড়ান, কলেজের উষ্ণ মস্তিষ্ক সংসার-বায়ুহিল্লোলে আজো যাঁহাদের শীতল হয় নাই, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন; কিন্তু যে হিন্দু, যে সামাজিক, যে সংসারী, সে ইহা পড়িবামাত্র নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে, লেখকের তীক্ষ্ণ মীমাংসাদৃষ্টি ও গভীর আলোচনাশক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। ভগবান মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া, চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিয়া, গৃহস্থাশ্রমের অসংখ্য পালনীয় কর্ত্তব্য রক্ষার জন্য ভার্য্যাগ্রহণের কিরূপ বিশেষ আবশ্যকতা, এবং যে বিবাহের উদ্দেশ্য এত মহৎ, এত পবিত্র সেই বিবাহে পত্নী কি বস্তু, লেখক তাহা সুন্দররূপে সরল ভাষায় ধীরে ধীরে বুঝাইয়াছেন। তাহা বুঝাইতে গিয়া, ইংরাজী কোর্টসিপ্ প্রথা হইতে হিন্দু কন্যা-নির্ব্বাচন প্রণালী কত উচ্চদরের তাহা দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, ইংরাজ-বিবাহ যেমন চুক্তি—contract মাত্র, হিন্দু বিবাহ তাহা নহে, হিন্দু-বিবাহের অর্থ স্ত্রীপুরুষে একীকরণ। "ধর্ম্মচর্য্যা এবং পরোপকারের জন্য ভার্য্যা। যেমন যজ্ঞ তেমনি তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। * * * সকল যজ্ঞ অপেক্ষা সংসারধর্ম্মরূপ যজ্ঞ কঠিন ও কষ্টসাধ্য। সেই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে যে

অপরিমেয় দয়া, ধর্ম্ম শক্তি, এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাই সংগ্রহ করণার্থ প্রাচীন হিন্দুরা গৃহস্থাশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ ভার্য্যারূপা মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু-ভার্য্যার অর্থ তাই। হিন্দুভার্য্যা কি সামান্য জিনিস!" যে হিন্দুপত্নীর এতদূর মহিমা, সাম্যবাদের তর্ক পাড়িয়া তুচ্ছ স্বাধীনতার বিনিময়ে যাহারা তাঁহাদিগের সেই দেবত্ব লোপ করিবার চেষ্টা পায়, হে রমণীগণ, তাহাদিগের জন্য কি তোমাদিগের অভিশাপ নাই?

হিন্দুপত্নী যখন এমনই জিনিস, তখন যাহাতে সে ইহার উপযোগী হয় তাহা করা উচিত। তাহার কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র দূর বিস্তৃত; বিবাহ-সূত্রে যে দিন সে স্বামীর সহিত মিলিত হয়, সেই দিন হইতেই তাহার মস্তকে কর্ত্তব্যের বোঝা চাপান হইয়া থাকে। সে কর্ত্তব্য পালনের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। সকলেই জানেন, বেশী বয়সে শিক্ষা ভাল হয় না। শিক্ষার আরম্ভ কাল শৈশব সময়। তখন প্রকৃতি নরম এবং কোমল থাকে, যেরূপ ছাঁচে ঢালা যায় সেইরূপ গঠন প্রাপ্ত হয়। নহিলে, "কাঁচায় না নুয়ালে বাঁশ, পাকায় করে টাঁস টাঁস।" শ্বশুর শাশুড়ী দূরের কথা, যে কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ হয়, সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাহার টাঁস টাঁসানির জ্বালায় তাহার স্বামীকে পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিতে হয়। হিন্দুপত্নী ইংরাজ-পত্নী নয়, শুধু স্বামীকে লইয়া তাঁহার গৃহধর্ম্ম নয়, বিবাহ কালে তাঁহাকে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—

ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরিচ সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।"

আর বরের সহিত কন্যার কি সম্পর্ক? বর কন্যাকে বলেন,

"প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈরমাংসানি ত্বচাত্বচম।"

—পতি পত্নীর এমন মিলন—এমন একত্ব আর কোন দেশে কোন শাস্ত্রে কল্পিত হয় নাই। সুতরাং যাহাকে আপনাতে মিশাইতে হইবে, আপনার পরিবার মধ্যে মিশাইতে হইবে, তাহার শিশু হওয়া আবশ্যক; আর যে তাহাকে এই সব মহৎ বিষয় শিক্ষা দিবে, তাহার জ্ঞানবান ও পরিণতবয়স্ক হওয়া উচিত। তাই শাস্ত্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কন্যার শৈশবাবস্থায় বিবাহ

দিবে, কিন্তু পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সারিয়া জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবে। ইহা শাস্ত্রের কথা। উড়াইয়া দিবার ইহাতে কিছুই নাই। চন্দ্রনাথ বাবু তাহাই একে একে বুঝাইয়াছেন। চন্দ্রনাথ বাবুর পূর্ব্বে মাননীয় ভূদেব বাবুও তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধে" এ কথাটা অনেক করিয়া বুঝাইয়াছেন। কিন্তু যে বুঝিলেও বুঝিবে না তাহাকে বুঝাইবে কে? আজকালের অনেক ইংরাজিনবীশ শাস্ত্র মানেন না, মানিলেও দেশকাল পাত্রের যুক্তি পাড়িয়া এ কথাটা মানিতে চাহেন না। না মানুন, কিন্তু তর্ক পরিত্যাগ করিয়া আমরা একবার তাঁহাদিগকে আজকালকার হিন্দুর পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া তাহার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে অনুরোধ করি। কি দেখিবেন? গৃহে গৃহে কলহ, গৃহে গৃহে অশান্তি—পত্নী পতিকে মানে না, বৌ শাশুড়ী ননদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, আত্মীয় স্বজন কেহ বাড়ীতে স্থান পায় না, কথায় কথায় ভাই ভাইয়ে বিবাদ বাঁধে। দেখিবেন, সে পাল পার্ব্বণ উঠিয়া গিয়াছে, সালগ্রাম শিলার পূজা হয় না, ভিখারী ভিক্ষা পায় না, অতিথি অভুক্ত ফিরিয়া যায়। সে স্বর্গের দৃশ্য আর নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আছে কি? আছে, সভ্যতা, স্বাধীনতা, শিক্ষাভিমান বাতির চটক, আর রোগ! আছে, নরকের আবর্জ্জনা ও পূরীষগন্ধ। সকল ঘরেই যে এইরূপ তাহা বলি না। কিন্তু ইহা ঠিক, যেখানে এ দৃশ্য নাই সেরূপ সংসার অতি বিরল। যাহা দেখা যায় তাহার তুলনায় নগণ্য মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, কেন এমন হয়? এখন বেটা বিয়ে করিয়া আসিলেই কেন মা পর হইয়া যায়? দোষ কাহার? ভাব দেখি, বুঝ দেখি, তর্কের কচকচি তুলিয়া রাখিয়া একবার সত্যের আলোচনা কর দেখি। একটা সত্যের কথা বলি। আজ রুখমাবাইয়ের আশ্চর্য্য ব্যাপার লইয়া দেশে কি না আন্দোলন চলিতেছে! কেন এমন হইতেছে? সার লেপেল গ্রিফিন এই সূত্র ধরিয়া বাল্যবিবাহ দোষাবহ বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিতে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শোন দেখি, সে জন্য তাঁহারই স্বজাতীয় একজন উত্তরে তাঁহাকে কি বলিতেছেন,—

—"We regret to see that the abolition of infant marriage is being mixed up with Rukhmabhai's grievance, *most unwisely*. * * * The evils that attend it are so conspicuous to foreigners and even to Englishmen themselves that to attempt to introduce it by law into India, would be

absolute insanity. We know well also that the unfettered choice of young persons in selecting their wives and husbands, as practised in England and America, is regarded by the Continental nations as attended with so much evil, that in Italy, Spain, France and even Germany, it is regarded as an *abuse.* STATESMAN—13th April, 1887.

ইহার পর আরও কি কিছু বলিতে হইবে ? অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হিন্দুরা শাস্ত্র লিখিত, তোমার আমার তাহা হঠাৎ উপেক্ষা করা উচিত নহে। চন্দ্রনাথ বাবু নিজে কিছুই বলেন নাই, তিনি সেই শাস্ত্রের কথাই ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন, তাই তাঁহার প্রবন্ধ এত সারগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ হইয়াছে। উপহাস না করিয়া—উপহাস করিবার ইহাতে কিছুই নাই, কেবল কবিত্ব নয়, সকলই সহজ সত্য—উপহাস না করিয়া আজিকার দিনে এ প্রবন্ধ দুইটী সকলেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৫। অকালকুষ্মাণ্ড
৬। হাতে কলমে } শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন প্রতিভাশালী কবি, তাঁহার লেখনী রসময়ী, কবিত্বময়ী। এ দুইটী প্রবন্ধ তাঁহার রচিত, দুইটী প্রবন্ধই রস ও কবিত্বে পূর্ণ। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা তাহা তিনি যে ভাষায় বলিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষার সর্ব্বত্রই কবিত্বের সৌরভ বহিতেছে ; রসের লহরী ক্রীড়া করিতেছে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলেন, আমাদের আজকালকার সাহিত্যটা আর কিছুই নয়, অকাল কুষ্মাণ্ড মাত্র, অসময়ে জন্মিয়াছে, অসময়ে মরিবে। বলেন, "আমাদের এ সাহিত্য প্রতিধ্বনির রাজ্য হইয়া উঠিতেছে! চারিদিকে একটা আওয়াজ ভোঁ ভোঁ করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর নহে, হৃদয়ের কথা নহে।" সাহিত্যে যোগান দেওয়ার পদ্ধতিটাকেও তিনি বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবুর কবিত্বে মুগ্ধ হইলেও আমরা তাঁহার সকল কথায় সায় দিতে পারি না। যে সাহিত্যে "পুষ্পাঞ্জলি" জন্মিয়াছে, যে সাহিত্যে "কপাল কুণ্ডলা" "বিষবৃক্ষ" "চন্দ্রশেখর" ও "কৃষ্ণকান্তের-উইল" ফলিয়াছে, যে সাহিত্যে "সারদামঙ্গল" ও "ভানুসিংহের পদাবলী" গীত হইয়াছে, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার যাহার

কবি, বর্ত্তমান সমালোচ্য পুস্তকের মনীষাসম্পন্ন লেখকগণ, এবং আরও অনেক চিন্তাশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ যে সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতেছেন, আমরা একেবারে তাহাকে অকালকুষ্মাণ্ড বলিতে পারি না। তবে, অনেক আবর্জ্জনা ঢুকিয়াছে বটে। আশা আছে, তাহা সময়ে সংস্কৃত হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু দেখাইতেছেন, আমাদের দেশে কাজ নাই কিন্তু কাজের ভাণ খুব আছে। আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়ই বাড়িয়াছে! কথায় কথায় সভা, সমিতি, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন। কিন্তু কাজের বেলা সব ফক্কিকার। সকলেই বলিতেছেন agitate কর—publicকে সব জানাও। কিন্তু কেবল agitate করায় কি ফল তাহা জানি না। public কে—পব্‌লিকের অস্তিত্ব কোথায় তাহা বুঝি না। আমাদের দেশে পব্‌লিক বলিয়া কেহ নাই, তোমার agitationএ মাতিবে কে? কিন্তু পব্‌লিকের অস্তিত্ব আবশ্যক। আগে তাহা গঠন করা প্রয়োজন। তাহা গঠিবে কি উপায়ে? "সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতে কলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া" লোকে কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথায় শিখিবে না। কথায় কোন কালেই চিঁড়া ভেজে না। "আর কিছু না, সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশ-প্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" নচেৎ, বান্ধব-সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন—"যেখানে কেবল বাবদূকতার প্রশ্রয়, সেখানে সাধনা নাই, সিদ্ধি নাই।"

৭। সোণার কাটি রূপার কাটি
৮। সোণায় সোহাগা } শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জন উচ্চদরের দার্শনিক, সমাজতত্ত্বেও তিনি বিশেষ পটু—সেই পটুতার ফল এই দুইটী প্রবন্ধ। ব্যঙ্গ করিবার ক্ষমতা তাঁহার বিলক্ষণ আছে। তিনি যেরূপ ব্যঙ্গোক্তিতে এই দুই বিষয় লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সকলের বিশেষ শিক্ষা লাভ করা উচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ বাবু কেবল ব্যঙ্গ করিবার জন্যই এ প্রবন্ধ দ্বয়ের অবতারণা করেন নাই, তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর বেদনা তাহাই জানান তাঁহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কি সফল হইবে না? বাঙ্গালী আজও

কি জাতিত্ব ভুলিয়া,মাতৃভাষা ভুলিয়া,আপনার পোশাক ছাড়িয়া পরের অনুকরণ করিবে, পরের বুলি বলিবে, পরের পোশাক পরিবে? বাঙ্গালী কি বাঙ্গালী হইবে না? যাহারা নিতান্ত অসভ্য,পশুসহচর, বনবাসী, মৃগয়াজীবী তাহাদিগকে আর কতকগুলি বাঙ্গালীকে একত্র একজন বিদেশীয় আগন্তুকের নিকট দাঁড় করাও দেখি; সে সেই অসভ্য বন্যদিগকেও একজাতি বলিয়া সহজেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু বাঙ্গালীদিগকে কখন একজাতি বলিয়া চিনিবে না। কিসে চিনিবে? পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কেমন আছ বাবা?" পুত্র উত্তর দিতেছেন "all right, papa" পিতার পরণে সাদা ধুতি, গায়ে নামাবলি, মাথায় আর্কফলা; পুত্রের পরিধানে পেণ্টালুন, গায়ে কোট, মাথায় হ্যাট! তবে বাঙ্গালী জাতি কি প্রকার জীব সে কেমন করিয়া চিনিবে! এক জন চীনেম্যানে ও একজন ইংরাজে যে প্রভেদ, ভাষায়, পরিচ্ছদে, চলনে, বলনে পিতা পুত্রে সেই প্রভেদ। ছি ছি! অনেকে আবার ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে যান! ইংরাজি অনেকেই শিখিতেছে, কিন্তু এমন করিয়া আর কেহই চলায় না। সে দিন Congress উপলক্ষে নানা দেশের নানা জাতীয় অসংখ্য কৃতবিদ্যের মহামিলন হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে কত অগাধবিদ্য মহা মহা পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালার যাঁহারা গ্যারিবল্‌ডি তাঁহারা ইংরাজিতে বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা তাঁহাদিগের সহিত ইংরাজিতে তেমন করিয়া কথা কহিতে পারেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই সব পণ্ডিত আপনাদের জাতীয় পরিচ্ছদেই ভূষিত। কাহারও পরণে সেই চুড়িদার পায়জামা, কাহারও মাথায় সেই প্রকাণ্ড পাগড়ি—কাহারও পায়ে সেই লপেটাদার জুতা। তাঁহারা কি হ্যাটকোট পরিতে পারেন না? না, তোমাদিগের অপেক্ষা বিদ্যায় ও সভ্যতায় কিছু কম? দুটা ইংরাজি শিখিয়া যে আপনার জাতিত্ব ভুলিতে চায়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে? ছি! ইহার উত্তরে আর যুক্তির কথা পাড়িও না। যিনি যেরূপ যুক্তি বলিবেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহা সকলেরই সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন।

কিন্তু তাই বলিয়া কি ইংরাজের দেখিয়া অনুকরণ করিবার কিছুই নাই? আছে বৈ কি। পর প্রবন্ধে তাহারই কথা তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তাহাই তিনি বলিয়াছেন, "আমরা যদি স্বদেশের আদর, স্বজাতির স্বজাতিত্ব

অব্যাহত রাখিয়া ইংরাজ-শক্তি আত্মসাৎ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের হৃদয়ের উপর শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া সোণায় সোহাগা করিয়া তুলে।” “তাহা হইলে আমাদের জাতি-গৌরব বজায় থাকিবে, তদ্ভিন্ন আমাদের দেশের মস্তকে ও বাহুতে শক্তির সঞ্চার হইয়া তাহার মুখশ্রী নূতন হইয়া উঠিবে।”

৯। হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না—লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার। এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এক দিন ইহা লইয়া দেশময় মহা আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছিল। কাগজে কাগজে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে অনেক তর্ক, অনেক বিচার, অনেক শাস্ত্রমীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। বিষয়টী অতি গুরুতর, বিচার করিতে গিয়া অনেক সময়ে মহা মহা পণ্ডিতও নির্ব্বাক্ হইয়া যান। অক্ষয় বাবু শাস্ত্রে তত দূর পণ্ডিত নহেন, কিন্তু শাস্ত্রের পথ অনুসরণ করিয়া অতি সোজা কথায় এমনি ভাবে তিনি ইহার মীমাংসা করিয়াছেন যে পড়িলে আর কোন পণ্ডিতের কোন যুক্তিই মনে লাগে না। অক্ষয় বাবুর মতে মত দিতেই হয়। লেখকের ইহা সামান্য ক্ষমতা নহে। অক্ষয় বাবুর ভাষার আমরা চিরকাল প্রশংসা করিয়া থাকি, তাঁহার ভাষার মোহিনী শক্তি; সেই মোহিনী ভাষায় এ প্রবন্ধ লিখিত। সুতরাং পাঠক সহজেই মুগ্ধ। তিনি দেখাইয়াছেন, হিন্দুদিগের বিবাহ ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠান। বিবাহকালে কন্যা ধ্রুব-নক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া বলেন—

“ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং।
পতিকুলে ভূয়াসম্॥”

—যে হিন্দুপত্নীকে পতিকুলে অচলা থাকিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, সে কি কখন পতিকুল ত্যাগ করিতে পারে। যে বিবাহের অর্থ, হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিল, আত্মায় আত্মায় মিল, স্বামীর পরলোক গমনে কখন সে বিবাহবন্ধন কি ছিন্ন হইতে পারে? তবে, অনেকে পরাশরের “নষ্টে মৃতে” শ্লোকের দোহাই দিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, সে শ্লোক যেমন আছে, তেমনি ইহাও আছে যে,

“প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।”

এখন দেখিতে হইবে কোন্‌টা শ্রেয়? অবশ্য, মুখ্য ব্যবস্থার কাছে গৌণ ব্যবস্থা কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না। যে পুনর্ব্বিবাহ করে, সে ত কেবল আপনার জন্যই বিব্রত, নিকৃষ্ট বৃত্তির ঘোরতর বশীভূত, আর যে নারী মৃত স্বামীর অনুধ্যান করিয়া, বিনামূল্যে সংসারের সেবা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন, তিনি নারী হইয়াও দেবী। বল দেখি, কোন্‌ মূর্ত্তি ভাল? যে যথার্থ সতী নারী, সে কি কখন পুনর্ব্বিবাহের নাম মুখে আনিতে পারে? "হিন্দুনারী জানেন, কেবল একং এবং অদ্বিতীয়ং; কাজেই তিনি পতিচারিণী হইলেই একচারিণী, সেই পতি যখন ব্রহ্মে লীন হইলেন, কাজেই তিনি ব্রহ্মচারিণী।" সুতরাং ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন হিন্দুবিধবার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আর নাই। ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতার কথা কেহ কেহ তুলিতে পারেন। অক্ষয় বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, বলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার উত্তরে মোটামুটি এই বলি যে, সকল কাজেই সাধিলে সিদ্ধি। আমরা যদি রমণীদিগকে গোড়া হইতে তাহার উপযোগিনী করিতে পারি তাহা হইলে আর এজন্য ভাবিতে হয় না। নচেৎ যে পিতা কন্যাকে মেমের পোশাক পরাইয়া, চা রুটী খাওয়াইয়া, গড়ের মাঠের বায়ু সেবন করাইয়া তাহার শৈশব হইতেই তাহাকে ঘোর বাবু ও বিলাসী করিয়া তুলিয়াছেন, সে পিতাকে অবশ্য সে কন্যার জন্য একটু ভাবিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু দোষ কন্যার না পিতার? যিনি সকল দোষ কন্যার ঘাড়ে চাপাইয়া আপনি সাফাই হইতে চান, তিনি ঘোরতর অধর্ম্মী। তাই বলি, শৈশব হইতেই কন্যাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগিনী করিলে ভবিষ্যতে আর কোন ভাবিতে হয় না। যে হতভাগিনীদিগের একবার কপাল পুড়িয়াছে, তাহাদিগকে পোড়ার উপর আর পুড়িতে হয় না।

১০। হিন্দুরীতিনীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে। লেখক শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে। শুনিয়াছিলাম, বীরেশ্বরবাবু যখন এই প্রবন্ধটী পাঠ করেন, তখন তাঁহাকে অনেকের ভ্রুকুটী, অনেকের অসন্তুষ্টি, অনেকের গালিগালি সহিতে হইয়াছিল, বীরেশ্বরবাবু এ প্রবন্ধ লিখিয়া কি এমন মহৎ অপরাধ করিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, পরিষ্কার সরল লেখা, পরিষ্কার সরল সত্য,

তবে কেন তিনি অপ্রিয়ভাজন হইলেন বুঝিতে পারি না। নানা বিষয়ে হিন্দু জাতির অধঃপতন ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহার কারণ যাহাই হউক, হিন্দুরীতি-নীতি নহে—অনেকে তাহা না বুঝিয়া হিন্দুরীতিনীতি গুলাকে একেবারে ঘুণে ধরা কাজের বাহির বলিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসন দিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন, এবং তাহার স্থলে বিলাত হইতে ভাল ভাল রীতি-নীতির আমদানি করিতে চেষ্টা করিতেছেন—বীরেশ্বর বাবু তাহাই তাঁহাদের ভুল দেখাইয়া গোটাকতক সত্য কথা বলিয়াছেন। তবে ইহা সত্য, যে কাণা তাহাকে কাণা বলিলে রাগে, যে ভুল করে তাহার ভুল দেখাইয়া দিলে জলিয়া উঠে; বুঝি, তাই বীরেশ্বর বাবু কতকগুলি লোকের বিষনজরে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, তাঁহার বুঝা উচিত, তাঁহার অপেক্ষা সমাজ অনেক বড়, দেশ অনেক বড়। সমাজের কাছে—দেশের কাছে তিনি উনি কে? যে সেই সমাজের হিতের জন্য—সেই দেশের হিতের জন্য কিছু বলিবে, সে যার-তার ব্যক্তি বিশেষের তুষ্টি অতুষ্টির উপর নির্ভর করিবে কেন? বীরেশ্বর বাবুর কথা দুই একজনের পক্ষে ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু তাহা সমাজের পক্ষে—এ অধঃপতিত দেশের পক্ষে বড়ই হিতকরী। তিনি হিন্দুদিগের বিবাহ-প্রথা, অবরোধ-প্রথা, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি কূট সমাজতত্ত্বগুলি একে একে মীমাংসা করিয়াছেন। মীমাংসা করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা কখন অস্বাস্থ্যকর ও অশুভজনক নহে, হিন্দুমাত্রেরই তাহা প্রতিপাল্য—পরিত্যাজ্য নহে। নব্যগণ যখন এই সকল চিরশান্তিপ্রদ নিয়ম তুচ্ছ করিয়া বিলাতী প্রথার অনুবর্ত্তী হইতেছেন, কাজেই এই বিষয় গুলির মীমাংসাকালে তাঁহাকে সেই বিলাতী প্রথারও কথা পাড়িতে হইয়াছে। না পাড়িলে চলে না। তুলনায় সমালোচনা না করিলে কে ভাল, কে মন্দ তাহা লোকে সহজে বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটা কথা এই, বীরেশ্বর বাবু তুলনার সময়ে বিলাতী প্রথার দোষ সম্বন্ধে কিছু বেশী বলিয়াছেন। মাত্র John Bull পুস্তকখানি অবালম্বন করিয়া কেবল দোষভাগেরই বর্ণনা করা ততটা ভাল হয় নাই। কোন বিষয়ের দুই দিকই ভালরূপ আলোচনা না করিলে তাহার ঠিক্ বিচার হয় না। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের কথা। নচেৎ শ্যামকে রাম অপেক্ষা ভাল বলিতেই হইবে বলিয়া, কেবল কি শ্যামের গুণের কথা, আর রামের

দোষের কথা, উল্লেখ করিতে হইবে? উভয়েরই দোষ গুণের কথা না বলিলে ঠিক্ বিচার হয় না। বীরেশ্বর বাবু সেইরূপ করিলে প্রবন্ধটী আরও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত। তাঁহার আলোচনাশক্তির আমরা সম্যক্ প্রশংসা করি।

১১। বাল্যবিবাহ ও অবরোধ-প্রথা
১২। প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ
১৩। হিন্দুবিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না

শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী এই তিনটী প্রবন্ধের রচয়িত্রী। এই কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রতিবারেই বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন লেখিকা স্বত্বেও প্রতিবারেই ইহাঁর রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় ইনি লাইব্রেরী হইতে ২৫৲ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ কয়টী প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা অধিক বলিতে চাহি না। যে দেশের রমণী এই সকল জটিল সমাজরহস্য এমন সুন্দররূপে মীমাংসা করিয়া এমন গবেষণা, চিন্তাশীলতা, আলোচনাশক্তি ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন, সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় নহে, আশা রৌদ্রদগ্ধের মৃগতৃষ্ণিকা নহে, তাহার উন্নতি অদূরবর্ত্তিনী।

পুস্তকখানি বাস্তবিক রত্নভাণ্ডার বিশেষ। যিনি এতগুলি উচ্চ শ্রেণীর লেখকের এতগুলি উৎকৃষ্ট জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ একত্রে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার অনুরাগ আছে, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই এই পুস্তকখানি এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রতি বৎসরেই এক এক খানি বাঙ্গালা কোর্স নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে; অধ্যক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করি, সেই এ-ও-তা হাবড়হাটির পরিবর্ত্তে এই সারগর্ভ—সকলের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ—পুস্তকখানি নির্ব্বাচন করিলে কি ভাল হয় না?

১২৯৩—বিদায়।

শেষ।

১২৯৩'র আজ শেষ মাস। তাহাও যায়—যায়। বৈশাখের কি জানি কিসের এক আনন্দ-পূর্ণ মধুর বাতাস, ঘুমন্ত সুন্দরীর মোহমন্ত্রমাখা

সুকোমল অস্ফুট হাসির মতন, কতদিনের হারান সুখের স্মৃতির কোমল স্পর্শের মতন, স্বপ্ন-পদ-সঞ্চারণে এক একবার আসিয়া, আবার কি ভাবিয়া, কোথায় চলিয়া যাইতেছে। জগতের মহাগৃহে—চারি দিকে—আজ কি মত্ততার তরঙ্গ—কি গীত-উচ্ছ্বাস! আজ যেন প্রকৃতির নব বেশ। চারিদিক্‌ হইতে কেমন এক নূতন কল্পনা—নূতন দীপ্তি—নূতন অঙ্কুর—নূতন জীবনের মধুর আনন্দময় কনক-কিরণ ফুটিয়া উঠিতেছে। জ্ঞান-কঠোর শীতের সেই মৃত-প্রায়, স্ফূর্ত্তি-হীন, উত্তেজনা-রহিত, পীড়িত ভাব—দিন—মরিয়া আসিতেছে। পৃথিবী যুড়িয়া বোধাতীত এক বিরাট সংগীত আরম্ভ হইয়াছে। নববিবাহ-উৎসব—জগতে আজ যেন নববিবাহ-উৎসবের মহাধূম পড়িয়াছে। নূতন বধূকে সাদরসম্ভাষণ করিবার জন্য আজ যেন জগতের সকল লোকের সাজসজ্জা—এত দৌড়াদৌড়ি—এত হৃদয়-উচ্ছ্বাস—এত আকুল নিশ্বাস। বুঝিয়াছি, প্রকৃতি-রহস্য বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি, বৃদ্ধ পুরাতন ৯৩ প্রাণের হাসি-খেলা সাঙ্গ করিয়া—তাহার স্মৃতি মাত্র রাখিয়া—অনন্ত অতীত-দেশে চিরদিনের মতন বিদায় লইয়া যাইতেছে। নূতন '৯৪, আনন্দের আকুলতা—সুখের কোলাহল—প্রাণের বাসনা ও পিপাসা লইয়া, প্রকৃতির চারি দিকে মায়ার জাল পাতিয়া, হাসামুখে আসিতেছে। বুঝিয়াছি পুরাতন '৯৩-ফুল, শুকাইয়া, প্রেমের হাসি অসম্পূর্ণ রাখিয়া, নীরবে ঝরিয়া অদৃশ্য হইতেছে! নূতন ৯৪-ফুল, ফুটিয়া আবার সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া, আলো করিতে, অশ্রুবারি মুছাইতে, অগ্রসর। মরি কি সুন্দর,—কান্নার মুখে হাসি!—বিরহের ভিতরে প্রেম! কি সুন্দর! ইহা প্রকৃতির নিয়ম। Nature abhors vacuum—শূন্য কিছুই থাকে না। প্রকৃতি কর্ম্মাত্মিকা—কর্ম্মরূপিনী। প্রকৃতি, মাতা। প্রকৃতির অদৃশ্য গর্ভে রাসায়নিক আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ-কার্য্য অবিরাম হইতেছে। প্রকৃতির কার্য্য-বিরাম নাই। কার্য্য চলিতেছে। তাহার ফল কি, তাহা কে জানে? কে বলিতে পারে? এ প্রকৃতি-কার্য্যের নিবৃত্তি কবে হইবে? কখন হইবে কি?

আজ, নগেন্দ্র-৯৩'রও শেষ। আজ নগেন্দ্র, ৯৪। আজ তাহার নূতন বৎসর। জীবন পুস্তকের পাতা আর একখানি বাড়িল। শেষের সিঁড়িতে একপদ অগ্রসর হইল। শুক ৯৩'র পাতাখানি, দেখিতে দেখিতে, ৩৬৫ দিন পূর্ণ করিয়া—কত ফুল ফুটাইয়া আবার কত ফুল চিরদিনের মতন ঝরাইয়া—কত বসন্ত-মুকুলের অশ্রুবারি চিরদিনের মতন সৃজন করিয়া, কত গৃহে আনন্দের বাঁশীর তান তুলিয়া, জগতের চোখের উপর দিয়া, অতি ক্ষীণ পদক্ষেপে, বিরহিণীর স্বপ্নভ্রান্ত উদাস ছায়াময় মৃদু চকিত হাসির ন্যায়, অসীম অতীত গর্ভে মিশাইল। আহা! সে বড় দুঃখে গিয়াছে! তাহাকে জগৎ বিদায় করিয়া দিয়াছে! জগৎ সেই নির্ব্বাপিত, স্মৃতি-

অবশিষ্ট গত অতীত দৃশ্যের উপর এক অন্ধকারময় পাষাণ যবনিকা ফেলিয়া তাহার পৃষ্ঠে নূতনের শত-চিত্রময়ী জ্যোতির্ম্ময় পট হাসিতে হাসিতে আঁকিতেছে। দেখ, বৃদ্ধ ৯৩ দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে, ৯৪এ মিশিয়া গেল। আর নগেন্দ্র? তাহার কি? তাহার সমস্তই বিপরীত। তাহার জীবন-পুস্তকের অতীত পাতার সঙ্গে পরের এই নূতন পাতার মিল কিছুই নাই! যেন ইহা একখানা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পুস্তকের পাতা। তাহার জীবন-পুস্তক এইরূপই বটে। দেখ, ইহার মিল কোথাও নাই! সে জীবন সহস্র প্রকারের। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীপূর্ণ। তাহা আগা-গোড়া গোলমালে ভরা—শৃঙ্খলরহিত—ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গপূর্ণ! যেন একটা অঙ্ক-আলোচনার কতকগুলো ভুলের সমষ্টি। হায়! তোমরা কেহ কি তাহার ভুল মিলাইয়া দিতে পার?

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর সমাপ্ত হইল। আবার বৎসরে বৎসরে আজ দু বৎসর। সেই অবধি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—শূন্য! আশার আলোক নির্ব্বাপিত! হায়! কে বলে জীবন সুখের? জীবন দুঃখের! যে একটি তারকা, দুই বৎসর পূর্ব্বে জীবন আকাশ উজ্জ্বল করিয়া, শত জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া হাসিতেছিল, আজ তাহা কোথায় গেল? কেমন করিয়া গেল? ঐ নীলিমাময়ী শত স্বপ্ন-মাখা চিররহস্যময় মানব আকাশের কোলে কি—সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? কৈ, আর কোন তারা ত ঘুমায় নাই! সব তারাই ত জাগিয়া! কেবল আমার তারকাটিই অদৃশ্য হইল? সে শরতের প্রেমময় তারা, আমার এই শূন্য প্রাণে কত নূতন স্বপ্ন, কত নূতন সৌন্দর্য্য, কত নূতন গান, কত নূতন কবিতা, হাসিতে হাসিতে, সৃজন করিতেছিল? হায়! সে যে আমার জীবন ছিল! ১২৯১ আমার সে তারা। সেই '৯১-তারকাই আমার এ জীবন ফুটাইয়াছিল। সে '৯১ তারকা আজ কোথায় গেল! হায়! এইরূপ একটির পর আর একটি করিয়া আমার সব তারাই ত খসিয়া যাইতেছে! হায়! জগতে আমার পরিসর কমিয়া আসিতেছে কেন? আমার সব স্নেহের বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে কেন? আমি জগত-তরুতলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি কেন?

১২৯১, কখন বুঝিতে পারি নাই। তাহা একটা স্বপ্ন ছিল। তাহা আমার জীবনের বিস্মৃত—ভুল। যেন একটা হারান পরিচিত গলার দূরাগত অস্পষ্ট গান। নব বসন্ত। অপরিচিত দেহের স্পর্শ। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব। Shelly'র Epipsychidion'র "sweet spirit" এমিলি। হায়, বৎসর যত যাইতেছে—অগ্রসর হইতেছে, ৯১ও তত পিছাইয়া দূরবর্ত্তী হইতেছে! তবে কি, ৯১, ৯২'র জন্য গিয়াছে? ৯১, ৯২'র নহে। তাই গিয়াছে? ৯২ হইয়া থাকা তাহার সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাও কি হয়? পুরাতনের নূতনত্ব—

মৃতের জীবন—কোথায়? নির্ব্বাপিত প্রদীপে আলো কবে দেখিয়াছ? ঝরে-পড়া ফুল কি কখন ফোটে? দগ্ধাবশিষ্ট ভস্মের মধ্যে সে সুন্দর দেহ—সে রূপ—সে আলো—আর নাই! '৯১-দিন চলিয়া গিয়াছে! রাত্রি আসিয়াছে। এ অন্ধকারময় রাত্রিতে সে দিনের সূর্য্য-মুখ কোথায় দেখিব? আর কি তাহা দেখা যায়!

১২৯৪, ১২৯১'র মৃত্যু। সুখের দুঃখ। আলোর অন্ধকার। আর আমার? কি? দুখের নূতন অধ্যায়—অমাবস্যার অমাবস্যা, প্রতিপদ। সংসারে সাধের পূর্ণ চাঁদ প্রতিপদে উদয় হয় না। জীবন-কাননে সুখের ফুল কটা? আমার এই যত্ন-শূন্য, ফলপুষ্পহীন ভগ্ন জীবন-কাননে যে একটি স্থান-ভ্রষ্ট—আশার অতীত—পারিজাতের—পারিজাতেরও শোভার অধিক সে—কি সে—কি বলিব? বলি, স্বপ্নশ্রুত মোহময় গানের আভাস,—গন্ধ পাইয়াছিলাম, যাহা, '৯১-রঙ্গভূমির একমাত্র অভিনয়, যে '৯১ নগেন্দ্র-দশের শূন্যের একমাত্র পৃষ্ঠ-পূরক এক ছিল, সেই ফুল, সেই গান, সেই মোহ, সেই অভিশপ্ত অপ্সরা, সেই কি?—সময় '৯১'র কাজ সমাপ্ত করিয়া, আমার কানন শূন্য করিয়া, তাহার কি জানি কি এক অদৃশ্য অস্পষ্ট ভাব রাখিয়া, সেই '৯১'র হাত ধরিয়া—জগৎ হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া—অনন্ত অজ্ঞেয় পথে মিশিয়া গিয়াছে। কর্ণধার-বিহীন তরণীতে চাপিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।

আজ এই ধূলিময় পোড়ো বাগানেও নূতন ৯৪'র মধুর প্রভাত-কিরণ প্রবেশ করিল। আমার হাত ধরিয়া ডাকিল! প্রেমের মালা গলায় দিল! হায়, কার গৃহে কে রে! মিলন আর কি হয়! মৃতের মুখে আর কি হাসি ফোটে! নূতন আসিয়া ডাকিতেছে—সাধিতেছে। হায় সে কেন এল! তাহার কথা কে শোনে? কে তাহাকে আদর করে? চিনেই বা কে? নূতনে পুরাতনে প্রণয়—বিবাহ—কখন হয় না। দুইটা বিভিন্ন জগৎ। দুইটার প্রকৃতি, গুণ এক নহে। নূতনে-নূতনে মিলে, পুরাতনে-পুরাতনে মিলে। প্রকৃতির নিয়ম, জগতের শূন্য ঢেকে রাখা। তাই, কান্না কখন হাসে না। হাসে জগৎ। জগৎ হাসি দিয়া কান্না চাপা দেয়। বিরহেরও প্রেম নাই। প্রেম জগতের। জগতের বিশাল প্রেমের মধ্যে বিরহ ডুবিয়া থাকে। বিরহের পর মিলন নাই। থাকিলেও তাহার সেই পূর্ণ স্ফূর্ত্তিকর মূর্ত্তি আর দেখা যায় না। মৃত ব্যক্তির নূতন জীবন অসম্ভব। জীবন থাকিতে পারে। কিন্তু সে আকার আর থাকে না। ও ৯৪ আমার নহে। উহা জগতের। আমি পুরাতনের,—'৯১'র। আমি অতীত—মৃত। ৮ '৯১।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।